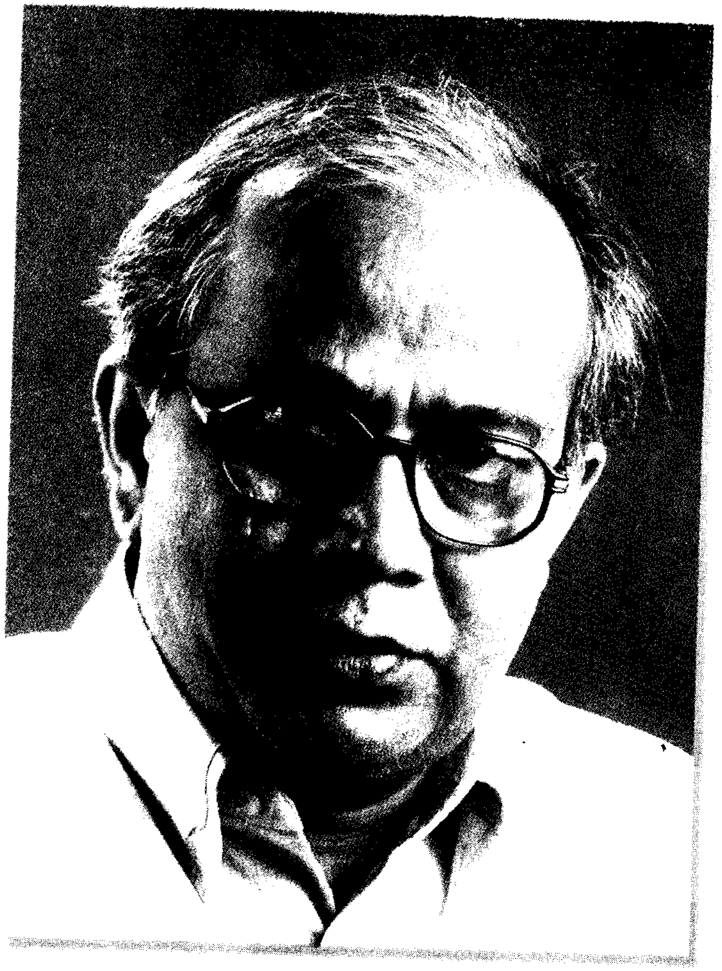
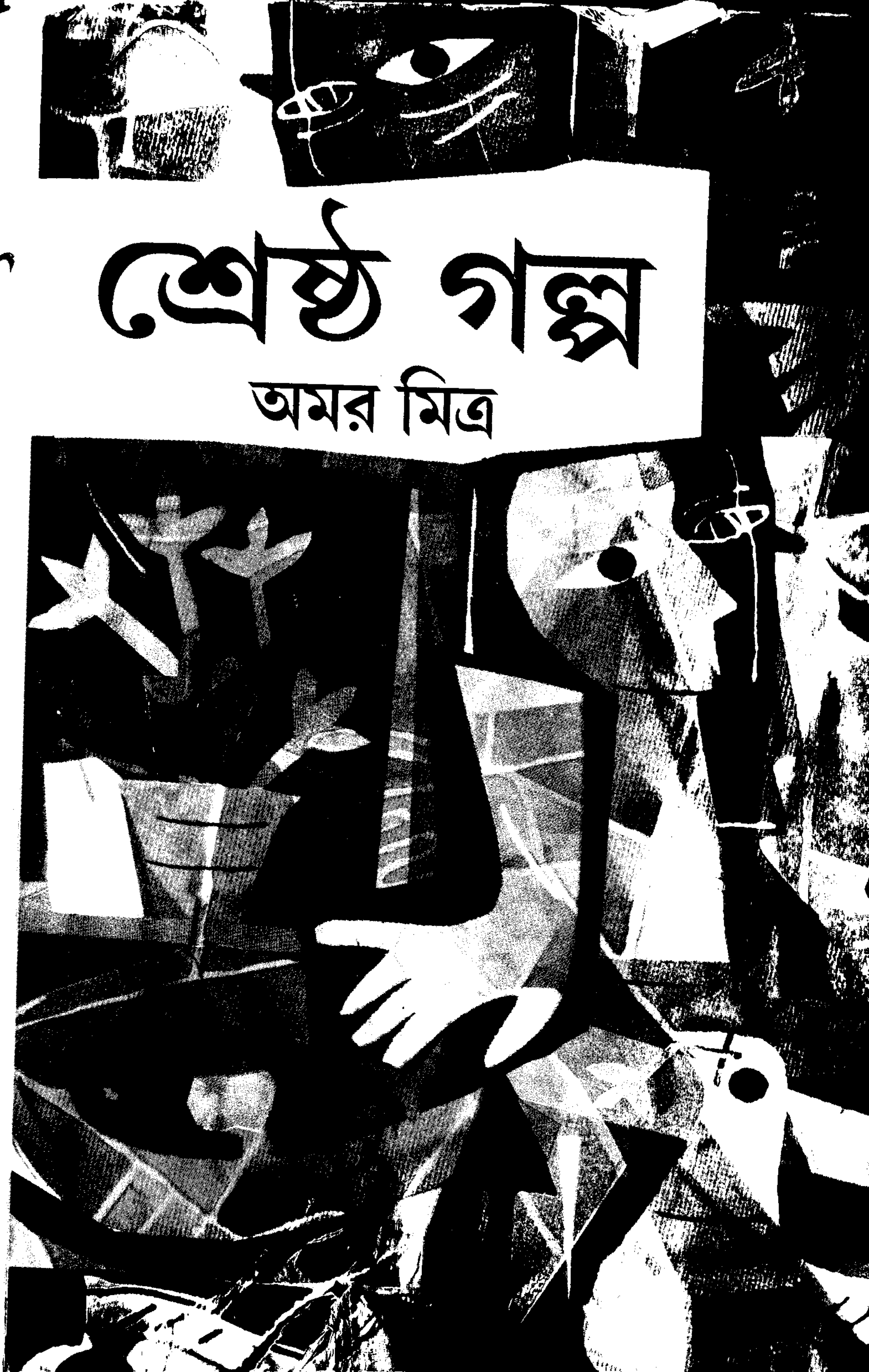


শ্রেষ্ঠ গল্প ◆ অমর মিত্র



শ্রেষ্ঠ গল্প

অমর মিত্র

গল্পক্রম ঃ

মেলার দিকে ঘর / ১
গাঁওবুড়ো / ৮
ডাইন / ১৬
ভারতবর্ষ / ২৪
দানপত্র / ৩৩
আগুনের দিন / ৪৩
হস্তান্তর / ৫৩
দুই নারী / ৬৩
ভুলো মৌমাছি / ৭১
বাদশা ও মধুমতী / ৮৪
জল ও বায়ু / ৯৯
কোকিল / ১০১
হনন আত্মহনন / ১১৩
নির্বাসিত / ১২১
উড়োমেঘ / ১৪২
সপ্তডিঙা / ১৫৭
বালিকামঞ্জরী / ১৭৩
স্বদেশযাত্রা / ১৮৯
কালো জল / ২০২
যাদুজীবন / ২১৬
ব্ল্যাকম্যাজিক / ২২৬
কেরানির সমস্ত জীবন / ২৩৭

ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ গল্প কথাটাতেই একটু অস্বস্তি হয়। ছোটগল্পের নির্মাণে অমর মিত্রের তুল্য বুৎপত্তি যাঁর, তিনি নতুন শতকের সঙ্গে কঠিনতর বোঝাপড়ার সূত্রে, ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত লেখা বর্তমান সংকলনের এই গল্পগুলির শ্রেষ্ঠত্বকে নিজেই ভেঙে দেবেন, এমন আশাই অমরের অনুরাগী পাঠককে মানায়। ওই আড়াই দশকের যে একুশটি গল্প নিয়ে এই বই, তাদের নির্বাচন অমর নিজেই করেছেন। গল্পগুলির ভিতরেই তৈরি গল্পকে ভাঙার আখ্যান মিশে আছে। এই ভাঙনের অনুষঙ্গেই যে বাস্তবের সন্ধানে অবাস্তবের পরিক্রমা বিন্যস্ত হয়েছে, ভাষা পেয়েছে বাস্তববাদের খোঁজে রূপকথার পথযাত্রা, তা মনোযোগী পাঠক মাত্রেই টের পাবেন।

অমর মিত্রের প্রথম গল্পসংকলন **মাঠ ভাঙে কালপুরুষ**-এর (গৌরব প্রকাশনী-১৯৭৮) প্রথম গল্পে নিরন্ন বাপ সহদেব চাল আর নগদ কুড়ি টাকার বিনিময়ে চোদ্দবছরের মেয়ে লক্ষ্মীকে বিক্রি করেছিল। সেই '**মেলার দিকে ঘর**'(১৯৭৪) দিয়ে অমরের শ্রেষ্ঠগল্পও শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় গল্পসংকলন **দানপত্র** (সংবাদ,১৯৮৬) থেকে যে পাঁচটি গল্প বর্তমান সংকলনে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে '**আগুনের দিন**' (১৯৮২) আর '**হস্তান্তর**' (১৯৮৫) দানপত্র গল্পগ্রন্থে পরপর সাজিয়ে ছিলেন লেখক। এখানেও সেই ক্রম অপরিবর্তিত আছে। '**আগুনের দিন**'-এ শ্বশুরের সম্পত্তি না-পেয়ে ক্ষুব্ধ সিরাজুল পোয়াতি বিবি নাজমাকে ফেলে গেল শাশুড়ি নেছারণের কাছে; বলে গেল, সম্পত্তির ব্যবস্থা হলে যেন খবর দেওয়া হয় তাকে। বৃষ্টিহীন শ্রাবণের সন্ধ্যায় পোয়াতি মেয়ে নাজমাকে দেখতে দেখতে মা নেছারণ ভাবে, 'এমন মেয়ের মা হওয়া যেমন কষ্ট, তেমনি কষ্ট মেয়ে হওয়া।' 'মেলার দিকে ঘর' অথবা 'আগুনের দিন' কি আসলে নিরুদ্দেশেরই কাহিনী নয়? নিরুদ্দেশ ভবিতব্যের? কিন্তু সেসব কাহিনীকে ছোটগল্পের বুনোটে বাঁধতে লেখকের প্রয়োজন হয়েছিল সহদেবের মতো বাপকে, সিরাজুলের মতো মরদকে, আজবাহার মন্ডলের মতো জন্মদাতাকে, দরকার পড়েছিল সুরত আলির ঔরসজাত পুত্রদের! প্রতিটি চরিত্রই যদি বদলে যায়, তবে সেই অন্যদের ভিন্নতর যুক্তির দায় বইতে হলেও (অর্থাৎ কাহিনীগুলির ঘটনাবিন্যাস আলাদা হলেও) যে লক্ষ্মী, নেছারণ, নাজমারা অন্য অন্য নামে নিরুদ্দেশের নিয়তি থেকে রেহাই পাবে না, গল্পহীনতার সেই নিশ্চিতি তখনো অমর মিত্রের নাগালে আসেনি। যে নিটোল গল্পটিতে তখন তিনি পৌঁছতেন, সেই গল্পকে ভাঙতে ভাঙতে, কাহিনীর শেষ ধাপ থেকে প্রথম ধাপে পিছতে পিছতে, সেই বেদনারই হদিস পাঠকের পাওয়ার কথা, যে বেদনা কেবলমাত্র লিখিত গল্পটিরই উৎস নয়; বিকল্প বহু অলিখিত গল্পের সূত্রও ওই বেদনায় নিহিত আছে।

'**হস্তান্তর**' গল্পে বিবিজানের সাম্প্রতিক ঘরকে অর্থাৎ বিবিজানের চতুর্থ পক্ষ মাজারুলের বাড়িকে দেখছি গাঁ-উজাড় পাড়ির অস্থিষ্টের উপমায়। পাড়ি দিচ্ছে বিবিজানের দ্বিতীয় পক্ষের দুই দেওর আচ্ছা মিঞা, মতিন মিঞা, বিবিজানের তৃতীয় পক্ষের মরদ মোতালেব মিঞা—

'বিবিজানের ঘর আর কতদূর! তার কাছে যে গচ্ছিত রয়েছে নানা মানুজনের নানা সম্পদ। চাষার জমি চাষার হৃদয়। সেই খোঁজে দুজন থেকে তিনজন, তিন থেকে চার, এমনি করে গাঁ উজাড় পাড়ি।' এমন পাড়ি কেন, সে প্রশ্নের সরলতম উত্তরে বলা যায়, বিবিজানের যে মন বসে না কারো ঘরে। কেন মন বসে না? কেন সে আচ্ছা-মতিনের দাদা কালু মিঞার জমি নিয়ে মোতালেবের ঘরে যায়? কেনই বা আবার মোতালেবের জমি নিয়ে চলে যায় মাজারুলের সংসারে? এও কি এক নিরুদ্দেশযাত্রাই নয়? যে কোনো নিরুদ্দেশযাত্রারই কি কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে না? না গিয়ে কী করবে বিবিজান? জীবনের যে যাপন তার জন্য নির্দিষ্ট, সেখানে তো সঠিক চেনা যায় না, কেই বা মতিন, কোনজনই বা আচ্ছা! সম্ভবত আজগার , কালু, মোতালেব, মাজারুলকেও একে অন্যের থেকে আলাদা করবার সুযোগ বিবিজানের জীবনভর মেলেনি। বারবার সে শুধুই নামহীন বিবিজান! বিবিজানের এই অনবরত চলে যাওয়ায় কি কোনো প্রাকৃতিক প্রতিশোধও মিশে থাকে? 'হস্তান্তর'-কে 'আগুনের দিন' এর ঠিক পরবর্তী গল্প হিসেবে সংকলনে পেলে, পাঠক কি অমর মিত্রের গল্পভাবনায় কোনো বাড়তি অর্থ যোগ করতে পারেন?

'হস্তান্তর'-এর ঠিক পরেই আছে গল্পহীন গল্পের বেশ পরিণত চিহ্ন **'দুইনারী'** (১৯৮৭) **আসনবনি** (করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৩) সংকলন থেকে নির্বাচিত এই কাহিনীতে সুন্দরী দাসী আর অন্নদা, দুজনেই ভাবে, অন্যজনের জীবন বুঝি তার নিজের জীবনের না-মেটা সাধ। দুজনের কেউই জানে না, যাকে তারা নিজের নিজের না-পাওয়া সুখের উপমা ভাবছে, আসলে তা তাদের দুজনেরই আয়ত্তাধীন, চিরচেনা দুঃখ। সুন্দরী দাসী যদি অন্নদা হতো আর অন্নদা যদি হতো সুন্দরী, তাহলেও এ কাহিনী এতখানিই গল্প থাকত। পাঠক তাই ভাবতে পারেন, নাজমার কাহিনী আর বিবিজানের গল্পের ঠিক পরেই এই 'দুই নারী'র অবস্থান একান্তই সংগত এবং যথার্থ। প্রতিরোধের বিভিন্ন অবয়বকে অবশ্য অমর মিত্র অনেক আগে থেকেই তার গল্পে লালন করেছেন। বর্তমান সংকলনে দানপত্র থেকে নেওয়া আরো যে তিনটি গল্প আছে সেই **'ডাইন'** (১৯৮০) **'ভারতবর্ষ'** দানপত্রে ছিল **'আত্মাপাথর'** নামে (১৯৮০) এবং 'দানপত্র'র (১৯৮০) কথা বলছি। হরি নায়েক গাঁয়ের গরিব-গুরবোদের ভগবান, আর বাবুদের বড় ভয়ের কারণ। তাই নায়েকের মৃত্যুকে বাবুদের চোখের আড়াল করতে শাখা-সিঁদুরে সেজে থাকে নায়েকের বউ, প্রতীক্ষা করে আর এক নায়েকের জন্মের। গ্রাম বাঁচানোর চেয়ে বড় পুণ্য কিছুতে নেই। সুবর্ণরেখার সূর্যডোবা চরে নায়েকের কবরে প্রদীপ দেখায় বউ। বাবুরা ভাবে, মেয়েটার চরিত্র খারাপ, 'ডাইন' হয়ে যাচ্ছে।

১৯৮০ সালে এমন আশার ব্যঞ্জনায় কাহিনী শেষ করার অর্থ আজকের থেকে নিশ্চয় বেশি ছিল। **'ভারতবর্ষ'** অথবা **'দানপত্র'**ও শিল্প সংগতি মেনে দেশ আর তার মানুষের কথা বলে, সেখানে বঞ্চনা-শোষণ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর সরবতা-নীরবতার শব্দবিন্যাস ইচ্ছাপূরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। দেশের ইতিহাসকে দেশের সমকালের সঙ্গে যুক্ত করবার শিল্পসম্মত অভিপ্রায় মাঝে মধ্যে সরল আশাবাদে স্তোকবাক্য খুঁজত। এমন খোঁজে দোষের কিছু নেই। আর ওই খুঁজে ফেরায় যে সীমা আছে, তাকে পেরনোর সংকল্প অমর মিত্রের ছিল। সেই পেরতে চাওয়ার একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপকে হয়তো শনাক্ত করা যায় বর্তমান সংকলনের আগে পর্যন্ত অগ্রন্থিত **'ভুলোমৌমাছি'** (১৯৮৮) গল্পে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৪ এই আঠারো বছর ধরে একজন মানুষ ভারতের এই প্রদেশ পশ্চিমবাংলার এক পুরনো

গঞ্জে বার বার ন'বার তার সন্তানদের শবদেহ নদীর কোল ঘেঁষে মাটিতে পুঁতেছে। প্রতিটি জন্ম, হয়তো বা প্রতিটি মৃত্যুও মানুষটির স্মৃতিতে মিশে আছে দেশের রাষ্ট্র-রাজনীতির, সমাজ-সংস্কারের, প্রতিরোধ-আন্দোলনের, ক্ষমতা-ব্যর্থতার অনুষঙ্গে আশা করবার মতো, সে আশার ভাঙনের মতো, নতুন আশার জাগরণের মতো, আবার সেই পরের আশাও পর্যুদস্ত হওয়ার মতো চরম নৈর্ব্যক্তিক আর পরম ব্যক্তিক সব ঘটনাপ্রবাহে। আসমান থেকে জমিন ব্যেপে প্রকৃতির অনুপুঙ্খ খুঁজে খুঁজে মানুষ তার সন্তানের নাম অর্জন করে। অথচ এমনি দিন, এমনি দেশ, এমনি সংসার, এমনি পিতৃত্ব-মাতৃত্ব যে, কয়েকদিনের বেশি আয়ু পায় না সেইসব মানবসন্তান। কাহিনীর অন্তিমে গল্পকার নিজে হাতে ভেঙে দেন এতক্ষণ ধরে বানিয়ে তোলা বিশেষ গল্পকে। সেই ভাঙনের ভিতর দিয়ে আঠারো বছরের শূন্যতা হাহাকার করে ওঠে। গল্পের আবরণে পাঠক যেন জীবনের বাস্তব থেকে রেহাই না পান, এরকমই বোধকরি অমরের অভিষ্ট। অথচ গল্পের নামকরণ থেকে শেষ বাক্যটি পর্যন্ত রূপকথায় আড়াল করেই তিনি বার বার মর্মভেদী বাস্তবকে পাঠকের চেতনায় পৌঁছে দেন।

সমকালকে রূপকথায় বাঁধবার স্বপ্ন অবশ্য অমর মিত্রের আরো পুরনো। সংকলনের দ্বিতীয় গল্প **'গাঁওবুড়ো'** (১৯৭৭) যখন লেখা হয়েছিল, সেই সাতের দশক অমরের সাহিত্যচর্চার প্রথম দশক। ছোটগল্পের ঐতিহ্যে একান্ত সম্পন্ন এই বাংলা সাহিত্যের প্রান্তরে নতুন লেখক তখনো রূপকথার সাধ নিয়ে বাস্তববাদের ছককে পুরো ভেঙে ফেলতে পারেন না। 'গাঁওবুড়োর' মতো গল্পে বড়বাবুর মোটিভ জরুরী হয়ে পড়ে। রূপকথাতেই পৌঁছতে চান অমর। কিন্তু বাস্তববাদের বাধা তিনি পেরতে পারেন না। অথচ সেই সাবেকি বাস্তববাদ অমরের সমকালীন বাস্তবকে শিল্পের সত্যে পুরোপুরি গাঁথতে অক্ষম। অবশ্য **'মাঠভাঙে কালপুরুষ'** বইয়ের গল্পগুলি যখন লেখা হচ্ছিল, সেই সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল কিছুটা ভিন্ন। সাতের দশকে অমরের যা সমকাল, তাকে তো নয়ের দশকের অমর সমকালীন ভাবতে পারেন না। তাই তখন তাঁকে **অমর মিত্রের ছোটগল্প** (প্রতিক্ষণ, ১৯৯৪) সংকলনে গ্রন্থিত **'জল ও বায়ু'** (১৯৯০) অথবা **আসনবনিতে** যুক্ত **'কোকিল'** এর (১৯৯১) মতো গল্প লিখতে হয়।

গত শতকের সাতের দশকে অমর রূপকথা বানাতে চেয়ে বাস্তববাদের দুয়ারে ফিরতেন। আটের দশকেরও অনেকদূর পর্যন্ত সেটাই ছিল অমরের পরিক্রমার চরিত্র। কিন্তু বিশ শতকের সর্বশেষ দশকটিতে অমরকে তাঁর পাঠক বার বার দেখছেন বাস্তবের অন্বেষণে রূপকথায় পৌঁছে যেতে। গল্পের দেশটার নাম তখন হচ্ছে পছন্দপুর। কিন্তু নিরুদ্দেশের কিংবা মরণের নিয়তিকে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেও মানুষের তখন রেহাই মিলছে না পরিপার্শ্বব্যাপী পণ্যরতির প্রবল স্পৃহা থেকে, অর্থের অনন্ত চাহিদা থেকে (**'জল ও বায়ু'**)। আবার সরকারি অফিসে এসে গেঁয়ো বাপ বাবুদের বলছে, খাটিয়ে খাটিয়ে তার সদ্য চাকরি পাওয়া ছেলেটার বুকের দোষ বাঁধিয়ে দিক দেখি অফিসবাবুরা। তবেই না জন্ম-জন্ম চাষার ছেলের পুণ্যি! তেমন রোগই তো বাপের জমিদার মনিব ধরিয়ে দিয়েছে বাপের বুকে। উপরি ছাড়া এক লাইনও কাজ করে না যে-অফিসবাবু, তার কানে ওই গেঁয়ো বাপটার গলাকে ঠেকে অসম্ভব কর্কশ। আর অমর তাঁর গল্পের নামকরণে পেয়ে যান 'কোকিল'। অর্থাৎ, এইসব কাহিনীর সমকালে যেন যে কোনো গল্প শুরু হওয়ার আগে থেকেই গাঁওবুড়ো জানে যে, বড়বাবু নেই। গাঁওবুড়োর সেই জানা লেখকের বেদনার অংশ হয়ে যায়। যে বেদনাবিহীন লেখক নিজের লেখায় পৌঁছতে অপারগ।

এই বেদনার কথা অমর নিজেই বলেছিলেন **অমর মিত্রের ছোটগল্পের** শুরুতে : 'বিষয়

নিয়েও তো লিখি না। লেখার পরে তা হয়তো বিষয় হয়ে যায়। লেখার আগে তো তা থাকে সামান্য বেদনার অনুভূতি। হয়তো কিছুই না। শূন্য থেকে যাত্রা।' 'সামান্য কথা' শীর্ষক এই উপক্রমণিকাটি অমরের গল্পভাবনাকে বুঝতে বেশ জরুরী। তাঁর প্রথম দুটি গল্পসংকলনে প্রায় সবগুলোই গ্রামের গল্প, তৃতীয় সংকলন থেকে নগরকেন্দ্রিক কাহিনীর অনুপাত বাড়ছে, আর চতুর্থ সংকলন **অমর মিত্রের ছোটগল্পে** এবং পঞ্চম গল্পসংকলন **বসন্তবিলাসে** (মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৬) নগর এবং নগরায়নের আনুষঙ্গিক কোনো না কোনো বিষয় প্রায় প্রতিটি গল্পেই খুঁজে নেওয়া যায়। অমরের গল্প তবে ক্রমে গ্রাম থেকে শহরে এল, এমন একটা সরলরেখা-পথ পাঠক বানাতেই পারেন। তবে অমর মিত্র যখন মূলত গ্রামের গল্প লিখেছেন, সেটা তাঁর গল্প তৈরি করার সময়। লেখকের কাহিনী বানাতে চাওয়া আর সে কাহিনীর গল্প হয়ে ওঠার মধ্যে ফারাকটা তখন, অমরের সাহিত্য কীর্তির ওই প্রাথমিক পর্যায়ে, স্বভাবতই তুলনায় বেশি ধরা পড়ত। বেদনা, ভাষা আর বিষয়ের সেতুবন্ধনে যতই অমর আরো আরো সাবলীল হয়ে ওঠেন, ততই তাঁর হাতের গ্রামের গল্পে, গল্পের গ্রাম আরো অনায়াসে জীবনের অথবা মরণের গ্রাম হয়ে উঠতে পারে।

১৯৯৫ সালে লেখা হয়ে যায় 'গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি'র মতো গল্প। যেখানে মহিষবাথান বুনোপাড়া ঢুকে যায় সল্টলেক মিউনিসিপ্যালিটিতে। লেখক একসঙ্গে অনেকগুলো গল্প বলেন—এক বুনোপাড়া মরে যাওয়ার গল্প, মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে ওঠার গল্প। মরে যাওয়া বুনোপাড়ার যে সব মানুষ নতুন বুনোপাড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল, নতুন বুনোপাড়া থেকে অথবা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তাদের হারিয়ে যাওয়ার গল্প। এযাবৎকাল যত নিরুদ্দেশের কাহিনী অমর বুনেছেন, তার সার্থক ভাঙন এই বুলু-শ্যাম-তাদের মা, বুটু-বুনি-শম্ভু-উঠোনের করমচা গাছ-পেয়ারাগাছ-মাদারগাছ কোকিল-উঠোনের ঘাস-মৌমাছি-ভীমরুল-ফড়িং-শীত-বসন্ত-বোশেখ-জষ্ঠি-আষাঢ়-বাতাসের নিরুদ্দেশের আখ্যানে। আবার পুরনো বুনোপাড়ার যেসব মানুষ স্বপ্নেও নতুন বুনোপাড়াকে ভাবতে পারে না, নতুন বুনোপাড়াকে যারা সেই নৌকা চলা, বিদ্যেধরী, সুন্দরবন, কুলটির গন্ধে ভরা পুরানো বুনোপাড়ার ভেবে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের একটু-একটু করে মরার গল্পও 'গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি' বাদ দেয় না। ১৯৭৭-এর গাঁওবুড়োই হয়তো ১৯৯৫-তে শম্ভুর বুড়ি ঠাকুমা হয়ে বুনোপাড়ায় (হয়তো বা কুসুমপুরেও) বসে বসে আর্তনাদ করে 'রাক্ষসী, রাক্ষসী, সব গেল!' অমর মিত্রর দেশের গ্রাম মরণ থেকে আরো ঘোর মরণের আঁধারে তলিয়ে যায়। সেই মরণের ভিতর থেকে উৎসবিহীন, পত্তনহীন নগর আচমকা জেগে ওঠে। লেখকের দেশের নদী-গাছ-পাহাড় এমনি গৌণ যে, মৌন অসহায় মানুষের পিছনে পিছনে তারাও কোথায় হারিয়ে যায়। দেশের গবেষক-পন্ডিতরা কিন্তু বোঝে না, পরিবারের সবাই যখন হারিয়ে গেল, ঠাকুমা কেন পড়ে রইল মাটি আঁকড়ে!

সাতের দশকে যিনি 'পার্বতীর বোশেখমাস' অথবা 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এর মতো গল্প লিখেছেন (**'মেলার দিকে ঘর'** কিংবা **'গাঁওবুড়ো'**র সঙ্গে **'পার্বতীর বোশেখ মাস' 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'**ও গ্রন্থিত হয়েছিল অমর মিত্রের প্রথম গল্পসংকলনে), আঠারো বছর পরে ১৯৯৫ তে সেই একই লেখক যেন দেখেন যে, ভাঙবার মতো কোনো মাঠ আর তাঁর দেশে রূপাইয়ের জন্যে পড়ে নেই। যেন তিনি বোঝেন যে, একজন পার্বতীর খিদের গল্প তাঁদের বাস্তববাদী কলমে যতই লেখা হয়, ততই সে খিদের মর্মান্তিক আর্তি নিজের সম্মান হারায়। পাঠক বোঝেন, কেন **'পার্বতীর বোশেখ মাস'** অথবা **'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'** শ্রেষ্ঠ গল্পের

অন্তর্গত নয়। কিন্তু বোঝা যায় না, কোন যুক্তিতে 'গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি' বর্তমান সংকলনের বাইরে থাকল। ১৯৯৫-তে পরপর অমর লিখেছিলেন 'সপ্তডিঙা', 'চাঁদবালি' 'গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি' এবং 'বালিকামঞ্জরী' (প্রত্যেকটিই **বসন্ত বিলাস** সংকলনে গ্রন্থিত) ওই কাহিনী চারটিকে আমি এখনো বলতে পারি অমর মিত্রের গল্প জুড়ে আমার পছন্দপুরের রাজধানী। **শ্রেষ্ঠ গল্পে** লেখক 'চাঁদবালি' আর 'গাছ পাখি...'-কে বাদ দিয়েছেন। 'চাঁদবালি'-কে বাদ দেওয়ার কারণ তবু বোঝা যায়। ইতিমধ্যে **অশ্বচরিত** জুড়ে অমর 'চাঁদবালি'র যন্ত্রণাকে দীর্ঘতর বিন্যাসে গ্রথিত করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক ব্যগ্রতায়। কিন্তু ১৯৯৯ তে 'ব্ল্যাক-মাজিক' পর্যন্ত কোনো গল্পে 'গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদির'র গঞ্জনা আর ব্যঞ্জনাকে, তার রূপকথা আর বাস্তবকে, সে গল্পের অনুক্তের স্বরকে, ব্যক্তের ধ্বনিকে লেখক পেরিয়ে যেতে পারেননি। পেরনোর ওই কঠিন বাঁকটাকে কি নতুন শতকের প্রথম-প্রথমই বুঝতে চাইছেন লেখক? 'গাছ-পাখি....'র অসামান্য বন্ধন থেকে নিজের জন্য, নিজের পাঠকের জন্য পরিত্রাণ চাইতে হচ্ছে অমরকে সাহিত্যিক গরজেই? তাই কি শ্রেষ্ঠ গল্পের আড়াই দশকে (১৯৭৪-১৯৯৯) 'গাছ-পাখি....' অনুপস্থিত?

ছোট বোন সারী আর তার বড় দিদি গৌরীর গল্প 'সপ্তডিঙা' চেয়ে না-পাওয়ার গল্প। মানবজীবনের দৈনন্দিন যাপন জুড়ে সব গল্পই তো কোনো-না কোনো অর্থে চেয়ে না-পাওয়ারই আখ্যান। ১৯৯১-এর **'নির্বাসিতা'**য় (ইতিপূর্বে **আসনবনিতে** গ্রন্থিত) কিংবা ১৯৮৯-এর **'বাদশা ও মুধমতী'**তে (ইতিপূর্বে **পাঁজর** সংকলনে [সৃষ্টি,২০০০] গ্রন্থিত) মানুষের অসম্মানের পাওয়ার আর সহায়বিহীন চাওয়ার যে যন্ত্রণায় লেখক দীর্ণ হয়েছিলেন, তার বিন্যাস যেন সম্পূর্ণ হলো 'সপ্তডিঙা'র বয়ানে। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবার অধিকার যে শুধুই পুরুষের, এ ধারণা ভেঙে পুরুষকে ভিখিরি বানাতে পেরেছিল চম্পা। সারী-গৌরীর চম্পা হওয়া হলো না। দিদি গৌরী ছোটবোন সারী হতে পারল না, কিন্তু গৌরী জানল, যৌবনের শেষপ্রান্ত ছোঁয়া তার নিষ্ফল, বর্তমান ভর করেছে সারীর অদূর ভবিষ্যৎকে। অথচ সারী জানল না যে, সে গৌরী হতে শুরু করেছে। গৌরী-সারীর স্বপ্নের সপ্তডিঙার আখ্যান, গৌরী-সারীর বিফল বিজ্ঞাপনে মিশে যাওয়ার আখ্যান নিছক কোনো 'লোক দেখানো নারীবাদকে' ঠোঙা করে উড়িয়ে দিল গৌরী-সারীর চরম অপমানের খাম-চিঠির পিছনে পিছনে।

অমর মিত্রের গল্পভাবনা গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছে---পড়বার এই ধরনটাতে আমি যে খুব আস্থা পাই না, সেকথা আগেই বলেছি। বরং গ্রামের গল্প আর শহরের গল্প বলে আলাদা যে কিছু নেই, সেটা প্রমাণ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। 'বালিকা মঞ্জুরী' গল্পে তাই বুলির বয়ে আনা গৎখালি গাঁয়ের কাহিনীকে কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটবাড়ির আখ্যান থেকে আলাদা করা যায় না। ফ্ল্যাট বাড়ির এক ঘরে ইংলিশ মিডিয়মে অসফল, পিঙ্কির মা-বাবার সংলাপ, অন্যঘরে বুলির কথকতায় চাষা আর চাষাবউ সাজা ডাইনি ভূতের সংলাপ মিলে-মিশে এক তৃতীয় ভাষা তৈরি হয়। এ ভাষা ঠাকুরমার ঝুলির ভাষা নয়, যে ভাষার কাছে একান্ত সৃজনশীল সমর্পণে গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি'র লেখক মানুষ প্রকৃতির মর্মভেদী নিরুদ্দেশ যাত্রাকে অমোঘ করে তুলেছিলেন। 'বালিকা মঞ্জরী'র এই তৃতীয় ভাষা অমরের অন্য এক উদ্ভাবন, যাকে কাহিনীর শেষ বাক্যটি পর্যন্ত গল্পকার সযত্নে জিইয়ে রাখতে চান। চারটি গল্পের মধ্যে 'বালিকা মঞ্জরী'র চ্যালেঞ্জ কঠিনতম। অনাহত বাল্যের সব থেকে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে বুলি আর পিঙ্কি। বালিকা থেকে কিশোরী থেকে যুবতি হয়ে, যৌবনের লজ্জা আর যন্ত্রণা

বয়ে মধ্যবয়সের প্রান্ত দেখতে যে সময়টুকু লাগে, সেটুকু বুলিকে দিতে হবে ক্রমে ক্রমে 'চাঁদবালি' গল্পের বাবলি আর তারপরে ঊষা হয়ে বাঁচতে। বুলির বর্তমান ক্রমশই আরো শূন্য হবে, ভবিষ্যৎ হবে আরো নিরুদ্দেশ। কিন্তু পিঙ্কির কী হবে?

'বালিকা মঞ্জরী-তে দেখি, তীর্থর মতো সফল ইংলিশ মিডিয়াম হওয়া বুঝি হলোই না পিঙ্কির। সে কি হবে বাংলা মিডিয়মে পড়া ঝর্ণার মতো? নিজের মায়ের মতো? বালিকা পিঙ্কি যতদিনে যুবতি হবে ততদিনে বুলি থেকে 'চাঁদবালি'র বাবলির প্রথম যৌবনের নিষ্ফল যন্ত্রণায়, 'চাঁদবালি'র ঊষার পড়তি যৌবনের অপমানে পৌঁছনোর সঙ্গে পিঙ্কি থেকে ঝর্ণার মতো একজন হওয়ার ফারাক কতটুকু থাকবে? ততদিনে অমর মিত্রের দেশের স্বাধীনতার বয়স আরো বাড়বে। অমর মিত্রের মাতৃভাষার মূল্য খোলাবাজারের বেচাকেনায় কমতে কমতে শূন্য থেকে ঋণাত্মক অঙ্কের দিকে ছুটবে। বুনোপাড়ার পদ্য অথবা গৎখালির গদ্য তখন আরো ব্রাত্য হবে। বালিকা পিঙ্কি বুলি হওয়া যদি ঠেকাতেও পারে, তারপরে সে আর কতটুকু পারবে? পিঙ্কি যদি 'হনন-আত্মহনন'-এর (১৯৯২) সুচরিতার মতো অথবা 'উড়োমেঘ'-এর (১৯৯৩) মালার মতো মধ্যবিত্ত অন্দরবাসিনীর জীবন চায়, তাহলেও তো এক প্রজন্মের ব্যবধানে তাকে আজকের সুচরিতা-মালা-ঝর্ণার তুলনায় সফলতর ইংলিশ মিডিয়ম হতে হবে।

বিশ শতকের অন্তিম দশকে মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের যেসব আলেখ্য অমরের কলমে এসেছে, সেখানে অনেকসময়েই ঘরণীরা নিজস্ব কোনো কর্মজগতের সংলগ্নতায় বাহিরকে পায়নি। কিন্তু ওই বাইরের অভিঘাত থেকে রেহাই মেলেনি তাদের। এমন অবস্থানে দাঁড়িয়ে তারা প্রতিবাদের ভাষায়, সত্যকথনের বিরল দায়িত্বে, মায়া-মমতার চোখের জলে চিহ্নিত হয়েছে। অথচ নিতান্তই সাধারণ তারা, নীতিবাগীশের গরিমা কিংবা ব্যতিক্রমীর বৈশিষ্ট্য তাদের নাগালের বাইরে। সে অর্থে 'হনন-আত্মহনন' বা 'উড়োমেঘ' (দুটি গল্পই ইতিপূর্বে অমর মিত্রের ছোটগল্পে গ্রন্থিত) অমর মিত্রের গল্পভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি যদিও বলেন, 'বিষয় নিয়ে তো লিখি না.... লেখার পরে তা হয়তো বিষয় হয়ে যায়', পাঠক দেখেন, বিশ্বকাপ ফুটবলের মাতামাতি ('সাত নম্বর', একান্তর ১৯৯০, 'মারদোনা মারাদোনা', দেশ ২৪.৯.৯৪) থেকে বিশ্বসুন্দরী নিয়ে উত্তেজনা ('চাঁদবালি'), ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু-পরবর্তী দাঙ্গা অথবা রাজীব গান্ধীর মৃত্যু-পরবর্তী আতঙ্ক ('জংশন', **আসনবনি**) থেকে কেব্‌ল টিভি-র আগমনে নতুন নতুন অভ্যাসের প্রতি সাম্প্রতিক জীবনযাপনের দুর্নিবার আকর্ষণ ('উড়ো মেঘ')—এই সবকিছুকেই বলা চলে অমর মিত্রের গল্পভাবনার বিষয়। প্রশ্ন ওঠে, 'উড়োমেঘ', কালোজল' (১৯৯৮), 'ব্ল্যাকম্যাজিক' (১৯৯৯) কাহিনী তিনটির প্রত্যেকটি' কি শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল? যখন বিজ্ঞাপনের ক্লেদাক্ত মুখোশে ঢাকা পড়ে গেছে মানুষের মুখ, নর-নারী অন্দর-বাহির জুড়ে যখন মানবশরীর এমন কী মানবমনও পণ্য হয়ে যায়, জীবনযাপনের প্রতিটি বাঁকে যখন চরম সম্মানহানির অভিজ্ঞতা, উৎপাদনের ভিত জুড়ে অর্থনৈতিক সদর্থ অথবা কল্যাণের থেকে অনেক পরাক্রান্ত যখন অনুৎপাদনশীল বিনিময়ের ভেলকি, সে বড় সহজ সময় নয়।

লেখকও তখন নিতান্ত অসহায়। হয়তো বা মানবিক এবং সাহিত্যিক অনিশ্চিতির তাড়াতেই তাঁকে লিখতে হয়ে প্রচুর। আর ভাবতে হয়, 'কালো জল'-এ কিছু নতুন কথা ব্যক্ত হলো তো, যা নাকি 'উড়োমেঘ-এ ছিল না-বলা? বিশ শতক যতই নিজের শেষ মুহূর্তটিকে স্পর্শ করার দিকে এগোয়, ততই বিকিকিনির আবর্তটা ফ্রি-গিফট আর ক্রেডিট ফেসিলিটির তোড়ে

রুচি-অরুচির, সভ্যতা, বর্বরতার, মানুষ-অমানুষের ভেদরেখাগুলো লোপাট করে দিতে চায়। সাহিত্যিককে আবার ভাবতে হয়, 'কালো জল'-এও যা ছিল অনুক্ত, তাকে ব্যক্ত করতে লিখতে হবে 'ব্ল্যাকম্যাজিক'। এমন মনে হওয়ায় এবং আনুষঙ্গিক নির্মাণে দোষের কিছু নেই। পাঠক ও নন্দিত হয়েছেন কিছু ভালো গল্প নাগালে পেয়ে। কিন্তু পাঠকের যদি মনে হয় যে, কোনো নতুন কথাই কি আদৌ বলা হলো পরবর্তী কোনো গল্পে, যা কোনো না কোনোভাবে ব্যক্ত হয়নি? 'গাছ-পাখি-মানুষ-পাথর ইত্যাদি'র বিস্তারে ? সে-গল্পে অমর মিত্র একটি বাক্য কেন, একটি শব্দও বুঝি বাড়তি লেখেন নি! আবার বিশ্বায়নের সংলগ্ন শোষণ বোতল বোতল কোল্‌ড ড্রিংকসে আর কলকাতার পাড়াতুতো সুন্দরী বৌদি আর বেকার দেওরের দেওয়া-নেওয়ায় ভর করে বিশ্বকাপ ফুটবলের গল্প 'মারাদোনা মারাদোনা' বানিয়ে ফেলেছিল; অমর মিত্রের পাঠকের মনে হতেই পারে, এই যে **শ্রেষ্ঠ গল্প** বেরনোর পরে 'মারাদোনা মারাদোনা'র মতো কাহিনী অগ্রন্থিত থেকে গেল, তার শ্রেয়তর বিকল্প যোগ হলো তো সংকলনটিতে? ঠিক তেমনি পাঠকের মনে হতে পারে বাথানিয়াটোলার অনুষঙ্গটুকু গল্পে যুক্ত হওয়ার পরেও 'কোকিল'-এর অথবা 'হনন-আত্মহনন'-এর থেকে কতটুকু বাড়তি বার্তা নিয়ে এল 'স্বদেশযাত্রা' (১৯৯৭)?

'যাদুজীবন'-এর (১৯৯৯) ('স্বদেশ যাত্রা', 'কালোজল' 'যাদুজীবন', ব্ল্যাকম্যাজিক' ইতিপূর্বে স্বদেশযাত্রা সংকলনে [দীপ প্রকাশনী, ২০০১] গ্রন্থিত) অমর মিত্র কি বাস্তবের সন্ধানে অবাস্তবের পরিক্রমায় নতুন সুর যোজন করছেন? গল্পের এই মেলাটির থেকে বাস্তবতর যেমন কিছু নেই, তেমন আবার নেই ওই মেলার চেয়ে জবরদস্ত অবাস্তবও। ১৯৯৯-তে পৌঁছে অমরের গল্প বানানো কি গল্পহীনতারই নামান্তর? তাই কোনো নিরন্ন বাপের মেয়ে এই মেলায় লোপাট হয়ে যায় কি যায় না, কোন মেয়ের আর্তস্বরে বোঝা যায় কি যায় না যে, ফুর্তির মেলা, হুজুগের মেলা বুঝি ভুখ মেটানোর মেলা হয়ে ঢুকে পড়ল কোনো মা-মেয়ের অন্দরে। পঁচিশ বছর আগেকার ওইসব বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ শোক দুঃখ আজ যেন ধূলিমলিন নির্বিশেষে একাকার হয়ে গেছে। জলজ্যান্ত একটা মৃত্যুই সেখানে যাদুর মুখ্য উপাদান। হায়! আস্ত একটা শবদেহ সেখানে মেলার মেলা-মেলা চরিত্রটাকেই আরো নিশ্চিত করে। 'মেলার দিকে ঘর' থেকে 'যাদু জীবন' ব্যাপী এই পঁচিশবছরের যাত্রাপথে পথিক নিশ্চয় পাবেন বিশিষ্ট পরিক্রমার স্বীকৃতি; সাহিত্যিক পাবেন সেই বেদনার অধিকার, যে বেদনা থেকে সাহিত্য নির্মাণের দিকে তাঁর যাত্রা। এমন অনুভব ছাড়া আর কীই বা **শ্রেষ্ঠ গল্পের** ভূমিকায় মূর্ত করতে পারেন একজন পাঠক? অমরের গল্পরা তো বিভিন্ন পাঠকের পাঠে-পাঠান্তরে নিজেদের কথা নিজেরাই বলবে।

আর যা রইল এই ভূমিকায়, তাকে বলা যায় নিজের গল্প দিয়ে বানানো অমরের পছন্দপুরের সঙ্গে অমরের গল্প নিয়ে তৈরি কোনো এক পাঠকের পছন্দপুরের কিছু ফারাক, কিছু মতভেদ। লেখক-পাঠকের পছন্দপুরে, বিভিন্ন পাঠকের পছন্দপুরে—পছন্দপুরে তেমন অমিল না-জমলে কোন ভরসায় প্রকাশক সেই লেখকের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ছাপবেন? ওই অমিল তো আদতে প্রমাণ করে যে, আমাদের লেখক আসলে যথেষ্ট পঠিত!

রুশতী সেন
০২/১০/০২

অলীক এই জীবন

১৯৭৩-এর নভেম্বরে চাকরি পেয়ে কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুর চলে যেতে হয়। না গিয়ে উপায় ছিল না। আমার মা চেয়েছিলেন আমি আরো পড়ি, ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হই। আমার গোপন ইচ্ছা যে ছিল না তেমন তা নয়। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের ভিতরে তফাৎ ঘটে গিয়েছিল। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে ট্রেনিং শেষে পোস্টিং নিয়ে যাই ডেবরা থানার করণ্ডা নামের একটি গ্রামে। বাস থেকে নেমে কংসাবতী নদী পার হয়ে দেড় ঘন্টার উপর হাঁটতে হত। একা একাই হেঁটেছি নির্জন পথে। আমার ক্যাম্প অফিসটিও ছিল লোকালয়ের প্রায় বাইরে। তার তিনদিকে ধান জমি, বৈশাখে তা রুক্ষ, নেড়া। কিন্তু তার কোথাও কোথাও ছিল ঘন সবুজ মখমলের চিহ্ন। সেখানে শ্যালো টিউবওয়েলে পাতালের জল তুলে উচ্চফলনশীল ধান চাষ। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছি। বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন উপলব্ধির জন্ম হতো যেন আমার ভিতরে। এইভাবে মানুষ বাঁচে? গ্রাম তাহলে এই রকম!

১৯৭৪-এর এপ্রিলে আমি 'মেলার দিকে ঘর' গল্পটি লিখি। তার আগেও গল্প লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুয়ার সব বন্ধই ছিল যেন। শহর থেকে দূরে গিয়ে, কখনো কংসাবতী, কখনো সুবর্ণরেখা, কখনো ডুলুং, তারপর হলদি নদী, বঙ্গোপসাগরের তীরে বদলি হয়ে হয়ে আমার এক সময় মনে হলো আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমার মতো করে এই পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছে কে? আমি বরং লিখেই যাই। আমি বরং আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাটুকু ব্যবহার করে চাষী বাসী বিপন্ন মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি। আমি টের পেলাম কলকাতায় এসে আর বেশিদিন থাকতে পারি না। সুবর্ণরেখা নদীতীরের বংশীধরপুর গ্রাম টানছে। ডুলুং নদীতীরের প্রহরাজ রাজার রাজবাড়িটি টানছে, টানছে মৌভাণ্ডার গ্রামের বুড়ো সাঁওতাল বাবা। টানছে পৌষ সংক্রান্তির আগের হাট, ভাবুকচরণ দাস নামের এক স্বভাব কবি।

গত আটাশ বছর ধরে জীবনকে দেখার সূত্র এইটা। এক একজন লেখক এক একরকম ভাবে দেখতে পান, দ্যাখেন, আমি দেখেছি এইভাবে। ভোরবেলায় জ্যাকব মাণ্ডি কিংবা গুহিরাম মণ্ডল এসে জানলার শিকে বাঁধা মশারির দড়ি খুলতে খুলতে একদিন বলল, কানাইশর পাহাড়ে যাবেন, পাহাড় পুজো? বেলপাহাড়ির আগে নারায়ণপুরে নেমে চললাম জ্যাকবমাণ্ডির সঙ্গে সেই পাহাড়ে। এখন সময় কত বদলে গেছে। এখন এভাবে গেলে কি পুলিশ সন্দেহ করত না?

গ্রামে থাকতে থাকতে আমার কালো রং আরো কালো হয়ে গিয়েছিল। মাথায় একবার ঘা হয়ে গেল গোপীবল্লভপুরে বাসের সময়। একজন পরম শ্রদ্ধেয় লেখকের নিকটজন আমার গল্প 'দানপত্র' পড়ে এবং আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আসলে আদিবাসী?

মনে মনে হেসেছিলাম আবার বিষণ্ণ ও হয়েছিলাম। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি কাটিয়ে দিচ্ছি দূর গ্রামের পথে মাঠ ভাঙতে ভাঙতে। আমার শহরবাসী বন্ধুদের সঙ্গে আমার তফাৎ ঘটে যাচ্ছে প্রতিটি দিন। সময় অতিবাহিত হচ্ছে চাষীবাসী মানুষের সঙ্গে। আর ছিল বই। কলকাতায় এসে নিয়ে যেতাম প্রিয় গ্রন্থগুলি, বিভূতি, মানিক, তারাশংকরের সঙ্গে চেখব, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি।

দানপত্র লিখেছিলাম ১৯৮০-তে। দলিল দস্তাবেজের লিখন প্রণালী ব্যবহার করেছিলাম ওই গল্পে। আসলে গল্পের আঙ্গিক, লিখন প্রণালীর জন্য নানারকম তত্ত্ব উপদেশের চেয়ে জীবনযাপনের দৈনন্দিনতার অনেক বড় ভূমিকা। একটা সময় ক্যাম্প অফিসে পৌঁছন, ক্যাম্প অফিস থেকে বাড়ি আসা, আবার যাওয়া আবার আসা, ক্যাম্প অফিস থেকে জরিপের দল সঙ্গে করে দূর গ্রামের দিকে যাত্রা এবং যাত্রাপথে দুপাশের গ্রামকে দেখা—এই ধরনটিই আমার গল্পের আঙ্গিক হয়ে আসে। মেলার দিকে ঘর, গাঁওবুড়ো, আরো অনেক গল্পে এই যাত্রাপথই ছিল গল্প। দলিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে, জমির ইতিহাস লক্ষ্য করতে করতে দানপত্র হয়ে গেল নতুন একটি দলিল লিখন।

১৭ বছর একটানা ঘুরে, সামরিক নগর উপান্তে এসে আবার দূরে চলে গিয়ে যখন নিজের শহরে এসে আবার স্থিত হলাম, তখন অবাক হয়ে দেখি যে শহরকে চিনতাম বাল্যকাল থেকে এই শহর যেন সেই শহর নয়। আমি আমার পাশের বাড়ির রূপহীন মেয়েটিকে কি আগে চিনতাম? চিনতাম কি আমার সহপাঠী যে ক্লাস ফাইভে পড়াশুনো ছেড়ে বাজারে সবজি নিয়ে বসে, তাকে? টালা পার্ক, টালার জলাধার, ২৪ ঘন্টা জলের সুখ কমে আসা, বাজারের মাছওয়ালা বুড়ো, ধর্মতলার মস্ত মস্ত বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং আমাকে নতুন বিস্ময়ে জারিত করে। আমি না জ্যাকব মাণ্ডির সঙ্গে নারায়ণপুর থেকে বারো মাইল পায়ে হেঁটে কানাইশর পাহাড়ে পৌঁছেছিলাম, ফিরেছিলাম প্রায় পনের বিশ মাইল হেঁটে চাকুলিয়া রেলস্টেশনে গভীর রাত্রে, শুয়েছিলাম প্লাটফর্মে, শেষরাত্রের ট্রেন ধরে কলকাতা শহরে ফিরেছিলাম—সেই আমি কি এই আমি, যে কিনা মেট্রোরেলে চেপে অফিস যাচ্ছে? জ্যাকব মাণ্ডি কত বুড়ো হয়ে গেছে! তার রামচন্দ্রপুর গ্রামে বসে হয়ত আমার কথা বলে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিল জ্যাকব মাণ্ডি। আমি তার কাছে সাঁওতাল জাতির আদি পিতা আদি মাতা পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির কথা শুনেছিলাম সন্ধের তার কুটারের সামনে চার পাই-এ বসে। আর শুনেছিলাম কেমন ছিল বনভূমি, কেমন ছিল জীবন সেই কথা, কে এসেছিল গ্রামে তার কথা। মাথায় তারা ভরা আকাশ ছিল। আবার কোনোদিন হয়ত ছিল বর্ষার মেঘ, কোনোদিন ছিল শীতের রোদ। গ্রামবৃদ্ধের সামনে আমি কি বসেছিলাম উজ্জয়িনী নগরে?

কলকাতাকে আমি চিনতে পারতাম না মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগণার গ্রাম না দেখলে। আমি চিনতে পারতাম না প্রতিবেশী কন্যাটিকে, প্রতিবেশী পুরুষটিকে, নিষ্ঠুর মধ্যবিত্তকে, কোমল মনের গৃহবধূটিকে।

আমি গ্রামে যাই শহরে আসি। শহরে এসে এক মানুষ হই, গ্রামে গিয়ে হয়ে যাই অন্য মানুষ। শহরে এসে লাতিন আমেরিকার গল্প, উপন্যাস নিয়ে আলাপে বসি, ইতালো কালভিনোর ইনভিজ্‌বল সিটিজ নিয়ে কথা বলি, গ্রামে ফিরে দলিল দস্তাবেজ, চাষের জল, ধানের ফলন, অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ না পাওয়া হতভাগ্য চাষীবাসী মানুষের সঙ্গে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলাপ জুড়ি। কীরকম অলীক লাগে সমস্তটা। আমি কোনটা বুঝি? দুটোই, নাকি কোনোটাই না? আমার কাছে কোনটা সত্য—ম্যালেরিয়া জ্বরে জীর্ণ হয়ে যাওয়া চাষীর ধানকাটা, হাঁটানো মেয়ের ভারে বিপন্ন মা বুড়ি, নাকি কফিহাউসের আড্ডাবাজ তরুণ কবি, গল্প লেখক, মেট্রোরেলের সুবেশা তরুণী, তরুণ এক্সিকিউটিভ যারা কোনো কথা বলে না, ইকোনমিক টাইমস-এর কেনাবেচার পাতায় চোখ মেলে রাখে নিঃশব্দে। নিজেকে কি তখন নামানুষ মিথ্যামানুষ মনে হয় না? কী অলীক এই জীবন—জীবনকে দেখে নেওয়া! কী অলীক এই ভারত নামে দেশটি, ভূমিকম্পের পর, বন্যার পর প্রত্যন্ত গ্রামে কী অনায়াসেই না দান হিসেবে পৌঁছে যায় বিস্কুট, [illegible] বার্লির প্যাকেট। এই অলীকতাকে প্রত্যক্ষ করেছি

বোধহয় দেড়দশক দুইদশক পার হয়ে গেলে, গত শতাব্দীর শেষদশকের কিছু আগে থেকে। এই অলীকতাই যেন এসে গেছে 'যাদুকাহিনী'র যাদুকরে, যে কিনা মৃত্যুপরেও বেঁচে উঠবে বলে তার চারপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয় মেলার লোককে। এই বোধই বোধহয় 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' লিখিয়ে নিয়েছে। আবার আর একরকম ভাবে লিখিয়ে নিয়েছে 'স্বদেশযাত্রা'কে। আমার তো সত্যই মনে হয় যারা খরায় মরে, বন্যায় মরে, ধর্ষিতা হয়, খুন হয়ে যায় ভূস্বামীদের প্রাইভেট আর্মির হাতে, তারা যেন এই ভারতবর্ষের কেউ নয়, তারা এক অলীক ভারতবর্ষের মানুষ, এইভাবে হত হতে, ধর্ষিতা হতেই জন্মায়।

বন্যা দেখেছি ৭৮-এ, খরাও দেখেছি বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাসের সময়। জলে জলে ভেসে গেছে সব, আবার জলের জন্য দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ—দুটোই সত্য। এই দুই সত্যের ভিতর থেকে তৃতীয় সত্যটি লেখকের নির্মাণ। সেই সত্য শহরে এসেও খুঁজে পেয়েছি। কলকাতার মানুষও তো খরায় পোড়ে। পুড়ে আদিম সমাজের মতো ক্রমাগত অভিশাপ বর্ষণ করে যায় যার উপর, সে যেন অভিশপ্ত হয়ে ওঠার জন্যই এই শহরে এসেছে সুবর্ণরেখার তীর থেকে। আমার গ্রাম আমার শহর দুইই তখন তার এক সত্য হয়ে জেগে উঠতে থাকে আমার সামনে।

১৯৭৮ সালে আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' বেরিয়েছিল। তারপর ২৪ বছর বাদে যে সংকলনটির জন্য এই প্রস্তুতি তাকে শ্রেষ্ঠ গল্প বলতে শেষ পর্যন্ত কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। কোন গল্পটি কার ভাল লাগবে তা কি আমি জানি? আমি তো লিখে চলেছি, শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিই যদি লিখে ফেলব তবে আর লেখা কেন? কিন্তু আমি তো এও জানি এই মুহূর্তে এইটিই সত্য, আর একটি সত্য হলো এই একুশটি গল্পের বাইরে যে গল্পগুলি পড়ে আছে তার ভিতর থেকেও কোনো না কোনো গল্প এই সংকলনে যেতে পারত।

আমার গল্প আমার এই অলীক জীবন থেকে উঠে আসে। কী আশ্চর্য! আমি একদিন লক্ষ্য করলাম যে বেলগাছিয়ায় বাস করি তার কোনো পরিবর্তনই হয়নি গত চল্লিশ বছরে, শুধু যারা ছিল বালক তারা ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, চোখে কম দেখছে, ঝুঁকে হাঁটছে। আমি দেখছি সব চেনা মুখ ধূসর হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। প্রায় ধূসর হয়ে যাওয়া মুখগুলিকে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করে কী যে হয়ে যায় সব! আমি শূন্য থেকেই যাত্রা করি, লক্ষ্য অসীমে পৌঁছন। কোথায় পৌঁছতে পারি তা পাঠক জানেন। কোনো গল্প হয়ত হয়, কোনোটা অধরা থেকে যায়। মনে মনে জানি কত আশ্চর্য গল্প লেখেন আমার সমকালের অগ্রজ, অনুজ লেখকেরা। কত আশ্চর্য গল্প পাঠ করে লিখতে শুরু করেছিলাম সেই কতদিন আগে, তখন আমার চোখে চশমা ছিল না, মাথায় অনেক চুল ছিল, মুখে কোনো ভাঁজ ছিল না। তখন আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারতাম। সাঁওতাল বুড়োর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে পারতাম। তখন যা পেয়েছি তা সমস্ত জীবনের সঞ্চয়। জীবনের আনন্দ ও বিষাদ কোনো কিছুই আমাকে কোনোভাবে আড়াল করে রাখতে পারেনি। গত ২৫ বছর থেকে এই সংকলনের ২১টি গল্প নির্বাচন। নির্বাচনে আবেগ রয়ে গেছে হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আমার কিছু করার নেই। শ্রীযুক্ত বামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্রয়ে এই শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উৎসাহ তাঁরই সবচেয়ে বেশী। ঋণ আমার বেড়েই যাচ্ছে।

অমর মিত্র
১০-১০-২০০২

মেলার দিকে ঘর

তিনদিন পর সন্ধেয় সহদেব ঘরে ফিরে তার চোদ্দ বছুরে যে মেয়েটা ঘরের কোণে নিদেয় এলিয়ে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কাল যাবি?'

মেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকানোয় সহদেব এক গাল হেসে বলে, 'সি. সিই মেলায়, আষাঢ়ী দ'র উপারে বড় মেলা দিখত্যা, সিবার বায়না ধরিছিলি, ইবার যাবি?'

বাপের কথা শুনে মেয়ে অবাক হয়ে নড়ে বসে। বাপের তার হ'লো কী, দিন তিনাক বাদ্যা প্যাটে আগুন আর মিলা দিখায় কথা কয়!

'ই থলিতি চাল আছে রাঁধ, তুর মা কুথায়?'

এই বাক্যের সঙ্গে ক্ষুণ্ণিবৃত্তির সঠিক সম্পর্ক থাকার দরুণ মেয়ে উঠে বসে, ছেঁড়া খোবড়া কাপড় দিয়ে উঠতি শরীরের এদিক ঢাকে তো ওদিক আলগা হয়, অতঃপর বাপের দিকে নিঃসাড়ে চেয়ে থাকে।

সাধ ক'রে মেয়ের নাম রেখেছিল লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী এখন লক্ষ্মীছাড়া। দেহের আচ্ছাদনটি গামছার সমগোত্রীয়, বহরে যা একটু বড়। তা দিয়ে খোলামেলা দেহের পুরোটা ঢাকা হয় না সেহেতু চোদ্দ পার হওয়া পনেরো ছুঁই ছুঁই মেয়ের বাপের কাছে লজ্জা করে আর বাপেরও অস্বস্তি হওয়ার দরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর আঁধার ফুঁড়ে আর একটি জীবের আবির্ভাব হয়। সে সময় লক্ষ্মী উনানে আগুন লাগায়, বেশ কয়েকদিনের বাসি উনানে আবার রাঙা আগুন নড়েচড়ে। দুগ্‌গা জল নিয়ে ফেরে। অবস্থা তার কন্যারই মত। অবশ্য পাঁচ সন্তানের জননী হওয়ার দরুণ লাজলজ্জার বালাই নেই, সামান্য কটি বস্ত্রই যেন তার যথেষ্ট মনে হয়, শুষ্ক কোঁচকান বুক তেমনভাবে ঢাকার প্রয়োজন বোধ করে না স্বভাবে। উনানে আগুন দেখে মেয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকানোয় লক্ষ্মী বলে, 'বাপে এন্যাছে' দুচোখ চকচক্ করে।

তিন তিনটে উলঙ্গ শিশু আর বছর দশেকের একটা উলঙ্গপ্রায় মেয়ের পাশে সহদেব বসে। দাওয়া মাটির সঙ্গে এক হয়ে গেছে, ঘরের চালের বাঁশ ঝুঁকে পড়ার ফলে ছাউনি নেমে এসেছে অনেক। শুকনো শন্ বাতাসে ওড়ে। এ বর্ষায় আর এ ঘর রক্ষা পাবে না এটা স্থির কেননা মরালো দিনের আলো এখনও উঁকি ঝুঁকি মারে ফুটো চালের মধ্য দিয়ে।

'তিন তিনটে দিন [illegible] কুথায়?' দুগ্‌গা জিজ্ঞেস করে।

'[illegible] ঘুরত্যা ঘুরত্যা আষাঢ়ী দ'র মেলায় চল্যা গিলাম, তুদের খাওয়া হইছে ই-কদিন?'

[illegible]ই দশদিন উপোস্ আর—দুগ্‌গা কথা শেষ করে না। শরীর অবসন্ন, খিদের জ্বালায় [illegible] কথা বল[illegible]।

'আর দুঃখু [illegible] হইছে, চাল এন্যাছি ভাত রাঁধ।'

'ট্যাকা দিল কে?' দুগ্‌গার জিহ্বায় তিক্ত স্বাদ, প্রশ্নেও।

'অ জুটিছে ইক রকম, তো নক্ষীরে নি আষাঢ়ী যাব।'

'কেনে?'

দুগ্‌গার প্রশ্নে সহদেব থতমত খায়, 'না, ইমনি মেলা দিখার জন্যি।'

সহদেব অন্যদিকে চোখ মেলে রাখে।

'ইবার ই অবস্থায় মেলা হচ্ছে, কে যেন কয়ছিল হবেনি।'

এ কথায় সহদেব থমকায়, পর মুহূর্তে বলে, 'মুই ঘুর্যা ইলাম আর মানুষে কয় মেলা হচ্ছেনি।' দুগ্‌গা নিশ্চুপ শুনে যায়, প্রশ্ন করতে চায় না কেননা ক্রমাগত অন্নহীন থাকার পর মানুষের কৌতূহল লোপ পায়। অন্নের ভাবনা ছাড়া ভাবনা নেই।

সহদেব স্ত্রীর কাছে মেলার গল্প করে, কদিন ধর্যা চলছ্যা সি মেলা, মুই ই-কদিন সিখেনে ছিলাম, সিখেন থিকেই তো ট্যাকা জুগাড় হ'লো। সিখেনে হরেকরকম মজা, রং বিরঙের জিনিশ, চুড়ী ডুরে শাড়ি, মণ্ডা মিঠাইর বাসে চান্দিক ম-ম করে, খেলাই বা কত রকমের, মরণ কূপ দিখে ডর লাগে, গা গতর ঠাণ্ডা মের্যা যায়, আন্ধারে উর তল দিখা যায়নি, পাগড়ি পরা মানুষ ঝপ্ কর্যা লাফ দিচ্ছে আবার হাসত্যা হাসত্যা উঠ্যা আসছ্যা উপ্‌রে, দুটা বাঘ আর ভল্লুক লিয়া সার্কেস এস্যাছে, হরিপরি মেয়্যার দল ইকটুখানি পুষাক পর্যা কত ভয়ের খেলা দিখায়, নক্ষী দিকে মজা পাবে খুব, কত মজার খেলা!'

দুগ্‌গা চুপ ক'রে থাকে কেননা এ গল্প তার বহুবার গাঁয়ের নানান লোকের কাছে শোনা। যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু কোনোবার যাওয়া হয়না। সে বলে, 'নক্ষী থাক বরং মুই যাই।'

সহদেব হা-হা ক'রে ওঠে, আরে না না উরে ক-বার কয়্যাছি, পরের বার বরং তু যাস্।

দুগ্‌গা আহত হয়, চুপ ক'রে ব'সে থাকে, অবশেষে বলে, উ যাক, ই ঘরে তো আর থাকবেনি বেশী দিন, সম্বন্ধ দিখার দরকার ইখন থিকে।

সহদেব কথা বলে না। চান্দিকে পাথর জমা অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য ; দুইয়ে মিলে অন্ধকার গাঢ় এবং ভয়াবহ মনে হয়। কখনো বা দূরাগত কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। অন্ধকারে ব'সে থাকে সহদেব আকাশে চোখ রেখে দাওয়ার খুঁটোয় হেলান দিয়ে। ভাঙা উনানে জ্বালানো আগুনে আলো এসে কাঁপছে দাওয়ায়। ক্ষুধার্ত শিশুর দল উঠে ঘিরে দাঁড়িয়েছে উনান। তারা অবাক হয়ে ভাতের ফুট দেখে, আবছা গন্ধ ভেসে বেড়ায় সামনে পিছনে। গাঁয়ে আলো জ্বলে না সন্ধের, মানুষজন উধাও হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নিরন্নের দল গাঁয়ের ধুলোয় পদচিহ্ন রেখে কোথায় চ'লে যাচ্ছে। যারা থাকছে তারা থাকবে কেননা সে কয়েকজনের গোলায় জমা আছে সাড়া গাঁয়ের মানুষের বছরের ধান। তারা কখনো মানুষ ভালো কেননা অসময়ে নিরন্ন মানুষকে দু-এক পালি ধান দিয়েও সাহায্য করে, যখন মর্জি হয় শোধ নেয় সুদে আসলে। আসল সুদের ঘায়ে পাহাড় হ'লে মানুষ হয় চার পেয়ে। সহদেবের ঘর শূন্য মাস দুয়েক আগে, এই প্রখর গ্রীষ্মে সে বুকে হাঁটা সরীসৃপ। মজুরীহীন অন্নহীন মানুষ ক'দিন বাঁচে? ভাগের জমিতে বাবুর মজুর, লাঙ্গল ধরবে তারা। আর সে এখন এ-গাঁ সে-গাঁ দূর অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়ায়—অন্ন চাই।

অন্নহীন পরিবারে বহুদিন পর অন্নের ছোঁয়া, তার গন্ধে সহদেবের স্ত্রী পুত্র কন্যা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লোলুপ দৃষ্টিতে ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকিয়ে।

'মেলায় কাল হরেনের সঙ্গে দিখা, উ উখেনে বিড়ির কারবার ধরিছে, পয়সা হইছে বেশ, উ ভুলে এটটা কাপড় দিল।' সহদেবের স্ত্রীর সামনে ভাঁজ করা কাপড়টা মেলে ধরে।

কাপড়ে লাল ডুরে। দুগ্‌গা ঝুকে পড়ে, আলো অপ্রতুল, আবছা আগুনে আলোয় কাপড়ের স্থানে স্থানে আগুনে রং ধরে। বোঝা যায় না স্পষ্ট কিছুই। দুগ্‌গা উল্টে পাল্টে দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, অতঃপর বুকের উপর মেলে ধরে আধ ভাঁজের কাপড়।

'ইডা পর্‌য্যা উ কাল মেলায় যাবে, কি কস্ তু?' সহদেব স্ত্রীকে প্রশ্ন করে।

এ কথায় মেয়েমানুষটা চমকায়? ধড়ফড়িয়ে ওঠে। কাপড়টা কোলের কাছে পড়ে যায়। সহদেবের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। নিরন্ন স্ত্রীলোকের সামনে পর্যাপ্ত সুখ। চারপাশে ফুটন্ত ভাতের গন্ধ, টগবগানো শব্দ, সে মাথা নামিয়ে সম্মতি জানায়। তবুও মেয়েমানুষের ভাবনা সহজে শেষ হয় না, সে উনানের কাছে বসা মেয়েকে দেখে, অবশেষে সহদেবকে উত্যক্ত করে প্রশ্নে, 'তো হরেন ইতো ভাল হল কবে থিকে? পয়সা হলে তো মানুষের মন ফিরে না, ইতো মনা হয়।''

সহদেব উত্তর করে না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের মাকে দেখে, দুগ্‌গা ছটফট করে, অবশেষে আবার কথা বলে, 'ইত কষ্টের সময়ে আর মেলা দিখাতি হবেনি, পয়সা থাক ঘরে।'

'কেনে পয়সার অভাব তো আর হবেনি, হরেন উরে দিখতে চেয়্যাছে, বলল কত ছোট দিখেছি কত ভাগর হ'লো নক্ষী।'

এই কথায় দুগ্‌গা নিশ্চুপ, দুহাত দিয়ে মাথার জট ছাড়ায়, চুলকোয়। তার ভাবনা আসে না, খিদেয় শরীর টালমাটাল, চান্দিকে ভাতের গন্ধ গভীর হয়ে এসেছে। সহদেব স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে। চতুর্দিকে এখন আঁধার গভীর, গাছপালায় দাঁত চাপা কাঠিন্য, বাতাস আসে না।

খাওয়ার সময় সহদেব লক্ষ্মীকে বলে, 'খা খা বেশী ক'রে খা, অনেক হাঁটিতি হব্যা কাল।' সে গোগ্রাসে ফেনভাত গেলে আর লক্ষ্মীকে বলে, 'খা খা বেশী ক'রে খা।

'মুই বুঝিনি বাপু তুমার মতিগতি, প্যাটে ভাত জুটছেনি আর তুমি মিল্যা দিখার কথা কও,' দুগ্‌গা মিন মিন করে।

'তু থাম, বড্ড টকর মারিস, গিলছিস গিল', সহদেব অধিকতর রুক্ষ।

খেতে খেতে সহদেব নিজের পাতের ভাত তুলে দেয় লক্ষ্মীর পাতে। দুগ্‌গা দেখে বলে না কিছুই। হাড়ে চামড়ায় আবদ্ধ বুক ধকপকায়, ভাঁটা ঠেকে মাথাটা।

ভোর না হতেই দুগ্‌গা মেয়েকে সাজায়। লাল ডুরে শাড়ী পরায়, মাথায় বেড়াবিনুনী ক'রে চুল বাঁধে। পুরানো বাক্সের কোণে একটা ইঁদুরে কাটা হলুদ্ ব্লাউজ ছিল, সেটাও পরায়, দুপায়ে গাঢ় ক'রে আলতা আর ছোট্ট কপালে সুগোল লাল টিপ্ যা আলতারই। তখন পূবের পৃথিবীতে গাঢ় লাল করে সূর্য ওঠে ঠিক যেন লক্ষ্মীর কপালের টিপ্। অতি কোমল আলোয় লক্ষ্মীকে প্রতিমার মত দেখায়, সহদেবের ভাঙা ঘরে ছোট্ট কপালে লাল টিপ আর দুপায়ে গাঢ় আলতা পরে নবীন আলোয় দুঃখী মেয়ে পৃথিবী হয়ে যায়, ভোরের পৃথিবী।

'মেয়্যারে দিখায় বেশ।'

'হা' সহদেবের উত্তর।

'বিয়ার দিন হইছে, ইরে ষোল সতেরো দিখায়, জন্ম তো সি সিই বড় বন্যের সময়, ইখেনে ম্যাজিস্টিরি সাব এইছিল, তা চোদ্দ পনেরো সাল হব্যা।'

সহদেব মাথা নাড়িয়ে দুগ্‌গাকে সমর্থন জানায়।

অন্নহীনের দেশে এমন চেহারা ক'জনের আছে. বাপের সঙ্গে লক্ষ্মী চলে মেলা দেখতে। উঠানের ধুলোয় তার ছোট্ট নরম পায়ের ছাপ পড়ে। এঁকে বেঁকে সামনে চলে যায় লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ; নরম ধুলোর পরে বৈশাখের আকাশতলে তার পদচিহ্নের আল্‌পনা আঁকা হয়।

'হাঁটিতি পারবিনি?' বাপের প্রশ্নে লক্ষ্মী সম্মতি জানায় মাথা নামিয়ে। দুগ্‌গা জীর্ণ কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে, বুকটা তার ভার হয়ে আছে। কেমন যেন লাগছে! লক্ষ্মীর মাথার টিপ্—কমলা রঙের বিরাট বলয় পূবে রঙ ছড়াচ্ছে, সূর্য দেরী করে উপরে উঠুক না হলে তার মেয়ের কষ্ট হবে। তার লক্ষ্মী মেলা দেখতে যাচ্ছে।

বাঁধে বাঁধে রাস্তা। দু'পাশে আদিগন্ত অনাবাদী ধানী জমি, জলের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে। সূর্য উঠেছে পূবের ঘন জঙ্গল ছাড়িয়ে প্রায় এক ... রাস্তার মাঝে মাঝে কোথাও বিশাল বট অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে, সেখানে নরম ছায়া অতঃপর আকাশতলে হাঁটা। মাঠে লাঙ্গল নিয়ে যাচ্ছে দু'একজনা, তাদের কেউ হাঁকে, 'উ স'দেব চললি কুথায়, কুটুমঘর?'

সহদেব হাসে, জবাব দেয় না। লক্ষ্মী মাথা নামিয়ে হাঁটে। লাঙ্গল যারা ধরেছে এখন তারা বাবুর বাড়ির লোক, পয়সার অভাব নেই। "শ্যালো এটটা থাকল্যা চাষ দিখায় দিতাম", সহদেব আপন মনে বলে। বাবুরা শ্যালো পাম্প দিয়ে পাতালের জল জমিতে তুলবে আর হরিণা-ডাঙ্গি, মানিকপুর, চন্দনপুর, আকালপৌষের অন্নহীন ভূমিহীনের দল মজুরির খোঁজে পরিবার অভুক্ত রেখে রাস্তায়।

'সি-সিইয়ে তালগাছ দিখছিস্, সি তালগাছের উপারে মানিকপুর, সিখেনে যাত্রা হইছিল. মনা আছে?'

লক্ষ্মী কোমল দুচোখ ফেলে দূরে—বহুদূরে মাঠ পার হয়ে আবছা কালো ছায়া ভেসে আছে তালগাছ বরাবর অনেক পিছনে। ঐ কালো ছায়ায় মানিকপুরের সীমা। সে হাঁটতে হাঁটতে দেখে পিতলরঙা রোদ উঠেছে চারপাশে। সে বলে, 'মনা আছে, মুই যেছিলেম, ইবারেও যাব।'

সহদেব দ্রুত হাঁটে, সুতরাং লক্ষ্মীও।

সহদেব বলে, 'জোরে হাঁট রোদ চড়া না হতি লোয়াদা পৌঁছাতি হবা. সিখেন থিকে আরো কোশ দুই পথ।"

লক্ষ্মীর চারদিকে পিতলরঙা রোদ আছে, বাতাসও, ফলত কষ্ট তেমন অনুভূত হয় না।

সহদেব বলে, ই দেখ গরমিন্ট ইলিকট্রিরির তার লাগাবাছিল শাল খুঁটি পুত্যা, তো নাইট তো এলোনি কারা সি তার কেটা নি গেছে।

লক্ষ্মী দেখে লম্বা লম্বা শালের খুঁটিগুলো মাঠের মাঝে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় মাথায় জোড় তার উধাও। এইসব দেখতে দেখতে দ্রুত বাপের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে লক্ষ্মী মাঝে মধ্যে বেসামাল, ছোট্ট আঁচল সামলাতে হিম্‌সিম্। অনেক পথ পিছনে চলে যায় অতিক্রান্ততায়।

'ই দেখ সি মন্দির, মা তারাদা. গেড়লা মারে পেন্নাম কর।'

পথের ধারে উদ্ধতের মত দাঁড়িয়ে বড় মন্দির। চূড়ায় চূড়ায় তার রোদ আটকে থাকে। লক্ষ্মী গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। সহদেব এক পলকে দেবীকে প্রণাম ঠুকে অন্যদিকে

তাকিয়ে থাকে, বিড়বিড় ক'রে বলে, 'বড় জাগন্ত দেবী ইনি বুঝলি, যা চাবি তাই পাবি।'

মন্দির ছেড়ে দু'জনে আবার পথে। বাজারে একটা মানুষও নেই শুধু যা কয়েকটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমোয়। রোদে রূপার বর্ণ ধরেছে। বাপে মেয়ে পা চালায় জোরে। লক্ষ্মী দেখে সহদেব দেখায়, "ই দেখ ই হ'লো শীষগেড়্যা পোস্টাপিস্, ইখেনে পত্তর যদি ইকবার দিলা যায় তবে বিলাত ও চল্যা যায়, বুঝলি. ইমনি কিরামতি মাস্টারবাবুর, উ ... দাঁড়ায়ে।"

লক্ষ্মী অবাক হয়ে মাস্টারবাবুকে দেখে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে লুঙ্গীর কষি বাঁধতে বাঁধতে এদিকে তাকিয়ে। সে লজ্জা পায়, দু হাত বুকে চাপা দিয়ে জোরে হাঁটে। শীষগেড়্যার হলুদ রঙের পোস্ট অফিস্ পার হয়ে অনেকদূর এগিয়ে যায়। এগোতে এগোতে লক্ষ্মী হঠাৎ দাঁড়ায়. এবার সে তার বাপ্‌কে দেখায়, "উ দেখ ঢ্যামনা সাপডা মাছ ধরিছে, উঃ গা কিমন করছ্যা!"

সহদেব দেখে পাশের কর্দমাক্ত ডোবা থেকে কালো সরু সাপটা শুকনো ডাঙায় উঠে মাছটাকে গেলার চেষ্টা করেছে। সে বলে, "ধুর তুর ইতেই ভয়, মেয়্যামানুষতো, উ সাপ তো মাছ ধরব্যাই।'"

লক্ষ্মীর সমস্ত দেহে শিহরন লাগে, সে হাঁটতে শুরু করে, "মাছটা ট্যাংরা হলি বেশ হত, মজা বুঝত উ ঢ্যামনা", চলতে চলতে লক্ষ্মী বলে।

এই ভাবে তারা দু'জন কত পথ পার হয়ে যায়। উজ্জ্বল আলোয় লক্ষ্মী চারপাশ দেখে অবাক হয়। এমন ভাবে এদিক দেখেনি সে ; গেছে যা দু'একবার যাত্রা দেখতে সে তো রাতে হরিণাডাঙ্গির পথে মাঠ ভেঙে। তখন তো সব আঁধার আর আঁধার।

'ই দেখ সি কিলাপ, ইখেন থিকে সিবার বন্যের সময় রিলিফ নিতা আসতাম, মনা আছে?' সহদেব কন্যাকে আকালপৌষের সেই জীর্ণ ক্লাব ঘর দেখায়, রাস্তার ধারে বড় নিঃসঙ্গ!

সি কিলাপ! লক্ষ্মী আবাক হয়, সি রাস্তা ই নাকি, চিনাই যায়নি!

'চিনবি কি কর‍্যা তখন তো সব জলে এক।'

'ইবার দিবে?' লক্ষ্মী সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

হ বন্যে তো হবেই আর দিবেও বুধয়, উ খালটার মুখ কেট্যা দিলা সব চুক্যা যায় তা গরমিন্ট তো আর কাটবেনি।

ওরা হাঁটে, বহুদূরে এগোয় লক্ষ্মী। এসব অচেনা, দুপাশে অনাবাদী ধানী মাঠ মাঝে উঁচু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, গাঁয়ের লোক বলে বাঁধের রাস্তা, এক হাঁটু ধুলো, দরদরিয়ে ঘাম ঝরে। সূর্য উপরে উঠেছে, রোদ হয়েছে গাঢ়, রাস্তার ধারে বড় একটা বকুল গাছেরতলা বকুল ফুলে ছেয়ে আছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ ভাসে। এই বাতাস লক্ষ্মীকে ঘরের কথা মনে পড়ায় তাই সে উন্মনা। রোদ অর্থাৎ উত্তাপ দেহ সাপটে ধরছে, মাথা ঝুঁকে পড়ছে মাটির দিকে তবুও সে হাঁটে। খিদে আবার নড়াচড়া করে তার শরীরে, মাথা ঝিম্ মারতে চায়। সহদেব বলে, আর একটু হাঁট, কাঁসাই পার হলিই পৌঁছা যাব লোয়াদা।

সহদেব কাঁসাই নদীর কথা বলে। লক্ষ্মী মোহগ্রস্তের মত হাঁটে। তীব্র রোদে শরীর টাটায় তার। ক্রমে উঁচু বাঁধ দেখা যায় নদীর। সহদেব তর্জনী তোলে দূরের দিকে, উই নদী দিখা যায়, চল জোরে চল এস্যা গিলাম।

লক্ষ্মী সামনে দৃষ্টি ফেলে, উঁচু বাঁধ দেখা যায় নদীর, ঘন গাছগাছালিতে ঢাকা, নদী কত

কাছে। হঠাৎ হরিধ্বনিতে তার চমক ফেরে, ছিটকে সে সহদেবের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কোনাকুনি মাঠ ধরে বাঁশের চালিতে একটা মড়া মেয়েমানুষ শুইয়ে ক'টা লোক হরিধ্বনি দিতে দিতে বাঁধের রাস্তায় ওঠে। তারা এগোয়। লক্ষ্মী জোড় হাতে প্রণাম করে। মেয়েমানুষটার পা দুটো চালি বেরিয়ে দুলছিল। লক্ষ্মী সবিস্ময়ে দেখে মরা মেয়েমানুষ টার পায়ে গাঢ় আলতা মাখানো, সে নিজের পায়ের দিকে তাকায়। দুঃখে দুচোখ ছাপিয়ে জল আসে তার, ধুলোর আস্তরণে পায়ের আলতা মুছে ধূলি ধূসরিত হয়ে গেছে পা দুটো ওর।

কোন গাঁর গো?

উ নরহরিপুর।

কি হইছিল? সহদেবের দ্বিতীয় প্রশ্নে শবযাত্রীরা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না, গতিবেগ বাড়ায়। একজন বলে, "গলায় দড়ি, সুমত্ত মেয়্যামানুষ অভাবে মরা হলো, গলায় রশি বেন্ধ্যা ঝুল্যা পড়ল।"

লক্ষ্মী বাপের হাত ধরে, শবযাত্রীর দল বাঁশের চালি বয়ে এগোয়, মাঠে নামে আবার ওরা, কাঁসাই-এর বাঁকে বালিতে পোড়াবে দেহ।

সূর্যে আগুন ধরেছে তাই বাতাসেও। ক্রমে নদীর পাড়ে পৌঁছয় তারা, এখানে রাস্তা দ্রুত উপরে উঠে আবার নেমেছে নদীর বুকে। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, ইখনও কদ্দুর মেলা? সহদেব নিরুত্তর।

'এট্টা ফিতা কিনা দিবা, লাল ফিতা।' সহদেব নিরুত্তর। লক্ষ্মী দেখে বাপের চোখ মুখ কেমন রুক্ষ হয়ে আসছে। প্রতি পদক্ষেপেই ছোট্ট দেহ দুমড়ে যাচ্ছে। সে দুমড়ে মুচড়ে হাঁটে।

রাস্তা যেখানে নদীর বুকে নেমে গেছে সেখানে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান, সহদেব দাঁড়ায় সেখানে। পাঁচটা মানুষ বসেছিল। একজন হেসে বলে, 'এই বুঝি তোর লক্ষ্মীরে স'দেব?"

লক্ষ্মীর দিকে বারবার তাকায় তারা, মেয়ে তো ভয়ে জড়োসড়ো।

'হাঁ'।

'তা দেরী হ'লো কেনে?'

'এজ্ঞে টায়েম তো ঠিক রেখ্যাচি', সহদেব আস্তে আস্তে বলে।

আধঘণ্টা দেরী, একটা মানুষ কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে।

পাঁচটা মানুষ লক্ষ্মীকে দেখে। জহুরীর চোখে দেখে।

ওরা আবার এগোয়। লক্ষ্মী এবার আগে আগে, সহদেব আর পাঁচটা মানুষ পিছনে। ক্রমে নদীতে নামে। মাথায় বোশেখের পোড়া আকাশ নিয়ে নদী পড়ে আছে সটান, জল শূন্য শুষ্ক বালি উজ্জ্বল রোদে ঝক্‌ঝক্ করছে। নদীর উপর আগুনে বাতাস, নিরন্ন মানুষের মত নদী আকাশ দেখে। লক্ষ্মী জোরে হাঁটার চেষ্টা করে, তাড়াতাড়ি মেলায় পৌঁছান দরকার। গরম বালির ভিতর ডুবে যাচ্ছে পা, হাঁটা দুষ্কর। শূন্যে ডানা ভাসিয়ে চকচকে বালির উপর গাঢ় বাদামী শকুন নামে ওই কোণে, বালির উপর আরো কয়েকটি ব'সে। ডানা বিছিয়ে ক'টা শকুন লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়, একটা অন্যকে ডানা বিছিয়ে তাড়া করে, কর্কশ চীৎকার বাতাসে ভাসে। লক্ষ্মী উন্মনা, এসব দেখে না তাই সেদিকে চলে যায় অনায়াসে, বাপ তার বেশ পিছনে। সে থমকে দাঁড়ায় শকুনের চীৎকার শুনে, ঘুরে ডান দিকে তাকায়, দেখে বালির উপর, ওকী! বাচ্চার দেহটা বালির ভিতর থেকে রাত্রে শিয়াল টেনে তুলেছে, এখন সেখানে

শকুনের পাহারা। আগুনে বালির উপর ছিন্নভিন্ন দেহ দেখে লক্ষ্মী ভয়ে ছুটে পালাতে চায় আর তখনই গরম বালির ভিতর তার পা ডুবে যায়, ভয়ে পা হড়কায়। তার চীৎকার শুনে সহদেব ছুটে আসে, লক্ষ্মী বাপের দেহ আঁকড়ে ধরে, ভয়ে ওর শরীর নীল, থরথরিয়ে কাঁপে। সহদেব দেখে লক্ষ্মীর পায়ের গাঢ় আলতার দাগ মুছে সেখানে কিছু নেই, কপালের টিপ্ মুছে গেছে, সযত্নে বাঁধা চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে মুখময়, আঁচল লুটোয় বালিতে। বাতাসে এখন কঠিন উষ্ণতা, উপরে প্রখর রৌদ্র পায়ের নিচে তপ্ত বালি। বালির বিস্তার সামনে পিছনে, যতদূর চোখ যায়।

'আর মেলায় যাবনি বাপ্ ঘরে নিই চল!' লক্ষ্মীর আর্তনাদে সহদেব নিরুত্তর। সহদেব কঠিন হয়ে বালির উপর দাঁড়িয়ে থাকে কেননা কোমরে ওর এক কুড়ি টাকা আর জিহ্বায় গত রাত্রের অন্নের স্বাদ এখনো বর্তমান। সেই পাঁচটা মানুষ বালির উপর লাফায়, লাফিয়ে এগিয়ে এসে বলে, 'অ স-দেব হ'লো কী, মেয়্যা তুর কান্দে কেনে?'

(একাল—১৯৭৪)

গাঁওবুড়ো

কুসুমপুরের বুড়ো ফকিরচাঁদ যাবে বড়বাবুর কাছে। পিঠের লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়েছে ছোট্ট পুঁটলি। সামনে ঝুঁকে হাঁটে বুড়ো। আলো ফোটার সময় এখন পৃথিবী কোমল শীতল, এই চৈত্রের ভোরবেলায়। বাতাস আর মাটি আশ্চর্য সুখের। একা মানুষ ফকিরচাঁদ যাবে বড়বাবুর কাছে। মোরগগুলোর গাঁক গাঁক চিৎকার এখনো থামেনি। পিলপিলে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে পড়ছে ঘর ছেড়ে। এক পা এক পা এগিয়ে বুড়ো দুহাত জোড় করে নতুন সূর্যকে প্রণাম জানায়। নাহ্, চোখটা এখন বেশ লাগছে, শরীরও। হাল্কা হাওয়ায় বুড়োর ঝাপসা চোখে কোমল হাতের স্পর্শ।

তার বয়স তিন কুড়ি দশ পেরুল নিশ্চিত। কী যে হল, এই বয়সেই চোখে ঝাপসা দেখে পৃথিবীটাকে। হাত পা থরথর করে কাঁপে। গায়ের চামড়া শিথিল কুঞ্চিত, চোখমুখে অসংখ্য ভাঁজ। এহেন বুড়োর হঠাৎ এই বয়সে ইচ্ছে হয় দশ মাইল দূরে দুর্গাছড়ি জঙ্গল পেরিয়ে পশ্চিমে সুবর্ণরেখার তীরে কন্যাডিহার বড়বাবুর কাছে গিয়ে সমস্ত দুঃখ দূর করে আসে। মন বড় অস্থির হয়েছে। অদেখা সেই বড়মানুষের কাছে সে যাবেই। তার দুঃখ কষ্ট কি একটা?

যেমন এই চোখ। সেই মানুষ নিশ্চিত সন্ধান দিয়ে দেবেন এমন এক বদ্যির যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তার চোখটা ভাল হয়ে যাবে। ছানি কাটলে আবার ছানি পড়ে, পৃথিবীটাকে কতদিন সে বুক ভরে দেখেনি। আর সেই বড় মানুষের কাছেই কতরকম ওষুধ না আছে, বনের শিকড়বাকড়।

যেমন তার একমাত্র পুত্র। গাঁয়ের একটা মেয়ে নিয়ে সে পালিয়েছে চাকুলিয়া। সেখানে কী যেন চাকরি জুটিয়েছে। অথচ এই বয়সে পুত্র সন্তানটি কাছে না থাকলে হয় না। বৃদ্ধ বয়সের সুখের জন্যই না পুত্রের জন্মদান। এই পুত্রটিকে ঘরে ফিরিয়ে আনার এমন অব্যর্থ পরিকল্পনা বলে দিয়ে তিনি দিয়ে দেবেন যে ভালবাসার মেয়েটিকে ছেড়ে সে সুড়সুড় করে ঘরে এসে ঢুকবে।

যেমন তার জমিজমা। একা মানুষ ফকিরচাঁদ, বউটিও মরেছে। এখন জমিজমা রক্ষা এই নষ্ট চোখে দায় হয়। ইচ্ছেমত পরিকে ধান কেটে নিয়ে যায়। সেই ফসল বাঁচানোর জন্য বড়বাবুর উপদেশই যথেষ্ট হবে। আর—

আর বউ মরার পরও এই সত্তর বছুরে দেহের রক্ত শীতল হয়নি। যদি একটা গরিবের মেয়ের সন্ধান তিনি দিয়ে দেন। বুড়োর চোখ চকচক করে ওঠে, মুখের কোণে লালা এসে যায়। সেসব ভেবে দেখলে এখনো শরীরটা কেমন করে ওঠে না।

সুতরাং, বুড়ো যাবে বড়বাবুর কাছে। তিনি থাকেন কন্যাডিহাতে। সবকথা তাঁকে খুলে বলবে সে। কদিন বাদে ফকিরচাঁদ নিজের মরণের স্বপ্ন দেখেছে। গাঁয়ের মানুষ সব তৈরি

হয়ে আছে তার মরার জন্য। মরলেই বেওয়ারিশ জমিজমা সব লুটেপুটে খাবে। না, তা হবার নয়।

অনেকদিন, বহু বছর ধরে সে শুনেছে বড়বাবুর কথা। একটা সময়ে তার কত কথাই না কানে আসত। এ তল্লাটের মাথা নাকি তিনি। তাঁর কথাতেই সব চলে যেত। ফকিরচাঁদ এই গাঁয়ে এসেছে বছর পনেরো। তার আগে ঘর ছিল সেই পরিহাটি পেরিয়ে। এখানে এসেই তার ঘর হল, অল্পস্বল্প জমিজমা। তখন শুনত বড়বাবুর কথা। যায়নি কোনোদিন, এবার যাবে। আগে বিশ্বাস হত না, এখন মন উচন পাটন করে।

এই বয়সে মনের ভিতর যে কী হয়। বউটা মরে স্বর্গে গেল। ছেলেটি নিজের পাপ জুটিয়ে পালাল। সে একা এই পুরি পাহারা দিতে থেকে যায়। একটু আধটু ও জমিজমা খবরদারি নিয়ে বুড়ো ফকিরচাঁদ যক্ষের মত বসে থাকে। গাঁয়ের দশটা মানুষ তার মরণ চায়। নাহ্ মরণ অত সহজ নয়, বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে ভাবে। চোখটা যদি ভাল হয়ে যায় তবে আর একবার উষ্ণ রক্তের অনুভূতিতে পৃথিবীটাকে দেখে নেবে।

কুসুমপুরের ঝোপঝাড় জলশূন্য ডোবাডাহি পেরিয়ে সে দমকা একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। এই মাঠ, কুসুমপুরের বিশাল ডাহি, সামান্য চড়াই উৎরাই পাথুরে গেরুয়া ভূমি, মাথার উপর বিস্তীর্ণ আকাশ, দিগন্তে বিলীন এই বিশাল পৃথিবীতে আলো গাঢ় হয়ে আসছে। গাঢ় আলোর ভিতর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ একা হাঁটছে ; এখন এই রকম দৃশ্য। যেতে হবে বহু দূর। মাঠ পার হয়ে গাঁ পেরিয়ে জঙ্গল, সেই জঙ্গল পেরিয়ে আবার মাঠ জঙ্গল গ্রাম ডাহি এই রকমই তো পথ। কত বছর আগে গাঁয়ে এসেছিল বুড়ো তা আর স্মরণে থাকে না। সেই যেবার যুদ্ধের উড়োকল ভেঙে পড়েছিল নিশ্চিন্তার ওপারে তারও অনেক আগে। যুদ্ধের উড়োকল। হ্যাঁ। ঘড় ঘড় শব্দে সে আকাশে চোখ মেলে। মাথায় পাখা ঘুরিয়ে হেলিকপ্টার যাচ্ছে কলাইকুণ্ডার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে রোদ্দুর হয়ে গেল পিতলরঙা। লাল টকটকে সূর্যটা কখন রং বদলেছে। সে মাঠ পার হয় ঢাঙায় ঢাঙায়। আকাশটা আরো দূরে সরে যায়। এবার হাল্কা ঝাঁটি জঙ্গলের ভিতর সরু পায়ে চলার রাস্তা। এই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলটা ফর্শা হয়ে গেলে সে থমকে দেখে সামনে এক খাল। এখানে জল এক কোমর হবেই। অন্য সময় দেড় মানুষ তো বটেই। এই চৈত্রে জল কমছে, বৈশাখে তলানি পড়ে আসবে। এর উপরে একটা সাঁকো থাকত না? সেটা উধাও। বুড়ো হাপুক-চাপুক চাদ্দিকে দেখে। কোথাও নেই, কোথাও নেই। তবে কি তার ভুল হল? উঁহু ভুল হবার কথা নয়। ঐই তো সেই বটবৃক্ষ! বুড়ো তার ঝাপসা চোখ মেলে দেয়। বাসুলপাটি খালের এই পারাপারের জায়গায় তো সেই বট। সেই কালপুরুষের বট। সেটা আছে, সাঁকোটা নেই। চিহ্নমাত্র নেই এখানে। বুড়ো নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে স্রোত আছে বেশ। এই মরাডাহির এলাকায় একমাত্র জলের উৎস। ঐ ওপারে উদ্ধতের মত দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়া বট অথচ সাঁকোটা উধাও। সে বিপন্ন বোধ করে।

খালের নিচে কাদা আছে। জল আছে আর স্রোতও। এক বর্ষায় বুড়ো নাককুড়ি মাছ ধরতে গিয়ে ভেসে গিয়ে মরে আটকে ছিল মাইল পাঁচেক দূরে কদমডিহাতে। বুড়ো বিব্রত বোধ করে। পার না হলে চলবে কী করে? ডানে বাঁয়ে তাকায়। এই টলমলে দেহ নিয়ে এইরকম ঝাপসা চোখ নিয়ে সে জলে নামতে পারবে না। নাককুড়ির কথা মনে পড়ছে। বিপদের ভিতরে

পড়ে বুড়ো ফকিরচাঁদ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশে রোদ খেলতে থাকে। আকাশ হামলে সূর্য উঠেছে অনেকটা। চারপাশ জনশূন্য।

ঠিক এমন সময় দূরে কোথায় বাঁশির শব্দ গাঢ় হয়ে ভাসে। সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। ধুলোয় ঢাকা চোখে এদিক সেদিক দেখে। কোথায়? বাঁশি বাজিয়ে একটা কালো মানুষ ধূমকেতুর মত সামনে এসে দাঁড়ায়। ফকিরচাঁদ মানুষ পায়।

যাবু কাই, ও গাঁওবুড়া? সে বাঁশি থামিয়েছে।

বড়বাবুর নিকট যাবা। ফকিরচাঁদ এগিয়ে এসেছে।

বড়বাবু! সি আবার কুন মানুষ হ্যাঁ! কালো মানুষ বিস্মিত হয়েছে।

বড়বাবুর কথা শোনেনি? বুড়ো খিক খিক করে হেসে ফেলে। কী বলবে সে বড়বাবুর সম্বন্ধে, এই পৃথিবী সম্বন্ধে কি সব কথা বলা যায়? তাই বুড়ো হঠাৎ সুর করে বলে ওঠে,

পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ ছড়ায়
মেঘে ভর করি কে বরষে জল?
পুষ্প ফুটিলে সে গন্ধ ছড়ায়
মেঘে ভর করি সে বরষে জল।

কালো মানুষের দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। বড়বাবুর কথা বুড়ো অনেক বলে যায়। অনেক।

তু সাচ বুলছিস বুড়া?

হাঁ। ঝুট বুলি না মুই। মোর দুঃখ জানিসনি তু, জুয়ান বেটা ঘর ছাড়ি পলাইছে, বউটি মরি যাইছে, ঘরে মুর মানুষ নাই, আঁখিতে দেখি না মুই, সব বড়বাবু ভাল করি দিবে।

বাব্বা দেওতার মতন! নবীন মেঘের মত শরীরে বিস্ময় উথলে পড়ে।

হ্যাঁ।

তা তু যা। কালো মানুষ ফিরে যেতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো তার হাত ধরে ফেলে, পার হবা কী করি?

মু জানি কি? সে হাত ছাড়াতে চায়।

তু পার করি দে। বুড়ো টলমলে কণ্ঠে বলে।

তা তু দিবি কী?

হাঁ বুড়ো তাকে সব দেবে। বড়বাবুর কাছে গিয়ে বলবে তার কথা, তুর দুঃখ নাই? হাঁ

সেউ দুঃখ দূর করি দিব বড়বাবুরে কহি।।

সাচ!

হাঁরে হাঁ, বড়বাবুর নামে ঝুটা কহি না।

ঝপ করে বুড়োর হাল্কা দেহটা কাঁধে তুলে সেই মানুষ খালে নামে। জল ঠেলতে ঠেলতে দুঃখের কথা বলে, বুড়া তুকে পার করি দিলাম, বড়বাবুকে কহিবি কিন্তু। এই ছোটসোনা মাণ্ডির বুকের ভিতরটা যেন চৈত্রদিনের মাঠ। ভালবাসে বঙ্কিম হাঁসদার মেয়েটিকে। সে মেয়েও ভালবাসে এই মানুষকে, কিন্তু তাতে হবেটা কী? মেয়ের বাপ বিয়ে দেবে না ওর সঙ্গে, কিছুতেই না।

বিয়ের কথা শুনেই বুড়োর শরীরটা ছমছমিয়ে ওঠে, আহা বেহাতে যে কী সুখ!

তা বেহা দিবেনি কেনে?

মুর ঘর নাই জমিন নাই।

অহ্ শালা হা ঘরে। বুড়ো খুক খুক করে খুব হাসে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ওপারে।

তু শুন গাঁবুড়া, মু উহারে ভালবাসি ঠিক, তু বড়বাবুরে কহিবি।

গাঁওবুড়ো তুই বলবি এই নবীন মেঘের মত যুবক ভালবাসে যে নারীকে তার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। গাঁয়ের নাম আসনবনি। বড়বাবু যদি ওদের মিলিয়ে দেন। সে এখন যেতে পারবে না, যাবে কলাইকুণ্ডার দিকে। দিনমজুরির কাজ আছে সেখানে। কাল বিকেলে এখানেই অপেক্ষা করবে সে। বুড়োকে পার করে দেবে আর তার সুখের খবর শুনবে নিশ্চিত।

উজ্জ্বল রোদে ভেসে সে বাঁশি বাজিয়ে দেয়। হাওয়ায় উড়তে উড়তে কোথায় চলে যায় সেই বাঁশির শব্দ। বুড়োকে পার করে দিয়ে খাল পেরিয়ে সে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফকিরচাঁদ উদাসীন পথ চলে। রোদ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসছে, আহা বড় দুঃখু তোর, ভালবাসার মেয়্যামানুষের সঙ্গে বেহা না হলে বেদনা হয়, বড়বাবুকে সব কহিব মু।

গাঁওবুড়ো পথ হাঁটে। রুক্ষ মাটির গেরুয়া পথ। একপাশে জঙ্গল অন্য পাশে ঢালু মাঠ। গহীন গাছগাছালিতে ঢাকা টিলা। চৈত্র শেষের দিন। টলমলে বাতাসে ভেসে আসে আলুথালু ফুলের গন্ধ। শাল ফুল মহুয়া ফুল।

সেই বিশ তিরিশ বছর আগেও শরীর ছিল মোষের মত। সব শেষ হয়ে গিয়েও জেরটা রয়ে গেছে। না হলে তপ্তদিন এতটা পথ হাঁটা এই শিথিল দেহে সম্ভব হয় কী করে? টালমাটাল দেহ ঝাপসা চোখ নিয়ে সে দুলে-দুলে হাঁটতে থাকে।

এখন রোদ্দুর রূপা বর্ণের হয়েছে। ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে দেহের উপর। বাতাসে অগ্নিময়তা। এমন টিটিয়া রোদে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ফকিরচাঁদের গলা শুকিয়ে যায়। কাঠ কাঠ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত মুখ। জিহ্বায় কেমন তিক্ত স্বাদ। দেহটা মরুভূমি হয়ে গেছে। বুড়ো ঝাপসা চোখে সব আলুথালু দেখে। এপাশে জঙ্গল ওপাশে রুক্ষ চড়াই-উৎরাই ডাহি। সে বিপন্ন বোধ করে। বড়বাবুর কাছে যাবে, তা সে তো অনেকদূর। তার চলন শ্লথ হয়ে আসে। জিভ বার ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে সে চলতে থাকে। তারপর এক সময় কোত্থেকে গান ভেসে আসে। ভরা রৌদ্রে গান গায় কারা? মানুষ কোনদিকে? গাঁওবুড়ো শব্দ লক্ষ্য ক'রে হাঁটতে থাকে। ক্রমে গানের শব্দ তীক্ষ্ম হয়ে আসে। ঘুরে হাল্কা জঙ্গল ছাড়িয়ে টুকরো মাঠ। সেখানে মেয়ে পুরুষ জুটেছে অনেক। তারস্বরে গান শুরু করেছে সবাই। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ। বুড়ো গুটিসুটি সেখানে গিয়ে হাজির হয়। মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। কি হয়টে ইখানে? ফকিরচাঁদ হাঁসফাঁস করে।

নেশাতুর এখানে সবাই। বুড়োকে দেখে তারা মজা পেয়ে যায়। বাহারে—

কুন গাঁ থেকে বিরোল ইটা?

দিব নাকি চাউলের পিঠা!

হা-হা-হা। রোদ্দুরে যে চাঁদি ফেটে যায় বুড়োর। সে বসে পড়েছে ছোট নিমগাছটার ছায়ায়।

শালুই পূজা হয়টে রুত্তা।

পানি দাও গো, মরি যাই।

পানি দে, পানি দে বলে চিৎকার করে ওঠে দু-একজন। বকবাকে পাত্রে জল আসে। আহ্ বুড়ো মাথার চাঁদিতে জল দেয়। গলায় জল ঢেলে সে ধাতস্থ হয়। দৃষ্টি ফিরে আসছে আবার। নিমের ছায়ায় সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়।

তা তুদের পূজা ইখেনে কেনে?

কেনে? জাহেরা থান, শালুই পূজা, জঙ্গলে যাব। মানুষটার কথা জড়িয়ে অসংলগ্ন। ও-পাশে আবার গান শুরু করে দিয়েছে মেয়েরা। সে ঝাপসা চোখ টান-টান করে। কে একজন ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় ওদের, 'ভিনদিশি মানুষ কথা কয়, ইখন গান লয়'।

মুরুব্বি সাঁওতাল টলে টলে জিজ্ঞাসা করে, 'হাঁ গাঁ বুড়া বাবু কাহি?'

কানিয়াডিহি।

ঘর কাহি ইইছে?

কুসুমপুর।

কুসুমপুর! হোয় বাব্বা! যাবু কনিয়াডিডি, কদ্দূরে বটে? তা যাবু কেনে?

বুড়ো এখন স্থির হয়েছে। সবার মুখের দিকে তাকায়। চোখ লাল করে সব টলছে। মু যাবো বড়বাবুর নিকট।

'সি আবার কুন মানুষ! ফরিস্টার?'

'ধুস! বড়বাবুর কথা জানোনি....।' বুড়ো অবাক হয়।

পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ ছড়ায়...। বুড়ো বড়বাবুর কথা বলে। বড়বাবুর মহিমার কথা। 'মুদের বড়বাবু লাগবেনি, মুরা ভাল আছি।'

'হোয় চুপ যা', কে একজন ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়, 'বুড়ো মুদের দুঃখু আছে অনেক, ওই আকাশের সমান দুঃখু।'

ফকিরচাঁদ চোখ পিটপিট করে যুবতিদের দোলাতে থাকে লুকিয়ে চুরিয়ে আর অন্যমনস্কের মত বলে ফেলে, 'কহি ফেল তুদের দুঃখ, সব দূর হই যাবে।'

'তা কহিবো, তুই হাঁড়িয়া খাবু? খপ করে একজন বুড়োর হাত ধরে ফেলে।'

'না হে, বড়বাবুর নিকট যাবো যে!'

'আহ্, তাহলে মুদের দুঃখুর কথা শুন।'

আমাদের বড় দুঃখ বুড়ো। শালুই পূজায় ধুমধাম করতে পারিনে। শাল গাছই জোটে না, ফরেষ্টার চালান দেবে খড়্গপুরে, আমাদের এই দুঃখ। আমাদের কষ্ট হয় যে পূজায় বরাহ বলি দিতে পারিনে, কত দুঃখ! আমার মেয়েটা ভিনদিশি হাবরের সঙ্গে পালিয়ে যাবে বোধ হয়...। বড় দুঃখ শাল গাছ পাইনে, কাঠ কাটতে পারিনে, শিকার জোটে না। সব চালান দেবে খড়্গপুরে। বরাহ জোটে না। মাথার বুক সন্তুষ্ট হয় না বুড়ো ... নেশা করলে পুলিশে এসে ধরে। সব চালান দিবে ঝাড়গ্রামে।

লোকটা দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকে। পাশের মানুষগুলোও কাঁদতে থাকে। বুড়ো তু যদি যাবি বড়ামঠাকুর, মুদের দুঃখু জানাবি এসিছিস। তুই হাঁড়িয়া না খা তো ভাত খা। ভাত না খা তো পানি খা।

বুড়োকে জোর করে ভাত খাইয়ে দেয় ওরা। মুখে রোচে না [illegible] ওদের। তবুও পেট বাঁচে। এক সময় উঠতে হয়। সাঁওতাল সেখরি পিছনে পিছনে আসে, বুড়ো তু বলিস সি

বড়মানুষকে বলিস যাতে বেদনাটা দূর হয়, তুরে কত ভালবাসলাম হাঁ।

ফকিরচাঁদ নরম হয়ে যায়, 'কাল এখেনে থাকিস ফিরার পথে তোদের সব বলে যাব।

গাঁওবুড়ো পথ হাঁটে। কয়েক পা চলেই ফিক করে হেসে ফেলে তারপর উদাসীন হয়ে যায়। কত কষ্ট মানুষের। বড়বাবুকে সব বলতে হবে। এমনি হাঁটতে হাঁটতে সূর্য্যি মাথায় উঠে হেলে যায়। আকাশে গুম গুম শব্দ হয়। মেঘের! না মেঘ নয়, কলাইকুণ্ডার বোমের শব্দ। মহড়া চলছে।

দুর্গাখড়ি জঙ্গল পড়ে যায়। বেলা নেমে আসছে। এটা পার হয়ে দুখানা গাঁ, মাঠ, তা পেরিয়ে সুবর্ণরেখা নদী। সে নদীর তীরেই কন্যাডিহা। সেই নদীর কাছাকাছি বড়বাবু থাকেন। দীর্ঘ উন্নত দেহ। টকটকে রঙ। মাথার চুল এতদিনে সাদা হয়ে গেছে নিশ্চিত। বড়বাবুকে দেখেনি ফকিরচাঁদ, শুনেছে তাঁর কথা। চোখে দেখেনি শুধু কানে শুনেছে।

বড়বাবুকে ছোট সোনামাণ্ডির কথা বলতে হবে, বলতে হবে ঐ গাঁয়ের সাঁওতালদের কথা। নিজের কথাও বলতে হবে। নাহ্ যখের মত পাহারা দিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। হয় একটা বউ চাই নতুবা ছেলেটা ঘরে ফিরে আসুক। গাঁওবুড়ো বিড়বিড়িয়ে পথ হাঁটে। আর এই রকম হাঁটতে হাঁটতে কখন মাথার গনগনে আকাশটা হারিয়ে গেছে গাছগাছালির আড়ালে তা বুড়ো জানে না। এখন জঙ্গলের গভীরে সে। রৌদ্র কোথাও কোথাও ঠিকরে পড়েছে দু এক টুকরো নতুবা সব ছায়াময়। জঙ্গল আগে ছিল ভয়ের, এখন ভয় কম। তবুও কত বিস্ময় না জমা হয়ে আছে। জানোয়ারের পিঠে চেপে এই জঙ্গলেই না ঘুরে বেড়ান বড়ামঠাকুর। ঐ শালগাছের গোড়ায় স্তূপাকার মাটির হাতি ঘোড়ায় তাঁর থান হয়তো। কোথায় যেন আছে রাক্ষসী রঙ্কিণী দেবীর থান। বুড়ো নিঃঝুম পথ হাঁটতে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় বিপন্ন হয়ে পড়ে। তিনদিকে তিনটি রাস্তা গেছে। কোন দিকে যাবে সে? ঝাপসা চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে তারপর হঠাৎ দেখে দূরে শালগাছের গোড়ায় কী নড়ে চড়ে, মানুষ নাকি!

সে হাঁক মারে, কোন মানুষ গো ইদিক আস।

সেই মানুষ হাতছানি দিয়ে ডাকে। বুড়োর ঝাপসা চোখ স্পষ্ট হয়। বুকের ভিতরটা ধ্বক-ধ্বক করে ওঠে। জঙ্গলে কত না ভয়! অপদেবতা নাকি। নড়ে চড়ে মানুষের মত। যাই হোক না কেন এখন দিকহারা বুড়োকে ওখানেই যেতে হবে। সে এগিয়ে যায়।

ঝাপসা চোখে সব স্পষ্ট দেখে। গা শিউরে ওঠে তার। একি! মানুষই বটে। ফিসফিসিয়ে কথা বলে। মহারোগে দেহটা বীভৎস। টসটসে লাল মুখটা। সে মৌতাতে [illegible] পড়ে আছে।

কোন গাঁর গো তুই? বুড়ো পয়সা ছুঁড়ে দেয় গাঁট থেকে।

মানুষটা ছুঁয়েও দেখে না, সনাতে নাই পয়সা [illegible]

ফকিরচাঁদ স্তব্ধ হয়ে যায়। কী বলে মানুষটা?

'মরণ ধরিছে মুরে, হাঁ গা বুড়া যাবু কাঁহি, কুন গাঁয়?'

'কনিয়াডিহি, বড়বাবুর কাছে।'

লোকটা নির্বিকার বসে রইল।

'বড়রোগ কচ্ছিলো [illegible]?'

[illegible]

[illegible]

'কনিয়াডিহি কুন পথে'? বড়ো জবাব পায় না।

'তু বড়বাবুর নিকটে গেল্যে' দাওয়াই বাতলে দিত। বুড়ো আবার বলে।

সি আবার কে? গমগম করে ওঠে কুষ্ঠরোগীর কণ্ঠস্বর এই জঙ্গলে।

বুড়োর দেহে শীত ঘনায়। সে কাঁপা গলায় কন্যাডিহার বড়মানুষের কথা বলে। কুষ্ঠ রোগীর চোখ স্ফীত হয়ে ওঠে, সে হাত বাড়িয়ে বুড়োকে ধরতে যায় আর কি। বুড়ো সরে যায়।

'মু পথ বাতলে দিচ্ছি, তু তোর বড়বাবুকে মুর কথা কহিবি, যদি রোগটা সারে, লোকালয়ে ঘুরতি চাইরে বুড়া। লোকটার স্বর ভারি হয়ে ওঠে।

শেষে মানুষটা পথ দেখিয়ে দেয়। বুড়ো কথা দেয় ওষুধ নিয়ে ফিরবে। বড়মানুষ যদি একবার ছুঁয়ে দেন তো রোগ সেরে যাবে, লোকটাকে বলতে থাকে বুড়ো।

এখন ফকিরচাঁদ জোরে হাঁটে। বুকটা ভার হয়ে আছে। এমন দেহ, বড় রোগে সব গেল। এমন নবীন বয়স। বলবে সে, বড়বাবুকে সবার কথা বলবে। এই সব মানুষ না থাকলে সে বড়বাবুর কাছে পৌঁছত কী করে? সকলের কথাই বলবে। সেই মানুষের ইচ্ছায় সকলের দুখের শেষ হবে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে নদীর দিকে। সে উদাসীন পথ হাঁটে। ঐ তো বোধ হয় কন্যাডিহা, ঐ দেখা যায় সুবর্ণরেখা। ধবধবে সাদা বালিয়াড়ি। ওখানেই সেই বড়মানুষের ঘর। বুড়ো জোরে হাঁটে। মানুষের কত দুঃখ। কত বেদনা। সকলের কষ্ট যদি চলে যেত তবেই না! ভাবতে ভাবতে বুড়ো চিকন্ হাসে। কষ্ট না হলে সুখটা বুঝবে কী করে মানুষ? সেই আশায় তো এতটা পথ ছুটে আসা।

বিকেলের পৃথিবীটা বিষণ্ণ হয়ে এল। তার বুকটা হাঁসফাঁস করছে উত্তেজনায়। শীর্ণ দেহ শিথিল কুঞ্চিত চর্ম ঝাপসা চোখ লগবগে শরীর নিয়ে তার ধকল গেছে বেশ। জিভ বেরিয়ে আসার জোগাড়। শরীরটা নুয়ে যাচ্ছে বার বার। এখন যদি কোথাও নরম বিশ্রাম পেত সে। আর সেই ঘরে যদি তার মরা বউটি বেঁচে থাকত, ছেলেটি ঘর ছেড়ে না পালাত, তাহলে এতটা কষ্ট হত না। শিথিল আরামে শরীর এলিয়ে সে ঝাপসা চোখে পৃথিবীটাকে দেখত। ছানি কাটিয়ে আনত, আবার ছানি পড়ত। তারপর একদিন ছেলের হাত ধরে চলে আসত এখানে। ছেলে তাকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে আসত, ডুলি করে নিয়ে আসত। কন্যাডিহার বড়মানুষ তার চোখ ভাল করে দিত। ফর্সা করে দিত পৃথিবীটাকে। তা হবার নয়, তাই তো জীবন হাতে করে এই চৈত্রের দিন ভেঙে অদেখা বিশাল পুরুষের কাছে জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছান।

ধকপকান বুক নিয়ে সে হাঁটতে থাকে। ছায়া হয়ে উঠেছে দীর্ঘ। সূর্য নেমে যায়। ফকিরচাঁদ বিষণ্ণ বোধ করে। দিন শেষের সময়েই চাঁদের হাট সংসারের কথা মনে পড়ে। গাঁওবুড়ো এসে পৌঁছাল সুবর্ণরেখার পাড়ে। এরই নাম কি কন্যাডিহা। চারপাশে বিষণ্ণ বাতাস বয়ে যায় হা হা করে। এই গাঁয়েই বড়বাবু থাকেন।

নদী খেয়ে ফেলেছে গাঁয়ের সবটাই। এখানে সেখানে ইতস্তত বাস্তুভিটের চিহ্ন ছড়িয়ে। পালকুল বাবলা আর কত রকম গাছগাছালির ঝোপে অন্ধকার। আর আশ্চর্য একটা মানুষও নেই। বুড়োর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। অস্বচ্ছ চোখেই সে মানুষ খোঁজে। মানুষ তো একটা না একটা থাকবে। বড়বাবুর গাঁ তো এটাই হবে এর পরে নদী নিয়েছে বিপদজনক বাঁক, আর গ্রাম কোথায়?

শরীর নিঃঝুম হয়ে আসছে। এটা হয়ত কন্যাডিহা নয়। পথ ভুল হ'ল।

আশপাশে কোথাও আছে। অন্য কোথাও। অন্য কোনওখানে।

ক্রমে অন্ধকার বিস্তৃত হয়। বুড়োর কাছে নদী পেরিয়ে বাতাস আসে। অন্ধকার গাঢ় হয়। বিপন্ন গাঁওবুড়ো এদিক সেদিক মানুষ খোঁজে। তারপর হঠাৎ এক সময় পায়ের কাছে ধূমায়িত আলো ঝুলিয়ে এক মানুষ ফকিরচাঁদকে পার হতে যায়, গাঁওবুড়ো হাসফাঁসিয়ে চিৎকার করে, কে যায়-গ মানুষ, রসো। সেই মানুষ থেমে যায়।

'বড়বাবুর ঘর কোন গাঁয়?'

বড়বাবু! বিস্ময়ে অন্ধকারে সে চেয়ে থাকে বুড়োর দিকে।

গাঁওবুড়ো কাঁপা গলায় বড়বাবুর মহিমার কথা বলে। তিনি পরিশ্রান্ত মানুষকে বিশ্রাম দেন, অফুরন্ত জীবনের কথা বলেন। অবলীলায় কত দুরূহ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। তিনি বড়মানুষ। বিশাল এক পুরুষ। রোগ শোক তাপে তাঁর কাছেই আশ্রয়।

এই মানুষ খনখনে গলায় হেসে ওঠে, 'হা হা তুমি স্বপ্ন দিখ গাঁওবুড়ো, এমন মানুষ কই? কোথাও নেই। এমন মানুষ আজকাল আর থাকে না, থাকে না।' লোকটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পা বাড়ায়, ফলত ফকিরচাঁদ নিঃসঙ্গ।

তখন অন্ধকারের পৃথিবীতে চাঁদ ভেসেছে গেরুয়া বর্ণের ডিম্বাকার। তার সামনে অন্তহীন চরাচরে কেউ নেই। সেই বিশাল পুরুষও নয়। একমাত্র আছে বিশাল বালিয়াড়ি নিয়ে এই নদী। সব কেমন রহস্যময়। বুড়োর মাথার ঠিক থাকছে না, সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু তুমি থাকলে না। মানুষে বলে এমন মানুষ আর এখন থাকে না। তুমি থাকলে না তাহলে আমার কষ্ট ছোটসোনার দুঃখ, কুষ্ঠরোগীর জীবন আর সেই সাঁওতাল গাঁয়ের কষ্ট বেদনা কী ভাবে হারিয়ে যাবে?

সে নেমে গেছে বালিয়াড়িতে। অল্পালোকে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে বালুকণা বিস্তীর্ণ বালিতে নেমে উদার আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সে তীব্র চিৎকার করে ওঠে, 'যখির মত পাহারা দিব কী করে বড়বাবু, অন্ধ চোখে বেঁচে থাকব কী করে বড়মানুষ?'

এই নদীটা রয়ে গেছে অথচ সে মানুষ থাকল না। নিঃশব্দে কখন চলে গেছে অথচ দুঃখ কষ্ট বেদনা আর বিশ্বাসটুকু রেখে গেছে গাঁওবুড়োর মনে।

'চলি গেল্যে তো সব দুঃখু গুলান নি গেঁলেনি কেনে?' বুড়ো ফিসফিসিয়ে নদীর সঙ্গে কথা বলে। দূরে কোথায় ছপ ছপ শব্দ হয়। বড়মানুষে হেঁটে যায়।

গাঁওবুড়ো দ্রুত দৌড়তে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে বালিয়াড়িতে। এক আকাশ পৃথিবীর উপর প'ড়ে থাকে। সব নৈঃশব্দে ডোবে। তারপর এক সময় সবুজ আলো জ্বালিয়ে এক উড়োকল নৈঃশব্দ ভেঙে চলে যায়।

ফেরার পথে সেই জঙ্গলে সেই মাঠে সেই খালের সামনে অপেক্ষা করে থাকে যে যেমন। গাঁওবুড়ো কাল ফেরেনি আজ ফিরলো না তবু ফিরবে নিশ্চয়ই।

(অমৃত ১৯৭৭)

ডাইন

সূচনা

ভর সন্ধেয় নদীর ধারে ডাইন ঘুরে বেড়ায়। গাঁয়ে তাই রটেছে। পলাতক হরি নায়েকের বউটা ডাইন হয়ে যাচ্ছে। রূপ খুলেছে তার। এই এ্যাত্তোখানি সিঁদুর ধেবড়ে আছে কপালে আর সিঁথিতে। লালপেড়ে শাড়ি, পা ভর্তি আলতা নিয়ে নায়েকের বউটা সুবর্ণরেখার চরে ঘুরে বেড়ায়। হাতের প্রদীপ অন্ধকারে তারার মত দেখায়।

মন্দলোকে কুকথা বলে। আর সত্যি কথাই যদি রসালো হয় তো সর্বমানুষ সুখ পায়। কথার রসে জিভে স্বাদ আনে। ভাল-মন্দের বিচার হয় না।

বড় রসালো খবর হয়েছে হরি নায়েকের বউটা। একটা বিশ-পঁচিশ বছরের সোমত্ত যুবতি বদলে যাচ্ছে। চরিত্রে বিক্ষেপ এসেছে তার। এত বড় খবর এই অঞ্চলে ইদানীং বড় হয় না। তাই মুখে মুখে কানে কানে সব ছয়লাপ। পুলিশেও শুনেছে। কেননা হরি নায়েক সংক্রান্ত যাবতীয় খবরেই পুলিশের কান।

—এই হচ্ছে নেতা, দুদিন পালাতেই বউ-এর চরিত্র বদলে যায়, ঘরের বউ ঠিক করতে পারে না আবার দেশ ঠিক করতে যায়।

থানার মেজবাবু বত্রিশ দাঁত বার ক'রে হাউ হাউ হাসতে থাকেন। হ্যাঁ, তাঁর মুখের হাসি ঠিক এই রকমের। দূর থেকে শুনলে মনে হবে কেউ যেন কাঁদছে! মেজবাবুর কাছে এই পৃথিবীটা শোকের। এটা বোধহয় বিশ বছর পুলিশে চাকরি করার ফলাফল।

রাত গহীনে গাঁয়ে এখনো শিয়াল উঁকিঝুঁকি মারে। দিনের আলোয় চেনা যায় না। হরি নায়েকের বউ-এর খোঁজে আছে শিয়ালগুলো।

বুঝলে হে দঁড়পাট, কালঅ রাতি লায়েকের বউটো মোর খিড়কি দিয়া উঁকি মারছিল। শতপথীবাবু পান চিবুতে চিবুতে বলেন।

কী রকম কী রকম?

সোউ এক বিত্তান্ত বটে, যোবতি মেয়্যামানুষ, লজ্জা, লজ্জা, তা নায়েক নিজেই গোলমেলে মানুষ, বউটো কী করি ভাল হয়!

হ্যাঁ, বড় গোলমেলে মানুষ এই হরি নায়েক। ইয়া পুরুষ। কালো মেঘের মত মানুষ। বুকের ছাতি নয় যেন মেঘ করা আকাশ। চোখ দুটো অঙ্গারের দুই টুকরো যেন। গালে পাতলা ফিনফিনে দাড়ি। লোকে বলে নায়েক যদি শক্ত ক'রে মাটিতে পা রেখে দাঁড়ায় তো সাধ্য কার যে সেই ঊরু একটুও সরায়। এই ভাবনাটি অবশ্য এসেছে একটি রঙীন হিন্দি চিত্র থেকে। রামায়ণ কাহিনী। রাবণের রাজসভায় অঙ্গদ। ঊরু স্থাপন করেছে মহাবিক্রমে। সে ঊরু কাঁপায়, কোন রাক্ষসের সাধ্য।

এ হেন হরিনায়েক তাবড় তাবড় মানুষের দুঃস্বপ্ন। হরি নায়েকের ভয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হয় মহাপাত্রদের। গোলমালটা কী রকম?

হরি নায়েকের মাথায় যেন কী আছে। সবটাই গোলমেলে। কেননা পৈতৃক চার বিঘে জমি চষে আর অন্য বাবুদের জমি ভাগে চাষ করে তার দিন বেশ চলে যেত এই পৃথিবীতে। সেই কারণে এই গ্রহের মানচিত্রে অপরিস্ফুট গোপীনাথপুর থানার ১৪৫ নম্বর জুরিসডিকশন্ লিষ্টের মৌজা কীর্তনিয়াশোল নিয়ে ভদ্রসজ্জন বাবু মহোদয়েরা এত তিত বিরক্ত হতেন না। শুধু কীর্তনিয়াশোল কেন, এর চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা মায় বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলার বাবুমহোদয়েরাও এই হরি নায়েকের নাম শুনে সারিডন খেতে বাধ্য হন।

হরি নায়েক এই অঞ্চলে প্রচলিত যাবতীয় প্রথাকে অস্বীকার করে। এই প্রথাগুলি ঐতিহ্যময় এবং বাবুদের জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত। ভদ্রসজ্জন মানুষের জীবনের সঙ্গে অন্যান্য ইতরজনের জীবনও যেহেতু আষ্টেপিষ্টে বাঁধা, সে কারণে প্রথাগুলি এই অঞ্চলের সর্বমানুষের জীবন ও জন্মে জড়িয়ে।

প্রথা কম নয়। যেমন বসন্তে গাঁ উজাড় হয়ে যাওয়ার সময়ে ধুমধাম সহকারে শীতলা ঠাকুরাণী মাতার অর্চনা। সময় অসময়ে অষ্টপ্রহর ষোড়শপ্রহর কৃষ্ণনাম টুসু পরব থেকে বারো মাসে তেরো দুগুনে ছাব্বিশ পরব। যদিও এগুলি সুপ্রচলিত, তবুও হরি নায়েকের চোখ এই প্রথাগুলিকে অস্বীকার করতে পারে না। সে বরং একটি হাস্যকর কাজ করে। যে যে প্রথাগুলিকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করে হরি নায়েক সেগুলি কাগজে-কলমে সরকারী খাতায় পুরোপুরি অ্যাবোলিশড্। কিন্তু কাগজ কলমের সরকারী নিয়মের বাইরেই পৃথিবী, হরি নায়েকের কীর্তনিয়াশোল এবং তার আশপাশের মৌজাগুলি।

সুতরাং কাগজ কলমের সঙ্গে বাস্তব অবস্থাকে মিলিয়ে দিতে গেলেই রব ওঠে। বাবু মানুষেরা যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও ক্ষেপে ওঠে। হচ্ছেটা কী?

সত্যিই এটা কী রকম? সরকারী আইন মতে এই সেচ এলাকার পুরো একটি পরিবার জমি রাখতে পারে বাহান্ন বিঘের মত। তিনি যদি তাঁর বাড়ির মুনিষ এবং বাগাল ছেলেটাকে কিছু জমি দান করেন বা জামাইয়ের নামে জমি কেনেন তো কারোর কিছু বলার নেই। কেননা 'দান' এই শব্দটি এদেশীয় সমাজ সভ্যতার একটি মূল্যবান অঙ্গ। আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। হরি নায়েক এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। তার উর্বর মস্তিষ্ক যাবতীয় গোলমালের সূত্র।

সে বলে এটি দান নয়, বেনাম। অধিক জমি রাখার কৌশল। দলবল নিয়ে সে ধান কাটতে যায়। জমি দখল করতে চায়। অথচ বাড়ীর মুনিষ বা জামাইয়ের নামে জমি রাখা একটি ঐতিহ্যময় প্রথা। সরকারী অফিসগুলিও তা জানে। এই পদ্ধতিতে জমি অর্থাৎ পৃথিবী ভোগ করা ধনবানের অধিকার।

এই চাকে ঢিল মেরে কয়েকজন পাগলাটে সরকারী অফিসার রীতিমত ভিমরুলের তাড়ায় দূর অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে চাকরি বাঁচিয়েছেন। তাঁরা আদপেই এসব কাজের যোগ্য ছিলেন না। বাবুরাও তাই বলেন, কেননা আবহমানকাল যে সব প্রথা চলে আসছে তাকে বরণ করে নেওয়ার ভিতরেই স্বাভাবিকতার লক্ষণ। মরা নদীর বালি সরিয়ে তাকে আবার প্রবহমান করে তোলার ভিতরে স্বাভাবিকতা নেই, অন্তত তাঁদের জীবনে প্রচলিত অভিধান যা বলে। হরি নায়েক অভিধানের শব্দ বদলে দিতে চায়। এ কারণে সে একটি অস্বাভাবিক মানুষ। অসুস্থতা

তার মাথায়। এবং এই অসুস্থতার জন্যই তার যাবতীয় কুখ্যাতি।

দাতা এবং গ্রহীতার সম্পর্ক ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন। সুদ দেওয়া এবং নেওয়া এদেশে একটি সুপ্রচলিত প্রথা এবং তা পেশাও। সুদ দিতে হয় কেননা তিনি ধার দেন। তিনি ধার দেন বলেই আমাদের ইহ জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং তাঁর যাবতীয় শর্ত আমাদের পূরণ করে চলতে হয়। এই ঈশ্বর করুণা করেন, করুণা করেন এই আশায় যেন আমরা ঈশ্বর নামক দেহী এবং বিদেহীর ভজনা করি।

হরি নায়েক গরীব গুবরো একেবারে মাটিতে বুক ঘষটে চলা মানুষগুলোকে নিয়ে দল পাকায়। তাদের মাটিতে দু'পায়ে দাঁড়াতে শেখায়। শিখিয়ে বলে সুদ দেওয়া বা নেওয়ার জন্য মানুষের জন্ম নয়।

তেমনি জমির ব্যাপারেও হরি নায়েক মানুষগুলোকে সঙ্গে নেয়। বলে, আপাতত আইন-কানুনই মানুন বাবুমশায়রা। বাড়তি লুকোন জমি আমাদের দিন। আমরা খেয়ে বাঁচি। অন্যের নামে জমি রেখে সেই জমির ধান নিজের খামারে তোলা সরকারী নিয়ম নয়।

এটা বেনিয়মও নয়। তাহলে সমস্ত মানুষের চর্মচক্ষুর সামনে এই প্রথা বহুকাল চলতে পারত না। গোলমেলে অনেক প্রথাই তো ব্যবহার হ'তে হ'তে নিয়ম হয়ে যায়। সেই নিয়মে মানুষের বংশগত অধিকার জন্মে যায়। অনন্তকালের সেই অধিকারে হরি নায়েকের হস্তক্ষেপে বাবুগণ সত্যিই বিরক্ত। কিন্তু মুখে সেই বিরক্তি প্রকাশে সাহস করেন না। হরি নায়েকের ভয় আছে।

সে এখনো পলাতক। তার বউটা এই সময় দুশ্চরিত্রা ডাইন হয়ে যাচ্ছে। ভর সন্ধেয় সুবর্ণরেখার বালুচরে প্রদীপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এসব হয় কেন? তাহলে হরি নায়েকের জীবনের গভীরে ঢুকতে হয়।

দুই

এই হরি নায়েক যেমন বাবুদের কাছে অস্বস্তি তেমনি গরীব-গুবরো হাড়-হাভাতে মানুষের কাছে ঈশ্বর প্রতিম। বছর সাত-আট আগের কথা। সত্তর একাত্তর সাল হবে বোধ হয়। পুরো গোপীনাথপুর থানা হরি নায়েকের ভয়ে ঠক ঠক করছে। হরি নায়েক তখন হয়েছে শ্রীহরি। শ্রীহরি ভগবান। ভগবান এই কারণে যে, আমাদের বিশ্বাস ভগবানই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মানুষের জীবন মৃত্যু তাঁর ইচ্ছা। একদিন হরি নায়েক মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করত। হরি নায়েক মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত করে দিত। একেবারে চিত্রগুপ্তের খাতা নিয়ে বসেছিল সে। পৃথিবীতে মানুষের পাপপুণ্যের হিসেব করত। মানুষে ছড়া বেঁধেছিল—

রাখে হরি মারে কে?
মারে হরি রাখে কে?

গোপীনাথপুর থানা হরি নায়েকের ভয়ে কাঁপে। বাবুগণ হরি নায়েকের ভয়ে দিনে ঘুমোন রাতে জাগেন। তাঁদের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে বিষয়টি মিলে যায়। এইভাবে আস্তে আস্তে জমি দখল হয়ে গেল। বাবুরা আদ্যিকালের প্রথা ছাড়তে বাধ্য হলেন। যাঁরা একটু অন্য রকম হতে গেলেন, পার পেলেন না। হরি নায়েক মানুষের ছায়া দেখে তার স্বভাব বলতে পারে।

বউ তার রূপবতী। তার মাথার এক মেঘ চুলে, তার কোমল দুই চক্ষুতে, দেহের রেখায়

রেখায় বন্য সৌন্দর্য। হরি নায়েক যেন বউ-এর গা থেকে বুনো ফুলের গন্ধ পায়। সৌন্দর্য তো সকলের প্রিয়। হরি নায়েকের আবার তাতে অহেতুক প্রীতি। সব সুন্দর হবে। মানুষসহ পৃথিবী হয়ে উঠবে অপরূপ। সেই কারণেই জমি দখল! বাবুগণের অধিকৃত প্রথায় হাত তোলা। বউকে সে মাঝে মধ্যেই বলে, যেমন তুই তেমনি হবে জগৎ।

এমনি বন্য। মাটি আর বনজ বৃক্ষের গন্ধমাখা দুর্দম সুন্দর। বউ এসব শুনেও কথা বলে না। তার মাথায় এসব ঢোকে না। তার রূপের অহংকার আছে অন্তত গাঁয়ের মানুষ যা বলে। রূপের গুমরে নাকি তার পা পড়ে না মাটিতে। সে বড় নিশ্চুপ। কথা নেই মুখে। তার হাসির শব্দ শোনে না কেউ। পায়ের শব্দ কই?

নায়েক সকলের মাথা ব্যথা। বউ এর তাতে কী হয়! সে থাকে তার মত, নায়েক নায়েকের মত! প্রশাসনে যাঁরা একটু অসুস্থ তাঁরা সমস্তটা অ্যানালিসিস করে নায়েকের দোষ খুঁজে পান না। কেননা জমিগুলো সত্যিই সিলিং বহির্ভুত। দখল হতে দোষ কোথায়? আর সুদের অত পার্সেন্টেজও হওয়া উচিত নয়। মানুষগুলো যে না খেয়ে মরবে।

কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মূলত নায়েকের বিপক্ষে। কেননা মহাপাত্র শতপথীবাবুদের জীবন রক্ষার জন্য, বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্যই তাঁদের জন্মবৃদ্ধি এবং চাকুরিতে যোগদান। তাঁরা আইনে বিশ্বাসী। কিন্তু এই আইন সর্বত্র একই রকম প্রয়োগে ততটা তৎপর নন।

সুতরাং একাত্তর সালে হরি নায়েক গ্রেপ্তার হয়, তাকে জেলে যেতে হয়। কিন্তু প্রথম দিকে নায়েকের এই গ্রেপ্তার ও কারাগারে গমন কীর্তনিয়াশোল এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় পুরনো দিন পুরনো প্রথা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেনি। বিশালদেহী হরি নায়েক ধরা পড়ার আগে মহাপাত্রবাবুর বন্দুকের তিনটে বুলেট পায়ে নিয়ে চারদিন জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। কাঁধে টাঙ্গির কোপ নিয়ে রাত অন্ধকারে ফিরে শতপথীবাবুর বিচার করে গ্রামবাসীর সমক্ষে। সে সকলের বিস্ময়। এমন মানুষ কে আছে যার কাঁধের ভিতরে নাকি এখনো বুলেট রয়ে গেছে। তার প্রভাব কি কম? সুতরাং নায়েক জেলে গেলেও মানুষের চেতনা যায় না। রাত অন্ধকারে বদ্‌মায়েশ বাবুর ঘরের সামনে তারা চীৎকার করতে ভোলে না, রাখে হরি মারে কে / মারে হরি রাখে কে?

বাবুরা প্রথমে নরম হন! কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। একদিন তাঁদের আবার পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা পুরনো অভ্যেসে ফেরেন। সহায়তা করে প্রশাসন। কেননা তখন দেশের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি জরুরি। বাবু মহোদয়গণ দেশীয় অর্থনীতির ধারক ও বাহক। তাঁরা উন্নত প্রথায় চাষ না করলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে। ভূমির নয় আসলে কৃষির সংস্কার চাই। গরীব হাড়-হাভাতেরা যে সব জমি দখল করে কর্ষণ করে, তা নিয়ে নাও। গরীব মানুষের না আছে অর্থের সংস্থান না আছে শিক্ষার আলো। তাদের দ্বারা জমি অপমানিত হয়। সুতরাং বাবুরা বেনাম জমির দখলে চলে গেলেন আবার। সুদের হার বৃদ্ধি করলেন। তাঁরা জেনেছিলেন এক মহান সত্যযুগের সূচনা হতে যাচ্ছে এদেশে। সুতরাং এই যুগ সন্ধিক্ষণে দেশের উন্নতি সাধনই জনগণের পবিত্র কর্তব্য। আর হরি নায়েক নিশ্চিত ফিরবে না। তাঁদের ঘুম এল। ঘুমের ভিতরে এল স্বপ্ন। তাঁরা দেখলেন সুবর্ণরেখা নদীতে এক সোনার নৌকো ভেসেছে। সেই নৌকোয় তাঁরা দুলছেন। হরি নায়েক লাশ হয়ে উদোম মেঘের মত বুক আকাশের দিকে ফিরিয়ে ভেসে যাচ্ছে স্রোতের বিপক্ষে—পশ্চিমে। তার বুকের উপর একটা ঈগল। ঠুকরে খাচ্ছে হরি নায়েকের টুসটুসে যকৃত।

তিন

এমনিভাবে দিন কাটলে গরীব গুবরোরা নিশ্চিত হটে যেত। দেশের সমস্ত মানুষ সম্পদশালী হয়ে উঠত অবশ্যই। কিন্তু তা হলো না। যে ব্যবস্থাটা শতপথী মহাপাত্র বাবুদের কাছে জরুরী ছিল দেশের মানুষের কাছে তা ছিল না। একদিন হরি নায়েক এল। একেবারে সুবর্ণ রেখার বালিতে বালিতে হেঁটে ফিরে এল। ঠিক দুপুরবেলা শতপথীবাবু নদীর চরে চিনেবাদাম ক্ষেতের উপর দাঁড়িয়ে ভূত দেখেন। জেলে একটুও বদলায়নি। সেই দেহ সেই চোখ। রব উঠল, রাখে হরি মারে কে?

তার রূপসী বউটা তখন দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। রোজ এমনিভাবেই থাকত। বিদেশে গেছে পুরুষ মানুষ, ঠিক ফিরে আসবে।

এবার প্রশাসন নিশ্চুপ। শতপথীবাবুরাও কথা বলেন না। তাঁরা কৌশল করেছেন কীভাবে এ যাত্রায় রক্ষে পাওয়া যায়। হরিনায়েক এল, দেখল, লোকজনকে নিয়ে বসল রাত দুপুরে। শৃগালের প্রহর গোনা বন্ধ হ'লো। সাপের লেজ খসে পড়ল। আগের বারে হরিনায়েকের নামে বিশেষ কোন চার্জ ছিল না। তবু আটক রাখা হয়েছিল এত বছর। কিন্তু এখন! নায়েক মরেনি। তার দাঁত পড়েনি, চুল খসেনি, গায়ের চামড়া তেমনই টানটান। কোথাও কোনও শিথিলতা নেই। চোখ আরো জ্বলজ্বলে। বুড়ো হাড়িরাম তার বুকে মাথা রেখে যাবতীয় দুঃখের কথা বলল। কথা বলল আরো কত মানুষ। বাবুরা ভয় পেলেন।

কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো অধিকার করা। পিতৃপিতামহ তাঁদের উপর যে পবিত্র দায় ভার অর্পন ক'রে গেছেন তা সুষ্ঠুচিত্তে পালন করাই মনুষ্য ধর্ম। এই ভূসম্পত্তি, এই সুদের ব্যবসা এসব রক্ষার দায়িত্ব বংশানুক্রমে তাদের উপরই বর্তেছে। এটাই প্রথা। আবার এসব যেন ব্যহত হ'তে চলে হরি নায়েকের ফিরে আসায়। সব থমথমে। নায়েকের ঔদ্ধত্য বাড়ছে। বাবুরা যমের মত ভয় করেন এই খাঁটি চাষাটিকে। নায়েক বেঁচে থাকতে এইভাবেই দিন কাটবে! অসহ্য! তাঁদের মনেও কেমন সংস্কার ঢুকে গেছে। নায়েকের মৃত্যু নেই। তিনটে বুলেট গিলে ফেলেও যে বেঁচে থাকে, টাঙ্গির কোপ নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে যে গ্রামে বিচার সভা বসায় সে আর যা হোক মানুষ নয়। আধিভৌতিক কোন শক্তি আছে ওর ভিতর।

কথা শোনা গেল নায়েক প্রতি অমাবস্যায় যায় চোরমুণ্ডির মহাশ্মশানে তন্ত্র সাধনা করে। ওর ভিতরে পিশাচশক্তি ভর করেছে। ওর কপালে তেল সিঁদুরের ফোঁটা। এখন মনে হয় পিশাচ নয়, পুরুষটার উপর তার ডাইন বউটাই বোধহয় ভর করেছিল। কী জানি কিছু বোঝা যায় না।

এই সময় নায়েক না হয় অল্প দিনের জন্য গা ঢাকা দিয়েছে কিন্তু তার বউটা ভ্রষ্টা হয় কী করে? তার ঢলঢলে পানপাতার মত মুখ, একমাথা চুল, অপরূপ চোখ যে অন্যকথা বলে। তার সম্পর্কে রটে যাওয়া কথা যে বিশ্বাস করতে ভয় হয়! তবু যা রটে তার কিছুটা বটে। মেয়েমানুষের মন!

রাত গহীনে সুবর্ণ রেখার চরে লালশাড়ি সিঁদুর আলতায় বউ হেঁটে বেড়ায়, তা দেখেছে সর্বজনে। দেখেছে সে চরে বসিয়ে দিচ্ছে প্রদীপ। অতবড় নদীর বালুচর! সেখেনে একলা যায় কেন যুবতি বউটা? বাবুরা বলেন, সে নানান মানুষের জানলায় রাত বিরেতে উঁকি দেয়। আরো আরো অনেক কথা। তা বলা যায় না।

বউ নাকি চোরমুণ্ডির মহাশ্মশানে যায় মহারাত্রিতে। চুল এলিয়ে নদীর বালিতে দাঁড়িয়ে নাঙা হয়ে যায়। প্রেতের সঙ্গে ওর শোয়া বসা। একেবারে ডাইন হয়ে যাওয়ার সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। দিন দিন তার রূপ ফেটে পড়ছে। প্রেতের স্পর্শ পড়েছে ও দেহে। বাবুরা মহা উত্তেজনায় ভুগছেন। এসব নিয়ে জোর রসালাপ চলে তাঁদের ঘরে। তাঁরা এ্যাদ্দিনে একটা বিষয় পেয়েছেন যা দিয়ে হরি নায়েককে নিশ্চিত খতম ক'রে দেয়া যাবে। বুনো পুরুষটা টাঙ্গি দিয়ে বউটার গলা কেটে নিজেই গিয়ে উঠবে থানায়, এরকম নিশ্চিত কিছু হবে।

হরি নায়েক নিখোঁজ হয়েছে সাত সাতটা দিন। সাত দিনেই এত কাণ্ড। নায়েক জেলে থাকার সময় বউটা কী করেছিল?

কাহিনী রচনা হয় মুখে মুখে। যার উদ্দেশ্য বউটাকে বহুবল্লভা প্রমাণ করা। বুড়ো হাড়িরাম বলে, নায়েক ফিরুক এর হেস্তনেস্ত হবে।

নায়েক আপাতত আত্মগোপন করেছে। কারণটা কী? না, এরসঙ্গে গোপীনাথপুর থানা বা কীর্তনিয়াশোল মৌজা জড়িত নয়। থানা নিরুপদ্রব থাকতে চায়। অযথা নায়েককে অ্যারেস্ট ক'রে কোন ডেফিনিট চার্জ দিতে না পারলে থানা বিপদেই পড়বে। রাত দুপুরে গাঁয়ে গাঁয়ে রব উঠবে ঃ মারে হরি রাখে কে?

গোপীনাথপুর থানা এলাকা বিহারের সিংভূম জেলার পাশাপাশি। সিংভূমের গ্রামগুলির সঙ্গে কীর্তনিয়াশোল ও তার পাশের মৌজাগুলোর যোগ আছে। এদিকের মানুষ ওদিকে যায় খাটতে, ধার আনতে। এদিকের বড়মানুষ বাবুরা ওদিকে জমি রেখে পশ্চিমবাংলার জমির উর্দ্ধসীমা আইন অক্লেশে ফাঁকি দেন। বিহারে যে আইন পশ্চিমবাংলায় তা নয়! কিন্তু জমি মাটি সব এক।

নায়েক জেলে যাওয়ার থেকেই এদিকের মহাপাত্র শতপথী বাবুরাও গরীব মানুষদের ধার দেওয়া বন্ধ করেছেন। তাই মানুষ ছোটে সিংভূমের গ্রামে। গ্রামের নাম ভালুকমারা। সেখানে দাতারাম সিং এর কাছে ধার পাওয়া যায়। তিনি রাজপুত। শোনা যায় তাঁর পিতা রঘুনাথ সিং লোটা কম্বল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এখানে। তারপর বড় মানুষ হয়েছিলেন সুদের কারবারে। বড় বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর ওয়ারিশান দাতারাম সিং। নায়েকের অনুপস্থিতিতে চড়া সুদে ধার দিয়ে চাষা-ভুষোর ঘটিবাটিও জমা করেছেন তাঁর ঘরে। নায়েক ফিরে সব শুনে বলল, সমস্ত ফেরত চাই।

রব উঠল, সমস্ত ফেরত চাই।

মানুষের যা যা গেছে সব ফেরত চাই। এতদিন জীবন রুদ্ধ হয়েছিল, জীবন ফেরত চাই।

দাতারাম সিং দানে অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। সুতরাং নিয়মমত সব ফেরত নেন তিনি। কেননা ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি চাই ভবিষ্যতের জন্য। তাঁর নামকরণের স্বার্থকতা বজায় রাখতে হবে। সুতরাং তাঁকে হ'তে হবে অনমনীয়। এত সহজে মাথা নোয়ালে এই জঙ্গলের ভিতর রাজা হয়ে বসতে পারতেন না। তিনি নায়েককে ভয় করেন। তবু মাথা নোয়ান না। নায়েক নাছোড়বান্দা। নায়েকের সঙ্গে কথা হয়। সব ব্যর্থ। দাতারাম জানেন একবার যদি আত্মসমর্পণ করা হয় তো সব শেষ। আবার লোটা কম্বল নিয়ে রাজস্থানে ফিরতে হবে। সে দেশ তিনি দেখেননি। এখানেই তাঁর জন্ম।

শেষে নায়েক হুঙ্কার দিয়ে ফিরে এল, ঘটি বাটি গহনা যা নিয়েছ, ফেরত দাও। তোমাদের সুদের খাতা দেখাও, হিসেব পরিষ্কার করো।

তা হয় না। এসব হ'লে স্বর্গ থেকে পিতার অশ্রু নামবে দাতারামের চওড়া বুকে। তাঁর ভাণ্ডার যাবে ফুরিয়ে। দান করবেন কীভাবে! সুদ আসবে কোত্থেকে?

সুতরাং আক্রান্ত হলেন দাতারাম। দুপুর দুপুর পাঁচশো মানুষ মিছিল ক'রে এল। নায়েক দাতারামের দেহে আঘাত হেনে পাপ করল।

রব উঠল—মারে হরি রাখে কে?

দাতারামের বন্দুক গর্জে উঠল। জঙ্গলের নিঃসীম স্তব্ধতায় ঘা পড়েছে। বেজে উঠল কাড়া নাকাড়া। এক সময় পুলিশ ভ্যানের শব্দ শোনা যায় ফরেস্ট রোডে। দাতারাম উল্টে পড়েছিল বারান্দার উপর। তীরে ঝাঝরা হয়ে গেছে তার শরীর। নায়েক পালিয়েছে। দাতারামের লাশ তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। নায়েকের নামে ওয়ারেন্ট বেরোয়। এবার খুন জখম হামলার চার্জ। ধরা পড়লে শাস্তি গুরুতর। তাই তাকে লুকোতে হয়েছে।

গোটা কীর্তনিয়াশোল দুলছে ভয়ে। শতপথী মহাপাত্ররা নিশ্চুপ। এমন ঘটনায় তাদের শরীর ছমছম করে দিনরাত। নায়েক আবার ক্ষেপেছে। দাতারামের মত শক্ত মানুষ যখন এইভাবে মরল, তাঁদের আর রেহাই নেই। গোলমাল চলেছিল সন্ধে অবধি। ভর সন্ধেয় যে কোথায় পালাল লোকটা বুঝিবা অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। গরীব মানুষ ভয়ে আছে, এই বুঝি খবর আসে নায়েক ধরা পড়েছে।

নায়েক তুমি ধরা দিয়ো না। তুমি যদি ধরা দাও তাহলে এই কীর্তনিয়াশোলের মাটি, এই সুবর্ণরেখা নদী, এই জঙ্গল সব আবার বদলে যাবে। শতপথীবাবুরা হয়ে উঠবেন দাতারাম।

এহেন বড় মানুষের বউটা যে কী হয়ে যায়! এমন মানুষের বউ এমন হ'লো! ভগবান পৃথিবীতে একের পিঠে এক বসাতে ভুলে যান। নায়েকের বউ নায়েকের মত হয় না। দুশ্চরিত্রা হয়ে ওঠে সে।

মনে হয় বউ বুঝি নদীর চরে প্রদীপ জ্বেলেছে। নায়েক ফিরে আসবে নদীপথে সেই সেবারের মত। এবার হয়ত ফিরবে সন্ধেবেলা তাই প্রদীপ জ্বালা। কিন্তু অত ঘটা ক'রে রূপ দেখান কেন? পানের রসে লাল টুকটুকে ঠোঁট নিয়ে লক্ষ্মী প্রতিমার মত হেঁটে যাওয়া কেন? চিল-শকুনের নজর পড়েছে, সেদিকে নজর নেই বউটার।

এসবের জবাব বউ-এর কাছে আছে। সে রূপের অহঙ্কারে কথার জবাব দেয় না। নায়েক চাইত বউ যেন তার ঘরে ফেরার সময়ে আলতা রাঙা পা মেলে ব'সে থাকে। কপালে যেন টকটকে সিঁদুরের টিপ থাকে। তাই কী বউ-এর অত সাজের ঘটা? এতো নায়েকের বিপদ ডেকে আনা। পুলিশের চরে ছেয়ে গেছে চারদিক। নায়েক যেন এক্ষুনি না ফেরে। বউ তার নষ্ট হয়ে যাক।

নায়েকের অন্তর্ধান বিষয়ে যাবতীয় তথ্য এই। এখানেই কাহিনীর শেষ হয়ে যায়। শুধু কৌতূহল থেকে যায় তার রূপসী বউ সম্পর্কে। তার চরিত্র বদল বিষয়ে। কোনও কথাই জানা যায় না। মানুষে শুধু ভাবে। বাবু মহোদয়েরা খুঁজে বার করেন যাবতীয় কলঙ্ক। আদি রসে তাঁদের ঠোঁট ভিজে যায়! আর অন্য মানুষেরা ভাবে অন্যরকম। সেই ভাবনা হয়ত এইভাবে হয়, তাহলেই নায়েক কাহিনীর উপসংহার হয়ে যায়।

উপসংহার

সেই সন্ধেয় দাতারাম সিং ঘরে প'ড়ে থাকলেন। পুলিশের গাড়ির শব্দে সকলে চমকে ওঠে। পালাতে হবে। নায়েক নির্দেশ দেয় না কেন?

এক শালগাছের গোড়ায় গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়েছিল মানুষটা। চারটে লোক তাকে মধ্যরাতে বয়ে আনে কীর্তনিয়াশোলে। তখন সব নিঃঝুম। তারা ডাকে নায়েকের বউকে। রূপসী বউটা বাইরে দাঁড়িয়ে খুব নিশ্চুপ। চারটে মানুষ হতচকিত। এই দেহ নিয়ে কী করবে? বউ নায়েকের বুকে কান রেখে রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তাহলে! ওরা কি লাশ বয়ে আনল নায়েকের? নায়েক নেই!

এই খবর জানলে কীর্তনিয়াশোলের বাবুরা বাঘ হয়ে উঠবে। ছিঁড়ে খাবে মানুষগুলোকে। চারটে লোক ভয় পায়। কাল থেকে কী হবে?

নায়ক মরল, না আমরা সকলে মরলাম?

ভয়ে চারটে মানুষ কাঁপছে। নায়েক কী ক'রে মরে। এতবড় লাশটার প্রাণ নেই! এটা কীভাবে হয়। নায়েকের তো মরার কথা নয়।

হেইখানে কথা লয়, আর লোকে জানত্যা পারবু, চ নদীর পাড়ে।

চারজনে লাশ নিয়ে চলে নদীর দিকে। তখন চাঁদ নেমেছে দূর জঙ্গলের মাথায় পৃথিবীর সীমানায়। জ্যোৎস্না ম'রে যাচ্ছে! এই রাতে নদীকে দেখাচ্ছে বড় দুর্বল, ধূ ধূ করছে বালি, একেবারে নিঃসম্বল বিধবার মতো।

নায়েক মরল, না আমরা মরলাম!

নদীর চরে লাশ নামায় ওরা। এখন কী করবে? চারটে পুরুষ, একটা মেয়েমানুষ নায়েকের দেহ নিয়ে বসে'থাকে। কাল কি পুলিশের হাতে লাশ তুলে দেবে? তাহলে হয়ত বাঁচবে ক'দিনের জন্য। নাহ'লে লাশ এখানে প'ড়ে থাকুক। রাত গভীরে সব গ্রাম ছেড়ে পালাক। নায়েক মরেছে শুনলে বাবুরা ছেড়ে কথা বলবে না। তারা লাশ ফেলে কেঁদে ওঠে।

শাখা ভাঙ। একজন নায়েকের বউ-এর দিকে তাকায়।

শাখা ভেঙে ঘর যা। একজন হিসিয়ে ওঠে।

এতক্ষণ যে চুপ ক'রে থম মেরে বসেছিল সে আর্তনাদ ওঠে, না আঁ আঁ।

কেনে? চারটে মানুষ আগুন চোখে বউটাকে দেখে।

শাখা ভাঙলে গাঁ শুদ্ধ মানুষ মরবে, নায়েক মরলে সকলের মরণ!

কিন্তু করি কী! একজন ফুঁপিয়ে উঠে নদীর বালি হাতড়াতে থাকে।

লাশ পুতে ফেল, রটাই দে নায়ক পলাইছে, মু সিঁদুর পরি। বউ ফিসফিসিয়ে বলে।

বলিস কি তু, পাপ হবেনি মেয়্যামানুষের?

আগে বাঁচি পরে পাপ, গাঁ বাঁচলে বড় পুণ্যি, শাখা সিঁদুর পরা থাকলি নায়েক মানুষের ভিতর বাঁচি থাকে, বাবুগণ ভয় পাবে, তদ্দিনে আর এক নায়েকের জন্ম হবে।

রাতারাতি সুবর্ণরেখার চরে লাশ পোতা হয়। নায়েকের বউ তোরঙ্গ থেকে লাল পেড়ে শাড়ি বের ক'রে সিঁদুরে আলতায় নববধূ হয়ে যায়। নববধূ নায়েকের কবরে প্রদীপ দেয়। বাবুগণ রটায় সোমত্ত বউটার চরিত্তির খারাপ, ডাইন হয়ে যাচ্ছে।

(অনুক্ত ১৯৮০)

ভারতবর্ষ

ছ'নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধ'রে আপনাকে নিয়ে এগোচ্ছি। ঠিক বিহার সীমান্তে পৌঁছনোর আগে ডানদিকে ঘুরে গেছে আর একটি সড়ক। এই নতুন পিচ আঁটা সড়ক চ'লে গেছে একেবারে সুবর্ণরেখা নদীর তীর অবধি।

যদি আমার সঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর দিকে যেতে চান, তো আসুন। ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে উত্তরে সুবর্ণরেখার পথে যেতে যেতে বাঁ দিকের ঐ জায়গাটা দেখলেই গা ছমছমে হয়ে ওঠে। একটু আগে নিবিড় শাল পলাশ পিয়াল আরও কত অজানা বৃক্ষের অরণ্য ফেলে এসেছি। এখন দুধারটা ধূ ধূ। ছায়ার লেশ মাত্র নেই। ল্যাটেরাইট পাথরে মাটিতে মেশানো লাল চড়াই উৎরাই-এ রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। এখানে সেখানে কাঁটা বাঁশের ঝোপ ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এখনো নদী বহুদূর।

বাঁ দিকের এই চড়াই-উৎরাই-এর ভিতর দিয়ে একটা লাল টকটকে রাস্তা গ্রামের ভিতরে চ'লে গেছে। রাস্তার দুপাশে ঘরবাড়ি নেই। শুধু এই নিস্ফলা মাটিতে এককালের নানান সরকারী প্রচেষ্টার চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সারিবদ্ধ খুপরি ঘর, টালির ছাউনি। কোনো ঘরেই মানুষ থাকে না। শুধু ঐ কোণের খুপরিটি বাদ দিলে।

এক সময় সরকারী অফিসাররা এখানে এসে আকর্ণবিস্তৃত হাসির সঙ্গে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেমন এখেনে গোটা তিনেক কুয়ো ক'রে দেয়া হবেই। হ্যাঁ ট্রাকটর নিয়ে চষে ফেলা হবে পাথুরে মাটি, তারপর সেই মাটিতে জেগে উঠবে সবুজ ফসল। ফলে বাতাস হবে ঠাণ্ডা, খুব মোলায়েম। ইলেকট্রিসিটি! তা দিচ্ছি না বটে, তবে সস্তায় কেরোসিন পাবে, তোমরা এখেনে বসতি কর। সরকার চায় 'গৃহহীনে গৃহ দাও' প্রকল্প চূড়ান্তভাবে সফল হোক।

আশায় আশায় ঘরছাড়া মানুষগুলো এখানে ঠাঁই নিয়েছিল। এই এত বড় পৃথিবীতে একটুখানি নিজের মত জমি পাওয়া, সে ভাগ্যের বটে। কে পারে ভগবানের মাটির মালিক হ'তে!

কয়েকদিন পরে দেখা গিয়েছিল টালির চালের মাথায় লতিয়ে উঠেছে গাছ। কোনো কোনো বাস্তুর সামনে তুলসি মঞ্চ বা বড়াম থান তৈরি হয়ে গেছে। নতুন গ্রাম পত্তন হচ্ছে। এইভাবে বছর ঘুরে গেল। আবার গ্রীষ্ম এল। মাটির সঙ্গে মিশে থাকা লৌহের যৌগ রোদ্দুরে পুড়তে লাগল! ঘরবাড়ির মাথায় লতিয়ে ওঠা গাছ শুকিয়ে গেল। সূর্য লোল জিহ্বা বের করে নেমে এল টালির চালের মাথায়। দেওয়াল ধ্বসে পড়ল। টালি খুলে কেউ কেউ বেচতে শুরু করল। জল আর জমি, জমি আর ফসল—সে তো সরকারী বাবুদের খাতায়। কবে হবে?

এই যে সরকার পত্তনের গ্রাম, যা ল্যাটেরাইট পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ধুঁকছে, একে শিক্ষিত মাষ্টার বাবুরা বলেন জয়ন্তী ভিলেজ। গান্ধী বা নেহেরু এইরকম কোনো দেশনেতার জন্মজয়ন্তীতে এই গ্রামের পত্তন, সে কারণেই বোধহয় ঐ নামকরণ। জয়ন্তী ভিলেজের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাইকেলে ব'সে পান খাওয়া ঠোঁট. দাঁতে মাষ্টারবাবুরা গাঁয়ের চেহারা দেখে হাসাহাসি

করেন। প্রয়োজনে সরকারী অপদার্থতা নিয়ে আলোচনাও করেন। সরকারী বাবুরা অবশ্য এদিকে এলে তাঁদের বাড়ির মুরগিটা ছাগলটা খেয়ে যান। এবং এতে তাঁরা কৃতার্থও হন।

যা বলছিলাম, জয়ন্তী ভিলেজের একদম শেষ বাড়িটায় মানুষ আছে। ফলে বাড়িটাও কোনরকমে টিকে আছে। খুপরি ঘর থেকে দিনে একবার ক'রে ধোঁয়া উঠে মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

এক সময় এই গোটা কলোনি গম্‌গম্ করত। অনেক মানুষের কণ্ঠস্বরে মনে হ'তো এও একটা পৃথিবী। তারপর একটা দিন আসে—সন্ধেয় পিথা হাঁসদা এসে বলে, আর ইখানে থাকবু নাই হে।

কেনে?

ইখানে জীয়নের উপায় নাই।

খুব ভোরবেলা পিথা হাঁসদার খুপরিটা খাঁ খাঁ করতে থাকে।

এক বিকেলে হাড়িরাম খিলারী এসে বলে, আর থাকবু নাই গঅ।

কেনে?

জীয়ন-থাকেনি।

এইভাবেই মানুষের ঘরবাড়ি শূন্য হয়ে যায়। শুধু শেষ খুপরিটা এখনো মানুষের চলাফেরায় স্পন্দনশূন্য নয়।

এখন নভেম্বরের শেষাশেষি। দুপুর গাড়িয়ে যায়। জয়ন্তী ভিলেজ-সংলগ্ন চড়াই উৎরাই আরো লালচে হয়ে গেছে। ভিলেজের একমাত্র মানুষ বুদাং মুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে লাল চড়াই-এ। এখান থেকে পৃথিবীটাকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মস্ত আকাশ দু হাত দিয়ে বুকের ভিতর ধ'রে রাখা যায় না। এই আকাশের নিচে বুদাং মুণ্ডা কালো পাথরের স্তম্ভের মত টান টান নিস্পন্দ।

এখান থেকে যারা চ'লে গেছে তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঢুকে বুদাং মুণ্ডা তন্ন তন্ন করে কিছুনা কিছু খুঁজেছে। পায়নি। শুধু পিথা হাঁসদার ঘরে ছিল একটা হাতল ভাঙা টাঙ্গি।

বুদাং মুণ্ডা জানে তার যাওয়ার জায়গা নেই। কত দিন কত জায়গায় ঘুরল। সুরমুই এ ঘোষদের বাড়ি, নয়নবসান এ রাজপুত সিংদের ব্যড়ি, এইরকম বড় বড় বাবুদের আশ্রয় পেয়েও তাকে তা হারাতে হয়েছে নিজের একগুঁয়েমির জন্য। ভালুকখুল্যার দাশেরা তো ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল রাতে। কোনও রকমে বেঁচে রাতারাতি উধাও হয়েছিল জতুগৃহ থেকে এখন ওর আশ্রয় লাল মাটির এই চড়াই উৎরাই, এই নিস্ফলা পৃথিবী।

দুই

আপনি তো পুরাতত্ত্বের ছাত্র। এখানে এসেছেন কৌতূহলে। এই যে মৌজাটা এর নাম জেনে রাখুন মহুলবনি। মৌজা জুরিস্‌ডিকশন্ লিস্ট নম্বর ১৭২ থানা গোপীবল্লভপুর, ব্লক ২ নম্বর। সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে আছে ১ নম্বর ব্লক। এসব অরণ্যের দেশ। একেবারে আদিম পৃথিবী।

মহুলবনি সম্পর্কে সব জেনে রাখা ভাল। সার্ভে সেটলমেন্টের সুবিধার জন্য এই মৌজাটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। দুভাগে দুটো নক্সা বা মৌজা ম্যাপ। এক নম্বর মৌজা ম্যাপে এই ডাহি, জয়ন্তী ভিলেজ, চড়াই উৎরাই কাঁটা বাঁশের ঝোপ, এক অর্থে অব্যবহৃত পৃথিবী পড়ে। দু নম্বর ম্যাপে পড়েছে নামাল জমি, ফসলের ক্ষেত, মানুষের ঘরবাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে বুদাং মুণ্ডার ঠাঁই হয়েছে এক নম্বরে।

আপনি যাবেন মন্থলবনির ভিতরে। যেখানে যাবেন তার সবটা পড়ছে দু নম্বর মৌজা ম্যাপে। সেখেনে অনেক বসতি, তা ঠিক এইরকম,

লাল মাটির বড় রাস্তার ধার ঘেঁষে তিন বাবুর বাড়ি। তিনজনই মহাপাত্র। বড় মেজ ছোট মহাপাত্র। ল্যাটেরাইট সয়েলের তৈরী বিরাট পাঁচিলে ঘেরা তিনটে বাড়ি। সামনেটা ততো সুশ্রী নয়, তবে খুব মজবুত গড়নের পাকা বাড়িতো বটেই। তিন মহাপাত্রেরই রমরমা অবস্থা।

এখানে বাগদি, ডোম, নায়েকদেরও ঘর আছে। এরা সকলেই এদেশীয় অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। মানুষগুলো যেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জায়গার ফোটোগ্রাফ থেকে নেমে এসেছে। এরা সকলেই নিঃশব্দে চলে ফেরে। মাথা উঁচু করে কথা বলে না। প্রত্যেকেই মহাপাত্রদের ঘরে বাঁধা।

এখানে বাস আছে সাঁওতালদের। আর আছে মুণ্ডাদের বসতি। মুণ্ডাদের পদবী সিং। সকলের জীবিকাই কৃষিকর্ম।

মন্থলবনির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জমি মহাপাত্রদের। এখন সরকারী আইনে জমির সিলিং আছে। কাগজ কলমে পরচায় মহাপাত্রদের জমিও সিলিং এর নিচে আছে। অ-সেচ এলাকা হিসেবে এই অঞ্চল সরকারি ভাবে বিজ্ঞাপিত।

সিলিং অনুসারে সাড়ে চব্বিশ একর কৃষিজমি রাখতে পারেন এক একটি মহাপাত্র পরিবার। মন্থলবনির এক নম্বর মৌজা ম্যাপের সঙ্গে দু'নম্বরের বিস্তর পার্থক্য। এই দু'নম্বর মৌজা ম্যাপের গা ঘেঁসে একটি পাহাড়ী নদী গেছে। নদীর নাম দলং। বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠে। যদিও মহাপাত্রবাবুরা আইন মোতাবেক সাড়ে চব্বিশ একর করেই জমি রেখেছেন পরিবার পিছু, তবুও বিবাহিতা মেয়ে, বাড়ির বুধি গাই, সম্বচ্ছরের তিনটি মজুর এদের সকলের নামেই তাঁদের জমি আছে। সরকারী আইনের ফাঁক ফোকর অনেক। কোনও কিছু প্রমাণ করা খুব সহজ হয় না। মহাপাত্রদের জমি-জমা যেমন আছে তেমনই থাকবে মনে হয়।

রঘুনাথ মহাপাত্র তো সেটেলমেন্টের কানুনগোর কাছে গিয়ে দাবড়ে বলে এসেছেন, হ্যাঁ আমাদের জমি বেনামে আছে, প্রমাণ করুন।

প্রমাণ করা সহজ হয় না। মহাপাত্ররা জমির টাকা বাসে খাটাচ্ছেন। ট্রাক নামিয়ে ন্যাশনাল পারমিট জোগাড় করেছেন। বাস যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম থেকে দীঘা অবধি। এককালে তাঁদের সুদের ব্যবসা ছিল, এখন তা নেই। তবে গরীব মানুষের অসময়ে তাদেরই ফলানো ধান তাদের ধার দিয়ে শোধ নেন বেগার খাটিয়ে।

মন্থলবনি সরকারী গেজেটে নোটিফায়েড ইরিটেড এরিয়া নয় তবে দলং নদীর ধারে বাবু মহাপাত্ররা আট ঘোড়ার পাম্প বসিয়ে জল তুলে নেন জমিতে। সেচ এলাকা হিসেবে বিজ্ঞাপিত হ'লে তাঁদেরই ক্ষতি। কেননা জমির সিলিং কমে যাবে।

অবশ্য এই সব বিজ্ঞাপনে এদেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষের কিছু হয় না। কেননা তারা জমির স্বাদ নিজের মত ক'রে পায়নি কখনো। সেই কারণে শুধু এই অঞ্চলে কেন তামাম দেশে জমির ক্ষুধা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো বছর আগে এখানকার গরীব চাষারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে জমি দখল করতে শুরু করেছিল। তখন গোটা গোপীবল্লভপুর থানা থরথর করছে। ধান কেটে সব নিজেদের ঘরে তুলে অন্নের স্বাদ নিয়েছিল গরীব চাষীরা।

সেই আন্দোলন থেমে গেলে মহাপাত্ররা আবার ফিরেছিলেন ঘরে। এর পর থেকেই ওঁরা গোটাদশেক বন্দুক ধান কাটার সময় মজুত রেখে দেন।

তিন

এসব আপনারা ভাল লাগছে না। কেননা আপনি তো মন্থলবনিতে এসেছেন অন্য একটি আকর্ষণে। আকর্ষণটা তো মন্থলবনি ছাড়া অন্য কোথাও নয়।

মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার মন্থলবনিতে একবার বড় বড় মানুষ এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই পুরাতত্ত্বে আগ্রহী। যেখানে মহাপাত্রদের বাড়ি তার সোজাসুজি পশ্চিমে নামাল জমিতে বেশ কয়েক হাজার পাথর দাঁড়িয়ে আছে। পাথরগুলো ছোট ছোট মন্দির আকৃতির। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফুটের মত হবে। মাটির ভিতর সারি সারি মন্দিরগুলো বসানো আছে। এই পাথর যে কত শো বছরের পুরনো তা মন্থলবনির মানুষ জানে না। এর পিছনে কিছু লোকশ্রুতি জড়িয়ে আছে। তা মহাপাত্ররা জানেন। দরিদ্র চাষীরা ওসবের খোঁজ রাখে না।

যে পাথরগুলোকে তারা জন্ম ইস্তক দেখে আসছে তার সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক ভাবেই কম। বরং কৌতূহল জমির রহস্য, ফসলের জন্মের দিকে। পুরাতত্ত্বের বড় বড় পণ্ডিতরা চলে গেছেন, পাঠিয়েছেন আপনাকে। আপনি একজন গবেষক ছাত্র। এই পাথরের রহস্য উদ্ধারের ভার পেয়েছেন।

আপনি কলকাতার মানুষ! এসে স্বভাবতই মহাপাত্রবাবুদের বাড়িতে উঠবেন। কেননা খবরের কাগজে কৃষক জোতদারের সংঘর্ষের কথা জানলেও বাস্তবে তা আপনি কখনোই দ্যাখেননি। এই সংঘর্ষ এবং দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। আপনি মন্থলবনির ভিলেজ নোট তৈরি করছেন। মহাপাত্রবাবুদের বাড়িতে থাকছেন, বিকেলে যান মুণ্ডাপল্লীতে। পাথরগুলি নিরীক্ষণে সময় কাটে। ল্যাটেরাইট পাথরের তৈরী স্তম্ভ, মন্দির আকৃতির। এগুলি এখানে কেন? অনেক রকম পর্যবেক্ষণের পর আপনি মহাপাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন এক লোকশ্রুতি। তা থেকে রিপোর্ট তৈরী করেছেন একটা। অবশ্যই এটা প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল। এই রিপোর্ট লিখেছেন এইভাবে।

মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মৌজা মন্থলবনির ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৬, ১০৭৮, ১০৮১ দাগে কয়েক হাজার মন্দিরাকৃতি পাথরস্তম্ভ দাঁড়িয়ে। এই পাথরস্তম্ভগুলি সম্পর্কে যে লোকশ্রুতি সংগ্রহ করা গেছে তা থেকে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ত্যাগ বৈরাগ্য ইত্যাদির কথা খুব পরিষ্কার করে জানা যায়। ধরা যাক এই মন্থলবনিই ভারতবর্ষ। একটি গ্রামকে পর্যবেক্ষণ করলেই দেশকে দেখা হয়।

যদিও হঠাৎ কখনো এই পাথরগুলিকে মনুষ্যাকৃতি মনে হয়, তবু সঠিক নিরীক্ষণে এগুলি যে মন্দিরের মতই তা প্রমাণিত। মন্থলবনির পশ্চিমে এই পাথরগুলো দাঁড়িয়ে। সামনে পিছনে ধু ধু আকাশ নামানো গেরুয়া চড়াই উৎরাই। দূরে জঙ্গল।

লোকশ্রুতি বলে এখানে একটি বুড়ো বটের নিচে (যদিও সেই বটের অস্তিত্ব এখন নেই) জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীর অধিষ্ঠান ছিল। তিনি সিদ্ধ পুরুষ। মানুষের মনোকামনা তাঁর কাছে পূরণ হ'তো। পরিবর্তে মানুষ একটি মন্দির গড়ে দিত। মানুষ সেই দেবতার মত মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়ে মন্থলবনির মাঠে মন্দিরাকৃতির পাথর বসিয়ে দেয়। কেননা পুরো একটি মন্দির গড়ে দেয়ার সামর্থ কারোর ছিল না। সন্ন্যাসী নিজে কখনো মন্দিরে উঠে আসতে চাননি। আমৃত্যু পড়েছিলেন বটবৃক্ষের নিচে।

বলতেন, আমার আশ্রয় মাটিতে, মন্দিরে আমার কষ্ট হবে! তোরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর

জন্য মন্দির গড়ে দে। আকাশের দেবতাকে আমি নামিয়ে আনি মাটির পৃথিবীতে।

মন্দিরময় আস্তিক ভারতবর্ষের মূল ইতিহাস এখানেই পাওয়া যায়। এই ইতিহাস ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের। বহুশত বছর ধরে এই অরণ্যসংকুল আদিম পৃথিবীতে প্রস্তরখণ্ডগুলি দাঁড়িয়ে। সভ্যতার বিস্তার কত গহীন অঞ্চলে হয়েছিল এ থেকে সেই প্রত্যয়ই হয়।

রিপোর্টের মূল বিষয় এইরকম। এই তথ্য মহাপাত্রবাবুদের কাছ থেকে পাওয়া। মহাপাত্রবাবুরা দেশীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল! তাঁদের ঘরে বন্দুকের মুখোমুখি দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার কেটে বাঁধানো সারি সারি মহাপুরুষদের ছবি ঝুলে থাকে।

চার

বুদাং মুণ্ডা সুরমুই বা অন্য কোথা থেকে এসেছিল মহুলবনিতে! জয়ন্তী ভিলেজ যদিও মহুলবনির অংশ তথাপি মূল মহুলবনির সঙ্গে এর কোন মিল নেই। জয়ন্তী ভিলেজ রুক্ষ জনহীন প্রান্তর নিয়ে একা। একেবারে পোড় খাওয়া মানুষের মত অনেকটা।

বুদাং মুণ্ডার জন্মভূমি কোথায়? কেউ জানে না। পুরো ভারতবর্ষই তার দেশ। তাই জয়ন্তী ভিলেজের সকলে যখন চলে যায় বুদাং মুণ্ডাকে সেখানে থাকতে হয়, কেননা মাথার উপর এতটা আকাশ সে কোথায় পাবে? এই মাঠ, রোদ্দুর, শ্রম! এইতো পৃথিবী। তার দেশ।

বুদাং এখানে আসার পর জঙ্গলের কাছে লাঙ্গল চালিয়ে বিঘে খানেক চাষের জমি তৈরী করেছে। পাশেই মহাপাত্রবাবুদের জমি। যথারীতি সেই জমির দিকে মহাপাত্রবাবুদের জমি এগিয়েছে এবং এক সময় দুটো জমি মিশেও গেছে। সমস্ত জমিতে মহাপত্ররা বুদাং মুণ্ডাকে ভাগচাষে বসিয়েছেন। এ নিয়ে যে রকম কথা হয়েছিল তা বলছি।

মহাপাত্ররা বুদাং মুণ্ডাকে বললো, ও জমি ফরেস্টের।

বুদাং ছুটল বিট অফিসারের কাছে, তিনি ম্যাপ দেখে প্লট সিডিউল দেখে ঘাড় নাড়লেন,ওখেনে চাষ হবে না।

কেনে?

ও জমি ফরেস্টের।

বুদাং বোঝে না কী করবে। সে তো পতিত জমিটাকে সুফলা করল, এখন কী ক'রে ছাড়ে। আর সে চাষ করলে কার ক্ষতি হবে?

মহাপাত্রবাবুরা বাইরে থেকে আসা এই কালো পুরুষটিকে ডেকে বলেন, তুই এক কাজ কর, দুই লপ্ত মিশিয়ে ভাগে চাষ কর।

কিন্তু উ জমিন তো ফরিসের, ফরিসবাবু কহিছে।

রঘুনাথ মহাপাত্র হাঁকড়ে ওঠেন, যা বলছি তাই কর।

এইভাবেই ফয়সালা হয়। ফরেস্ট বিট অফিসার মহাপাত্রদের অনুগত। জমি বুদাং একা ভোগ করতে পারবে না, কিন্তু ঐ রকম বন্দোবস্তে তিনি খুশি। ফসলের ভাগ মহাপাত্রবাবুরা পেলে বিট অফিসার বাঁচেন।

এ ঘটনা আগের। সব কথা আপনি জেনেছেন। জেনে অবাক হয়ে গেছেন। শেষে ভাবেন এসব হয়েই থাকে। মহাপাত্ররা বিগ্ রায়ত। তাঁরা এটুকু সুবিধে নেবেনই সরকারী কর্মচারীকে প্রলোভন দেখিয়ে। কিন্তু বুদাং মুণ্ডা তো ঐ জমিতে আছে।

এখন ঐ কালোপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে লাল মাটির চড়াই-এ। মুণ্ডা পাড়ায় যাবে। সেখানে সন্ধের সময় কলকাতার বাবুর আসার কথা আছে। বাবু আপনি। উঠেছেন মহাপাত্রবাবুদের ঘরে। ঐ পাথর নিয়ে প্রিলিমিনারি রিপোর্ট লেখার পরেও আপনার অনুসন্ধান থেমে থাকেনি। গতকাল আপনি বুদাং-এর সঙ্গে কথা বলেছেন। বলেছেন ঐ গল্পের কথা। সন্ন্যাসী, মন্দির ইত্যাদি। কিন্তু তখন আপত্তি জানিয়েছিল বুদাং মুণ্ডা। আপনি অবাক হয়েছেন।

এখন সে খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ওর এগোনোর ভিতরেই সূর্য নেমে যায়। আলো ফুরিয়ে ফুরিয়ে কিছুটা প'ড়ে থাকে। সব থমথমে। সে মহাপাত্র বাবুদের বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে নেমে যায় জমিতে। আসন্ন শীতের মাঠ ফসলের ভারে নত। এই সন্ধেয় মহুলবনি এক অদ্ভুত চেহারা নেয়। প্রতিদিনই অন্য রকম মনে হয় মহুলবনিকে। দূর মাঠপাথার চড়াই উৎরাই ঢেকে যাচ্ছে খুব পাতলা নীল অন্ধকারে। সে দাঁড়িয়েছে সুমহান ভারতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন মন্দিরগুলোর কাছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভারতবর্ষে। এখন সারি সারি পাথরগুলোর সঙ্গে নিস্পন্দ বুদাং মুণ্ডাকেও কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথরস্তম্ভ ব'লে মনে হয়। অথবা পাথর স্তম্ভগুলোকে নিস্পন্দ মানুষ। বুদাং প্রত্যেকটি পাথরের মাথায় আলতো ক'রে হাত রাখছে। মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় অন্ধকার গাঢ় হয়ে সব ঢেকে দেয়।

বুদাং মুণ্ডাকে অনুসরণ ক'রে আপনি মুণ্ডা পল্লীতে গেলে সে আপনাকে কী তথ্য জানায়? বুদাং-এর সঙ্গে তো আপনার অনেক কথা হয়। লোকটিকে আপনার ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। সে যে তথ্য জানিয়েছে তা তো এখনি প্রকাশযোগ্য নয়। কেননা এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান দরকার। অনুসন্ধানে প্রতিটি তথ্যের ভিত শক্ত হয়ে ওঠার দরকার।

ফেরার পর রঘুনাথ মহাপাত্রর মুখে জিজ্ঞাসা, কী ব্যাপার কোথায় ঘোরেন?

আপনি হাসেন। দ্যাখেন রঘুনাথের মুখে কেমন চিন্তার ছাপ। রাতে মহাপাত্রবাড়িতে শুয়ে ধামসা মাদলের শব্দে আপনার ঘুম আসে না। আদিবাসী পল্লীতে উৎসব। নৃত্যের সঙ্গে গানও কানে আসছে। মহাপাত্রবাড়ি ছাড়তে পারেন না আপনি।

পাঁচ

আপনি তো ফিরে এসেছেন মহুলবনি থেকে। কলকাতায় ব'সে গবেষণা করছেন বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু মহুলবনির কি হলো!

মহুলবনিতে অশান্তি শুরু হয়েছে।

সেই কয়েক বছর আগের মত মহাপাত্রদের এবারও ঘোর চিন্তা হয়েছে। ভাগচাষীরা সকলেই রসিদ দাবী করেছে। রসিদ ছাড়া কেউ ধান দেবে না মালিককে।

বুদাং মুণ্ডা বলেছে, তার তৈরি জমির ফসল সে তার ঘরে তুলবে।

মহাপাত্ররা এক কথায় না ব'লে দিয়েছেন। রসিদ দেবেন না।

সমস্ত মুণ্ডারা বলেছে, তাহলে জমির ধান ভাগচাষীর ঘরে উঠবে।

ফরেস্ট বিট অফিসার প্রথমে মাথা গলিয়েছিলেন তাঁর ফরেস্ট ল্যান্ডটির ব্যাপারে। কিন্তু বুদাং বলেছে, ফসল কাটি নিই, তারপর ফরিসের জমিন ফরিস লি লিক।

মহাপাত্ররা ছুটেছেন জুনিয়র ল্যান্ড রিফর্মস অফিসারের কাছে। বুদাং মুণ্ডা সহ সমস্ত ভাগচাষী নোটিশ পেয়ে গেছে।

মহাপাত্ররা বলেছেন, এরা আমার চাষী নয়। সব জমি আমার ব্যক্তিগত চাষে, মজুর দিয়ে করাই।

কিন্তু গোপন উত্তেজনাটা থেকে যায়। জে এল আরও কোন ডিসিসন নিতে পারেন না যা মহাপাত্রদের ফেবারে যায়। অথচ তিনি স্পষ্টভাবে ভাগচাষীদের পক্ষে কথা বলতেও সাহস পান না। দুইয়ের মাঝামাঝি থেকে তাঁর ঘুমের বারোটা বেজে যায়।

বুদাং মুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করানোর চেষ্টা করলেন রঘুনাথ মহাপাত্র। কিন্তু গোপীবল্লভপুর থানা রাজী হয় না। কেননা বারো বছর আগের স্মৃতি ভুলবার নয়। এ মাটি অগ্নিগর্ভ। তিল থেকে তাল হ'তে কতক্ষণ! বুদাং মুণ্ডাকে অ্যারেস্ট করলে মহুলবনিতে পীজান্ট আনরেস্ট প্রবল হয়ে উঠবে। তার জন্য দায়ী হবেন থানার বড়বাবু। এখন হারভেস্টিং সীজন। কোনো ঝুঁকিতে তাঁরা যেতে চান না। মধ্যিখানে পড়ে শুধু গোপন ভয়ে থানার বড়বাবুর চোখে কালি পড়তে লাগল। চাকরির মেয়াদ আর কদিন? এখন শান্তিতে কেটে গেলে বাঁচেন। তা হবার নয়। যত গোল ঐ অঘ্রানের ফসলে।

মহাপাত্ররা খবর পেয়েছেন বিহার থেকে কয়েক হাজার মুণ্ডা এসে এদের সঙ্গে যোগ দেবে। সকলে টাঙ্গি আর তীর ধনুক নিয়ে সশস্ত্র। ধান কাটতে শুরু করবে সকলে এক সঙ্গে। থানাকে এটা জানালেন মহাপাত্ররা। বড়বাবু কাঁপতে কাঁপতে সদরে ছোটেন। মেদিনীপুর জেলার এস. পি, এই খবর পাঠালেন বিহারের সিংভূম জেলার এস, পি, কে।

বিহার থেকে জবাব এল, এই ধরনের কোন মুভমেন্টের খবর তাঁদের জানা নেই। তবে প্রত্যেক মুণ্ডা বস্তিতে চোখ রাখা হচ্ছে। কেউ যেন বিহার থেকে বাংলায় না যেতে পারে।

থানা এই খবরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু মহাপাত্রবাবুরা এই খবরেও আশ্বস্ত হন না। তাঁরা নিজেরা তৈরি হন। আরো গোটা পনের বন্দুক এবং প্রচুর গুলি জমা হয় তাঁদের ঘরে। এ সব সংগ্রহে তাঁদের বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় না। বাড়ির সব মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছেন ঝাড়গ্রামে। মহাপাত্রবাবুরা বাতাসে বিপদের গন্ধ পান। তাঁদের ফ্যামিলিতে এখন গোটা কুড়ি পুরুষ ব্যতীত কেউ নেই। এদের ভিতরে আছে বাইরের বেশ কয়েকজন। তারা জাতিতে রাজপুত। উত্তর বিহারের মানুষ। অস্ত্র চালনায় খুবই দক্ষ, ভাড়াটে খুনে।

মহাপাত্রবাবুরা টেনশনে ভুগছেন। কিন্তু গোপীবল্লভপুর থানা এই ঘটনায় খুব বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছে না। কেননা তাতেই নিশ্চিন্তি। বাইরে থেকে মুণ্ডাদের আসা বন্ধ। অল্প কয়েকজন লোক কী করতে পারে?

বুড়ো শ্রীনিবাস মহাপাত্রকে কিছুতেই এ সময়ে ঝাড়গ্রামে পাঠানো যায়নি। জমির ধান নিজের খামারে না দেখে তাঁর শান্তি নেই। ক-দিন আর বাঁচবেন। যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন দখল যেন থাকে মাটিতে।

আপনি এসব কিছু জানেন না। কলকাতায় বসে গবেষণা করছেন। একটা বিশেষ রিপোর্ট তৈরী করতে চেষ্টা করছেন। আবার মহুলবনি যেতে হবে। তাই চিঠি দিয়েছেন রঘুনাথ মহাপাত্রকে। মহুলবনির এক আদিম সংস্কৃতিগত গুরুত্ব আছে। সে সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছেন আপনি। গিয়েছিলেন ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য তথ্য খুঁজে পেয়েছেন।

ইতিমধ্যে মহুলবনিতে অনেক কিছু ঘটে যায়। তা ডায়েরীগতভাবে এই রকম।

বিশে নভেম্বর ঃ সকালে বিশজন মুণ্ডা কাস্তে হাতে জমিতে নেমে যায়। বুদাং মুণ্ডার হাতে একটা টাঙ্গি। মহাপাত্ররা বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা। পাজলড হয়ে যান। রঘুনাথ মহাপাত্র জমির ধারে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দেন বন্দুক উঁচিয়ে। মুণ্ডারা ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে আসে। ধান কাটা বন্ধ। ধান এখনো ভাল করে পাকেনি। মহাপাত্ররা বাইরে থেকে মজুর এনে কয়েকদিন পরেই ফসল কাটবেন। গ্রামের সমস্ত মজুর তাঁদের বয়কট করেছে। গোপীবল্লভপুর থানা বেঁচে যায়। না মহুলবনিতে অন্তত মুণ্ডাদের দিয়ে কোন ট্রাবল তৈরী হবে না।

একুশে নভেম্বর ঃ রাতে গোটা মহুলবনি চমকে ওঠে। হাজার মানুষ মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মহাপাত্র-বাড়ির কাছের জমিতে মশাল উঠেছে আকাশে। হো-হো চীৎকারে শীত অন্ধকার চমকে উঠেছে। তাহলে খবর ঠিক। রাতের অন্ধকারে পায়ে পায়ে হাজার মুণ্ডা এসে মিলেছে মহুলবনিতে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাগদি ডোম বাউরিরা।

বুড়ো শ্রীনিবাস মহাপাত্র চোখে কম দ্যাখেন। কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে প'ড়ে যান। চোখ মুখে নীল অন্ধকার ছেয়ে আসে। অন্ধ চোখে শ্রীনিবাস দ্যাখেন সমস্ত জমির ধান আস্তে আস্তে মানুষের মত হেঁটে যাচ্ছে মুণ্ডা পাড়ার দিকে। গিয়ে সব মানুষ হয়ে যাচ্ছে। যত ধান তত মানুষ। হাজারে হাজারে মশাল উঁচিয়ে।

সেই কত কাল আগে ওড়িশার কোন প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্রীনিবাসের বাবা। কয়েক বছরের ভিতর অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন। বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন সকলের সেরা। জমি-জমার পরিমাণ বাড়তে লাগল। জঙ্গলের জমি তৈরী করেছে বাউরি বাগদি ডোম সাঁওতাল মুণ্ডারা। তখন তো সব জঙ্গল মহল। জমির হিসেব হত না! ব্রিটিশ আমল। সেই আমলে সমস্ত জমি চক্রবৃদ্ধি সুদের আরে উঠে এসেছে মহাপাত্রদের ঘরে। এখন দিন কাল বদলেছে। মহুলবনি জুড়ে হো-হো শব্দ। যা আছে তা বুঝি রক্ষা হয় না। বন্দুকের শব্দ ওঠে।

ভাড়াতে রাজপুতরা বলছে পালিয়ে যেতে। হাজার হাজার মানুষের বন্যায় মহাপাত্রবাড়ি রক্ষা পাবে না। মহাপাত্ররা বেরোতে চান না। দুর্যোধনের পণ। ঘরের যাবতীয় গরু, মোষ, হাঁস, মুরগি অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয়। বাড়িতে আগুন লাগতে পারে।

গুলি চলছে। কিছু মশাল এগিয়ে আসে। হাজার মশাল পিছনে। গুলিতে একের পর এক মশালবাহী মানুষ প'ড়ে যেতে থাকে।

এক সময় সব থমথম করতে থাকে। দূরে হাজার মশাল জ্বলে কিন্তু অতি নৈঃশব্দে। মহাপাত্ররা সারারাত জাগেন বন্দুক তুলে। মহুলবনিতে সমস্ত রাত ফিসফাস, মানুষের ত্রস্ত পায়ে চলাফেরা। কী যেন হয়ে গেছে! অন্ধকারে কোথায় যেন কান্নার শব্দ ওঠে।

ছয়

ঘটনা অবোধ্য। মহাপাত্ররা সমস্ত ধান ঘরে তুলেছেন। জয়ন্তী ভিলেজে বুদাং মুণ্ডার ঘর ফাঁকা। তার কোনও খবর নেই।

আপনি এলেন কলকাতা থেকে। ইতিহাস সংস্কৃতিকে মেলাবেন আপনার রিপোর্টে। মহুলবনি থমথমে। বুদাং মুণ্ডার ঘরে কাউকে পান না। ভাঙা টাঙ্গিটা পড়ে আছে। কী ব্যাপার? বাতাসে পাচ্ছেন অন্যরকম গন্ধ। না আর মহুলবনিতে রাত্রিবাস করবেন না। যা সংগ্রহের তা সংগ্রহ

ক'রে সন্ধের বাসে ঝাড়গ্রাম ফিরে যাবেন। সেখান থেকে কলকাতা।

মহুলবনি সম্পর্কে আপনি রিপোর্ট তৈরী করেছেন। সেই রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন এখানে। তা এইরকম হ'তে পারে।

মহুলবনির সারিবদ্ধ মন্দির আকৃতির পাথরগুলো আসলে মুণ্ডা জাতির কবর। এ ধরনের শ্মশানবুরু ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক দেখা যায়। বুদাং মুণ্ডা প্রথমে ব্যাপারটা আমাকে ধরিয়ে দেয়। বুদাং মুণ্ডার বাড়ি কোথায়, কোথায় তার জন্ম তা জানা যায় না। তবে পুরো ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল তার নখদর্পণে। সে বলে এই জঙ্গল পাহাড় সব তার দেশ।

মুণ্ডারা তাদের মৃতদেহ কবর দিয়ে তার উপর মনুষ্যাকৃতির এই পাথরস্তম্ভ স্থাপন করে। সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখলে স্তম্ভগুলোকে মানুষের জমায়েত মনে হয়। অনেক মানুষ। মুণ্ডারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মার ভিতরেই মানুষের যাবতীয় শক্তি নিহিত। মৃত মানুষের আত্মাশক্তিকে রক্ষার জন্যই এই আত্মাপাথর প্রচলন। আত্মাশক্তি এই পাথরেই রক্ষা হয়। মুণ্ডারা বিশ্বাস করে এই ভাবে আত্মাশক্তিকে রক্ষা করলে জনপদের শক্তি ক্ষয় হয় না মানুষের মৃত্যুর পর।

মহুলবনির মূল মানুষ হলো মুণ্ডারা। এই অঞ্চল অরণ্য পরিবৃত। অরণ্য সরিয়ে জমি তৈরি করেছে মুণ্ডারা। মানুষের বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরী করেছে তারা। তারপর সেই সব জমি চলে যায় মহাপাত্রদের কাছে।

একসময় মহাপাত্রদের কাছ থেকে জমি রক্ষা করার জন্য মুণ্ডারা এই শ্মশানবুরুগুলোর উপরে মশাল বসিয়ে তাকে মানুষের রূপ দিয়ে রাতের অন্ধকারে কৌশলে ভয় দেখিয়ে মহাপাত্রদের পর্যুদস্ত করেছিল। সে বহুদিন আগের ঘটনা। সে রাতে আত্মাপাথরগুলো সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠেছিল। মৃত মুণ্ডারা তাদের জমি রক্ষার জন্য মশাল তুলে ধরেছিল আকাশের দিকে।

মহুলবনির পাথরগুলোর এই ইতিহাসই আসল ইতিহাস। এ থেকে অরণ্যময় আদিম ভারতবর্ষের মূল ইতিহাস ও সংস্কৃতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, মন্দির কাহিনী এ সবের কোনও ভিত্তিভূমি নেই। কেননা এই অঞ্চল মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত। তারা সকলেই আধিভৌতিক দেবদেবীতে বিশ্বাসী। আত্মাপাথর বা শ্মশানবুরুগুলোর বয়স যতকাল, ততকাল এখানে উৎকল ব্রাহ্মণেরা আসেননি।

এই রিপোর্ট উপস্থাপিত করবেন কী করবেন না ভাবতে ভাবতে আপনার ঘুম চলে গেছে। আপনি মহুলবনিকে এখনো ভুলতে পারছেন না। আবার ছুটেছেন সেখানে। গিয়ে সদ্য প্রোথিত একটি মনুষ্যাকৃতির পাথরস্তম্ভ খুঁজে পেয়েছেন।

বুদাং মুণ্ডার খোঁজ নেই। প্রশ্ন করলে মুণ্ডাপল্লীর শিশু থেকে বৃদ্ধরা রক্তচক্ষু নিয়ে মহাপাত্র-বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে।

শেষে খুব আস্তে আস্তে এক বৃদ্ধ বলে, গিইছে কুনো দিশে বটে, জঙ্গল বুরু, জঙ্গল বুরু সব উয়ার দিশ, উল্‌গুলান হউক, আসবু ঠিক।

(প্রস্তুতিপর্ব শারদীয়া—১৯৮০)

শিরোনাম পরিবর্তিত

দানপত্র

দানপত্র (সাহেবমারি বাস্কে সম্পাদিত)

গ্রহীতা : সাহেবমারি বাস্কে, পিং ঁমুচিরাম বাস্কে, জাতি সাঁওতাল, গূঢ় অর্থে ভারতীয়, সাকিন মৌজা সোনারিমারা, অর্থে স্বদেশ ভারতরাষ্ট্র।

দাতা : সাহেবমারি বাস্কে, ঁপিং মুচিরাম বাস্কে, জাতি ঐ সাকিন ঐ।

কস্য জবরদখলী স্বত্ববশিষ্ট স্বত্বের জোতজমি বাস্তুভিটা ইত্যাদি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আদির পারিবারিক সদর্থে সামাজিক দানপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে, পরগণা সাঁন্তালীবসান, ভারতরাষ্ট্রভুক্ত তপশীলবর্ণিত সম্পত্তি—

আমি পুণ্য জন্মভূমি সদর্থে মাতৃভূমি ভারতরাষ্ট্রভুক্ত সোনারিমারা মৌজা নিবাসী স্বর্গীয় সাহেবমারি বাস্কে মহাশয়ের পৌত্র এবং ঐ সোনারিমারা নিবাসী স্বর্গীয় মুচিরাম বাস্কে মহাশয়ের পুত্র সাহেবমার বাস্কে অদ্য ভাদ্র মাসের করমপরব তিথিকে অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই দানপত্র দলিলে বর্ণিত সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ঐ সোনারিমারা মৌজা নিবাসী সাহেবমারি বাস্কের অধীনে যাইবে। আমার লোকান্তে এই তপশীলবর্ণিত ভূমি বিষয়ে যাবাতীয় কার্যাবলী এই দানপত্র গ্রহীতা দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যাবতীয় দখলীস্বত্ব যাইবে সাহেবমারি বাস্কের অনুকূলে! অদ্য হইতে এই দানপত্রে বর্ণিত ভূসম্পত্তিআদির প্রতি আমার কোনরূপ মায়া রহিল না। ইহার যাবতীয় শোক-আনন্দের ভাগ গ্রহণ করিতে তুমি, শ্রীসাহেবমারি বাস্কে,নীতিগতভাবে বাধ্য থাকিবে।

হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, এই ভূসম্পত্তির যাবতীয় দায়ভার অদ্য হইতে তোমাতে সমর্পিত হইল। আমি সাহেবমারি বাস্কে, তোমার পিতামহ আমার ভয়াবহ জীবন বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ অবগত। এক্ষণে আমি জীবনসায়াহ্নে উপনীত, এ দেহ জরায় কবলিত, চক্ষুতে আলোর চিহ্ন লুপ্ত প্রায়। এ জীবনে আমার দ্বারা প্রার্থিত কার্যাদি সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আর দেখি না। তবুও আশাহত হই নাই, সেই কারণেই এই দানপত্রের অবতারণা। আশা এই যে, অবশিষ্ট দিনগুলিতে, দানপত্র মোতাবেক তোমার কার্যাবলী আমাকে সুখী করিবে। সেরমাপুরি অর্থে স্বর্গপুরিতে গমনের পূর্বে আমার এ চক্ষুতে আলো আসিবে, এ দেহে উত্তাপ জন্মিবে, ন্যুব্জ শরীরে আসিবে বৃক্ষের কাঠিন্য এবং দার্ঢ্য।

এই দানপত্র পাঠকের নিকট দাতা এবং গ্রহীতার পরিচয় বিষয়ে একরূপ জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদিগের জীবনে জটিলতা প্রকাশ পাইলে বহুজনের জীবনে আনন্দ আসে,

সেই আনন্দ আমাদিগের শোকের কারণ হয়। সুতরাং জটিলতা দূর করিবার প্রচেষ্টাই হইবে দাতা এবং গ্রহীতার আশু কর্তব্য। নচেৎ ভবিষ্যৎ নিরাপদ নহে।

এই দানপত্র গ্রহীতা এবং দাতার জাতিগত পরিচয় সাঁওতাল আদিবাসী। বর্ণ পাথুরে কৃষ্ণ, দাতা সাহেবমারি বাস্কের দক্ষিণ হস্ত নাই। সেই কাহিনী সামান্য অন্তর কহিব। তুমি সাহেবমারি বাস্কে, এই দানপত্র গ্রহীতা, জানিবে এই ভারতভূমি, ভারতরাষ্ট্রের মৃত্তিকা হইতে তোমার জন্ম। এই দেশের আদি মানুষ তোমার পূর্বপুরুষগণ। সে কারণে এই দানপত্র সম্পাদনে আমার অধিকার। ইহা গ্রহণে তোমার আনন্দ।

আমি সাহেবমারি বাস্কে, তোমার পিতামহ, আমার নামে তোমার নামকরণ হইয়াছে। দাতা সাহেবমারি বাস্কের নামকরণ হইয়াছিল তাঁহার পিতামহের নামে। এইরূপে আমরা পূর্বজীবনে দৃষ্টিপাত করি! সদার্থে তোমার আমার নাম পূর্বজীবনের কোনও এক সাঁওতাল পুরুষকে মনে রাখিয়া হইয়াছে। তুমি সাহেবমারি বাস্কে, আমার পৌত্র, স্মরণ রাখিয়ো, তোমার দেহে আমাদিগের সেই অদেখা অথচ অনুভবের পুরুষ, সাঁওতাল পিতা, সাহেবমারির রক্তধারা প্রবাহিত।

সাহেবমারি আমাদিগের আদিপুরুষ। তাঁহার পুণ্য স্মৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহার পুণ্যজীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার জন্য এই প্রথার প্রতি অনুগত থাকিয়ো।

এক্ষণে, আমরা সেই পূর্বজীবনে দৃষ্টিপাত করি। এই দৃষ্টিপাতে চক্ষুর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাউক, জীবনের মায়াচ্ছন্নতা হউক দূরীভূত।

স্মরণ রাখিয়ো, এই সাহেবমারি বাস্কের জন্ম হইয়াছিল কোনওকালে এই সোনারিমারা মৌজায়। তখন তাঁহার কী নাম ছিল তাহা বিস্মৃতিতে, তবে ইহা জানি, সাহেব মারিয়া তিনি হইয়াছিলেন সাহেবমারি।

আমাদিগেরএই নামকরণে বাবুমানুষ, শিক্ষিতজনেরা প্রায়শ অভিমান করেন। কহেন, ইহার সহিত একটি ভীষণ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি জড়িত। ইহা বহন করে হিংসার চিহ্ন। এই নামকরণ একপ্রকার বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেয়। ইহা আমাদিগের জীবন সরল হইবার অন্তরায়। তাঁহারা কহেন, সাঁওতাল জাতি অতীব সরল, উহাদের হৃদয় পাহাড়ি ঝর্ণার ন্যায় স্বচ্ছ। এই নামকরণ ঐ স্বচ্ছ জলাশয়ে পঙ্কের ন্যায়। এই নামকরণে সাঁওতাল জাতি তাহার সারল্য হারায়।

হে পৌত্র, ইহজীবনের অভিজ্ঞতা বলে, বাবুমানুষ দিকু মহাজন কথিত ঐ সরলতা আমাদিগের জীবনের অন্ধকার। ঐ সরলতা যাবতীয় অধিকারচ্যুত হইবার একপ্রকার সূত্র। সুতরাং বাবুদিগের অভিমানে আমাদিগের বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। জীবনের অধিকারকে বুঝিয়া পড়িয়া না লওয়া যদি সরলতা হয়, আইস, সেই সরলতা মুক্ত হইয়া আমরা আদিমানুষ সাহেবমারি বাস্কের জীবন স্মরণ করি।

ইহা সত্য যে, দিকু বাঙালী মহাজন ঈশবরবাবুর গৃহে সেই সাঁওতাল পুরুষ বাঁধা মুনিষ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার কঠোর জীবনের কথা কি কহিব? ঈশবরবাবুর নিকট ঋণের দায়ে ভাত কাপড়ের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তিনি। ঈশ্বরবাবু এক অর্থে আমাদিগের সেই পূর্বপুরুষ সাঁওতাল পিতার ঈশবরই হইয়াছিলেন।

তৎকালে এই দেশ আরো অরণ্যময়। সেই অরণ্যের ভিতর ঈশ্বরবাবুই বুদ্ধিমান, সুতরাং রাজা! তখন ভারতভূমি ইংলন্ডীয় সাহেবদিগের অধীনে। সদর শহরে থাকিতেন এক সাহেব বেনিয়া। তিনি একদা কার্যোপলক্ষে এদেশে আগমন করেন। আতিথ্য লন মহাজন ঈশ্বরবাবুর গৃহে। বাবু মহাজন ধন্য হইলেন। বোঝা গেল, ঈশ্বরও তাঁহা অপেক্ষা শক্তিমান কাহাকেও ঈশ্বর জ্ঞানে ভজনা করেন। তিনি একমেবঅদ্বিতীয়ম নহেন। অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন আমাদিগের সেই পূর্বপুরুষ।

হে পৌত্র, মহাজন ঈশ্বরবাবু খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনয়ন করিলেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার প্রতি সাহেবের বিলাইতি চক্ষু মায়াময় হইল। সাহেব প্রস্তাব করিলেন গোপনে ঈশ্বরবাবুর সেই কন্যাকে। ঈশ্বররাবুর কন্যা সাহেবের বিলাইতি ভাষা বুঝিতে পারিলেন না, তবে ইঙ্গিত বুঝিলেন। তিনি ভয়তরাশে পিতাকে সব অবগত করাইলেন। ঈশ্বরবাবু তাঁহার ঈশ্বরের রূপপ্রকৃতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন। চিন্তিত হইলেন। তিনি সাহেবকে সহসা সাঁওতালী কন্যা সেলামি দিবার কথা কহিলেন। সাহেবের চতুর মন সমুদয় উপলব্ধি করিল। তাঁহার মুখ ভার হইল। বেনিয়ার চক্ষু পুলিশ মিলিটারির চক্ষু হইল কোন অজান্তে।

ইহাতেই সমাপ্তি ভাবিয়া ঈশ্বরবাবু লোভনীয় সাঁওতাল বাগদি ডোম রমণীর খোঁজ করিলেন। সেই রাত্রে রমণী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে আমাদিগের সেই পূর্বপুরুষের ঘুম ভাঙিলো। দিবসে অরণ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, গো চারণ করিয়া, সন্ধ্যায় তিনি অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন কুয়া পার্শ্বে সেই ধবলবর্ণ দিকু সাহেব মহাজন ঈশ্বরবাবুর উপাস্য দেবতা গোপীবল্লভ হইয়াছেন। আকর্ষণ করিয়াছেন বালিকার বস্ত্র। বিপদাপন্ন হইয়াছেন ঈশ্বরবাবুর সুন্দরী কন্যা। গর্জিয়া উঠিলেন সাঁওতাল পুরুষ। এক যষ্টির আঘাতে সাহেবের প্রাণপাখি কালাপানি পার হইয়া গেল। আমাদিগের পূর্বপুরুষ সাহেবমারি হইলেন।

ইহার ফলাফল হইল বিষম। ঘটনা উল্টাইয়া গেল। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিল না, দেশবাসী সাহেবের কীর্তিগাথায় মুগ্ধ হইল। সাহেবের মর্মরমূর্তি স্থাপিত হইল সদর শহরে। তাহা এখনো বিদ্যমান, আমি দেখিয়াছি, তুমি দেখিয়াছ। কী করিয়া হইা হইল, সে কথায় পরে আসিতেছি।

এই দানপত্রে বর্ণিত জমিজমার ইতিহাস শ্রবণ করা তোমার আশু কর্তব্য। জমির গঠন, জমির প্রকৃতি রূপ ইত্যাদি বুঝিলে যেমন ফসল উৎপাদন প্রভূত হয়, তেমনি জমির পূর্বকথা জানিলে উহাতে অধিকার রক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। জমির ইতিহাস হাতবদলের কাহিনী। মালিকানা বদলের গল্প। সঠিক মালিকানা শূন্য হইবার ইতিহাস। কীরূপে কীরূপে সম্পত্তি আদি হাতবদল হইয়াছে তাহা না কহিলে শুধুমাত্র তপশীল বর্ণনা নথিপত্রের সহিত মিলিবে না। সরকারী নথিপত্র জমির ইতিহাস সংরক্ষণ করে। তাহা অতি ভয়ঙ্কর বস্তু।

এই দানপত্র তপশীলে সোনারিমারা মৌজার সমুদয় বাস্তভিটা ও ধান্য জমি দাগ নম্বরসহ বর্ণিত হইয়াছে। ওই ধান্য জমি আউয়াল শ্রেণীর। যদিচ ইহা অরণ্যময় অঞ্চল, তথাপি এই সমস্ত আউয়াল জমি বহুকালের কর্ষণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ফসল ফলাইয়া মাটিকে সম্মানিত করিয়াছেন আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ। এই ভূমির রহস্য আমাদিগের পূর্বপুরুষে অবগত হইয়াছিলেন, সেই কারণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ইহাতেই। আমাদিগের দ্বারা মাটি সম্মানিত হইবার পর, ইহার দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিলেন বাবুমানুষেরা। ভূমির হাতবদল হইল। বদল হইল সরকারী নথিপত্র। আমাদিগের সারল্যে বাবুগণ লাভবান হইলেন।

হে পৌত্র, যেহেতু এই দানপত্র তপশীল আপাতচক্ষে গরমিলে পরিপূর্ণ, সে কারণে বারংবার ভূমির হাতবদলের সূত্র উল্লেখ করিলে সমস্ত বিষয়টি স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে। দানপত্র মোতাবেক

কার্য সম্পাদনে তোমার সুবিধা হইবে।

তুমি জান, সোনারিমারা মৌজার প্রান্তে শাল মহুয়া কুসুমের ঘন অরণ্য। এই অরণ্যের গভীরে এক ঝর্ণার পার্শ্বে একবিঘার একটি জমি বহুকাল ধরিয়া আমরা চাষ করিতাম। আমার পিতা উহাতে চাষ করিতেন। পিতৃপিতামহ ঐ জমিতে শ্রম করিয়াছেন, বিনিময়ে ফসল উঠিয়াছে গৃহে। আমরা মাটিকে চিনি, নথিপত্রের সহিত পরিচিত নহি। নথিপত্র ফসল উৎপাদন করে না ইহাই জানিতাম। হে পৌত্র, সেই জানা সঠিক ছিল না নিশ্চিত, অন্তত পরবর্তী ঘটনাক্রম তাহাই কহে।

জানিলাম উহা সরকারে বর্তানো খাস জমি। একদিন দেখিলাম, বাবু চৈতন্য মহাকুড় মহাশয়ের মুনিষ ঐ জমিতে। কারণ জানিতে চাহিলাম, জানিলাম, ঐ জমি বাবু জোতদার মহাশয়ের অনুকূলে সরকারী পাট্টা বন্দোবস্ত হইয়াছে। শুনিলাম, ঐ জমি একদা চৈতন্যবাবুর নিকট হইতে সরকারে বর্তায় অতিরিক্ত জমি হিসাবে (আইন মোতাবেক জমির ঊর্ধ সীমার অতিরিক্ত)।

সরকার চৈতন্যবাবুর নিকট হইতে একদা ঐ জমি গ্রহণ করে, বিনিময়ে চৈতন্য মহাকুড় পান ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণ পাইবার পর ঐ জমি আবার চৈতন্য মহাকুড় মহাশয়ের নিকট পাট্টা বন্দোবস্ত মোতাবেক ফিরিয়া আসে। চৈতন্যবাবু তাঁহার মুনিষের নামে পাট্টা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মুনিষ জানে, ইহা তাহার নামিত বাবুর জমি। ইহাতে তাহার অধিকার নাই।

নথিপত্রের এত কথা জানিতাম না। বহুকাল ঐ জমি আমাদিগের দ্বারা কর্ষণ হয়। কবে চৈতন্য মহাকুড়ের হইল, কবে উহা সরকারে বর্তাইলো, কখন তাহার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন চৈতন্যবাবু, এসব আমার অজ্ঞাত। সবই নথিপত্র দ্বারা সম্ভব হইয়াছে। সম্ভব হইয়াছে ইহার পাট্টা বন্দোবস্ত।

হে পৌত্র, আমি রুখিয়া দাঁড়াইলাম। কহিলাম, এই মাটি আমাদিগের পিতৃ-পুরুষের। সরকারী কর্মচারী হাসিলেন, কহিলেন, মিথ্যা কহিয়ো না, ইহা তো চৈতন্যবাবুর জমি ছিল একদা, তাহা হইতেই সরকারী খাস হইয়াছিল।

বুঝিলাম, ইহা নথিপত্রের খেলা। চৈতন্য মহাকুড় মহাশয় ইহকালে এই ভূমিতে পা রাখেন নাই। তথাপি ইহার দ্বারা সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করেন, আবার পাট্টা বন্দোবস্ত করিতেও তাঁহার অসুবিধা হয় না।

কহিলাম, নথিপত্র বুঝি না, এই মাটি আমাদিগের।

চক্ষুর সম্মুখে বাবু চৈতন্য মহাকুড় নীলবর্ণের পাট্টা বন্দোবস্ত কাগজটি দুলাইতে লাগিলেন। দেশীয় আইনরক্ষকদের আগমন ঘটিল এই অরণ্যে।

হে পৌত্র, নথিপত্র মানুষের জীবন অপেক্ষা মূল্যবান, তাহা সে নথি সত্যমিথ্যা যাহাই বহন করুক না কেন! পিতৃপুরুষের মাটিতে রক্তপাত হইল। আমার দক্ষিণহস্ত বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হইয়া গেল।

অবশেষে সরকারী আইনের জয় হইল। চৈতন্য মহাকুড় জমিতে দখল পাইলেন! জমি দখলের হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে নিহত হইল হাড়িরামে বাগদি, সে আমার হইয়া মাটিতে দৃপ্ত বক্ষে দাঁড়াইয়াছিল! আইন এবং নথিপত্রকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এই রকম হত্যাকাণ্ডে আইনরক্ষকগণ নির্দোষ। বিচারক তাহাই কহিলেন। ভূমির সম্মান রক্ষা করিবার

নিমিত্ত আমি আমার দক্ষিণ হস্তটি বিসর্জন দিতে বাধ্য হইলাম, হাড়িরাম বাগদি তাহার প্রাণ উৎসর্গ করিল।

এখন সেই নথিপত্র ফসল তুলিতেছে বাবু চৈতন্য মহাকুড়-এর গৃহ।

একদা এই সোনারিমারা মৌজা, তপশীল বর্ণিত দাগগুলি এই দানপত্রদাতা ও তাহার স্বজন পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের দখলীভুক্ত ছিল। বহুকাল পূর্বের নথিপত্র সন্ধান করিলে আমার বর্ণনাই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

ইহার পর নথিপত্র স্বয়ং বদল হইয়াছে। এই বদল অতিশয় আশ্চর্যজনক। নথিপত্রকে তাই কখনো জীবন্ত প্রাণী বলিয়া মনে হয়। মনে হয় উহা বহুরূপী-গিরিগিটি সদৃশ। সময়ে সময়ে রূপ-রঙ বদল করিয়াছে। একদা যে প্রাণীর বাস ছিল সবুজ অরণ্যে, তাহা কোন অলক্ষ্যে পা বাড়াইয়াছে এক ধূসর মৃত বৃক্ষের দিকে। আশ্রয় করিয়াছে সেই বৃক্ষকে। তাহার পর রং বদল করিয়াছে। মনে হয়, প্রাণীটি হয়ত রঙ বদল করিয়া সেই বৃক্ষে দেহ রাখিয়াছে।

ইহার ফলে নথিপত্রের আপনা আপনি আর বদল হইবার সম্ভাবনা দেখি না। যদিচ কখনো কেহ কেহ ঐ মৃত বৃক্ষের কাণ্ড হইতে বহুরূপীটিকে মুক্ত করিয়া সবুজ অরণ্যে নিক্ষেপ করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছে।

অতএব, সেই মানুষটির কথা স্মরণ করি। সদর শহরের বাঙালী যুবক। দৃপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু পুরুষ। আমাদিগের দরদীও বটে। নৈশস্কুলে আমি তাঁহার হাতে অক্ষর জ্ঞান লাভ করি। তিনি ছিলেন বিদ্যাদাতা, আমি হইলাম গ্রহীতা। সেই স্মৃতি আজও ভুলিবার নয়। আমার সম্মুখে মানুষের পৃথিবী, জগতের রহস্য উন্মোচন করিয়া তিনি স্মরণীয় হইলেন। জানিলাম পৃথিবীর জন্মকাহিনী, সম্পদের ইতিহাস, ভিন্নদেশের আলো হাওয়া মেঘ অরণ্যের কথা।

সেই দেবেন্দ্রনাথ একদা কহিলেন, এইসব কালো মানুষ, ইহারাই আদি পৃথিবীর, তোমরা জান না, তোমাদের জন্ম হইয়াছিল মৃত্তিকা হইতে।

অন্তরে বিস্ময়বোধ জাগ্রত হইল।

তিনি কহিলেন, যেমন আমাদিগের দেবতা শিবশম্ভু উঠেন মৃত্তিকা গর্ভ হইতে, কালোপাথর তাঁহার দেহ, তেমনি তোমরা উঠিয়াছ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া। মৃত্তিকায় তোমাদিগের আজন্ম অধিকার।

হে পৌত্র, হিন্দুদিগের দেবতা শিবশম্ভুর উন্মত্ততার কথা জানি। জানি তাঁহার প্রলয়ঙ্কর চরিত্রের কথা। দেবেন্দ্রনাথ সেই মহাদেবতার সহিত আমাদিগের তুলনা করিলেন। পুনঃপুনঃ কহিলেন, মৃত্তিকায় তোমাদিগের আজন্ম অধিকার। তিনি প্রশ্ন করিলেন, এই ভূমি একদা তোমাদিগের ছিল?

আমি তাঁহাকে সমর্থন করিলাম।

দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, হস্তান্তর হইল কী করিয়া?

হে পৌত্র, হস্তান্তরের সূত্র তো অজানা নয়। সেই সূত্রের একটিকে ছিন্ন করিয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ। আমি শিক্ষার আলো পাইয়াছি। কিন্তু অন্য সূত্রগুলি! জন্মাবধি তো সকলে ভূমিশূন্য গৃহশূন্য। পিতৃপিতামহও তাই।। অথচ ইহা আশ্চর্যের যে এক একটি জমি এক এক মানুষের, জাতির নামে চিহ্নিত যাহারা এখন দুঃসহ জীবন ভোগ করিতে করিতে ক্রমে জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

তুমি অবগত যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দশ বিঘার লপ্তটি নিমে সাঁওতালের জমি নামে পরিচিত। কে এই নিমে সাঁওতাল? তাহা জানা নাই। আমাদিগের পূর্বপুরুষ কেহ হইবে। ঐ জমি এখন উৎকল ব্রাহ্মণদিগের হেফাজতে। উহার পার্শ্ববর্তী তিরিশ বিঘার টুকরো টুকরো লপ্তগুলি সাঁতালি সোঁত নামে চিহ্নিত। এখন উহা সাঁওতালদিগের নহে। এমনি বাগদির মাঠ, ডোমের মাঠ, মাহালিশোল, ধারোপায়জোড়া কত জমি! সোনারিমারার সব জমিই এক এক নামে চিহ্নিত।

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, এইসব জমির নামের সহিত তাহার আসল মালিকানার চিহ্ন জড়িত। দুই শত বৎসরেও গোটা ভারতভূমির নাম যেমন ইংলন্ড হয় নাই, তেমনি অক্ষত রহিয়াছে বাগদির মাঠ, মাহালিশোল, সাঁতালি সোঁত।

সকলে নিশ্চুপ। বাগদি বাউরি ডোম, সাঁওতাল সকলের চক্ষুতে বিস্ময়। অশীতিপর বৃদ্ধ হরি ডোম চিৎকার করিয়া কহিল, হ্যাঁ সত্যই বটে, ডোমের মাঠ আমাদিগের ছিল, পিতার নিকট তাহা শুনিয়াছি।

সন্ধ্যার পর কয়েক প্রহর পার হইয়াছে। সব নিঃঝুম। অদূর বনভূমিতে বোধহয় সেই কথার প্রতিধ্বনি উঠিল। আমি শুনিলাম, অরণ্য কহিতেছে, এই সব ভূমি সত্যই উহাদের, আমরা তো বহুপ্রাচীন, সাক্ষী রহিয়াছি।

বিষণ্ণ হইলাম, এই অরণ্যের ভাষা নাই, এই সব সুপ্রাচীন বৃক্ষেরা আমাদিগের সপক্ষে আইন আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিবে না।

আর আইন আদালত বড় বিষম অঞ্চল। মিথ্যা মামলা মোকদ্দমায় সত্য সাক্ষ্যদ্বারা যখন জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, উকিলের জেরায় সে সাক্ষী মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া ঐ ভয়ঙ্কর স্থান হইতে পলায়ন করিয়া বাঁচিয়াছে। আদালতের রায়ে যখন বিবাদী দরিদ্র মানুষটির শাস্তি হইয়াছে, তখন সেই ভীত দরিদ্র সাক্ষীটি গ্রামে ফিরিয়া ক্রন্দন করিয়াছে। বারংবার কহিয়াছে, ঐ হেন বিচিত্র রূপ স্থানে গিয়া জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়। উকিলবাবু সম্মুখে মস্তিষ্কে যন্ত্রণা শুরু হয়। ভয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং যদি কেহ সত্যই দর্শন করিয়া থাকে, তাহাতে কোন লাভ দেখি না। সেই সুপ্রাচীন মানুষ একপ্রকার ভাষাহীন বৃক্ষ!

দেবেন্দ্রনাথ সন্ধান করিতে লাগিলেন। গমন করিলেন জিলা সদরে। তাহার পর একদিন পরম উল্লাসে ছুটিয়া আসিলেন সোনারিমারায়। তাঁহার সহিত কত কাগজপত্র। নানান তথ্য তাঁহার মনে উল্লাস জাগাইয়াছে।

কহিলাম, কোথায় গিয়াছিলেন?

তিনি কহিলেন, সদর শহরে, মহাফেজখানায়। মহাফেজখানায় পুরাতন সরকারী নথিপত্র রক্ষিত থাকে।

হরি ডোম কহিল, গোটা জিলার ভূমির ইতিহাস তথায় পাওয়া সম্ভব?

হয়ত সম্ভব।

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথের নিকট মহাফেজখানার ইতিবৃত্ত শুনিলাম। তথায় ধূলির ভিতরে লুক্কায়িত আছে আমাদিগের জমির ইতিহাস। সমস্ত পুরাতন নথিপত্র, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

লাখন মুর্মু কহিল, তথায় ইন্দুর নাই?

লাখন মুর্মু জমিতে ইঁদুরের সন্ধান করিয়া ফেরে। উহার ভূমি নাই, বাস্তু নাই। বৎসর ভর ইঁদুর ভক্ষণ করিয়া তাহার দেহে কী প্রকারে যেন চর্ম রোগ দেখা দিয়াছে।

লাখন মুর্মু কহিল, যে ইন্দুর বাবুদিগের জমির ফসল ভক্ষণ করে, তাহার স্বাদ জানি, যে ইন্দুর মৃত্তিকার ইতিহাস ভক্ষণ করে তাহার স্বাদ কী প্রকার জানিতে ইচ্ছা হয়।

আমরা জানিলাম, দেবেন্দ্রনাথ মহাফেজখানার ধূলি মাখিয়াছেন, পাঠ করিয়াছেন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, আরো কত আইন। নকল করিয়াছেন ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্টট, পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইত্যাদি নথিপত্র, পরচাখতিয়ান।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, হাত বদলের সূত্র কী?

রাবণ সোরেন কহিল, ক্ষুধা?

আমি সমর্থন করিলাম। হ্যাঁ, ক্ষুধাই হইবে, দরিদ্র মানুষের দেহে অপরিসীম ক্ষুধা, শিক্ষিত জন কহে উহারা স্ত্রীপুত্র বেচিয়া খায়? পারিলে পৃথিবীকে উহারা হা-মুখ গহ্বরে প্রবেশ করাইবে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন, যত জমি রহিয়াছে সোনারিমারায়, তাহার সমুদয় যদি তোমাদিগের হয়, বাঁচিবে?

হ্যাঁ, বাঁচা সম্ভব হইবে। আমাদিগের একমাত্র চাহিদা জীবন রক্ষা।

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, যে কালে এই ভূমি তোমাদিগের ছিল, সেই কালে মানুষও অনেক কম ছিল, তথাপি ক্ষুন্নিবৃত্তির দায়ে ভূমি হাত বদল হইল?

সকলে নিশ্চুপ হইয়া গেল। সেই কালে কি একটি মানুষ বিশটি মানুষের খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিত।

দেবেন্দ্রনাথ ছুটিলেন জিলা সদরে। আবেদন করিলেন মহামান্য বিচারপতির নিকট। নথিপত্রে দেখা যাইতেছে এই ভূমি অন্য মানুষের। তাহারা এখন ভূমিশূন্য, অবহেলিত। ভূমি তাহাদের হাত হইতে অন্যের নিকট কীভাবে গেল সেই সূত্রও নথিপত্রে উল্লেখ নাই। নথিপত্র স্বচ্ছ নহে। সুতরাং আইনকে সম্মানিত করিবার জন্য যাহাদের ভূমি তাহাদের ফেরত দেওয়া হউক। যাহার মাটি তাহার নিকটে গিয়া আহ্লাদিত হউক।

হে পৌত্র, যে বহুরূপী গিরগিটি ধূসর বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রঙ বদল করিয়াছে, অতঃপর তাহাতে দেহ রাখিয়া জীর্ণ মলিন হইয়াছে, তাহাকে সবুজ অরণ্যে ফিরাইয়া রং বদলের কি অমানুষিক চেষ্টাই না দেবেন্দ্রনাথ করিলেন। সর্বক্ষণ এই আশা করিতে লাগিলেন যে, নথিপত্রে আমাদিগের মালিকানা দখলীস্বত্ব ফিরিয়া আসিবে।

হায়! সেই সুন্দর আদালতগৃহ মৃত গিরিগিটির কটু গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নথিপত্র জীর্ণ হইয়া উড়িয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে সময় গেল। বিচারক মহাশয় উঠিলেন, গোপনকক্ষে আহার বিশ্রাম সারিলেন। আবার ফিরিলেন। উকিলবাবুর পোশাক নথিপত্রের ধূলিতে বিবর্ণ হইল। বাক্‌বিতণ্ডা চরমে উঠিল। বিচারক জনে জনে পরামর্শ করিলেন, বারংবার যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করিলেন। মাথার রগ চাপিয়া ধরিলেন। কিছুতেই আপন সিদ্ধান্তে নিবিষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, জগতে এইরকমই হয়।

বহুরূপীর রং এইভাবে আর বদল হইবার নহে। বিধ্বস্ত দেবেন্দ্রনাথ সোনারিমারায় ফিরিলেন না। মহাজন বাবুগণ তাঁহার উপর যেইরূপ আমাদিগের উপর তদ্রুপ ক্ষিপ্ত হইলেন। ফলাফল শুভ নহে। কেননা এক্ষণে জানিয়াছি যে, আমরা মৃত্তিকাজাত। মৃত্তিকায় আমাদিগের দখল ও স্বত্ব প্রাকৃতিক নিয়ম। আদালত হইতে ফিরিয়া আমরা উৎখাত হইলাম। প্রায়শ ইহা ঘটিতে

লাগিল। রক্তপাত হইতে লাগিল মৃত্তিকার দেহে। বুঝিলাম, এ পৃথিবী হইল যুদ্ধের।

হে পৌত্র, দেবেন্দ্রনাথ অতীব শিক্ষিত মানবদরদী ব্যক্তি। কিন্তু তিনি হয়ত অবগত ছিলেন না প্রাকৃতিক নিয়মগুলি। যাহা এই দুঃসহ জীবনে আমরা অবগত হইয়াছি তাহা একান্তই মেঘ অরণ্যের নিয়ম। অরণ্যে না জন্মিলে অরণ্যের ভাষা জানিবে কী করিয়া! মাটি কখন মেঘের গন্ধ চায়, একথা কে জানে?

যে প্রাণীটি মৃত তাহাকে ঐ পদ্ধতিতে আর জীবিত করা সম্ভব নহে। আইন এবং নথিপত্রও তো সেই বিষ যাহা উহার রং বদলের কারণ। যে বিষে মৃত্যু সেই বিষে প্রাণ সঞ্চার সম্ভব হইতে পারে, কেননা বিষে বিষে বিষক্ষয়, ইহা জানিতেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু বিষক্ষয়ের পর আবার ঐ বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হইতে পারে, এই সহজ প্রাকৃতিক সত্যটি ভুলিবার নয়।

যে নথিপত্র রং বদল করিয়াছে, তাহা এই মোকদ্দমায় আবার বদল হইলেও সেই বদল যে চিরদিনের, এ বিশ্বাস কোথায়? উহা যে আবার আইন মোতাবেক দিকু মহাজনের নিকট আত্মগোপন করিত না, একথা কে কহিতে পারে?

দেবেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন, বিচারক মহাশয় আমাদিগের দখল ফিরাইয়া দিবেন। মৃত্তিকার মালিকানা আমরা অন্যের নিকট হইতে উপহার পাইব। সেই মূঢ় মানবহিতৈষী দেবেন্দ্রনাথকেএই জীবন সায়াহ্নে আসিয়া আর একবার দেখিতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন।

দেবেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধেয়। তিনি সত্য সন্ধান করিয়াছিলেন। ইহা প্রমাণিত যে, তাঁহার মত সূত্র সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সমস্ত পৃথিবীর মাটি যাহাদের এখন নাই, তাহাদের। মাটির গভীরে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, আমাদিগের ন্যায় মানুষের নাম সর্বত্র প্রোথিত আছে। সাঁতালি সোঁত, ডোমের মাঠের ন্যায় গোটা পৃথিবী নিশ্চিত নিঃস্বের ভূমি।

এই সত্য মহাফেজখানার ধূলিতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তোমাকে ইহা অবগত করাইয়া আমি নিঃস্ব হইলাম।

জানিয়া রাখ, সাহেবকে মারিয়া আমাদিগের পূর্বপুরুষ কুখ্যাত হইয়াছিলেন বাবুগণের নিকট, দূরান্তের মানুষের নিকট। মোকদ্দমায় ইহা প্রকাশ পাইল যে, সেই সাঁওতালপুরুষ ঈশ্বরবাবুর কন্যার উপর অত্যাচার করিতে যায়, সাহেব তাহা প্রতিরোধের কারণে নিহত হন! সরকারী সাক্ষী হইলেন ঈশ্বরবাবু। তাঁহার কন্যাও রক্ষা পাইল, তিনিও সরকার বাহাদুরের দ্বারা সম্মানিত হইলেন। সেই ধবলবর্ণ সাহেবের মূর্তি স্থাপিত হইল সদর শহরে। আমাদিগের পরিবারে সাহেবমারি নামকরণ তাই বাবুগণের নিকট বর্বরতার নিদর্শন।

হে পৌত্র, যতবার সদরে গিয়াছি, ঐ মূর্তি চোখে পড়িয়াছে। যাহা সত্য তাহাকে পদলুণ্ঠিত করিয়া ঐ সাহেব মূর্তি এদেশে বর্তমান। যাহা পুরাতন সত্য, তাহাই ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে মহাফেজখানায় রাখিয়া মিথ্যা কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে এদেশে। আমাদিগের শৌর্যের কথা, সততার কথা মানুষের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। ভুল ইতিহাস আমাদিগকে বর্বর চোয়াড় আখ্যা দেয়। সেই ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করিয়া সাহেবমারির আসল ইতিহাস এক্ষণে বর্ণিত হইল।

জানিয়ো, সাহেবকে মারিয়া আমাদিগের সেই পূর্বপুরুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সাহেবমারি বাস্কের জন্ম হইয়াছিল কারাগারে। সেই কাল হইতে এই পরিবারে, এই সোনারিমারা মৌজায় সাহেবমারির জন্ম হইতেছে। জন্ম হইতেছে কারাগারে।

কারাগারে জন্মের দরুন এই পৃথিবীর বর্ণ গন্ধ সাহেবমারি উপলব্ধি করিতে পারেন না। কতবার চেষ্টা হইয়াছে কারাগার ভাঙিবার। জন্মের পর দারিদ্র অসম্মান এই পৃথিবীটিকে আমার নিকট, আমার পিতামহ সাহেবমারির নিকট কারাগার করিয়া তোলে।

আমি সাহেবমারি বাস্কে, এই দানপত্র দাতা, বহুবার চেষ্টা করিয়াছি এই কারাগার ভাঙিবার। সফল হই নাই। সেই কারণে জগতের আলো হাওয়া আমাদিগের দেহের কাছাকাছি নাই। অথচ উহা অপ্রতুল নহে। ইহা স্পষ্ট। কারাগারের গরাদ ধরিয়া সেই আদি পুরুষ সাহেবমারি বাস্কে আকাশ দেখিবার চেষ্টা করিতেন। ভাবিতেন ফসলের কথা। মৃত্তিকার ধর্মরক্ষার কথা। সম্মান বাঁচাইবার কথা। এই ভাবেই সকল সাহেবমারির জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

তুমি সাহেবমারি বাস্কে, এই দানপত্র গ্রহীতা, দুই হস্ত প্রসারিত করিয়ো। জীবনের অভিজ্ঞতা বলে গরাদ অতি ভঙ্গুর বস্তু।

এই দানপত্র সম্পাদনের প্রথা দিকু মহাজন, বড়মানুষদিগের। তাঁহারা বিভিন্ন কৌশলে সম্পদ অর্জন করেন। আমরা নিঃস্ব হই। সম্পদ অর্জনই তাঁহাদের কৃতী হইবার পরিমাপ। অতঃপর সেই সম্পদকে রক্ষা করিবার বাসনায়, আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার দায়ে, আস্থাভাজন কোনও এক ব্যক্তিকে দানপত্র সম্পাদন করেন। দিকু বড়মানুষেরা দানপত্র সম্পাদন করেন এই আশায় যে, যেভাবে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে, অসংখ্য মানুষের সম্পদ যেভাবে তিনি নিজগৃহে মজুত করিয়াছেন, সেই প্রথা বজায় রাখুক তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী।

আমার ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই। যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গেলাম, তাহা অন্য মানুষের নিকট যেন উপস্থিত না হয়। কেহ যেন আমাদ্বারা দর্শিত ভয়াবহ পৃথিবীর সম্মুখীন না হয়। সেই কারণে এই দানপত্রের অবতারণা।

হে পৌত্র, অদ্য পবিত্র করম পরব। আকাশ পৃথিবী মেঘ ও ফসলের ভারে নত হইয়াছে। এই দিবসেই পুরাণ কথার কর্মু যাত্রা করিয়াছিল করম দেবতার নিকট। সেই যাত্রাপথে ভয়ঙ্কর বিঘ্ন। দুর্দম অগ্নি, বিষধর সর্প, কুম্ভীর,-সমুদ্র, নদী, পাহাড়। কর্মু ইহাদের সাহায্য লইয়া পৌছিল করমঠাকুরের নিকট। উদ্ধার করিল হৃত সম্পদ।

যে সমস্ত দুর্দম শক্তি বন্ধু হইতে পারে, তাহাদিগকে বন্ধু করিয়ো। ইহা করম পরবের কথা। তাহা হইলে এই দানপত্র সত্য হইবে।

স্মরণ রাখিয়ো, বাবু মানুষের দানপত্র দ্বারা কেহ কেহ বঞ্চিত (আমাদিগের বঞ্চনার কথা আর কহিনা), কেহ হয় লাভবান। ঐ দানপত্রের সহিত জড়িত থাকে অবিশ্বাস এবং ভয়। সেকারণে ঐ দানপত্র কোবলাটি সিন্দুকে রক্ষিত হইয়া জীর্ণ হইতে থাকে।

আশা এই যে, তুমি সাহেবমারি বাস্কে জানিয়া রাখো, এই দানপত্র সরকারী নথিপত্র এবং বাবু মানুষের কোবলার ন্যায় রক্ষিত হইবে না মহাফেজখানায় বা লৌহসিন্দুকে। ইহাতে নাই অবিশ্বাস। এত কাল কাটাইয়া ভয়েরও কিছু দেখি না। সে কারণে ইহা জীর্ণ হইবে না। মহাফেজখানার ইন্দুরের খাদ্য হইবে না।

আশা এই যে, সাহেবমারি বাস্কে কৃত দানপত্রের অক্ষর চিরদিনের জন্য জগতের আলোয় বা[illegible] সে বর্ণে গন্ধে মেঘে ফসলে লিখিত হইবে। জন্মিবার পর চক্ষু উন্মীলনের মুহূর্তে মানুষ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার অক্ষর, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যে ভাষা, তাহা বুঝিতে পারিবে। বুঝিবে ইহার গ্রহীতা হইল সাহেবমারি। বুঝিবে সাহেবমারির কারাগার ভাঙিতে পারিলে

মৃত্তিকাজাত মানুষের নিকট মৃত্তিকাময় পৃথিবী ফিরিবে। জানিবে, এই দানপত্রে লিখিত রহিয়াছে সাহেবমারির জন্মকথা, যে জন্মের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দায়ে রক্তপাতের নিহিত সূত্রতে।

জীবনের প্রান্তে আসিয়া আমি বৃদ্ধ সাহেবমারি বাস্কে এই দানপত্র সম্পাদন করিতেছি। আকাঙ্ক্ষা এই যে, আলোয় মৃত্তিকায় দৃষ্টিপাত করিয়া এই দানপত্রে উল্লেখিত ভূমি গ্রহণের নিমিত্ত সকলে হইয়া উঠিবে সাহেবমারি।

এতদর্থে সাক্ষীগণের সাক্ষাতে লিখিত পড়িত করতঃ সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাপূর্বক সরল অন্তকরণে অন্যের বিনা প্ররোচনায়, পবিত্র করমপরব দিবসে, অত্র সামাজিক দানপত্র সম্পাদন করিলাম।

ইসাদী
(মেঘ অরণ্যময় পৃথিবী ও জন্মদাত্রী মৃত্তিকা)

ভবদীয়
সাহেবমারি বাস্কে
সাকিন সোনারিমারা
ভারত রাষ্ট্র

(তপশীল পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত)

(অনীক, শারদীয়া—১৯৮০)

আগুনের দিন

সিরাজুল ঘুম থেকে উঠেছিল বোধ হয় অন্ধকার থাকতেই। আর সেই ফিকে অন্ধকারে একা একা দাওয়ায় বসে বোয়ালঘাটা যাওয়ার কথা ভেবেছে। তাই ঘুমভাঙা বিবিকে দেখেই কথাটা পেড়েছে, 'চ বোয়ালঘাটা ঘুরে আসি, বাপ মরার পর যাসনি।'

নাজমা দুটো পা ছড়িয়ে আলস্যে বিশ্রামে দাওয়ার এককোণে বসেছিল। ঘুমের রেশ এখনো কাটেনি। সাত মাসের পোয়াতি, এখন ঘুম বিশ্রাম সবই বেশি পেলে ভাল। আলস্য সব সময় জড়িয়ে আছে দেহে। হাঁটাচলায় হাঁপ লাগে, শুধু শুয়ে বসে কাটাতে ইচ্ছে করে।

সিরাজুলের কথা কানে গেলেও বিশ্বাস হয় না নাজমার। সত্যি সত্যি বোয়ালঘাটা নিয়ে যাবে! বাপ মরার পর কতবার বলেছে, কান দেয়নি। শুধু সুরত আলির মৃত্যু সংবাদ এনেই খালাস।

আজ আকাশটা গুম মেরে আছে। নাজমা সোজাসুজি আকাশে চোখ রাখল। এ বছর এমনিতে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। আষাঢ় মাস চলে গেল। মাঠঘাট শুকিয়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। বীজতলা পুড়ে পুড়ে মরা ঘাস। পাটের চারাগুলো বীজ থেকে বেরিয়ে বিকলাঙ্গ শিশুর মত ক্ষেতে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। পুরো আষাঢ় মাসটা রোদে রোদে কেটেছে। আর সেই রোদের তেজ কী। যেন আকাশ থেকে আগুনের কণারা বাতাসে ভর করে নেমে আসছে মাঠ পাথার পুড়িয়ে দিতে।

নাজমা ঘুরে সিরাজুলের দিকে তাকায়, চোখে জিজ্ঞাসা স্পষ্ট, ঠোঁট কাঁপছে। সিরাজুল খালি গায়ে লুঙিটা হাঁটুর উপর তুলে দাওয়ার খুঁটিতে পিঠ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। নাজমার দিকে তাকাচ্ছে না। দেখছে খটখটে আকাশের গায়ে ধূসর প্রলেপ।

নাজমা অনেকক্ষণ পরে বলল, মেঘ এয়েছে, পানি নামতি পারে।

সিরাজুল নিজের ভিতর গর্জে উঠল, পানি সারা আষাঢ় মাস নামল না, যেই শউর বাড়ি যাব ভেবেছি, অমনি নামবে?

বাপ মরার পর যাইনি, এহন গোরের মাটিও শুকোয়ে খটখট হয়ে গেছে।

তহন আমার টায়েম ছিল না।

নাজমা মাথা নামিয়ে আছে। চোখ মুখ থমথমে। বাপ সুরত আলির কথা মনে পড়ছে। মায়ের দ্বিতীয় পক্ষ, সেই হিসেবে সুরত আলি তার নিজের বাপও নয়। কিন্তু ছিল বাপের চেয়েও বেশি। সেই লোকটা মাটি নিল, সিরাজুল খবর আনল লোকমুখে শুনে শুনে, কিন্তু গেল না বোয়ালঘাটা। কাঁদতে কাঁদতে নাজমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, অথচ কে ওসব দ্যাখে? সিরাজুল মিঞা নিজের তালে আছে।

ক'দিন ধরেই সিরাজুল কেমন অন্যমনস্ক। গম্ভীর ভাব এসেছে ওর চোখ মুখে। বিবির সঙ্গে কথাবার্তাও বলছে না ঠিক মত। গতকাল সন্ধে থেকে একেবারে কথা বন্ধ করেছিল তার সঙ্গে। রাতে খায়নি। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়েছিল। কী ওর মনে ঢুকেছে কে জানে।

অন্য সময় হ'লে অন্য কথা। এখন রাতে একা শুতে ভয় হয়। পেটের ভিতরে রক্ত মাংস নিয়ে বড় হচ্ছে সিরাজুলের বাচ্চা। এখন একা থাকতে নেই, অন্ধকার হলে একা বেরোতে নেই। জিন পরি ভর করতে পারে। তাতে শরীরের ভিতরে যে শরীর জন্ম নিচ্ছে তার ক্ষতি।

ঘরে কাল থেকে কেরোসিনও নেই যে রাতে জ্বালিয়ে রাখবে হারিকেন। ঘরটায় চাপা কালিমাখা অন্ধকার। নিজের হাত-পাও চেনা যায় না। শুয়ে পড়ে নাজমা ঘর থেকে ডেকে উঠেছিল, আসপা ঘরে।

জবাব পায়নি। ভয়ের ভিতরে শুয়ে থেকে কখন যে ঘুম এসে গিয়েছিল জানে না। নাজমা দ্যাখে সিরাজুল দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। উঠোনে পায়চারি করতে থাকে। একবার বিবির দিকে তাকায়। নাজমার চোখে চোখ পড়তেই ঘুরে দাঁড়ায়।

নাজমা দেখছিল দেহের লালিত্য চলে গেছে মানুষটার। ক'দিন ধ'রে ঘুরছিল এখানে ওখানে। কাল ভোরে বেরিয়ে সন্ধেয় ফিরেছে। চোয়াড়ে মুখ, ঘোলাটে চোখ। সিরাজুলের কালো শরীর পেশীবহুল। ঘাড়ের কাছে ছুলির সাদা সাদা দাগ। চুলে তেল নেই। থুতনির কাছে একগুচ্ছ চুল দাড়ির মতো আটকে আছে।

বোয়ালঘাটা যেতি হবে, তাড়াতাড়ি নে।

নাজমা আর বসতে পারে না। সত্যি সত্যি তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে সিরাজুল। এ-সময় তো মায়ের কাছেই মেয়ে থাকে। প্রথম পোয়াতি। কিন্তু মার উপরে যে বাজ পড়েছে। মা নেছারণ বিবির জন্য নাজমার বুক উথলে উঠল। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নাজমা জিজ্ঞেস করে, সত্যি যাবা?

হ্যাঁ, যেতি তো হবেই।

সিরাজুলের আগ্রহ দেখে নাজমা আবার অবাক হয়, সে উঠোনে নেমে বলে, কিন্তু এ অবস্থায় আমার নড়াচড়া....।

রাখ তুই, আমরা আর মার পেট থেকে পড়িনি, মার এটটা মেয়ে, মারে দেখতি ইচ্ছে করে না, শোকে তাপে বেহাল হয়ে গেছে বুড়িটা।

সিরাজুলের কথায় নাজমা মুখে কাপড়চাপা দিয়ে ঘরের দিকে এগোয়। দুর্দান্ত পুরুষ, ওর কথার উপরে কথা বললে গায়ে হাত তুলতে পারে। শেষে যদি পড়েটড়ে কিছু হয়ে যায়।

নাজমা দ্রুত শাড়ি পরে নিল। বিয়ের সময় সিরাজুল দিয়েছিল, শিফনের গোলাপী জমি, আঁচলে সবুজ আর হলুদ ফুলের সমারোহ। কী ফুল তা জানে না নাজমা। তবে ফুলই, কেননা ফুলের একটা নিজস্ব চেহারা থাকে।

দুহাতে চুল ঘুরিয়ে একটা খোঁপা করে নেয় নাজমা। চুল বাঁধার সময় নেই। সিরাজুল গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে নিয়েছে। ঘি ঘি রঙের টেরিকটনের পাঞ্জাবি, বিয়ের সময় নাজমার বাপ সুরত আলি দিয়েছিল।

সিরাজুল তাড়া দিচ্ছে। নাজমা এর ভিতরে একবার বলেছে, গোসল করি গেলি ভাল হত, খরার দিনি চ্যানডা অন্তত...।

খরা কুথায়, আকাশে মেঘ এয়েছে না, সিরাজুল নাজমার কথা ওকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। নাজমা আর কিছু বলে না। মনের ভিতরে ধন্দ লাগে, বোয়ালঘাটার শ্বশুরবাড়ি যেন সিরাজুল মিঞাকে দুহাত দিয়ে টানছে।

নাজমা এতক্ষণে ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। যেতে যখন হবে তাড়াতাড়ি করাই ভাল। তবুও মা তো। একটু শান্তি পাবে তাকে দেখলে। গিয়ে বলবে, বাপের এন্তেকালের সময় আমারও বড় বেপদ ছিল মা, তুমার জামাই তো ডাব গাছ থেকে পড়ি গিয়ে রক্তারক্তি, আমি কি একা আসতি পারি ; লোক মুখে সব শুনিছি কিন্তু করবো কী, দূরটা তো কম নয়।

নেছারণ বিবির মুখ দেখার জন্য মনটা আনচান করে ওঠে। কতদিন দ্যাখেনি মাকে। অনেক, অনেকদিন। মাস তিনেক আগে গোলাবাড়ির হাটে দেখা হয়ে গিয়েছিল পাকেচক্রে। মা বাপ সুরত আলির সঙ্গে হাটে এসেছিল সওদা করতে, সিরাজুল নাজমাকে নিয়ে যাচ্ছিল দে-গঙ্গায় সিনেমা দেখতে।

কেনাকাটা করে বুড়ো সুরতআলির সঙ্গে নেছারণ বিবি তেইশ নম্বর বাসের অপেক্ষায় ছিল। সিরাজুল দেখতে পায়নি, নাজমার চোখ এড়ায়নি। ছুটে গেছে। নেছারণ বিবি মেয়ে দেখে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছে।

নাজমা বলেছে, ও মা, তুমি আমার সঙ্গে শিমুলগাছি চলো।

নেছারণ উচ্ছ্বাস সামলে মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, দেখে চোখমুখ আলো করে গোপনে জিজ্ঞেস করল, ক'মাস?

নাজমা মাথা নামিয়ে জবাব দিয়েছে। বুড়া সুরত আলি তখন জামাইয়ের সঙ্গে কী যেন কথা বলছিল। সিরাজুল কথা থামিয়ে নাজমাকে তাড়া দিল, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাবে কিন্তু।

নেছারণের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু সিরাজুল পাত্তা দেয় না, যাওয়ার কথা বলে না। শেষে নাজমাকে এক রকম টানতে টানতে দেগঙ্গায় নিয়ে চলে।

যাওয়ার পথে সিরাজুল বলেছিল, তোর বাপকে একটা সাইকেলের কথা বললাম।

মেঘে মেঘে ছায়ায় ঢাকা দেয়া আকাশ। সূর্যের চিহ্নও নেই। ভয়ঙ্কর গুমোটে গাছগাছালির পাতা নড়ছে না। মাঠঘাট হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে। বেরোতে গিয়ে নাজমা বলে, এহন পথেঘাটে বেরোতি লজ্জা করে।

সিরাজুল কঠিন চোখে বিবির দিকে তাকায়। নাজমা সিরাজুলের চোখ দেখে নিভে যায়। আসলে পুরুষ মানুষের মতিগতি বোঝা ভার। বিশেষত এই সিরাজুলের মত পুরুষ, যে কোথাও কোনও থই পায় না। জমিজমা বেচে চালের ব্যবসা করতে গিয়ে ফেল মেরে বসে আছে। ফেল তো মারবেই, ওর যে জুয়ার নেশা তাসের নেশা নতুন বিবির চেয়ে একরত্তিও কম নয়।

নাজমা আকাশে তাকিয়ে দ্যাখে ডোবার ধারের নারকেল গাছটায় ডাবগুলো ঝুনো হয়ে গেছে। বর্ষা পড়েনি বলে ভিটেটা পরিষ্কার আছে, পানি নামলেই আগাছায় ভর্তি হয়ে যাবে ডোবা আর ডোবার কোলগুলো।

সিরাজুল এক সময় বলেছিল পাকা করাবে ভিটেটা। ঘরে ইট কাটাবে। কিন্তু এখন সে সব মুখেও আনে না।

জোরে হাঁট, সিরাজুল বলেছে।

নাজমা বলল, এটটু আস্তে হাঁটলি যদি কিছু...।

কিছু হবে না, গোলাবাড়িতি তেইশ নম্বর বাস ধরতি হবে, একটা চলি গেলি পাক্কা দেড়ঘণ্টা বসি থাকতি হবে।

নাজমা জোরে পা চালানোর চেষ্টা করে। এখন পেটটা ভারি হয়ে ওঠায় পায়ের উপর

বল কমেছে। কেমন যেন অবশ আচ্ছন্ন লাগে। ও ঘুরে তাকায় পিছনে। আকাশের নিচে সিরাজুলের ভিটে বাস্তুটা ঘুমের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো খড়ো চাল, চালের মাথায় লালচে দড়ি পাকানো মৃতপ্রায় কুমড়োর লতানে কাণ্ড, তার পিছনে শূন্যে মাথা তোলা নারকেল গাছ, সব নিঃঝুম। বাস্তুটা একেবারে একা হয়ে গেল যেন। লাল ঝুঁটি মোরগটা বেড়ার উপরে লাফ দিয়ে উঠে এদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ও সিরাজুলকে ডাকে, শোনবা এদিকি।

সিরাজুল বিরক্ত হয়ে পিছনে ফেরে।

কুকড়োটা বাসকোয় তুলা হয়নি!

সিরাজুল দাঁতে ঠোঁট চাপে, তারপর বলে, থাকুক কেউ লেবে না।

যদি কেটে খেয়ে লেয়?

সিরাজুল জবাব না দিয়ে হাতঘড়ি দ্যাখে, বিয়ের সময় ওটা সুরত আলি দিয়েছিল জমি বন্ধক রেখে। সাইকেলটা অবশ্য দিতে পারেনি।

কায়েম হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি হাঁট।

নাজমা এগোতে গিয়ে আবার থমকায়। রাত্তিরে মোরগটা কোথায় যাবে! তাহলে কি রাতে ফিরতে হবে? না, না নাজমা মাথা ঝাঁকায়, যদি ফেরে তো সিরাজুল ফিরুক। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মনের ভিতরে হঠাৎ যে আর্দ্র ভাব এসেছিল তা নিমেষে উধাও।

দুজনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠেছে। এখান থেকে মাইল দেড়েক। একটা ভ্যান রিকশায় উঠতে পারলে হত! এইভাবে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাজমার। তাছাড়া সকালে কিছু খাওয়া হয়নি। পেটে খিদেটা তো তার একার নয়, ভিতরে রক্তমাংস কে যেন নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। বুকটা ভার হয়ে আছে। মার সামনে দাঁড়াবে কী করে! বাপের মরার পর কেউ ওমুখো হল না। এক ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলতে বুক কাঁপবে না! মাটির নিচে শুয়ে বুড়ো সুরত আলি যে সব ধরতে পারবে।

কয়েক পা হাঁটার পর নাজমার ঘোমটা পড়ে যায়। ঘাম হচ্ছে। মাথার খোঁপাটা খুলে চুল ছড়িয়ে গিয়েছিল পিঠে, ও আবার খোঁপাটা বেঁধে নেয়। মুখটা সুগোল, গায়ের রঙ বেশ ফরশা। মায়ের মুখ আর রং পেয়েছে ও। চোখের কোলে পুরু করে কালি পড়েছে। বহনের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে।

সিরাজুল সামনে লম্বা লম্বা পা পেলে হাঁটছে। নাজমা চেষ্টা করছে ওকে ধরে ফেলতে। কিন্তু বড় দূরে চলে গেছে মানুষটা। দুপাশে শস্যহীন মাঠ পাথার ফেলে রেখে সিরাজুল সিধে হেঁটে যাচ্ছে। পিছনেও ফিরছে না।

আর নাজমা! তার লক্ষ্য সিরাজুল। চোখের সামনে আধপোড়া লালচে হয়ে যাওয়া বীজতলা, শুকনো পাটের চারা, একবার লাঙল মারা শক্ত ইটের মত দলাদলা মাটি। গরুছাগল সব অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরছে।

সিরাজুল দাঁড়িয়েছে। নাজমা ওকে দাঁড়াতে দেখে জোরে হাঁটার চেষ্টা করে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। শরীরটা টলমলে হয়ে গেছে! হঠাৎ নাজমার চোখ ফেটে যেন জল আসে। এমন গরু ঘোড়ার মত কী ছোটা যায়? এখন না গেলে হত না! তার চেয়ে মা নেছারণ বিবিকে সিরাজুল যদি এনে রাখত এখানে। পোয়াতি মেয়েমানুষ কী একা থাকতে পারে? তাতে মার শোকও কমত, সেও বাঁচত।

দূর থেকে জাফরপুরের মসজিদের চূড়োটা দেখা যাচ্ছে। মসজিদটা ক্রমশ এগিয়ে এসে নাজমাকে ধরে ফেলে। বাঁ হাতে মসজিদটা রেখে মাঠে মাঠে হেঁটে বড় রাস্তা। বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে! সেই রাস্তাও দেখতে পাচ্ছে নাজমা। এখন সে সিরাজুলের অনেক কাছে। ওর কথা সিরাজুল শুনতে পাচ্ছে।

মার যহন দরকার ছেল আমারে, তখন নে গেলে না।

বলতে গিয়ে নাজমা ভীত চোখে থেমে গেছে। সিরাজুলের চোখ যেন খরার আকাশের সূর্য। ওতে বড় তেজ।

দুই

ওরা দুজনে জোরে হেঁটেও ধরতে পারেনি তেইশ নম্বর বাস। লোক বোঝাই করে তা একটু আগে ছেড়ে গেছে দক্ষিণের দিকে।

গর্জে ওঠে সিরাজুল, তোর জন্যি হ'লো।

মাথা নামিয়ে নাজমা কয়েক পা পিছিয়ে যায়, পিছিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে সিরাজুলকে। তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে স্তিমিত কণ্ঠে বলে, তুমি যাও, আমি যাব না, বাপের মরণ তো আজ হয়নি।

সিরাজুল একটু ভড়কে এগিয়ে আসে, যাবিনে মানে, বাপ মরলি যাসনি।

নাজমা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে। ঘোমটার ভিতর থেকে সিরাজুলকে দেখতে থাকে। সিরাজুলের কণ্ঠস্বরে ও শান্ত হয়েছে। চোখের জল সামলে নিয়েছে নাজমা। এখন খিদের অনুভূতিটা অসাড় হয়ে গেছে। ভিতরেরটা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। নাজমা খুব গোপনে একবার তলপেটে হাত দিল।

সিরাজুল ওকে নিয়ে ছইলদ্দির চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে। তারপর বলে, দুটো চা দ্যাও দিনি মিঞা।

নাজমা ঘোমটার ভিতর থেকে বলে, আমি খাব না।

ঠিক আছে দুটো সুজি বিস্কুট দ্যাও সঙ্গে।

নাজমা দেখছিল গোলাবাড়ি হাটটা সব সময় জমজমাট। আজ হাটের দিন নয়, তবু কত লোক। বুড়ো ছইলদ্দি মিঞার উনুনে টগবগ ক'রে দুধ ফুটছে। ঘন দুধের গন্ধ আসছে বাতাসে। সিরাজুল বলেছিল একটা গাই পোষানি নেই। আর ব্যবসায়ে লাভ হলেই কিনে আনবে বাছুর সমেত গাই। সে তো অনেকদিন আগে বলেছিল, এখন আর ও কথা মুখেই আনে না।

রফিক সায়েব বলিছিল না একটা গাই পোষানি দেবে—!

নাজমার কথায় জবাব দেয় না সিরাজুল। বুড়ো ছইলদ্দি চা আর বিস্কুট বাড়িয়ে দেয় নাজমার দিকে। ও কী মনে করে চায়ে মুখ দেয়, বিস্কুট দুটো এগিয়ে দেয় সিরাজুলের দিকে। সিরাজুল বিস্কুটে দাঁত ঠেকায়।

এখন ব'সে থাকতে হবে অনেকক্ষণ। চা শেষ করে নাজমা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ এক ঝলক রোদ উঠে যাচ্ছে। রোদ দৌড়তে দৌড়তে টাকি রোডের ঢালাও পিচ রাস্তা বেয়ে ছুটে যাচ্ছে হাসনাবাদের দিকে। এখন রোদ মানে ভয়। কতকাল যে বৃষ্টি হয়নি!

সেই রোদের দিকে চোখ মেলতেই নাজমা দেখতে পায় আব্দুর রবকে। কী সব্বোনাশ!

দিব্যি মোটর সাইকেলে ব'সে পা মাটিতে নামিয়ে কথা বলছে এসমত আলির সঙ্গে। দুজনকেই নাজমা চেনে।

এসমত আলি এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় মেছোঘেরির মালিক। বাড়ি দক্ষিণের দিকে আমিনপুরে। আমিনপুর পার হয়েই বোয়ালঘাটা যেতে হয়। আর আব্দুর রব! এইতো ভোটের আগে গোলাবাড়ি হাটে মিসকিন মোল্লার পেটে নিজ হাতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ভোজালি। তারপর থেকে ফেরার। ওর বাড়ি তো জাফরপুরে। পাগল ইউসুফ মিঞার ছেলে। রবের বাপ ইউসুফ খেতে পায় না, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

পুলিসে খুঁজছে না আব্দুর রবকে? এই এসমত আলি নাকি সেই খুনের দিনে একসঙ্গে পনেরো হাজার টাকা বের ক'রে দিয়েছিল ওই কেস ঠেকা দেয়ার জন্য। সবই তো সিরাজুলের কাছে শুনেছে নাজমা।

নাজমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সাদা প্যান্ট তার উপরে লাল শার্ট, পায়ে পালিশ করা জুতো, কোমরে চওড়া বেল্ট, রবের চেহারাটা সিনেমার নায়কের মত লাগছে। বেশ মোটাসোটা হয়েছে।

নাজমা সিরাজুলকে ধাক্কা দেয়, ওই দ্যাখো।

সিরাজুল ছইলদ্দির সঙ্গে কথায় মগ্ন ছিল। নাজমার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে ওর ইঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে মোটরসাইকেল আরোহীকে দেখেই লাফ দিয়ে ওঠে।

নাজমা ভয়ে ওকে আটকাতে চায়। ধাক্কা মেরে উঠে যায় সিরাজুল। নাজমা পড়তে পড়তে টাল সামলায়। তারপরেই দ্যাখে সিরাজুল রবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নাজমা কাঁপতে থাকে। ওকে কি আটকাতে গেল সিরাজুল?

অবাক হয়ে ও দ্যাখে সিরাজুল হাত কচলাচ্ছে লোকটার সামনে। আব্দুর রব ওর দিকে চেয়ে হাসল, তারপর আবার এসমত আলির সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যাপৃত হল। অনেকক্ষণ পরে আব্দুর রব তার মোটরসাইকেলে চাপ দিল। নৈঃশব্দ্য ভেদ ক'রে জেগে উঠল যন্ত্র দানবের গর্জন। সিরাজুল এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়েছিল ওখানে। ধোঁয়া উড়িয়ে মোটর সাইকেলটা যেন উড়ে চলে গেল বারাসতের দিকে। সিরাজুল সেই দিকে চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এল।

নাজমা অন্যদিকে ফিরেছিল। তার ভয় হচ্ছে সিরাজুলকে দেখে। মিসকিন মোল্লা এইতো সেদিন খুন হয়ে গেছে। দু মাস কেটেছে কী কাটেনি। এখনো সব জলজ্যান্ত স্মৃতি।

বুড়ো ছইলদ্দি মিঞা জিজ্ঞেস করল, কী বলতেছে রব?

সিরাজুল অন্যমনস্কের মত বলে, ওর হাতে অনেক ক্ষ্যামতা এখন।

তিন

তেইশ নম্বরের পরিবর্তে একটা ম্যাটাডোর ছাগল, মুরগির সঙ্গে অনেক মানুষ তুলে দক্ষিণে চলেছে। সিরাজুল হাত বাড়িয়ে সেটাকে দাঁড় করালো।

কখন তেইশ আসে ঠিক নেই।

রোদ গিয়ে আবার ছায়াময় হয়েছে পৃথিবী। নাজমা বলল, অত মানুষের ভিতর এই শরীল নিয়ে, গা কেমন করতিছে।

দেরি করিসনে, ওঠ।

ম্যাটাডোরের দিকে তাকিয়ে নাজমার মনে হ'ল সত্যিই সে যাচ্ছে বোয়ালঘাটায়। বাপ সুরত আলি তার মা নেছারণ বিবির দ্বিতীয় পক্ষ। সুরত আলির নিজের মেয়ে না সে। হাঁটানো-মেয়ে। মেয়ে সমেত মাকে ঘরে তুলেছিল বাপ। নিজের বাপ না হ'লেও টান কিকম। লোকে জানেও না যে সে সুরত আলির মেয়ে না। সেই বাপ? মরলে যেতে পারেনি। এখন যেন চোখের ভিতরে গাঢ় বর্ষণ শুরু হয়েছে। শ্যামবর্ণ ছোটখাট মানুষ সুরত আলির দাড়ির রং ধবধবে সাদা। ওই মানুষটা দিন দিন বুড়ো হয়েছে, আর ক্রমশ ঘন যৌবনা হয়েছে এই মেয়ে।

সিরাজুলের সঙ্গে সুরত আলির আলাপ এই হাটে। সিরাজুল তখন আগের পক্ষকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করার ফিকির খুঁজছে। সন্ধ্যেবেলায় পাট গুদামে বসে সিরাজুলকে পছন্দ করে বুড়ো সুরত আলি। তার হাঁটানো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। সিরাজুলকে বলল, মেয়ে দেখে যেতে।

জে, ওঠপো। নাজমা ভীত পায়ে এগিয়ে এক চাষী বউ-এর হাত ধরে ম্যাটাডোরের পিছনে ওঠে। ভাগ্যিস রোদ নেই। রোদ হলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যেত সে। সিরাজুলও ওঠে নাজমার পিছু পিছু। মাল আর মানুষে বোঝাই হয়ে গাড়ি চলল দক্ষিণে।

বোয়ালঘাটার খালপাড়ে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরে গেল। এখানে তারা দুজনই শুধু নামল। বেলা অনেকটা উঠে গেছে। ওরা দুজন পুবে হাঁটে। মাঠে মাঠে রাস্তা। ভালু মিঞার মেছোঘেরির পাশ দিয়ে দুজন এগোচ্ছিল। নাজমা দ্যাখে মেঘ ভেঙে রোদ ছুটে আসছে জলের উপর দিয়ে। আবার রোদের পিছনে পিছনে মেঘের ছায়া। সকাল থেকে এই চলছে।

সিরাজুল হাঁটতে হাঁটতে জলকরের আকার দেখছিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতি জলাভূমি। পাড়ে পাড়ে খোড়ো ঝুপড়িতে এক-একজন লেঠেল ব'সে আছে। এই কাজ করত সুরত আলি।

তোর বাপ কোন ঘেরিতে মরেছে?

বাপ তো কাজ করত কুণ্ডুবাবুদের ঘেরিতি।

সুরত আলি কুণ্ডুদের মেছোঘেরিতে কাজ করত। দিন কুড়ি আগে লুট হয় সেই ভেড়ির মাছ। ভাল জাতের বাগদা চিংড়ির চাষ কুণ্ডুবাবুর। সুরতআলি সেই লুট আটকাতে গিয়ে লড়ে পারেনি। দাঙ্গা ঠেকাতে গিয়ে তার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ওই অবস্থায় দিন পাঁচেক যুঝেছিল মানুষটা।

বাপের কয়বিঘে জমিন আছে?

সিরাজুল এবার আস্তে হাঁটছে। নাজমা একটু দূরে। অর্ধ বৃত্তাকর মেছোঘেরির কালোজল নাজমার পিছনে খল খল করে নাচছে। নাজমা হাঁটতে পারছে না। মস্ত ছায়ার ভিতরে শ্লথ পায়ে নাজমা এগিয়ে আসে ডিম ভরা মাছের মত। জল আর ছায়া দুই মিলে মিশে ধূসর। ধূসর শূন্যতা যেন মেঘের মত, ছায়ার মত, জলের মত। নাজমা আর পারে না। নুয়ে যায় বার বার। হাওয়া উঠছে হাওয়া। হাওয়ায় মাথার কাপড় প'ড়ে গেছে, চুল উড়ছে। বেশবাস অবিন্যস্ত হয়ে গেছে তার।

নাজমা বলল, বাপের জমির খবর আমি জানিনে।

জানিসনে মানে! গর্জে সিরাজুল ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

নাজমা পেটের উপরে হাত রেখে টলমল ক'রে হাঁটছে। সিরাজুলের দিকে আর তাকাচ্ছে

না। ভয় হচ্ছে বুকের ভিতরে।

রব তোমারে কী বলতিল?

সিরাজুল থমকে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণ চোখে বিবির দিকে তাকায়, জবাব দেয় না।

ও মাডার করিল, ওর সঙ্গে কথা বলা কি—!

তুই দেখিচিস মাডার করতি?

আমি দ্যাখপো কেন? বলতে বলতে সরাসরি সিরাজুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন কুঁকড়ে যায় নাজমা।

সিরাজুল হিসহিসিয়ে ওঠে, কেউ দ্যাখেনি, বললিই হলো, কে দেখেছে ওরে মাডার করতি...।

সিরাজুলকে যেন ভয় লাগে। নাজমা আর কথা বাড়ায় না। তার দুচোখে ঘোর। সর্বাঙ্গে কষ্ট আর ক্লান্তির ছাপ। সে সিরাজুলকে বলল, এটটু বসপো এখেনে?

সিরাজুল জবাব দিল, না, ঘরে বসিস একেবারে।

চার

সকালের মেঘ বিকেলেও যায়নি। এ মেঘে বৃষ্টি হয় না, এ মেঘ বৃষ্টির নয়। এখনো আলো রয়েছে চারদিকে। নেছারণ বিবি দাওয়ার উপর নিঃঝুম হয়ে বসেছিল। উঠোনে স্তূপ অন্ধকার হয়ে বসে আছে নাজমা। লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছে সিরাজুল।

তুমি তো বাপ দেখতিছ, ও লোকের বিঘে তিনেক জমি আছে, তা সে জমি তার হাঁটানো মেয়ে পাবে কেন?

সিরাজুল নেছারণের দিকে তাকায় না, বিবিকে দ্যাখে না। দুপুরে এ বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকে ধুন্দুমার চলছে শাশুড়ির সঙ্গে। সে খোঁজখবর নিয়ে আশায় আশায় এসেছে। শ্বশুরের সম্পত্তিতে মেয়ের বকলমে তারও তো কিছু অংশ থাকবে। হোক না হাঁটানো-মেয়ে।

সুরত আলির হাঁটানো-মেয়ে বিবি নেছারণের সঙ্গেই এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। বুড়োর ঔরসে নেছারণের দুই ছেলে। বাপ মরার পর ওই দু'জন নিজেদের ভিতর ভাগাভাগি করে নিয়েছে সম্পত্তি। যে মেয়ের বাপ সুরত আলি নয়, সে মেয়ে কী করে সম্পত্তির ওয়ারিশান হয়?

এত কথা বুঝতে তো সিরাজুল আসেনি। সে বলছে, ঠিক মেনে নিলাম নাজমা পাবে না, কিন্তু তুমি তো পাবা, শাউড়ি হলো গে শউরের বে করা বউ।

নেছারণ বিবি হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকে জামাইয়ের দিকে।

সিরাজুল বলল, তোমার অংশডা লিখি দ্যাও মেয়েরে, তুমি তো দু আনা পাবা, সেডা দ্যাও, মেয়ে ফাঁক যাবে কেন?

নেছারণ কথা খুঁজে পায় না। স্বামীর সম্পত্তিতে তার দু আনা অংশ আছে ঠিক। কিন্তু ওই অংশ চলে গেলে তার ভাত-জল যে উঠে যাবে। দুই ছেলেতে বার করে দেবে ঘর থেকে। যে মেয়ের জন্ম তাদের বাপ সুরত আলি দেয়নি, সে মেয়ে যদি কোনও রকমে এ সম্পত্তির অংশ পায় তো তারা শুনবে? ভূমি আর রক্তধারা একখাতে বয়ে যাওয়াই রীতি। এর ব্যতিক্রম—? হয় না হয় না, কোনও কালে হয়েছে বলে কেউ শোনেনি।

আগে জানলি হাঁটানো-মেয়ে বে করত কেডা, বুড়োর উচিত ছিল না মেয়েরে কিছু লিখে দেয়া।

সিরাজুলের কথায় নাজমার বুকটা হিম হয়ে আসে। নেছারণ চমকে উঠেছে। মা মেয়ে দেখছিল শুকনো আকাশ থেকে সারাদিনের সেই মেঘেরা গুঁড়ো-গুঁড়ো ছায়া হয়ে নেমে আসছে নিচে। বৃষ্টির বদলে খরার দিনে মেঘেরা অন্ধকার নামাচ্ছে।

সিরাজুল দুপুর থেকেই বলছে জমি না পেলে বউকে রেখে যাবে। হাঁটানো মেয়ে জমি পায় না তো তার জানা ছিল না।

সত্যি বলতিছি বাপ, নিজির বাপের লয় বলে ও মেয়েরে সম্পত্তি দেবে না ছেলে দুটো, আর দিলি তাদ্দেরই বা কী থাকপে?

নেছারণ সিরাজুলের দিকে ভীরু চোখে চেয়ে থাকে আশায় আশায়। যদি মন ভেজে! সিরাজুল এদিকে ফেরে, কঠিন দু চোখ।

লোকে বে করে কেন, শউরের সম্পত্তির জন্যি তো!

নেছারণের মুখটা এই কথায় কালো হয়ে গেল। আধময়লা পুরনো কাপড়ে অন্ধকার জমছে, নেছারণ বিবি মাথায় কাপড় টেনে দিল। আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে এল, বুড়ির দু' ঠোঁট কাঁপছে, থেকি যাও বাপ, শুধু রাতডা তো, রাতি কুথায় যাবা?

খপর পাঠায়ো দলিল করার আগে।

থাকপা না বাপ! নেছারণ ক্রমশ দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ে জামাইয়ের সামনে।

নাহ, কুকড়োডা ছাড়া রয়েছে, আমি যাই, তুমার মেয়েরে রেখে যাচ্ছি, সম্পত্তি হলি খপর পাঠায়ো।

সিরাজুল সত্যি সত্যিই বেরিয়ে যায়। সে এক আশ্চর্য কল বার করেছে। এ রকম চাপ না দিলে জমি পাবে না। টাকার দরকার তার।

নাজমা মাথা তুলল। উঠোন আর আকাশ সব এক। ভিজে মাটি, সে যেন বহু জীবনের স্মৃতি! সে নেছারণের দিকে চেয়ে থাকে। মা, মেয়ে নিশ্চুপ।

সত্যিই চলি গেল! নাজমা ফিসফিসিয়ে আসন্ন অন্ধকারকে জিজ্ঞেস করে। এখন ধূসর ছায়াময়তা গাঢ় হয়ে রাত্রি নেমে আসছে সব দিকে।

আবছা অন্ধকারে নেছারণ এগিয়ে আসে। মেয়ের হাত ধরে, ঘরে চল।

মেয়ে সাত মাসের পোয়াতি। এ মেয়েকে দেখে মায়ের চোখ জুড়োনর কথা। কিন্তু নেছারণের চোখ যেন ধুলো ময়লায় ভর্তি হয়ে গেছে।

মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মা মেয়ের পাশে।

চ, এ অবস্থায় অন্ধকারে থাকতি নেই।

নাজমা মায়ের হাত ধরে বলে, কোথায় যাব মা?

মা মেয়ের দিকে তাকায়, মেয়ে মায়ের দিকে। তারপর দু'জন একসঙ্গে চোখ মেলেছে বাগানের দিকে। ওখানে সুরত আলির কবর। নেছারণ মাথা ঝাঁকাতে থাকে। কী বলবে সে?

যে জবাব দিতে পারত, সেই মানুষ তো মাটির নিচে ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে শুয়ে আছে। বহুদিনের রক্ত ঘাম মাটিতে ফেলে বিঘেতিনেক মত সম্পত্তি করেছিল সুরত আলি। ও ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি। হাঁটানো মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল না বুড়ো। কিন্তু কী করবে? যা হয় হবে। কবরের অন্ধকারে তাকিয়ে নেছারণের বুকটা হা হা করে ওঠে।

সেই কতকাল আগে। সব এখন ছায়া-ছায়া মনে আসে। ছ'মাসের মেয়ে নাজমাকে নিয়ে

দিশেহারা নেছারণ বিবি পথে নেমেছিল। নাজমার বাপ, তার প্রথম পক্ষের স্বামী আর একটা বিয়ে করে তাকে বার করে দিয়েছে গলা ধাক্কা দিয়ে। তখন কোথায় যাবে সে? কাছে পিঠে কোনও যাওয়ার জায়গা ছিল না। বাপের বাড়ির অবস্থা মরা গাছগাছালির মত। সেই লোকটা, নাজমার বাপ, তার যেন কী নাম ছিল? আজবাহার মণ্ডল, সাকিন আমিনপুর। মুখের চেহারা বহু বছরের স্মৃতিতে ধুলো চাপা হয়ে গেছে।

সে ছিল এক ঘোর শ্রাবণের দিন। আকাশের গায়ে গর্ভবতী ক্লান্ত গমনা মহিষীর শরীর। রঙ আর গাম্ভীর্য এক রকমের। বৃষ্টির ভারে আকাশ বুঝি নেমে এসেছিল মাটির কাছাকাছি। ফিসফিসিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল আর হাওয়া দিচ্ছিল। জমিতে সদ্য রোয়া ধান বাতাসে মাথা কাঁপাচ্ছিল।

মেয়ে নিয়ে রাস্তার ধারে গাছের নিচে বসেছিল নেছারণ বিবি। তখন আধবুড়ো সুরত আলি ফিরছিল জমি থেকে। মনের খুশিতে ফিরছিল মানুষটা। সময়ে বৃষ্টি নেমেছে, ফসল হবে ভাল।

দূর থেকে নেছারণকে দেখে লোকটা এগিয়ে আসে, আকাশের দিকে তাকায়, তাকে দ্যাখে, তারপর বলে, 'আশমানের গতিক সুবিধের লয়, বাজ পড়তি পারে, মেয়ে তুমি কেডা, ঘরে যাও, এইদিনে বেরোন উচিত হয়নি।'

নেছারণ নির্বাক। ঘোমটার আড়ালে ফিসফিসিয়ে কাঁদে। ওর সামনে সর্বাঙ্গ জলে ভেজা কাদামাখা ছোটখাটো চেহারার একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে যাও, কোন মিঞার বিবি তুমি?

নেছারণ আর পারে না। হাউ হাউ করে কেঁদে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরত আলি সব শুনল। শুনে এগিয়ে এসে নিচু হয়ে নেছারণের হাত ধরল, চলো আমার ঘরে থাকপা।

যেতে যেতে সুরত আলি বলল, বিবি পাচ্ছি, সঙ্গে হাঁটানো মেয়ে এটডা।

খটখটে কবর ছুঁয়ে শুকনো বাতাস আসছে। নেছারণের দু চোখে ঘোর লাগে। এতক্ষণ সে কাঁদেনি, এবার ভেঙে পড়ল। নেছারণ মাটিতে বসে পড়েছে। গাঢ় অন্ধকারে সব ছেয়ে গেছে। কাছের মানুষকেও চেনা যায় না।

কী বলবে মা তার মেয়েকে? সেই সুরত আলি তো আর বেঁচে নেই। এখন সব বদলে গেছে। তেমন মানুষ আর চোখে পড়ে না। শ্রাবণের আগুনের দিনে আকাশ পৃথিবী মানুষের ছাতি ফাটে। সুরত আলিরা এই পৃথিবীতে আর নেই।

মায়ের পাশে মেয়ে বসে পড়েছে। তলপেটে হাত রেখে থরথর করে কেঁপে উঠল। অন্ধকারে নেছারণবিবি মেয়ের পেটের দিকে তাকিয়েছে। ছায়ায় অন্ধকারে ওই ভরাপেট ঢেকে গেছে। সব অস্পষ্ট!

এমন মেয়ের মা হওয়া যেমন কষ্ট, তেমনি কষ্ট মেয়ে হওয়া। নেছারণের মেয়ে গভীর নৈঃশব্দ হয়ে বসে আছে। মা ডেকে উঠলেও জবাব দেয় না। একমনে চেয়ে থাকে সুরত আলির কবরের দিকে। কবরে শুয়ে থাকা মানুষটা ছাড়া এই পৃথিবীর সবই তার অচেনা।

(দেশ—১৯৮২)

হস্তান্তর

বিবিজানের কথা ভাবতে ভাবতেই দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নামে। দুই ভাই সকাল থেকে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। দলিলের খোঁজ নেই। দলিলের খোঁজে মনের ভিতরে বিবিজান ভাবির খোঁজ পড়ে। মতিন মিঞা তো দলিলের কথা ভাবে না, ভাবে বিবিজানের কথা। অথচ হারানো দলিল খুঁজতে গিয়েই না বিবিজানের কথা মনে পড়া।

আচ্ছা মিঞা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে মতিন, তোর ঘরটা ভালভাবে দেকিচিস?

মতিন আকাশের দিকে হাঁ করে বসেছিল। আচ্ছার কথা তার কানে গেল না। কখনো ভাবছিল বিবিজানের কথা, কখনো ভাবছিল আচ্ছা মিঞার শয়তানি কথা। গোলমালটা আচ্ছা করছে কিনা তার ঠিক কী। এসবে তো তার নাম ডাক কম নয়। এক জমি দশজনকে দশবার গোপনে বেচে আসে। দলিলটা তো ও বেটাই লুকিয়ে রাখতে পারে।

মতিনের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে আচ্ছা মিঞার সামনের দুটো হলুদ দাঁত ভিতরে ঢুকে মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাহলে শয়তানিটা মতিনই করছে। ওর ঘরের কোথাও না কোথাও আছে। চালের বাতায় কিংবা পুরনো কলসিতে। দলিল লুকিয়ে জোচ্চুরি করার ধান্দা! আর এসব তার মাথায় থাকতেই পারে। বেটা জুয়োর আড্ডায় বাঁশি বাজায়, চৌকি দেয় জুয়োর বোর্ড। বদবুদ্ধি ষোল আনা।

আচ্ছা মিঞা হেঁকে উঠল, ও মতিন কানে শুনতিচিস?

মতিন চমকে গেল, এই শুনলাম।

দলিলডা গেল কোথা?

মতিন ভাবছিল আচ্ছা কতটা সরল কতটা কপট। দলিলের কথা তাকে জিজ্ঞেস করে। সত্যিই কি ও জানেনা?

আচ্ছা মিঞা আর মতিন মিঞা পরস্পরকে জরিপ করছিল। ওদের চারপাশে কখন যে আঁধার ঘনায় তা খেয়াল হয় না কারোর। এমনিতে এখন বেলা ছোট, দুপুরটা কখন আসে আর কখন যে যায় বোঝা যায় না।

দুই ভাই উঠোনে বসেছিল। ওদের পিছনে বাঁশঝাড়ে এর মধ্যে ঝুপসি অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকারের সঙ্গে বিনবিনে শীতও। বাঁশবাগান, বনবাদাড় একধারে রেখে দুই ভাইয়ের দুটো ধ্বস্ত কুঁড়ে ঘর। আজ সারাদিন দুই ভাই আঁতিপাতি করে দলিলটা খুঁজেছে। শেষে হাল ছেড়ে ঘরের বাইরে গালে হাত দিয়ে বসেছে। অথচ দলিলটা তো চাই। জমি বেচতেই হবে। বিবিজান ভাবির দলিল করে দেওয়া সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি না বেচলে এই অঘ্রান পৌষ যে আর কাটে না। বিবিজান দুইজনকে যে সম্পত্তি বেচে গিয়েছিল, সেই সম্পত্তিই বেচবে দুজনে।

ভাবির সম্পত্তি কতডা হবে? মতিন জিজ্ঞেস করল।

আচ্ছা মিঞা ভাবতে বসল। বিবিজান তাদের মৃত বড়ভাই কালু মণ্ডলের বিবি। কালু

মণ্ডলের মৃত্যুর পর কিছু সম্পত্তি তার বিবির কাছে বর্তায় একেবারে ইসলামি ফরাজি নিয়মে। সেই সম্পত্তি বিবিজান এই দুইজনকে বেচে অন্য গাঁয়ে নিকে করে।

আচ্ছা মনে মনে হিসেব ক'রে ভাইকে বলে, হিসেব জানিনে, তবে কিনা বড়ভাইয়ের যা ছিল পেথমে, আমাদের দুজনেরও তা ছিল মানে বাপের সম্পত্তি তো তিন ভাগ হয়েছিল, বুন ছিল না, মা মাটি নেছলো আগে।

হিসেব মতিনের মাথায় ঢোকে না। তবুও সে মাথা নাড়ে বিজ্ঞের মত! তার তুলনায় জমিজমা আচ্ছা বেশি বোঝে। বুঝবেই তো, মতিনের তো বোঝার কথা নয়। সে তো এতটা কাল গোলাবাড়ি হাটে হায়দর আলির জুয়োর বোর্ডের পাহারাদার হয়েই কাটিয়ে দিল। যেদিকে দেগঙ্গা, সেদিক থেকে তো দারোগা পুলিশের মুখ দেখানোর কথা। পুলিশের গাড়ির মুখ কাচকলের বাঁক থেকে এদিকে ঘুরলেই মতিনের মুখে হুইস্‌ল বেজে ওঠে। পুলিশ আসছে। হুইস্‌ল বাজলেই হায়দর আলি বোর্ড তুলে ভোঁ ভাঁ। মতিনের বাঁশি বাজলেই একটাকা। আর ভুল বাজালে আগের পাওনা থেকে আট আনা কাটা। হাটের দিন সতর্ক থাকতে হয় বেশি। বাস থেকেও নামতে পারে হাবিলদার কনস্টবল। শাদা পোশাকেও হাট করতে পারে দারোগাবাবুর পিয়ন। জুয়োর বোর্ড দেখলে পিয়নবাবুর উপরি আয় হয়। নতুবা সব সমেত থানায় চালান করার ব্যবস্থা করবে। বাঁশি বাজানো যার পেশা, সেই মতিন মিঞা জমির হিসেব বুঝবে কীভাবে?

এ বছর রোদে খরায় গেছে। পাতাল অবধি জল শুকিয়ে খাঁক হয়ে গেছে মাটির বুক। ধানের বদলে জমির খড় কেটে ক'দিন আগে ওরা বেচে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি আর দিন চলে। এখন বেচতে হবে জমি।

হায়! অঘ্রান মাসে জমি বেচতে হয় একথা কি কেউ শুনেছো? দুই ভাইয়ের এতটা বয়স হলো, তবু এমন কাণ্ড কেউ করেনি কখনো। দশ কাঠার মত জমি দুই ভাইয়ের দখলে আছে। সে জমি কার দুই ভাই জানে না। যখন তখন জমি বেচেছে দুইজনে, এখন আবার বেচবে। তার জন্য চাই জমির দলিল। দাগ নম্বর, অংশ ভাগ দেখতে হবে। বিবিজান ভাবির কাছ থেকে যে সম্পত্তি কিনেছিল দুই ভাই. তা বিক্রি করবে!

আচ্ছা মিঞা বোঝাচ্ছিল, মতিন মিঞা ঘাড় দুলোচ্ছিল। ওদের মাথার উপরে শীত পাখি তার অন্ধকার ডানা মেলে চরাচর আড়াল করছিল। শীতের ছোঁয়ায় দুজনে আর নড়ছিল না। আচ্ছা মিঞা তার গায়ের গামছা বেশ করে জড়ায়, আর মতিন তার আদ্দিকালের ছেঁড়া খদ্দরের চাদরে মুড়ি দিয়ে জবুথবু।

আচ্ছা ফিসফিসিয়ে বলল, 'যে জমিডা পড়ে আছে, তা বিবিজান ভাবির সম্পত্তি, ও ছাড়া আর নাই, সব বেচা হই গেছে।'

মতিন ভাবছিল বড়ভাই কালু মণ্ডল এ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই মাটির নিচে মাটি হয়ে গেছে। তার বিবি ভিনগাঁয়ে ফের নিকে করেছে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি এই দুজনকে বিক্রি করে।

মতিন তার চাদরের ভিতরে দিয়ে জুলজুলে চোখে ভাইকে দেখছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ভাবির কথা তোর মনে পড়ে আচ্ছা?

আচ্ছা অবাক হয়ে ভাইকে দ্যাখে। একথা কেন? ভাবির কথা মনে পড়বে কেন, মনে পড়ছে দলিলের কথা। জমি ছাড়া সে কিছু বোঝে না। এ ব্যাপারে তার মাথা খুব সাফ। মাদ্রাসায়

যাতায়াত করেছিল কম বয়সে। আর মৌলবি সায়েবের পিয়নও হয়েছিল দু বছর। জুতো আর ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হত। আচ্ছা ভাবল, এ কথা মানে মতিনের চালাকি। হচ্ছে দলিলের কথা, এর ভিতরে ওসব কথা আসে কী ভাবে? দলিল আর মেয়েমানুষ কি এক?

এ ভাবনা আচ্ছার ভিতরে আসতেই তার চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। দু চোখে যেন বারুদ ছুটতে লাগল। মুখগহ্বরে যে কটি দাঁত অবশিষ্ট আছে তা উপর নিচ পরস্পরে ঘষে গেল। দুটো হাত নিসপিস করতে লাগল। আচ্ছা ভাবল মতিন কথা ঘুরোচ্ছে, মানে দলিল ওর কাছে আছে।

সে হেঁকে উঠল, দ্যাখ মতিন আমারে ফাঁকি মারতে যাসনে।

একথা শুনে মতিন লাফ দিয়ে ওঠে আর কী! তার সমস্ত দেহটা হঠাৎ যেন আগুন হয়ে উঠল। ফাঁকি মারার কথা ওঠে কীভাবে? দাঁত কিড়মিড় করে উঠল মতিন মিঞার।

সে বলে উঠল, মিছে দোষ দিবিনে বলতিছি, বিচার করতি আমি হায়দর আলিরে লে আসপো!

আচ্ছা চিৎকার করে উঠল, লে আয় তোর জুয়োর পাটি, দলিলডা লুকোয় রেকিচিস, বললি দোষ!

অন্ধকারে দুজনে উঠে দাঁড়িয়েছে। মতিন লাফ দিয়ে আচ্ছার দিকে তেড়ে গেছে। গলাবাজিতে কেউ কম যায় না। এ বলে তুই চোর, ও বলে তুই চোর। দুটি একরকম মানুষ লাফ দিতে থাকে উঠোনের শক্ত মাটিতে। একই রকম হাত পা মুখ চোখ আর মাথা।

আচ্ছা আর মতিন, দুই যমজ। এমনিতে চেনা দায়। মতিনের দাঁত নেই, আচ্ছার গায়ে গামছা। মতিনের গায়ে আদ্দিকালের ছেঁড়া চাদর, আচ্ছার দেহটা একটু বাঁকা।

দুই ঘর থেকে দুই বিবি দৌড়ে এল। সকাল থেকে এইরকম পরস্পরে দাঁত দেখানো যে কতবার হল তার ইয়ত্তা নেই।

দুই

কতকালের কথা হবে। বছর হিসেব করা দুই মিঞার কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তা বড় বন্যার আগের বছর তো বটে। বছর পাঁচেক কেটে গেছে। সেই সময় দুই যমজের বড় ভাই পেটের ভিতরে ঘা নিয়ে মারা যায়। হাসপাতাল অবধি নিয়ে যেতে হয়নি, তার আগেই শেষ।

কালুমিঞার দেহ ছিল ছোটখাট। কিন্তু বড় ভাই তো! দুই যমজকে কী এক গোপন ছায়ায় ঢেকে রেখেছিল। পেটের ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে যখন কালু তিনবার থরথর করে স্থির চক্ষু হয়ে গেল, তখন বিবিজানের কোলে এক বছরের বাচ্চা। আর এই দুইজনের দুই বিবির পেটেও প্রথম সন্তান।

কালু মণ্ডল মরার পরে মতিন একদিন ফিসফিস করেছিল আচ্ছার সঙ্গে, 'ভাবিরে বে করতাম, কিন্তু আর এক দু বছর গেলি হত, এহন লয়।'

আসলে প্রথম সন্তানের আহ্লাদে মতিনের তখন মাথা খারাপ। কী করবে ঠিক করতে পারছে না। ক'দিন বাদেই তো সে বাপ হচ্ছে!

কালু মাটি নেওয়ার পর বিবিজান স্থির নিশ্চল হয়ে ঘরে বসে থাকত। তার রূপ ছিল দেখার মত। তারিফ করার মত। ঠিক যেন ইমানদার ঘরের বউ বিবি। কালুর ভাগ্য বটে।

যে কদিন বাঁচল এই বিবির সঙ্গে কাটিয়ে গেল।

কালু মিঞা হলো বিবিজানের দ্বিতীয় পক্ষ। আগের স্বামীকে মনে ধরেনি তার। কালুর যাতায়াত ছিল সেই বাড়িতে। সেখানে বিবিজান নিঃঝুম হয়ে বসে থাকত। আজগার মণ্ডলের বউ-এর মনের ভিতরে ঢুকবে কে?

আজগার মণ্ডল, বিবিজানের প্রথম পক্ষ। সে ছিল কশাই। হাড়োয়ার নামকরা মানুষ লতিফ মণ্ডলের পিলখানার এক নম্বর ওস্তাদ। শেষ রাত থেকে গরু কাটত। আকাশ ফর্শা হতে না হতে গোটা তিনেক জবাই শেষ। ভোর তখন পিলখানার চারদিকে শকুন নামত। আজগার মণ্ডল শকুন পরিবৃত হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। দুপুর নাগাদ বিবিজানের সেই প্রথম পক্ষ ঘরে ফিরত লুঙিতে গরুর খুন মাখামাখি ক'রে। এই স্বামীর ঘরে বিবিজানের মন বসে কীভাবে?

না, আজগার মণ্ডলের বাচ্চা তার বিবি তখনো পেটে ধরেনি। বিবিজানের ভয় ছিল। কশাই নাকি নির্বংশ হয়। কশাইয়ের অঙ্গে অঙ্গে নাকি ভবিষ্যৎ কালে রোগ দেখা দেয়। চামড়া খসে খসে যায়। সেই ভয়ে বিবিজান আজগার আলিকে ত্যাগ ক'রে চলে এল কালু মণ্ডলের ঘরে।

সেই আজগার আলি ছমাস পরে সত্যিই মাটি নিল। তিনদিনের জ্বরে শেষ। খবর এনেছিল মোতালেব মিঞা। আজগার আলির এক স্যাঙাৎ।

মোতালেব কালুকে এসে বলেছিল, আর ছড়া মাস যদি অপেক্ষা করত বিবিজান, তাহলি আজগার এর সম্পত্তির অংশ পেত, এখন সেই সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খাচ্ছে।

কালু আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়েছে, উঁহু, কশাইয়ের সম্পত্তি ভোগের হত না, বিবিজান এ্যাদ্দিন ওর কাছে থাকলি বাঁচতিই পারত না।

কালু মণ্ডল মাটি নেওয়ার পর বিবিজান নিশ্চুপ। চোখের জল ভিতরেই শুকিয়েছে বোধহয়। বেওয়া মেয়েমানুষের পায়ের শব্দও শোনা যায় না। নীরব চোখে কালুর গোরস্থানের দিকে চেয়ে থাকে বিবিজান। তারপর একদিন ওই পথেই মানুষজন আসতে দেখল। আনাগোনা শুরু হলো পুরুষমানুষের।

বুদ্ধিটা আচ্ছা মিঞার, সে বলল, ভাবি তুই আবার নিকে কর, আর—!

আর কী? বিবিজানের চোখ আচ্ছা মিঞার চোখে।

বড় ভাইয়ের যে সম্পত্তিডা পেয়েছিলি ওয়ারিশান হয়ে, তা ছেড়ে দে আমাদের দু ভাইরে, হ্যাঁ টাকা দেব।

মতিন কিন্তু আচ্ছার এই কথায় রুষ্ট হয়েছিল মনে মনে। বিবিজান ভাবি তার ঘরে এসে উঠুক, এই ছিল তার মনের কথা। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। ঘরে তার বিবির পেটে বাচ্চা, এখন কি নিকে সম্ভব? বড় ভাইয়ের বড় আদরের ছিল বিবিজান। জন্মেও সে ভাবেনি এমন বিবির সঙ্গে ঘর করা তার ভাগ্যে লেখা আছে, আর এমন বিবিকে ছেড়ে মাটি নিতে হবে অকালে। বিবিজানকে এই ভিটেতে রাখতে পারলে মাটির নিচে কালু মণ্ডলের বুক স্থির হবে।

আচ্ছার তখন ভবিষ্যতের ভাবনা। কম পয়সায় যদি ভাবির কাছ থেকে জমি পাওয়া যায় তো তাদের জমি বেড়ে যায়।

বিবিজান জলের দামে তার পাওয়া জমির ভাগ বিক্রি ক'রে দিল দলিল করে। দুই ভাই তা কিনল। সেই টাকা নিয়ে বিবিজান ঘর করতে গেল জীবনপুরে। এসেছিল মোতালেব মণ্ডল, আজগার আলির পুরনো স্যাঙাৎ। সে নিয়ে গেল বিবিজানকে জীবনপুরে।

মতিন তার দাওয়ায় বসে দেখল ফাল্গুন মাসের ভোরে বিবিজান তার মেয়ে কোলে করে মোতালেবের সঙ্গে যাচ্ছে ঘর করতে। তখন আমগাছে বোল এসেছে, নিমগাছে ফুল। ভোরের সব সুবাস বিবিজানের পিছু পিছু হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে বিবিজান একবার পিছনে ফিরল।

মোতালেবের এ ইচ্ছে অনেক কালের। এই আশাতেই তো সে আজগার আলির ঘরে যেত। কিন্তু তখন হল না। কালু মণ্ডল নিয়ে চলে এল বিবিজানকে। কালু মাটি নেওয়ায় মোতালেবের আশা পূরণ হল।

তিন

রাতে আচ্ছা মিঞা ভাবল, ভাবি কি দলিল সঙ্গে নিয়ে গেল?

মতিনও তাই ভাবছিল, ভাবি কি দলিল দিয়ে গেল না?

আচ্ছা ডাকল, ও মতিন শোন।

মতিন বলল, আমিও ভাবতিছি তোরে ডাকপো।

দুই ভাইয়ে ভাবতে বসল। বিবিজান কি দলিল তাদের দিয়েছিল! উঁহু, রেজিষ্ট্রি করে আনার পর তো দলিলটা ভাবির কাছেই ছিল। আর তো চেয়ে নেওয়া হয়নি।

চেয়ে নেওয়া হয়নি বোধহয়। কিন্তু বিবিজান যখন কাজ করল মোতালেবের সঙ্গে, তখন তো দলিলটা দিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। জমি লোকে জমিতেই কেনে, কাগজে নয়। কাগজের দরকার না পড়লে খোঁজ হয় না বড়, বিশেষত যাদের জীবন জমির সঙ্গে মাখামাখি।

দুই ভাই কথা বলে না। মতিনের বুকের ভিতরটা ধ্বকি করে উঠল। দলিল কি বিবিজান নিয়ে গেছিল? তাহলে কি সে ভেবেছিল মতিন যাবে দলিল আনতে? মতিনের বুকটা হা হা করে ওঠে। চোখের সামনে গৌরীকন্যা পরির মতো। বিবিজান বিবি ভেসে ওঠে। সে তো জানত মতিন তাকে নিকে করতে চায়। কিন্তু হল না। এমনিতেই হল না। শেষে মোতালেব এসে নিয়ে গেল তাকে। তখন তার না নিয়েও উপায় ছিল না। এই বয়সের মেয়েমানুষ কতদিন একা থাকবে? আর মোতালেব তো খোঁজ রেখেছিল বিবিজানের। তক্কে তক্কে ছিল।

আজগার তালাক না দিলে, সেই ছ'মাস পরে আজগার মাটি নিলে বিবিজান তো মোতালেবের ঘরেই যেত। আজগার মরার আগে কালু মণ্ডল গিয়ে হাজির। অথচ কালু মাটি নেওয়ার পরে মোতালেব এল।

মতিনের মনে পড়ে সামনে যাচ্ছে আশমানি জোব্বা পরা মোতালেব মণ্ডল। দীর্ঘকায় শয়তানের মত পুরুষ। চোখ মুখে ধূর্তামি। সে যেন আর এক কসাই। তার পিছনে ফুলের মতো বিবিজান। কোলে এক বছরের বাচ্চা, যার বাপ কালু মণ্ডল, হাতে ঝুলছে পুঁটুলি। সেই পুঁটুলির ভিতরে কি দলিল ছিল? যার আকর্ষণে মতিন গিয়ে হাজির হবে ভেবেছিল।

বিবিজান ভাবি ক বছর গেল? মতিন জিজ্ঞেস করে।

তা বছর পাঁচ তো হবে, ধর গে, আমার তোর ছাওয়াল দুটোর যত বয়স, তারা তো তখন ন মাস পেটে।

বাহ্! আচ্ছার মাথাটা সত্যিই সাফ। অক্লেশে হিসেব করে ফেলল। দেখতে দেখতে এতদিন

কেটে গেছে! মতিনের মনে হয় হায়দর আলির জুয়ার বোর্ড পাহারা দিয়ে সে বড় ভুলটা করেছে। না হলে তো দলিল খুঁজতে খুঁজতে বিবিজানের ওখানেই হাজির হতে পারত।

মতিন বিড়বিড় করল, জমিতো বেচতি হবে।

বিষণ্ণ আচ্ছা বলল, না বেচলি খাব কি, বেচতিই হবে।

মতিন বলল, তাহলি তো ভাবির কাছে যেতি হয়।

আচ্ছা ঘাড় কাত করল, যেতে তো হবেই।

চার

জীবনপুর কোথায়? না সেই বিদ্যেধরী নদী পার হয়ে দক্ষিণে। বিদ্যেধরীর এপারে হাড়োয়া, ওপারেও হাড়োয়া। যেন দুই যমজ।

হাড়োয়ায় ছিল আজগার আলির বাস। সেখান থেকে অন্তত মাইল আটেক ডাউনে জীবনপুর। নদী পথে যাওয়া যায়, নদী আড়াআড়ি পার হয়ে পায়ে হেঁটেও।

ভোর ভোর দুই যমজ বেরিয়েছে। একরকম মুখ, একরকম চোখ। শুধু মতিনের লুঙির উপরে খাঁকি শার্ট, গায়ে সেই ছেঁড়া ফাটা চাদর। আর আচ্ছার গায়ে কোঁচকানো গোলাপী পাঞ্জাবি, রং তার ধুয়ে গেছে। কাঁধে চেককাটা গামছা। দুই ভাই যাচ্ছে দলিল আনতে। না আনলে এ বছর খরায় শুকিয়ে মরতে হবে।

এই ভোরে যেন কুয়াশা দখল করে ফেলেছে গোটা পৃথিবী। মতিন এগোয় তো আচ্ছা ওকে যেন কুয়াশায় হারিয়ে ফেলে। আচ্ছা তো সর্বক্ষণই মতিনের মনে হারিয়ে আছে। কুয়াশায় মতিন যেন বিবিজানের মুখমণ্ডল ধরার চেষ্টায় আছে। সেই চোখ সেই মুখ যেন হারিয়ে না যায়।

আবছা নীল কুয়াশায় ওরা দুজন ভিজে যায়। সমস্ত দেহ কেমন স্যাঁতসেতে হয়ে যায়! মতিন দেখছিল কুয়াশার নীল আর ধূসরতায় মেশামেশি রং যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠছে। ওরা এসে পৌঁছয় দেবালয়ে। এখান থেকে পিচঢালা রাস্তা সোজা বিদ্যেধরী নদীর গায়ে পীর গোরাচাঁদের মাজারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পথে মতিন একবার জিজ্ঞেস করে, মোতালেব মিঞার ঘর জানিস তো?

মৌজায় গে জিজ্ঞেস করলি হবে।

বাস বন্ধ। ওরা দুই ভাই ভ্যান রিকশায় উঠে বসল। কুয়াশায় সামনেটা পরিষ্কার দেখালেও দু হাত দূরে ধূসর নীল পর্দা। দুই যমজ বোঝে তারা বারে বারে আবছা নীল থেকে নীলচে ধূসরে ঢুকে পড়ছে। জোরে ছুটছে তিন চাকার ভ্যান রিকশা।

মতিন ভাবছিল, কতক্ষণে পৌঁছবে জীবনপুর, বিবিজান খুব অবাক হবে। আচ্ছা ভাবছিল, কতক্ষণে হাতে আসবে সেই দলিল।

দুই যমজ শীতের ঘায়ে কাঁপছিল। কুঁকড়ে যাচ্ছিল দুজনে। কাঁপতে কাঁপতে মনের ভিতর বিবিজান আর দলিলের খেলা খেলতে খেলতে ওরা এসে পৌঁছয় বিদ্যেধরীর কোলে। মতিন মিঞা অবাক হয়ে দেখল এখানে কুয়াশা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। রোদ ছড়িয়ে পড়ছে নদী আর পৃথিবীর উপর। অঘ্রানের প্রথম রোদ যেন গলন্ত সোনা। সোনার জলের পুকুর। তার ভিতরে পাখিরা সাঁতরাচ্ছে অকাতরে।

এখানেই দেরি হয়ে যায়। নৌকো ছিল না। নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করে বেলা বেড়ে ওঠে। তখনই আবার নদীতে জোয়ার ঢুকল। জোয়ারে ডাউনে যাওয়া কষ্ট। মতিন হাঁটতে চেয়েছিল। নদী বাঁধ ধরে হেঁটে, জীবনপুরের ঘাটে পার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না।

নদীপথে, স্রোতের বিরুদ্ধে জীবনপুরে পৌঁছতে সূর্য আকাশের মাথা থেকে নামার উদ্যোগ করেছে। মতিনের বুক কাঁপছিল। সে আর সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। জীবনের অনেকটা সময় হারিয়ে গেছে। জীবনপুরে পা দিয়ে আর দেরি করা নয়। সে কি জানত, বিবিজান দলিল নিয়ে জীবনপুরে এসে তাকে গোপনে এতকাল ধরে ডেকেছে।

নৌকো থেকে নেমে আচ্ছা জিজ্ঞেস করল, ও মতিন ভাত পাওয়া যাবে এখানে?

মতিন যেন সব জানে। যেন মতিনের ঘরে মতিন ফেরে। সে হেসে বলল, কী করে জানব, ওকি আর আমার ঘর?

দুই যমজ একসঙ্গে হাসল। ক্ষিদে চেপে থাকার অভ্যেস আছে দুজনেরই। সকালে পান্তা খেয়ে বেরিয়েছে! সন্ধে অবধি চলে যাবে।

দুপা এগিয়ে দুজনে ধরল এক চাষাকে, 'মোতালেব মিঞার ঘর জান?'

লোকটা কাটা ধান বোঝাই করছিল একা একা। অতবড় নিঃঝুম প্রকৃতিতে তার চারদিকে আর কোনো মানুষ নেই। সে চমকে যায় এদের দেখে। চোখে ভুল দেখছে না তো? একটা মানুষ কি ডবল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

আস্তে আস্তে তার বিস্ময় কাটে। সে বোঝে, না দুজনই দাঁড়িয়ে। দুটোই একরকম, শুধু জামা কাপড়ে যা তফাৎ। সে খুঁটিয়ে ওদের দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কোন মোতালেব?'

কোন মোতালেব? বিপদে পড়ে যায় দুই ভাই। মোতালেবের বাপের নাম তো জানে না। তাহলে কী পরিচয় দেবে?

আচ্ছা বলল, হাড়োয়ায় এক কশাই ছেল, আজগার আলি, তার স্যাঙাৎ।

মতিন বলিল, তেনার বিবি হলো বিবিজান, সেই বিবিজান যে আজগার আলির বিবি ছেল পেথমে, তারপর হয় আমার বড় ভাই কালুর...।

আর পরিচয় দিতে হয় না। লোকটি মাথা দুলোতে লাগল। মাথা দুলোতে দুলোতে মতিনকে থামায়, বুঝতি পেরেছি, এখেন থেকে সিধে হেঁটে যাও, অশথতলা পাবা, তা থেকে বাঁ দিকি ঘোরো, সামনেই মোতালেব মিঞার ভিটে।

দুই ভাই তখন প্রায় দৌড়য় আর কী! নদীকে পিছনে ফেলে দুই ভাই রোদ ছেড়ে ছায়াময়তায় প্রবেশ করে। অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ভীষণ অন্ধকার, যেন গাছের জন্ম ইস্তক এ মাটিতে রোদ পড়েনি।

এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুজনের হঠাৎ যেন শীত লাগল। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। মতিনের বুক টিপটিপ করতে লাগল। সে বুকের বাঁদিকে হাত চাপা দেয়। দুজনে একসঙ্গে দেখতে পেল মাটির ভিটে বাড়িটা।

বড় অগোছালো। উঠোনে খাবলা খাবলা মাটি তোলা। গোবরছড়া কতকাল পড়েনি বোঝা যায় না। চালের খড়ও এলোমেলো। কোণের ক্ষেতে অবহেলায় বোনা মুসুরি আর সর্ষে সবুজে হলুদে একাকার হয়ে পড়ে আছে। উঠোনের একধারে ধানের স্তূপ, তাও যেন বড় এলোমেলো, অস্থির।

আচ্ছা ভাবল, জমি থাকতেও এ লোকটা তার মর্যাদা বোঝে না। তার যদি এমন জমি থাকত, রাখতে পারত যদি জমি, সর্যের রঙের বাহার দেখিয়ে দিত। জমি বেচে বেচে চাষবাস ভুলে যাচ্ছে সে।

আচ্ছা মিঞা হেঁকে উঠল, বিবিজান ভাবি, বিবিজান!

মতিন যেন দম আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা আবার হাঁক দিল, মোতালেব ভাই।

একটা শীর্ণকায় মানুষ তখন মাথায় করে ধানের বোঝা এনে উঠোনে রাখছিল। ওদের আসার ফাঁকে সে ছিল ভিটের পিছনের জমিতে। সে মোতালেব মণ্ডল।

মোতালেব ক্ষেত থেকে উঠোনে আসার পথে দূর থেকে দেখছিল দুটো মানুষ পায়চারি করছে তার সর্যে ক্ষেতের সামনে। সে উঠোনে ধানের বোঝাটা ফেলে গামছা দিয়ে গায়ের খড় ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসে।

আই বাপ! দুজনে যে একরকম! তার মানে? মোতালেব হাঁ করে নিরীক্ষণ করতে থাকে দুই যমজকে।

আর আচ্ছা, মতিন দুজনে দেখছিল, রোগা ডিগডিগে, এ যে দেখি তালপাতার সেপাই। দুটো চোখ কোন গহ্বরে সেঁধিয়ে গেছে। চোখের মণি বোঝা যায়, দেখা যায় না। এই বয়সেই চুল দাড়ি সব পেকে শাদা। একটু বাঁকা বাঁশের মত হয়ে গেছে লোকটা। যখন হেঁটে আসছিল এদিকে ওর বুকের ভিতরের সব কলকজা যেন কাঁপছিল। বুকটা দপদপ করে উঠছে নামছে। হাড়ের উপর চামড়া যেন ফেটে যায় যায়।

কেডা? চিনতে না পেরে মোতালেব ওদের সামনে এসেছে।

দুই যমজ অবাক! সেই মোতালেব! মস্ত চেহারার, প্রায় শয়তানের মত পুরুষ, গায়ে ছিল আশমানি পাঞ্জাবি, সেই মানুষে আর এই মানুষে যে মেলে না একেবারে। দুই যমজে যেমন মিল, দুই মোতালেবে তেমনি অমিল।

চিনতি পারছো, ভাবির আগের পক্ষ কালু মিঞার দুই ভাই মোরা।

আচ্ছা মিঞার কথায় মোতালেব হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে ওঠে। সে বসে পড়ল উঠোনে। গায়ে গামছা জড়ায়। তার চোখমুখে কেমন নিস্পৃহের ভাব। সে জিজ্ঞেস করে, 'তা হঠাৎ, বেপার কী?'

ভাবির কাছে দরকার, মানে এটডা দলিল, ভাবিরে ডাকো দিনি।

মোতালেব আচ্ছা মিঞার কথা কিছু শোনে কিছু শোনে না। মতিন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে, 'তুমার এর'ম চেহারা হলো কী ভাবে মোতালেব ভাই, এক্কেবারে ভেঙে গেছো দেখতিছি।'

মোতালেব অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ম্যালেরিয়া জ্বর ধরেছে সেই বৈশেখ মাস থেকে, বছর ঘুরতি গেল, জ্বর আসে আর ছাড়ে, এই এখন যেন আবার কাঁপুনি আসতেছে, এই রোগেই খেয়েছে আমারে।

মতিন তার গায়ের চাদর ফেলে দিল মোতালেবের গায়ে। চেপে ধরল জীর্ণ-শীর্ণ দেহটিকে। মোতালেব থরথর করছিল।

আচ্ছা বলল, মিঞা ঘরে ঢোক, ক্ষেতে লোক আছে তো?

মতিন বলল, না হয় আমরা দেখতিছি, কোন জমি দেখায় দ্যাও।

মোতালেব আস্তে আস্তে বলল, ভিটের ঠিক পেছনে।

তখন মতিন প্রায় ফিসফিসিয়ে বুক ভার করে বলল, ভাবিরি এটটু ডাকো, পানি খাব, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মোতালেব মাথা নামিয়ে কাঁপছিল জ্বরে। সেই অবস্থাতেই ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, বিবিজানের খোঁজে তো এয়েচো, আরও মানুষ এয়েছিল, তা সে তো নেই।

নেই! মতিন যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

তালাক হয়ে গেছে, ফের নিকে করেছে ও।

মতিন বসে পড়ল। ওর পাশে মোতালেব হাসফাঁস করতে থাকে। আচ্ছা ছুটল মোতালেবের ক্ষেতের দিকে।

মতিন একটু পরে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে হলো তালাক?

তা বছর ঘুরতি চলল পেরায়, গেল বৈশেখে, যবে রোগে ধরল আমারে।

বিবিজানেরে তালাক দে দিলে মোতালেব ভাই! মতিনের কণ্ঠস্বরে হতাশা।

মোতালেব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে বলে, আমি কি দেছি তালাক, বিবির রূপ যেন ফেটি পড়তিল, অমন মেয়েছেলে ঘরে রাখাই দায়, কালু মিঞার এটডা, আর আমার দুটো বাচ্চা লে সে পাটকেলঘাটার মাজারুল হকের কাছে গেছে, হক সায়েব ইমানদার, জমিঅলা মানুষ! তারে নে গেল পেরায়, বিবিজানেরে সে দেখিল হাড়োয়ার মেলায়।

ওরা রাতে থেকে যায়। মোতালেবের ঘরে এখনো নতুন বিবি আসেনি। সব ধূধূ পড়ে আছে। ঘর গেরস্থালি ভাঙাচোরা। শীতে তিনজনে ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়।

সন্ধেবেলা আচ্ছা মিঞা তাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তার কথা শুনে জ্বরো মোতালেব লাফ দিয়ে ওঠে। তাই তো! সে যে দুবিঘা জমি দানপত্র হেবানামা করে দিয়েছিল বিবিজানকে; সেই দলিল কোথায়? বিবি তালাক হয়ে গেলে তো আর সেই বিবিকে জমি দেবে না মোতালেব।

খোঁজ খোঁজ! খুঁজে পাওয়া যায় না দলিল। গাভর্তি জ্বর নিয়ে মোতালেব বাক্স পেঁটরা উপুড় করে দেয়। দলিল নেই।

তখন মতিন বলে, লে গেছে বিবিজান, দলিল আনতি হয়ত তুমি যাবা, তাই ভেবেছলো।

মোতালেব মুখ ঢেকে বসে থাকে, কোনরকমে বলে, হবে হয়ত, জ্বরের কাঁপুনিতি মাথার ঠিক ছেল না আমার!

পাঁচ

রাতে দুই যমজে ঠিক করল পাটকেলঘাটা যেতে হবে। তখন জ্বরো মোতালেবও ধরে বসল ওদের, আমারেও নে যেতি হবে।

কিন্তু তুমার যে ধূম জ্বর! আচ্ছা বলল।

সহালে থাকপে না।

রাতে মতিনের দুচোখের পাতা এক হয় না। সে ভাবছিল গত চৈত্র বা বৈশাখে আসতে পারলে সে নিয়ে যেতে পারত বিবিজানকে। এখন যেতে হবে মাজারুল হকের ওখানে। আরো অপেক্ষার দিন এল।

শেষ রাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মোতালেবের। সকালে গা ঠাণ্ডা। সে ঘরে তালা দিয়ে সঙ্গ নিল দুই যমজের। দুর্বল শরীরে টলেমলে হাঁটে। যেতে যেতে মোতালেব বলল, বিবিজানের যেন মন বসে না কারো ঘরে।

আচ্ছা মিঞা ভাবে দলিলটা পেয়ে কবে জমি বিক্রি করে দেবে! মাটি তাদের কপালে নেই। আজ কিনলে কাল বেচতে হয়। বড়মানুষে কিনে নেয়।

মতিন জিজ্ঞেস করল, পাটকেলঘাটা পৌঁছতি কি সূয্যি ডুবে যাবে?

মোতালেব ঘাড় কাত করল, 'জে, সে তো অনেক দূর, যখন পৌঁছব, বেলা আর থাকপে না।'

হাঁটতে হাঁটতে মোতালেব মণ্ডল হঠাৎ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, হাঁ গো, তুমাদ্দের কোনডা কেডা?

মানে? মতিন দাঁড়িয়েছে।

আচ্ছা মিঞা কেডা?

আচ্ছা সরে এসে বুকে হাত দিয়ে বলে, এই আমি।

তুমার কথা খুব বলত বিবিজান।

মতিনের বুক একা একা ভেঙে যায়। মাথাটা ঝুলে পড়ে। এ কী বলছে মোতালেব মিঞা! সত্যি! বিবিজান কি জানত তাদের কোনটা আচ্ছা কোনটা মতিন? তাকেই তো ভুল করে ক'দিন আচ্ছা বলে ডেকেছিল না! সে বিষণ্ণ হয়ে হাঁটতে থাকে, চোখমুখ কালো হয়ে গেছে। পা যেন আর এগোতে চাইছে না পাটকেলঘাটার দিকে।

তিন মানুষে হাঁটছে। দুই পাশে দুই যমজ আর মধ্যিখানে হাড়জিরে মোতালেব। বিবিজানের ঘর আর কতদূর? তার কাছে যে গচ্ছিত রয়েছে নানা মানুষজনের ভাতকাপড়, দিবাস্বপন। চাষার জমি চাষার হৃদয়। সেই খোঁজে দুজন থেকে তিনজন, তিন থেকে চার, এমনি করে গাঁ উজাড় পাড়ি।

(প্রতিক্ষণ—১৯৮৫)

দুই নারী

তাদের নামার কথা ছিল থানা টাউনে। টাউন মানে ওই রকম, দোকান বাজার থানা পুলিশ অফিস কাছারি লোকলস্করে রমরমা। একজন আসছে দামোদর পেরিয়ে বল্লভপুর, রানিগঞ্জ থেকে, অন্যজন দামোদরের এপারের গাঁ থেকে। তারা দুইজন, সুন্দরী দাসী আর অন্নদারানি, দুই বুড়ি, একজন থুত্থুড়ি, অন্যজন সবে বুড়ি।

সবে বুড়ি অন্নদারানির ঘরে স্বামী আছে, কিন্তু বিছানায় শুয়ে। পুত্র বিদেশবিভুঁয়ে কাজের খোঁজে গিয়ে আর ফেরেনি। স্বামী এখন খুব বুড়ো থুত্থুড়ো. কিন্তু যেহেতু একদিন তাকে উদ্ধার করেছিল, সংসার পেতেছিল তাকে নিয়ে তাই মনে মনে কৃতজ্ঞতা তো আছেই, ছিটেফোঁটা ভালবাসাও যে নেই তা নয়। বুড়ো এখন প্রায় মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে আছে ঘরের কোণে। তার মুখে ভাত দিতে হবে তো। সে হল অন্নদারানি, অন্নহীন রাখে কী করে সংসারকে? খুব বুড়ি সুন্দরীদাসীর অঙ্গে এখন থান কাপড়, আধময়লা ফুটোফাটা, সেলাই-এর উপর সেলাই করা। স্বামী গেছে কোন সকালে, পুত্র গেছে এই বিকেলে, রোগে ভুগে তিনটি বাচ্চা আর জোয়ান বউ ঘরে রেখে। তারা দুজন মেজিয়া থেকে আসছিল ন'পাহাড়ি। কিন্তু ঝিমুনির ঘোরে কখন যে ন'পাহাড়ি পার হয়ে আটমাইল দূরে পাহাড়ের কোলে এই মটুকবনিতে এসে পৌঁছেছে তা খেয়াল হয়নি। কন্ডাক্টরই খেয়াল করে নামিয়ে দিয়েছে বিনাভাড়ার এই দুই বুড়িকে। ন'পাহাড়ি কেউ চেনে না, তবু ঝিমুনির ফাঁকেই কম বুড়ি অন্নদারানির সন্দেহ হয়েছিল। তার গায়ে রাঙা জনতা শাড়ি হাতে ময়লা শাঁখা লাল প্লাস্টিকের রুলি, তুলনায় সে শক্তি ধরে বেশি, ধাক্কা দিয়েছিল সুন্দরীদাসীকে, ও বুড়ি ওঠ, এস্যা গেছি মনা হয়।

বুড়ি সুন্দরীদাসী প্রায় ঘুমন্ত চোখ খুলে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের জ্বলন্ত পৃথিবী দেখে চোখ বন্ধ করতে করতে বলেছিল, কী রোদ উঠছ্যা গো!

সত্যি। রোদ উঠেছে বটে। এই নিঝুম পাহাড়ের কোলেই বা কী রোদ! যেন কাচের গা, বালি চিক চিক নদীর বুক। আর হাওয়া! তা যেন যজ্ঞিবাড়ির উনুনশালের তাপ। শুধু মন নয় সমস্ত দেহ যেন ভেপে ওঠে। বাসের মধ্যে ঝিমুনির ঘোরে রোদের আঁচ বুঝে অন্নদারানির মনে পড়েছিল নিজের বিয়ের ভোজের কথা, খাসিমাংসের স্মৃতি। মাংসমাখা ভাত পাকা তেঁতুল তুল্য। মনে করলেই জিভে জল আসে। সেই একবারই যেন খাওয়া হয়েছিল এ জীবনে, সেই স্মৃতি এখন রোদে ঝলসে কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। ঘরে পঙ্গু, প্রায় মাংসপিণ্ড হয়ে যাওয়া বুড়োস্বামী, বাইরে আগুন,—তার ভিতরটা শুধু জ্বলে। কে জানে কার বিয়ে হয়েছিল কবে? কোন জন্মে ভোজ হয়েছিল এ সংসারে।

জানালা বন্ধ বাসের ভিতরটা ছিল কেমন আলো আঁধারি, দুই বুড়ি কুঁকড়ে বসেছিল বাসের এক কোণে, অনেক মানুষের পায়ের ধুলোর ওপর। তাদের ঝিমুনি আর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল

অনেক পরে কন্ডাক্টরের হাঁকডাকে। বাস এই মটুকবনির পাহাড়ের ধারে দুজনকে নামিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল পুরুলিয়ার পথে।

বুঝল প্রথমে সুন্দরীদাসীই, 'ইতো ন'পাহাড়ি নয়গো।'

হুঁ! অন্নদারানি চিন্তিত।

মুর না হয় মাথা খারাপ, হাঁ করত্যা না কর্যা বসি, তা তুই কী করছিলি গো, ও সধবা বুড়ি, তুর ও কি দিক ঠিক নাই?

অন্নদারানি জবাব দিল না, রোদে দাঁড়াতে পারছিল না কেউ। সুন্দরী দাসীর ঘামাচিভরা গা চিড়বিড়িয়ে উঠছে। দুজনে বসল এক আকাশমণির ছায়ায় ধুলোর উপরে, পা মেলিয়ে। এদিকে অফিস কাছারি, লোকজন, দোকানপাট নেই। হতভম্ভ হয়ে গেছে দুজনেই। সামনে পাহাড় পিছনে পাহাড়, যেখানে নেমেছে সেও বোধ হয় পাহাড়েরই গা, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল।

যমপুরীতে নিয়ে এলি নাকি ও বউ। বিড় বিড় করে সুন্দরীদাসী। রাঙাশাড়ি শাঁখাসিঁদুরে সবে বুড়ি অন্নদা তখন মাথার ঘোমটা ঘাড়ে ফেলে মাথার উকুন চুলকোয় থাবা মেরে, খালভরা বাসউলা উ কেনে ইখানে নামালো গো, মর মর।

তাপে মাথার উকুনগুলো চঞ্চল হয়েছে খুব। অন্নদারানি অপরিসীম ক্রোধে মাথায় ভিতরে আঙুল চালায়, দীর্ঘ দিন তেল না দেওয়া রুখু চুল বেঁধেছিল সরুপাড় দিয়ে, তা মুহূর্তে খুলে ফেলায় হাওয়ায় চুল ওড়ে, উড়ে যেত চায় যেন মাথা ছাড়িয়ে শুকনো পাতার মত।

ইখন কী উপায়? বিড়বিড় করল থান পরা। উপায় নেই, থমথমে রোদজ্বলা কালো সাপের মত পথ, নিঝুম জঙ্গলপাহাড়ী পথ বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে পশ্চিম ঘেঁষে উত্তরে, ওই দিকেই পুরুলিয়া।

গ্রামখানি খুব বড় নয়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কিছু ঘর বাড়ি, শুকনো ক্ষেত, ফসল শূন্য ধুধু। এই রৌদ্রবেলা বড় নিঃঝুম, কেউ নেই কোথাও, এই বাস স্টপেজে একটা পান সিগারেটের গুমটি অর্ধেক খোলা হয়ে ঝিমোচ্ছে, আর একটা চা তেলে ভাজার দোকানে ফোলা পায়ের এক বুড়ো আধখোলা চোখে কাত হয়ে আছে। কালিপড়া কেটলি, নিভোন উনুন সব যেন ঘুমোচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দুই বুড়ি একে একে সব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে হতাশ ও নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশমণির ছায়ায় পাকাপোক্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এ জায়গায় ভাত কাপড়ের জোগাড় হবে না ঠিক, ভিখ মাগলেও কেউ কিছু দেবে না এও নিশ্চিত। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এও এক ভিখমাগা গ্রাম।

বেলা কত হল? সুন্দরী দাসী জিজ্ঞেস করল।

আকাশে তাকায় অন্নদা, বারটা হব্যা, সুয্যি মাথায়।

তার কম হবেনি?

উঁহু। আন্নদা ঘাড় নাড়ে। নিশ্চিন্ত হল আবার থান পরা বুড়ি। এক পরম নির্লিপ্তি তার চোখে মুখে ঘনিয়ে এল। অনেককালের পুরোন অভ্যাসে বুড়ি বুকের কাপড় ফেলে দিল। মুহূর্তে চোখের মণি চঞ্চল হয়ে দেখে নিল অবশ্য, কেউ কোথাও আছে কিনা। তার এই বুকের কাপড় ফেলার ভঙ্গিটি অনেক প্রাচীন, তা সে নিজে জানে। এখনো খোলা জায়গায় আলগা হতে বুক ছম ছম করে।

ঘামে সমস্ত দেহটি ভিজে। রোদ ঘাম উত্তাপ সব মিলে মিশে পুরনো দেহটিকে যেন শুইয়ে ফেলতে চাচ্ছে ধুলোয় ধুলোয়। এ রোদ বড় দুষমন, শুধু শুতে ইচ্ছে করে, তারপরেই ঘুম। থানপরা বিড়বিড় করে, ওলো বারটার পর আর কত হল? রাঙা শাড়ির অন্নদারানি আবার আকাশ দেখল, সাড়ে বারটা হব্যা।

তার মানে কটা বাজত্যা কটা?

তিরিশ মিনিট হইছে, আর তিরিশ মিনিট আছে একটা বাজত্যা।

কেন? সুন্দরী বুকে হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করে।

ষাট মিনিটে ঘণ্টা হয়।

কে বুলেছে?

অন্নদা এই প্রশ্নে থমকে যায়। মাথার উকুন মারা থামায়। একটু অপ্রতিভ হয়, বলতে যেন ওর সরম লাগে, কালো মুখে কয়েক পলের জন্য লালচে ভাব জেগে ওঠে, সে মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে, সে লোক বুলেছে।

কোন লোক?

বুঝো না! ফোকলা গালে হাসে সুন্দরীদাসী, ভুলিই গিঁইছি তুর সি মরদ ইখনো চিতায় উঠেনি।

তড়িতাহত হল যেন অন্নদা। কেঁপে উঠল ভিতরে ভিতরে। এবুড়ি কি জানে, সে লোক চিতায় উঠব উঠব করছে? একেবারে বসে গেছে, যাকে বলে পড়ুটে। কোনরকমে ঘষটে ঘষটে ঘর থেকে ভাঙা দাওয়ায় আসতে পারে এই পর্যন্ত। চোখে ভাষা নেই, মাথা বিকল, শুধু প্রাণবায়ুটি আছে বলে তার এই শাঁখা শাড়ি রয়েছে।

সোয়ামি নিয়ে খুব আহ্লাদ করিস, না? জিজ্ঞেস করেছে সুন্দরীদাসী।

আহ্লাদ! মাথা কাত করল অন্নদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। আহ্লাদ তো বটেই। হঠাৎ মুখটা কালো হয়ে যায় অন্নদার। কালো মুখ হাতে আড়াল করে সে।

বুড়াবয়সে বুড়োমরদে কী করে ওলো গরবিনী?

নিজিরটা থাকলে বুঝতিস! হিসহিসিয়ে জবাব দেয় অন্নদারানি।

সুন্দরী শুনল কিনা বোঝা যায় না, হয়ত শুনেও না শোনার ভান করে সে চেয়ে আছে মটুকবনির পাহাড়ের দিকে। পাহাড়কে হঠাৎ হঠাৎ মেঘ বলে ভ্রম হয়। উহ! কত কাল যে বৃষ্টি হয়নি এই পাথরের দেশে। দুই বুড়ির মুখ চেনা হয়ে গেছে আজই, মেজিয়ার নদীঘাটে। দামোদরের এপারে মেজিয়া, জেলা বাঁকুড়া, ওপারে বল্লভপুর রানিগঞ্জ, বর্ধমানের মধ্যে পড়ে। সুন্দরী দাসী আসছিল ওপার থেকে এপারে নদী পেরিয়ে। অন্নদারানি যাচ্ছিল এপার থেকে ওপারে, রানিগঞ্জ রেল স্টেশনে। দেখা হয়েছিল নদীমধ্যে, নদীতো এখন শুকনো ধুধু, হেঁটে পার হয় সর্বজনে। এ গেছে নদীর এপারের অর্ধেক, ও এসেছে নদীর ওপারের অর্ধেক।

রাঙা শাড়ির অন্নদারানি শুধিয়েছিল, ওবুড়ি মু যাব অন্ডাল, তা টিরেন আছে না গেছে? থান পরা সুন্দরী জবাব দিয়েছিল, টিরেন তো এই ছাড়ি গেল। আবার দুঘণ্টা বাদে, হাঁ লো নদীঘাট কী ওই দিশা যায়, মেজিয়া কদ্দূর?

নদী মধ্যে দাঁড়িয়ে সধবা বুড়ি বলেছিল, নদীঘাট থিকে মাইলটাক, কিন্তু টিরেন সত্যি চলি গেল?

না বিশ্বাস হয় তো যা দেখি আয়।

তখন সধবা অন্নদারানি আর এগোয়নি। ঘুরে আবার ফিরতে লেগেছিল ট্রেন যখন দু'ঘন্টা বাদে তখন ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে হয়। অন্ডালে সে কেন যাচ্ছিল তা জানে না, কিন্তু যেতে কোথাও হবে তাই ঘর ছেড়ে বেরোন। ঘরে কারো ভাত জোটে না, না তার, না বুড়োর মুখে কিছু তো ধরতে হবে তাই ঘর ছেড়ে বেরোন। কোথাও না কোথাও, কিছু না কিছুর সন্ধানে বেরোন। সে ঘুরে এসে নদীঘাটে মস্ত এক অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় গালে হাত দিয়ে বসেছিল, আর একটু আগে ঘর থেকে বেরোতে পারলেই অন্ডালে যাওয়া যেত। অন্ডালে গেলে হয়ত ভাত কাপড়ের সুরাহা হত। সুরাহা হতই, হত বলেই না সে পৌছনোর আগে ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

থানপরা বুড়িও তার পিছুপিছু এপারে এসে উঠেছিল, তার পাশে গুটিগুটি বসেও ছিল। সামনে নদী হাহা, বালি উড়ানে ঘূর্ণী হচ্ছে হাওয়ায়। থানপরা সুন্দরী তার কাঁধে হাত দিয়েছিল, অন্ডাল কেনে, ঘর কুথায়? বিষণ্ণ অন্নদদারানী চকিতে ঘুরেছিল তার দিকে, আপাদমস্তক দেখেছিল বিধবা বুড়িকে। তারপর ফিসফিস করেছিল, ভাত কাপড়ের জুগাড়ে।

চেনাজানা আছে কেউ?

না! মাথা দুলিয়েছিল অন্নদা প্রায় অশ্বত্থের পাতার মত। চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছিল, চেনাজানা! তার চেনাজানা কোথায়? অনেককাল কেউ তার কোনও খোঁজ করে না। বাপের ঘর নিশ্চিহ্ন প্রায়, মা বাপ স্বর্গে গেছে বহুকাল। দুটো ভাই ভিটে বাস্তু বেচে চিনাকুড়ি কয়লা খনিতে সেই যে কাজ করতে গেল আর আসে না।

থানপরা বুড়ি বলেছিল, নদীর ওপারে কাম কাজ নেই তো ভাত কাপড়ের জুগাড় হব্যা কী কর্যা, বল্লভপুর কাগজ কল বন্ধ, অন্ডালে তিন ফ্যাকটিরি বন্ধ, কে পয়সা দিবে, যাও কুথায়?

শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছিল সধবা বুড়ি, তবে যাই কুথায়?

বিধবা তখন নিঃঝুম, তাকিয়েছিল নদীর দিকে। এই খরার দিনে নদীর ও সাজ বিধবার, রঙ নেই, প্রাণ আছে বলে মনে হয় না।

এবার অন্নদারানি জিজ্ঞেস করেছিল, তা তুমি যাও কুথায়?

ইপারে, গাঁয়ে যাব, মেজিয়া গাঁ।

কার ঘরে, কুটুম আছে?

উ হুঁ! মাথা নেড়েছিল বিধবা বুড়ি, বলেছিল, যাব ভাত কাপড়ের জুগাড়ে।

ইপারে কুথায় ভাত কাপড়, মোরে দিখছ নাই!

কোনে, ইপারে গেরস্ত ঘর নাই, উপোসী বেধবারে দিবে না কিছু?

উপোসী বেধবা! খরায় পুড়ছ্যা সব, কতকাল বিষ্টি নাই, সব উপোসী হঁই গিইছে, ইপারে ভাত কাপড় কুথায়?

ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়েছিল তখন থানপরা বুড়ি, তবে যাই কুথায়?

দুজনে একসঙ্গেই যেন উচ্চারণ করেছিল 'তবে যাই কুথায়'। একজন মনে একজন মুখে। সধবা অন্নদারানি বিধবার চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, কেননা বিধবা তখন নিজের দৃষ্টি স্থির করেছিল সধবার সিঁথির দিকে। অবশেষে সে দৃষ্টিও সরল কিছুক্ষণের জন্য।

দুজনে বসল পরামর্শে। একজন যাচ্ছিল অন্ডাল, একজন আসছিল মেজিয়া। কেউ অন্ডালও গেল না। কেউ মেজিয়াতেও নয়।

নদী ঘাট থেকে ভিখ মাগা মানুষের মতো বাসে উঠল দুজনে। বসল ধুলোর উপরে এক কোণে। কন্ডাক্টর বড় সদয়, তারা তার পা ধরতে ভাড়াটাও ছেড়ে দিল। কিন্তু যেখানে যাবে মনস্থ করে উঠেছিল দুইজন, সেই ন'পাহাড়ি থানা টাউনে, সেখানেও যাওয়া হল না। নামল এসে এই পাহাড়ের ধারে মটুকবনিতে। নদীর ধারে বসেই একে অপরের হাঁড়ির খবর জেনে নিয়েছে যতটা পারে।

অন্নদারানি হা হা রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে সুন্দরীদাসীকে থাবা মারার চেষ্টা করে, হাঁ লো তুর ঘরে তাহলে দুটা সোয়ামী খাকী! বলে জিভ বার করে শুকনো ঠোঁটে বুলিয়ে নেয়, দুটারে চিতায় তুল্যাছিস? সুন্দরীদাসীর তামাটে মুখে মুহূর্তে কিসের যেন ছায়া জড়িয়ে যায়। ছায়া সরতেই চোখ জ্বলে ওঠে। সে মাথা হেলায়, ঘর্মাক্ত বুকে জোরে জোরে ফুঁ দেয়, এমন ভাবে ফুঁ দেয় যেন চুলো জ্বালাচ্ছে, উসকে দিচ্ছে নিভু নিভু আগুন।

ঘরে খাবার লোক কটা? অন্নদারানি উকুন মারতে মারতে আবার জিজ্ঞস করে। হাতের পাঁচ আঙুল দেখায় বিধবাবুড়ি। ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচটা

বউটা ভাতার খেল? ফটাস করে উকুন মারে অন্নদারানি।

মু ও তো পুতও খেলাম। হিসহিস করে জবাব দেয় সুন্দরী।

তু কবে খেলি নিজির ভাতার? আবার জিভের ছুরি ঠোঁটে ঘষে অন্নদা।

সে অনেককাল, গতর থাকতেই। বলে মুখ ঘোরায় বিধবা।

তবে আর কেনে? বলতে বলতে অন্নদারানি তার ময়লা শাঁখা, লালরুলি সমেত হাতটি যেন সুন্দরীর সামনে সাপের ফণার মত ঘোরায়। বুড়ি বিধবা সুন্দরীদাসী হাঁ করে সেই হাত দেখতে থাকে। বুক ধকধক করে তার। চোখে জ্বালা। দুটো দিন গমের ঘাটো দিয়ে কোনো রকমে আধাপেট ভরিয়েছে ঘরের প্রাণীগুলির। আজ সকালে বেরিয়ে এখন বেলা হাঁই হাঁই। ঘরে তিনটে নাড়ির ধন নেতিয়ে আছে, আর ওই সোয়ামী খাকী পুতের বউ জ্বরে কোঁকাচ্ছে। সে গায়ের ঘামাচি জোরে খুঁটে দেয়, তারপর জিভ বার করে সাপের মত।

হাঁ লো, উ বুড়া সোয়ামী লিয়ে করবি কি?

অন্নদারানি জবাব দেয় না।

মোর তবু পুত ছিল, এখন সে নাই তো নাতিনাতনি আছে, ঘাটের মড়া কেউ নাই।

অন্নদারানির মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ ভারি ঠেকে। নিঃঝুম দুপুরে পাথুরে নৈঃশব্দের ভিতরে অন্নদারানি নিজের চোখের জল গড়ানর শব্দ শুনতে পায় যেন। আর সুন্দরীদাসী বসে তার বুকের ঘাম বুড়ো আঙুলের ধার দিয়ে প্রায় কোদাল চাঁচার মত চেঁচে দেয় ধুলোর উপরে। কেউ কারোর মুখ দ্যাখে না অনেকক্ষণ, তারপর বিধবা বুড়িই বলল, চল উঠি।

কুথাকে যাব্যা!

ভিখ মাগব। জবাব দেয় সুন্দরী।

মরণ! হাসে অন্নদারানি, ভিখ মাগত্যা যাব কেনে?

তবে?

তবে কি! রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল সধবা। বেলা হাঁই, হাঁই দুপুর হল। ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন, সব শিখিয়েছিল ওই লোকটা। এখন তার নিজের মাথার কল বিকল, চিনতে পারে না, মনে রাখতে পারে না। একা ঘরে বসে খাবো খাবো করছে।

অনেককাল বিষ্টি হয়নি, না! আবার মুখ খুলেছে বিধবা।

হাঁ, দামোদরে শুধু বালি, পথে শুধু রোদ আর ঘুন্নী বাতাস।

তুর সোয়ামী তা জানে?

চমকে যায় অন্নদারানি। রোদে পোড়া মুখ থমথম করতে লাগল। বুক যেন পাহাড় হয়ে গেল, এমনি তার ভার। সত্যি! সোয়ামী বুড়োটা কি তা জানে? কতকাল, কতযুগ যেন বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি হয়নি বলে পথেঘাটে লোক নেই, নদীর এপারে ওপারে কাজ নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই। মানুষজন সব পথের কুকুরের মত ঝিমোচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। মাঠ ঘাট সব তার ফাটা পায়ের পাতার মত হয়ে গেছে। ময়লা উড়ছে ধুলো ঢুকছে, হাঁটতে গেলে যন্ত্রণা হচ্ছে। তাতা পাথুরে মাটিতে রাখা যায়না পা। এতসব খবর কি তার পড়ুটে স্বামী জানে? জানে কি ক'দিন আগে মেজিয়ার পাহাড়ে পাতায় পাতায় ঘষে আগুন লেগে গিয়েছিল, সে আগুন এখনো জ্বলছে। বুড়ো কি জানে তার অন্নদারানি ঘর ছেড়ে অন্নের জোগাড়ে বেরিয়েছে। বেরিয়ে অন্ডালে যাবে বলে এই মটুকবনির পাহাড়ের কোলে এক বিধবার পাশে বসে আছে, যার স্বামী পুত্র নেই বটে, নাতিনাতনি নিয়ে সংসার আছে। ও বুড়ো কিচ্ছু জানে না। ঘরের কুটুরিতে অন্ধকার, সেখানেই শুয়ে বসে থাকে। জগতের কোন খোঁজ রাখে না, শুধু মুখের কাছে এটা ওটা ধরলে জিভ বার করে দেয়।

অন্নদারানি বলল, না সে কোনও খপর রাখে না।

সুন্দরীদাসী চমকে গেল হঠাৎ। কী জিজ্ঞেস করেছিল তাও ভুলে গেছে এতক্ষণে, শুধু বলল, কে জানে না?

জবাব দিল না অন্নদা। দুজনে আবার চুপচাপ পথের দিকে চেয়ে। বাস গেছে মধুকুণ্ডা হয়ে পুরুলিয়া, কখন ফিরবে তাও জানা নেই।

একটু বাদে অন্নদারানি জিজ্ঞেস করে, বেটা কবে মরল?

মুখ থমথম করে সুন্দরীর, মাথাটা হঠাৎ ফাকা হয়ে যাচ্ছে, খরার মাঠের মত, সে বিড় বিড় করে, কি বললি, ষাটঘণ্টায় ..., হিসেব কর দেখি।

তুর কী মাথা খারাপ হলো?

মলিন হাসল বিধবা, মাথা যে তার খারাপ হচ্ছে দিনদিন তা সে নিজে বুঝতে পারে। স্বামী পুত্র মরলে কার মাথার ঠিক থাকে। আর তারা মরলেও যাদের রেখে গেছে তাদের নিয়েও বুক বাঁধা যায়, কিন্তু বাঁধবে কী করে, দড়াদড়ি কিছুই নেই। না আছে সম্পত্তি না আছে কিছু। বিষ পুঁটুলির মত তিনটে বংশের প্রদীপ ছিঁড়ে খাচ্ছে সর্বক্ষণ, ছেলের বউ মুখ ভার ক'রে চোখের জল ফেলছে দিনরাত। যেন সব দায় তার, এই বুঁড়ির।

ভাত কাপড়ের জুগাড় হব্যা? অন্নদারানি ফিসফিস করে।

কী জানি। সুন্দরীদাসী মাথা দোলায়।

তুর ঘরে তবু কথাবার্ত্তা আছে, লাতিপুতি....।

ঘাড় কাত, মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে বিধবা। কথাবার্তা আছে বটে তার ঘরে, কিন্তু সে কেমন কথা তা যদি জানত। ওই কথাবার্তার হাত থেকে রেহাই নেওয়ার জন্যেই তো পথে বেরোন, ধুলোর ভিতরে বসা, যদি ঘেঁটেঘুটে দুআনি এক আনি জুটে যায়।

সোয়ামী খেয়েছে সকালে?

ঘাড় কাত করে অন্নদারানি, মুখে-কিছু বলে না। খাওয়াবে কী, আছে কিছু? ওই খাওয়াবার ভয়েই তো ঘর থেকে বেরিয়ে আসা। ইদানীং ওই বুড়োর সামনে দাঁড়াতেও তার ভয় করে। চিলচিৎকার শুনলে গা ছমছম করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মায়াও হয়, রাগও হয়।

জল আছে ইখেনে? সুন্দরী আবার জিজ্ঞেস করল।

আছে কুথাও। বিড়বিড় করল অন্নদারানি।

মোর কাছে মুড়ি আছে, মুড়ি।

তাই! চঞ্চল হয়ে উঠেছে অন্নদারানি, উ থলিতি আছে?

রসো, ঘর থিকে বার হবার সময় বড় নাতিটা বাঁধি দিল।

তুর সুখির সংসার। ফিসফিস করল অন্নদারানি।

সুখের সংসার। ফোকলাগালে মলিন মুখে হাসল বিধবা। লুকিয়ে মুড়িগুলোকে নিয়ে বেরোতে হয়েছে। বিষ পুঁটুলির মত শয়তান নাতি-নাতনিগুলো দেখতে পেলে কেড়ে খেয়ে নিত।

অন্নদারানি বলে, মোর কাছে দুটো টাকা আছে।

টাকা! বিস্মিত হয় সুন্দরীদাসী।

হাঁ, বেরুবার সময় সে লোক আঁচলে বাঁধি দিল। বিড়বিড় করল অন্নদা।

আহা কী সুখের সোয়ামী সংসার, বুড়া হলেও ইসব মনে থাকে তার!

কথাগুলো শুনল অন্নদা। মুখে কিছু বলল না। মুখ অন্ধকার। কী সুখের ঘর তার! এ দু টাকা শেষ সম্বল, নিয়ে বেরিয়ে না পড়লে ওই বুড়োর পেটে আজই চলে যেত। অন্নদারানি তাকিয়ে থাকে নাতি নাতনির ভরা সংসারের বিধবা সুন্দরীদাসীর দিকে। সুন্দরীদাসীও তাকে দেখছে। দুজনে একে অপরকে দেখতে দেখতে ঝিমোয়। এদিকে রোদ্দুরের তেজও কমছে একটু একটু করে। তবে কিনা এ বেলা হলো পাহাড় প্রমাণ, এ বেলা শেষ হতে অনেক কাল বাকি।

ঝিমোতে ঝিমোতে সুন্দরী দাসী জিজ্ঞেস করে, জল কুথায় যে মুড়ি খাবি?

অন্নদা বলল, চল, পখর দেখি, গা ডুবাতে হব্যা, ক্ষুধাও হইছে খুব।

যাবি। চোখ চকচক করে ওঠে থানপরার। দুই বুড়ি উঠল। উঠে হাঁটল। তাতা পিচ রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে ঝোপের ভিতরে রাস্তা দেখল দুজনে। সেই রাস্তা দিয়ে একের পিছনে অন্য, বিধবার পিছনে সধবা যায় যেন তীর্থ যাত্রীর মতো, ঘর্মাক্ত দেহে টলতে টলতে, ঝুঁকতে ঝুঁকতে। এগিয়ে কিছুটা গিয়েই দ্যাখে, হ্যাঁ, বড় জোড়, জলাশয়। রোদে গলন্ত রূপার মত, দুই বুড়ির চোখের মণির মত জল চকচক করে। দুজনে জোড়ের ধারে দাঁড়িয়ে বলল, সিনান করব।

একসঙ্গেই বলল তারা। সারাদিনের অসহ্য তাপে পোড়া ধুলোময়লায় ভরা দেহ তড়াগের জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। আহ, একই সঙ্গে যদি সব ধুয়ে ফেলা যেত, সব, দুঃখ, কষ্ট বেদনা!

থানপরা ভাবল সত্যি বুড়ো স্বামী নিয়ে ও কত সুখে আছে, লাল পেড়ে শাড়ি পরা ভাবল, নাতি নাতনি ভরা সংসারের স্বাদই আলাদা।

সুন্দরীদাসী বলল, কাপড় ভিজাব না।

না, এখানে থাকুক, জনমনিষ্যি তো কেউ নাই।

দুজনে ঝাঁপালো অভ্রনীল জলে, ঝাঁপালো অতি সতর্কতায়, চারদিক দেখে কুমারী মেয়ের ত্রস্তসুখে। জলের আড়ালে গিয়ে নিশ্চিন্ত হল। অন্নদা বলল, ঠাণ্ডা।

সুন্দরীদাসী জলে ডুব দিল। আহ্ এমন ঠাণ্ডা জলে তারা কতকাল গা ডোবায়নি। জলে খেলতে খেলতে অন্নদা বলল, হাঁ লো, মুড়ি দিবি তো মোরে?

হাঁ দিব, তুর টাকায় চা মিষ্টি খাওয়া হব্যা তো?

হাঁ হব্যা।

তারপর ওঠার সময় হয়। প্রাচীন দেউলের মত দুটি ভাঙাচোরা নগ্নশরীর জলসিক্ত অবস্থায় উঠে এল জলের উপরে। জল থেকে পাড়ে উঠতেই হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল দুজনে। কিসের যেন শব্দ হয়, কে যেন আসে! শুকনো পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুই রমণী সতর্ক হলো, তারপরেই পড়িমরি করে ছুটল দুজনে খোলা কাপড়ের দিকে।

আশ্চর্য! কেউ এল না। তখন বেলা শেষের বাতাস আরম্ভ হয়েছিল। গাছেদের ঘুম ভাঙছিল। দুপুরের ঘুম, রৌদ্রের ঘুম, আলস্যের ঘুম আগুনের হাত থেকে বাঁচার ঘুম। সেই শব্দ বয়ে যাচ্ছিল চারদিকে। তা বুঝতে পেরেই খিক খিক করে হেসে উঠেছে সুন্দরীদাসী, একী! একী হলো, ওলো অন্নদা?

নিজের দিকে তাকায় সচকিতা অন্নদারানি, তাই তো! এ কী!

কাপড় বদল হয়ে গেছে। সুন্দরীদাসীর অঙ্গে উঠেছে রাঙা শাড়ি, আর অন্নদার গায়ে থান কাপড়। দুজনে নিঃঝুম। থর থর করে কাঁপছে। সত্যি, কেমন হল? আপনা আপনি হল, নাকি এমনই হবে তাই ভেবেছিল দুজনে। দুজনে একসঙ্গে পা ফেলল পথের দিকে। তখন আলো মরছিল, পাহাড়ের ছায়া ঢেকে দিচ্ছিল বিশ্বভুবন।

(সানন্দা—১৯৮৭)

ভুলো মৌমাছি

বিয়ের দেড়বছরের মাথায় আমার মেয়ে হয়, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম সেই সময়, বলতে গেলে কী একদম রেডি ছিলাম না আমি।

দুর্গাদাসের কথায় পঞ্চাশোর্ধ সীতাংশু হাসলেন কিনা বোঝা গেল না, তবে একটু অন্যমনস্ক হলেন যেন। সীতাংশু হাসেন কম, হাসলেও সে হাসিতে কোনো শব্দ থাকে না, বোবার হাসিতেও যা থাকে। সীতাংশুর এ অভ্যেস গত তিরিশবছরের, যখন থেকে নিজের জন্যভাবা শুরু, সেই তখনকার। কমদিন হল! এর মধ্যে কত মুখ্যমন্ত্রী কত প্রধানমন্ত্রী বদল হল, এখানে আর ওখানে, মানে দিল্লিতে। তাঁরা তো ভাবতেন বিধান রায় আর জওহরলাল ব্যতীত ওই সিটে বসবার মানুষ নেই এদেশে।

শোন, রেডি নাথাকলে হবে কী, যখন বউ-এর মুখে খবর পেলাম, তখন আমার তো পাগল হওয়ার দশা

নিঃশব্দে হাসলেন সীতাংশ, যা বলেছ!

আমি ক্যালেন্ডারে দাগ মারতে আরম্ভ করলাম, আর যাকে বলে আদর আর সোহাগ তা যেন আমার ভেতরে দিন দিন উথলে উঠতে লাগল

সীতাংশু নীরবে শুনছেন। মন্তব্য করলেন না।

জন্মের পর তার নাম রাখলাম সোহাগ, সত্যি বলতে কী প্রথম সন্তান তো সোহাগেরই সৃষ্টি, কী বল?

সীতাংশ অস্ফুট কণ্ঠে যা বললেন তা দুর্গাদাসের কানে গেল না। দুর্গাদাস কথা থামালেন না, সোহাগ করলে তো সবাইকে কাছে আনা যায়, ধরে রাখা যায়, কী বল?

সীতাংশু এবার একটু জোরে বললেন, তা বলতে পার, কিন্তু মেয়ে সন্তান তো ঘরে রাখার নয় শেষ পর্যন্ত।

তা বটে! দুর্গাদাসের মুখের উপরে যেন পাতলা ময়লার সর পড়ল, যেমন শীতকালে হয় গাছের পাতায়, যদিও সময়টা এখন আষাঢ়ের শেষ, তবে বাতাস থেমে যাওয়ায় গাছের পাতা ময়লা হতে শুরু করেছে, বৃষ্টি নামলে তবে ধুয়ে যাবে। সেই মলিন মুখ কিন্তু চুপ করে থাকল না, দুর্গাদাস ফিসফিসিয়ে চাপা স্বরে বললেন, আমি আমার মেয়ের মুখ দেখেছিলাম মাঝরাতে, তখন গাছপালাও তো ঘুমোচ্ছিল আয়েশে, বাতাস নেই, আকাশে গুমোট মেঘ, একদিনও বৃষ্টি হয়নি তখনো, ধামসি যখন আমাকে ডেকে বলল মেয়ের মুখ দ্যাখো গো নন্দীমশায়, আমি হেরিকেনের ময়লা আলোয় দেখলাম অন্ধকারে সে যেন হাসফাস করছে, মনে হল তখনো বুঝতে পারে নি কোথায় এসে পড়েছে, যেখানে ছিল সেখানকার অন্ধকার আর এই অন্ধকারে তফাৎটা কী।

বলতে বলতে দুর্গাদাস থেমে গেছেন। জানালার বাইরে বেলা বয়স্ক হয়েছে, প্রায় এই এঁদের মত। আলো যাই যাই, বুড়োটে ভাব জেগেছে হেথা হোথা, তবু কখনো সখনো টের পাওয়া যাচ্ছে যৌবনের ভাব, ছায়া ইত্যাদি যা যেমন।

দুর্গাদাস বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রসন্ন হলেন, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরলেন বন্ধুর দিকে। বন্ধুটি তাঁর মত নয়, জোরে হাসে না, কথা বলে না অহেতুক, বন্ধুর টাকা পয়সা বাড়ি ঘরদোরের গুমর আছে ভেতরে ভেতরে তা ওর মুখের ভাবেই স্পষ্ট।

দুর্গাদাস বললেন, আমি খুব গোলাপ ভালবাসি, তা মনে আছে তোমার সীতাংশু?

সীতাংশু আড়মোড়া ভাঙলেন, গোলাপ কার না পছন্দ!

দুর্গাদাস বললেন, পরের মেয়েটির নাম দিয়েছি গোলাপ, কেমন নাম?

সীতাংশু নিঃশব্দে হাসলেন ঠোঁটের কোণায়। তারপর জরিপ করতে লাগলেন বন্ধুটিকে। বন্ধু ছিল একদিন, এখন সম্পর্কটা কী রকম? আরো নীরব হলেন যেন সীতাংশু। পুরনো বাড়ির মত যেন ভেঙেচুরে গেছে দুর্গাদাস। পঞ্চাশ বছর কী কোনো বয়স হলো! তাঁর নিজের দু দশটা চুল পাকলেও ডাই করে একদম তিরিশ বছর আগের মত। অথচ দুর্গাদাসের মাথাটি পুরোপুরি সাদা। গায়ের চামড়া একটু কুঁচকেছে যেন মনে হচ্ছে। মোটা গোঁফ জোড়া কাঁচায় পাকায় ভাল দেখাচ্ছে না, সীতাংশু গোঁফ রাখেন না। এমন গোঁফ রাখা যায় না। দুর্গাদাসের মুখখানি বেশ ভারী, থমথমে, কিন্তু গাল তুবড়ে গেছে। তিরিশবছর আগে দুর্গাদাস খুব ফরসা ছিল। সেই রং এতকাল ধরে এই গঞ্জের রোদে পুড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে তামাটে করে ফেলেছে, এখন ঘষলেও পুরনো রং ফিরবে না। বুকের খাঁচার হাড় কাঠি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতসবের মধ্যেও ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায় দুর্গাদাস এককালে কী ছিল, কেমন ছিল। চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক, চওড়া কব্জি নিয়ে দুর্গাদাস যেন পুরনো জমিদার বাড়ি, প্রাচীর উধাও হওয়া রাজগৃহ। ধ্বংসস্তূপ দেখলে যার যৌবনের রমরমা দিনগুলোকে মনে করা যায়। মেরুদণ্ড এখন একটু নুয়েছে বটে, কিন্তু যদি সোজা করে দাঁড়ায় তো কেমন হবে?

ধরা যাক তিরিশবছর বাদে সীতাংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে দুর্গাদাস নন্দীর দেখা হয়েছে এই পুরনো গঞ্জে। এখানে সীতাংশুর কৈশোর কেটেছিল কাটা ঘুড়ির মত, এখানে তিনি যৌবনে পা দিয়েছিলেন শাল বৃক্ষের মত। যৌবনে পা দিয়ে সীতাংশু আর এখানে থাকেন নি। তিরিশটা বছর কোনো খোঁজ রাখেন নি এই গঞ্জের। ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন, ভাগ্য খুঁজে পেয়েছেন। অনেকদিন দূরদেশে কাটিয়ে সীতাংশু এই ক'বছর ফিরেছেন নদীর ওপারে। নদী নয়, তাঁরা বলতেন দামোদর নদ, তার ওপারে ইস্পাত নগরী দুর্গাপুর। দুর্গাপুরে থিতু হয়েছেন সীতাংশু। দুর্গাপুর এখান থেকে বাসে একঘণ্টা, দামোদরের ব্যারেজ পেরোতে হয়। সীতাংশুদের পৈতৃক গ্রাম এই গঞ্জ থেকে আটমাইল, শালিনদীর উজানে উজানে। শালিনদীর নাম এই গঞ্জের মানুষ ব্যতীত বাইরের কেউ জানে না, দামোদরেই তার শেষ, কিছুটা পুবের দিকে গিয়ে।

সীতাংশু বহুকাল বাদে এই গঞ্জে পা রেখেছেন কারণটা খুব সামান্য। বয়সের টানে হয়ত দেখতে আসা কেমন আছে সেই গঞ্জ, কিন্তু তাও নয়, তিনি এসেছেন সামান্য ধান্দায়। পৈতৃক গ্রামে এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়, তবে শুনেছেন সেখানকার দু পাঁচ বিঘে মাটিতে তাঁর অধিকার এখনো আছে, অন্তত কাগজে কলমে। তিনি কিছু পাবেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তার যদি সন্ধান করা যায়। ফোকটে যদি কিছু পাওয়া যায়। সেই সন্ধানে জমির অফিসে ঢুকে

যে কেরানীবাবুটির সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি এইজন। সীতাংশুর অভিলাষ শুনে দুর্গাদাস বলেছিলেন, কী দরকার ও সম্পত্তির, তুমি তো বিক্রি করে দুর্গাপুরের বাড়ি সাজাবে তাই না?

সীতাংশু ঘাড় হেলিয়েছিলেন, হ্যাঁ টাকার দরকার পড়েছে।

এতদিন বাদে টাকার দরকার পড়ল সীতাংশু এই পঞ্চাশ বছরে পা দিয়ে?

সীতাংশু চুপ করে ছিলেন, জবাব দেননি স্বভাব অনুসারে।

দুর্গাদাস আবার বলেছিলেন, ওই টাকা তুমি দুর্গাপুর থেকেই জোগাড় করো না কেন, যারা এতকাল আগলে আগলে রেখেছে ওই সম্পত্তি, ভোগ দখল করছে, তাদের নিরাশ্রয় না হয় নাই করলে।

কথা হয়েছিল এইটুকু। সীতাংশু ফিরবেন ঠিক করেছিলেন। আজ ভুল করে এই মানুষটিকে না ধরে যদি কোনো দালালের হাতে ভার দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই কোনো একটা হিল্লে হত। এমন ভাবতে ভাবতে বাসস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়িয়েছেন যখন, তখন তাঁর পিঠে হাত, চলো সীতাংশু, আমার বাড়ি চলো, কতদিন বাদে এলে তুমি!

দুজনে দুজনকে চিনতে একটুও ভুল করেন নি। দুর্গাদাসের কাছে অনেক খবর পেয়েছেন সীতাংশু, যার একটি হলো এই তিরিশ বছর দুর্গাদাস এই গঞ্জ ছাড়েননি কখনো। দামোদর পার হয়েছেন যদি সকালে তো বিকেলেই ফিরে এসেছেন সেই ব্যারেজর উপর দিয়ে। বাইরে রাত্রিবাস করেন নি কখনো, কি করে করবেন, ছেলেপুলেদের ছেড়ে যে কোথাও থাকতে পারেন না দুর্গাদাস। সীতাংশু ভেতরে ভেতরে হেসেছিলেন একথা শুনে, একেবারে গ্রাম্য হয়ে আছে, বদলালো না একটুও।

রাস্তায় দুর্গাদাস জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বহু জায়গা তো ঘুরে এলে তাই না?'

হ্যাঁ, গোটা ভারতবর্ষই বলো।

কিন্তু এখন চেনাও দেখি আমার বাড়ি কোন্‌টা?

থমকেছিলেন সীতাংশু। চিনতে পারবেন কি? চারদিকে অনেক বদল হয়ে গেছে। এমন কি দুর্গাদাসের সেই বুনো মহিষের মতো দেহটিও ভেঙে পড়েছে চুন সুরকির দেওয়াল যেমন জীর্ণ হয়। কথা না বলে সীতাংশু হেঁটেছিলেন দুর্গাদাসের পাশাপাশি। এই তো ধর্মরাজতলা, ধর্মঠাকুরের গাজন হয়, ওই তো জমিদার বাড়ি, ভেঙে পড়েছে যেন হুড়মুড় করে। দরজায় দরজায় তালা। সীতাংশুর খুব খারাপ লাগছিলনা। একটু একটু করে যেন চিনতে পারছিলেন সব। তাঁর বয়স যেন নামছিল এক একধাপ করে। যে সিঁড়ি পথে তিনি উঠে গিয়েছিলেন বয়সের এই চাতালে, সেই পথে নয়, যেন অন্য কোনো ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে নামিয়ে এনেছিলেন দুর্গাদাস। শেষ পর্যন্ত পেরেছিলেন, অস্ফুটগলায় চাপা, চিৎকার করে উঠেছিলেন 'ওই তো তোমার বাড়ি!'

সীতাংশু আশ্চর্য হয়েছিলেন দুর্গাদাসের বাড়িটি দেখে। অবিকল যেন সেই তিরিশ বছর আগের মত দাঁড়িয়ে। তিরিশটা বছর তাহলে এমন কিছু নয়। সেই টিনের চাল, পাকা দেওয়ালে খড়িমাটি রং তিরিশ বছর আগের একটি পায়রা যেন অবিকল সেই ভাবে একা একা বসে আছে মরচে ধরা চালের এক ধারে। আগের মতই সাদায় কালোয় মেশানো পালক। সীতাংশুকে এতদিন বাদে দেখে ডানা ঝাপটে চালের উপর লাফ দিল একবার! তারপর গরগর করে

উঠল ফূর্তিবাজ মেঘের মত। দুজনে ভেতরে এসে বসেছেন তক্তপোষের উপর। রাস্তার দিকের দরজায় তালা লাগানো ছিল। সদর দরজা দিয়ে ঢোকার প্রয়োজন হল না। দুর্গাদাস গায়ের জামাটি খুলে গা আলগা হলেন।

সীতাংশু বসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী কই?

বাড়ি নেই। এমন একটা দিনে তুমি এলে যখন বাড়িটা ফাঁকা।

সীতাংশু ভাবছিলেন ফাঁকা রয়েছে খারাপ কি? দুর্গাদাসের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কী কথাই বা বলতেন। সে এক কাণ্ড হতো বটে। দুজনে নীরব বসেছিলেন কয়েক মিনিট, তারপর দুর্গাদাস তাঁর ছেলেমেয়ের কথা আরম্ভ করলেন।

কত বয়স তোমার মেয়ের? জিজ্ঞেস করেছেন সীতাংশু।

ধরো তার জন্ম ছেষট্টির প্রথমে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার হলো পঁয়ষট্টিতে তখন সে মায়ের পেটে, জানুয়ারিতে বোধহয় রাশিয়ার তাসখন্দে গিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেলেন, সে হল তারও পাঁচ মাস বাদে জুনমাসে।

চমৎকার হিসেব রেখেছ তো?

বাহ্ রাখবো না! ধরো তার আগের বছর ভীষণ খরা গিয়েছিল, ভাদ্রমাসেও রোয়া হয়নি অধিকাংশ জমিতে, তাই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়,মানে অঘ্রান মাসে ধান কাটা হল না,, চাপটা এসে পড়ল শীত শেষ হওয়ার আগেই, ভাবতে পার কাঁচা শালপাতা সেদ্ধ ক'রে খেয়েছে সেবার মানুষ, মানে যেবার আমার মেয়ে হল, কী অভাব ঘরে ঘরে!

সীতাংশু পিছনে ফিরে তাকান না কখনো। কবে কোন কালে কী হয়েছিল, কে মরেছিল কে বেঁচেছিল সে হিসেব রাখা তাঁর অভ্যাস নয়। তাঁর এসব মনে রাখার দরকার নেই। মাথাকে কাজে ব্যবহার করতে হয়, এটি সীতাংশু খুব ভাল জানেন। সুতরাং তাঁর চুপ করে থাকাই শ্রেয়। সীতাংশু ভাবছিলেন শুধু সিক্সটি সিক্স থেকে এই এতটা বছর এই বয়সের মেয়ে গাঁয়ে গঞ্জে ঘরে থাকে না। সেও এতদিনে সংসার বুঝে নিয়ে ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বহুকাল নগর বাসে সীতাংশু একটি অভ্যাস আয়ত্ত করেছেন, তা হল অনাবশ্যক কৌতূহল নিবৃত্ত করা। তাই ঠোঁট জোড়া বুঁজিয়ে রাখলেন।

দুর্গাদাস বললেন, তারপরের জন, গোলাপের পরে আমার ছেলে হয়, তার নাম আদিত্য, আদিত্য তো সূর্য, তাই না?

সীতাংশু ঘাড় হেলালেন।

ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় নামটা বলে দিয়েছিলেন, আমি রেখেছিলাম সূর্য, হেড মাস্টার মশায় শুনে বললেন, বরং আদিত্য রাখো।

বাইরে পর্যটক মেঘ এসেছে তা বুঝলেন সীতাংশু। ঘরের ভেতরটা হঠাৎ যেন ছায়ায় ভরে গেল। তার ভেতরে গম্ভীর ভারী গলায় দুর্গাদাস তাঁর ছেলেমেয়ের ইতিবৃত্ত বলছেন। সীতাংশুর হঠাৎ মনে হল এ যেন মেঘের ডাক, বৃষ্টি নামতে পারে যখন তখন। ঘরে বসেই যেন বৃষ্টিকে ডাকছে দুর্গাদাস। সীতাংশুর মনে পড়ল, একবার, সেই বহুকাল আগে, এই দুর্গাদাস তাঁকে ময়ূর দেখাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। বলেছিল মেঘ ডাকলে ময়ূর পেখম মেলে। সেদিন মেঘ ডেকেছিল খুব, কিন্তু তাঁরা ময়ূরের দেখা পাননি জঙ্গল ঢুঁড়ে। সারা দুপুর কেটেছিল শাল মহুয়া, আকাশমণি, কেঁদ, নিম, বুনো আম গাছের আড়ালে। দুর্গাদাসের একথা মনে

আছে কি? তাঁর যখন মনে পড়ল তখন দুর্গাদাসও ভোলেনি নিশ্চিত। এখন যে এই ঘরে বসে লোকটা মেঘ ডাকছে প্রায়, কোনো ময়ূর কী এই ডাকে পেখম তুলে দাঁড়াবে? জানালার বাইরে উঠোন। উঠোনে বেশ বড় একটা গাছ। পাতায় পাতায় পেখম তোলা ময়ূর অথবা মেঘ, কিংবা কিছুই না শুধুই গাছ। সীতাংশু গাছটিকে দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ পেলেন। লোভের গন্ধ, কাঁঠালী চাঁপা ফুল অথবা কাঁঠাল। কাঁঠাল পেকেছে হয়ত। সীতাংশু এই পর্যন্ত এগিয়ে কৌতূহল সম্বরণ করলেন। চোখে দেখায় বিশ্বাসী সীতাংশু। উঠোনে বেরিয়ে দেখবেন গন্ধটা আসছে কোথা থেকে।

দুর্গাদাস বলছিলেন, আদিত্য হল সেভেনটিতে, সিক্সটি এইটে গোলাপ আর ছেষট্টিতে সোহাগ, সোহাগ যখন হল তখন তো দেশ উত্তাল, খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, মিছিল দাবি, গুলি, টিয়রগ্যাস, কী কলকাতা, কী মফস্বল, সব জায়গা যেন টগবগ করে ফুটছে। তা করতে করতে সাতষট্টিতে ভোট। ভোটে যুক্তফ্রন্ট হল, কী রমরমে অবস্থা তখন সীতাংশু, তোমার নিশ্চয়ই সব মনে আছে, আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম এখানে যুক্তফ্রন্ট আসতে পারে, ভাবতে পারি নি। কিন্তু তা হয়ে গেল, কিন্তু হলো তো মাত্র ক'দিনের জন্য, আটষট্টির ফেব্রুয়ারিতে ভেঙে গেল ফ্রন্ট, সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। সেই বছরই জানুয়ারিতে হয় গোলাপ, তারপর আবার ভোট, আবার যুক্তফ্রন্ট, খুন জখম, পুলিশের বন্দুকের গুলি ফুরোচ্ছে না, কী ভীষণ অবস্থা, সত্তরের মাঝামাঝি সময় আদিত্য হল।

সীতাংশ কথাগুলি নির্বিকার কানের পাশ দিয়ে উড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরের গাছটির দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন ক্রমাগত। এ ছাড়া তাঁর আর উপায় কী? নিষ্কর্মা লোক ছাড়া এত পুরনো কথা কেউ বলতে পারে? সীতাংশু তো এসেছেন উদ্দেশ্যে। দুর্গাদাসের বাড়ি আসার মধ্যেও যে উদ্দেশ্য নেই তা নয়। যদি গাঁয়ের সেই সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিতে পারে দুর্গাদাস, প্রথমে অরাজী হলেও, রাজি হতে কতক্ষণ! মানুষ এখন এই ভাবে, তখন অন্য রকম। সিক্সটি সিক্স, এইট, সেভেনটি দিয়ে কোনো দরকার নেই সীতাংশুর। তাঁর সেই সময় কেটেছিল ভাগ্য গড়তে। অত গোলমালের ভেতর এখানে মানে এই পশ্চিমবঙ্গে থাকলে তাঁর অসুবিধে হত ঠিক, হয়তো দুর্গাদাসের মত পঞ্চাশ বছরে এসে শুধু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসতেন। তা হয়নি কেন না তিনি তখন সুজলা সুফলার মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুদূর মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ নিষ্ফলা পাহাড়ের কোলে, জঙ্গলের ছায়ায়।

অন্যমনস্ক সীতাংশুকে ডাকলেন দুর্গাদাস, তুমি শুনছ?

চমকে উঠেছেন সীতাংশু, ও হ্যাঁ, বলো, তারপর কী যেন হল?

হা হা করে হাসলেন দুর্গাদাস, রাজকন্যার ঘুম ভাঙাইতে গিয়া রাজপুত্তুর রাক্ষসের গন্ধ পাইল।

সীতাংশু হাওয়ার মত হাসলেন, তা যা বলেছ, এসব এখন রূপকথাই বলে মনে হয়।

দুর্গাদাস মুহূর্তে গম্ভীর, হ্যাঁ, অনেকটা তাই, আদিত্যের পরে মৃগাঙ্ক হল, মৃগাঙ্ক মানে যে চাঁদ, তা আমি জানতাম না, বলেছিলেন আমাদের হেডস্যার।

সীতাংশু শুনলেন মৃগাঙ্ক মানে চাঁদ। এর আগের পরের কথা যথারীতি জানলা টপকে বাইরের গাছের পাতায় জড়িয়ে গেছে। গাছটা এখন কেমন মেঘ মেঘ লাগছে। এতো পাহাড়ের দেশ নয় যে জানালার মুখে মেঘ এসে দাঁড়াবে। ফাঁক পেলেই ঢুকে পড়বে ভেতরে, সুতরাং

ওটা গাছই।

দুর্গাদাস বলছিলেন, জঙ্গলের হরিণ আর আকাশের চাঁদ, দুইয়ে মিলিয়ে নাম রাখা হল। বাহাত্তর সালে মৃগাঙ্ক হয়। তখন মিলিটারি কাম্প ইস্কুলের মাঠে, জলপাই রঙের রাইফেলধারীরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, হুটহাট ঢুকে পড়ছে গৃহস্থের ভদ্রাসনে। হেডমাস্টারমশায়কে একদিন রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে হাড় ভেঙে দিল পায়ের, তাঁর অপরাধ, ইস্কুলের মেয়ের দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল এক গোঁফু মিলিটারি, একদিন একজনের হাত ধরে টানতে গিয়েছিল জলপাই রঙের সৈনিক, এ সবের প্রতিবাদ করতে হেডস্যার ঢুকে পড়েছিলেন ক্যাম্পের ভেতরে।

কেউ কিছু বলল না?

মাথা খারাপ, একাত্তরে বাঙলাদেশ হয়ে গেছে, তখন ক্ষমতায় চলে এসেছেন জওহরলালের কন্যা, এখানে রাষ্ট্রপতি মিলিটারি দিয়ে খুব শাসন করছেন আমাদের, যে বলতে যাবে তার প্রাণ চলে যাবে, হেডস্যার এখনো হাঁটতে পারেন না, পা ভেঙে পড়ে আছেন ঘরে, ওই অবস্থায় নামটি আমাকে বলে দিয়েছিলেন কিন্তু মনের মত করে।

সীতাংশু চুপচাপ শুনছিলেন। শেষের কথাগুলি তাঁর তেমন পছন্দ হয়নি বটে, কিন্তু প্রথম দিকেরগুলি কানে ঢুকে গেছে আলটপকা। সীতাংশু জানলেন বুড়ো হেডমাস্টার মশায়, যাঁর এখন আশির কাছে বয়স, তিনি চলাফেরা করতে পারেন না তেমন, কেননা চোরের মার খেয়েছিলেন রক্ষী বাহিনীর হাতে।

দুর্গাদাস বললেন, ওসব থাক তোমার কথা বল।

বাঁচলেন যেন সীতাংশু বললেন, মনে পড়েছে তাহলে?

নিঃশব্দে লজ্জিত হলেন দুর্গাদাস, 'আমি খুব নিজের কথা বলতে ভালবাসি, এজন্য কেউ আমার ছায়া মাড়াতে চায় না, দেখছ তো কেমন বোবা মেরে আছে চারদিক।'

সীতাংশু টিনের চালের উপর সেই পায়রাটির বকম বকম শুনতে পেলেন! আর কেউ এসেছে নাকি? ডানা ঝাপটে চালের অন্যদিকে এক্কা দোক্কার মত লাফ দিল যেন পায়রাটি। সীতাংশু কান পাতলেন, খুব নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বোঁ বোঁ--- যেন মউমাছির ডানার শব্দ। মিষ্টি গন্ধটা জানালার আলোয় যেন মাখামাখি হয়ে আছে। কোথায় যে কাঁঠালি চাঁপা ফুটল!

সীতাংশু প্রায় তিরিশ বছরের নৈঃশব্দ ভেঙে বললেন, 'আমার প্রথমটি ছেলে, দুর্গাপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে, ফোর্থ ইয়ার।'

তোমার মত হয়েছে, না ওর মায়ের মত?

মিলিয়ে মিশিয়ে। সীতাংশু অস্ফুট জবাব দিলেন।

কী নাম?

শ্যামল।

দুর্গাদাসের গোঁফের নিচে জেগে উঠল যেন প্রাপ্তির হাসি, তিনি বললেন, 'আমার একটি ছেলেরও যে ওই নাম, শ্যামল মানে তো সবুজ, উচ্চারণ করলেই যেন বুকের ভেতরে মায়া ধরে যায়, কী বলো?

সীতাংশু চুপচাপ। ভাবছিলেন কখন উঠবেন। নামের ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, হলেই হল।

দুর্গাদাস বললেন, শ্যামল হল আটাত্তরে। তার আগে এমার্জেন্সী শেষ হয়েছে, এখানে লেফট

ফ্রন্ট আর দিল্লিতে জনতাপার্টি--- হেডস্যার আবার ক্রাচ ভর করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, আমি ছুটে গেছি তাঁর কাছে --- সে বছরই বন্যা হল, দামোদরের ব্যারেজ একাংশ ভাঙল, আনন্দ আর দুর্ভোগ যে কী ভীষণ তা কল্পনা করতে পারবে না সীতাংশু।

কল্পনা করা বড় কঠিন। বিশেষত সীতাংশুর পক্ষে তো বটেই। তিনি ভাবছিলেন এতটা বছর এই গঞ্জে বাস করে, এখানে কেরানিগিরি ক'রে কী ভয়ানক কাণ্ডই না বাঁধিয়েছে তাঁর সামনের লোকটা। এতগুলি ছেলেমেয়ে। একএক বছরের তফাতে বাবা হওয়া! সীতাংশু এতক্ষণে দুর্গাদাসের অনেক কথাই জানলা পথে বাইরের ঝুপসি মেঘের মত গাছটির দিকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এবারে ভাবনার চোরাবালিতে যেন পড়ে গেলেন। দুর্গাদাস কি অন্ধ? পৃথিবীর কোনো খোঁজই রাখে না। ও না রাখুক, হেডমাস্টার মশায় তো রাখেন। তাঁর উচিত ছিল তো ওকে থামানো। নাকি তিনিও ভাঙা পায়ে গাঁয়ের ইকুলে ব'সে নামের ফুল ফোটাচ্ছেন, ছাত্রসংখ্যা বাড়াচ্ছেন। কোথায় দুর্গাদাসের সাধের ছেলে মেয়েগুলো, কী যেন নাম সব, সোহাগ গোলাপ, আদিত্য মৃগাঙ্ক---মোট কতজন?

সীতাংশুকে কঠিন ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করলেন দুর্গাদাস, তোমার ছেলের কথা তো শুনলাম, মেয়ে?

পড়ছে, ইংরিজিতে অনার্স নিয়েছে, থাকে কলকাতায় হোস্টেলে।

কত বয়স?

সীতাংশু যেন দুর্গাদাসের মতই বললেন, সাতষট্টিতে হয়েছে।

তার মানে যেবার যুক্তফ্রন্ট হল?

হ্যাঁ আমি তখন উজ্জয়িনীতে, এখানে ছিলাম না। সীতাংশু বললেন।

দুর্গাদাসের ঘাড় ঝুঁকে গেছে যেন নিচে, বুক ছুঁয়ে ফেলেছে তাঁর চিবুক, কিছু যেন মনে করার চেষ্টা করছেন, একটু নীরব হলেন যেন দুর্গাদাস, তারপর চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে ছিলে না, তাই দ্যাখোনি তো সীতাংশু কী দিন এসেছিল সেবার, ফুড মুভমেন্টে অত মার খেয়েও শেষ পর্যন্ত জিতে ঘরে এসেছে সকলে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট, মনে হচ্ছিল গোটা দেশটাই যেন আমাদের দখলে চলে এসেছে, বহু কষ্ট গেছে আগের বছর। আমরা আগে গম চিনতাম না, গমের স্বাদ পেয়েছি সবে, কিন্তু এতে তো কষ্ট ছিল না, গোলাপ তখন ওর মায়ের পেটে।

সীতাংশু নিশ্চুপ। তাঁর প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। দুর্গাদাস মুখ তুললেন বৃষ্টির শব্দে। হঠাৎ বাইরে মেঘ যেন খেয়াল মেটাতেই ঝম ঝম---। টিনের চালে একশোটা কচি শিশুর পা পড়ছে তালে তালে, খেয়ালে ঝুম ঝুম, পায়ের মল বাজছে যেন। সীতাংশু কান পেতে আছেন। দুর্গাদাসের চোখ বাইরের একলা অন্ধকারে, গাছের উপর।

দুর্গাদাস জানালা থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মেয়ের নাম কী?

সীতাংশু জবাব দিলেন না। [illegible] থেকে কথা সরিয়ে এনেছেন তবুও জবাব দিলেন না। ভাবছিলেন কখন যেতে পারবেন। আর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে বয়স যেন [illegible] মুহূর্তে লাফ দিয়ে [illegible] দিকে [illegible] এ অতীত [illegible] মনে হওয়া [illegible] পেনশনের দরকার, কিন্তু বৃষ্টি যে

ডালপালা মেলা গাছটাকে ধুইয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত। সীতাংশু নাকে আবার সেই গন্ধটা পেলেন।

দুর্গাদাস বললেন, আমার শেষের জনের নাম মৃত্তিকা।

সীতাংশু অবাক হলেন না, কিন্তু চমকে উঠেছেন হঠাৎ, তোমার কটি ছেলে মেয়ে?

নয়টি। দুর্গাদাস স্থির হয়ে জবাব দিলেন।

সীতাংশু নিবিষ্ট হয়ে জরিপ করছিলেন বন্ধুকে। বন্ধু কি! ছিল একসময় বন্ধুতা যখন বাছ বিচার করতে জানতেন না। এখন নয় ছেলেমেয়ের বাবা এই লোকটাকে দেখে আর বন্ধু মনে হচ্ছে না সীতাংশুর, মনে হচ্ছে আলটপকা আলাপ হওয়া কোনো লোক গালগপ্পো ফেঁদেছে তাঁর কাছে। ছেলেপুলের ভারে লোকটা একটু নুয়ে পড়েছে বটে।

তুমি কি আমাকে কিছু বললে সীতাংশু? দুর্গাদাস একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন।

না, মানে তোমার ওয়াইফ পারলেন?

দুর্গাদাস জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন, টিনের চাল থেকে গড়িয়ে আসা জল টপ টপ ক'রে জানালা থেকে এক দেড় হাত দূরে সরু সুতোর মত দুলছে যেন হাওয়ায়। বৃষ্টি থেমেছে। ওদিকে তাকিয়েই দুর্গাদাস বললেন, 'পেরেছে।'

উঠবে তো?

হ্যাঁ, জল থেমেছে। দুর্গাদাস উঠে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিলেন, 'চলো'।

সীতাংশু বাঁচলেন। দুর্গাদাসের নয় ছেলেমেয়ের ফিরিস্তি তাঁকে আর শুনতে হবে না। ওঁরা এবার উঠোনের দিক দিয়ে বেরোবেন। দরজায় তালা দিয়ে ভেতরের প্রাচীর ঘেরা উঠোনে নামতেই সীতাংশু দেখলেন গাছটা কাঁঠালের। সদরের একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার মুখটা অন্ধকার করে রেখেছে। গন্ধটা ওর গা থেকেই আসছে। আকাশের গা পরিষ্কার হয়ে গেছে, জলে ধোয়া ঝকঝকে। অনেক দূরে পুবের দিকে এক টুকরো মেঘ, যেন সমুদ্রের ভেতরে একটি নৌকো। সীতাংশু ঘাড় নামিয়ে চোখ সোজা করলেন গাছটার দিকে। আশ্চর্য! একেবারে গোড়া থেকেই ফল ধরেছে, মাটিতে লুটোচ্ছে পাকা কাঁঠাল। গন্ধটা ওই পাকা ফলের। বৃষ্টিতে এখন বাতাসও কেমন ধোয়া, কেমন ঠাণ্ডা ভাব। পুরো গাছটা জলে ভিজেছে, চান করে উঠে এসেছে যেন জল ছপছপ ক'রে। পাতা থেকে নিঃশব্দে জল ঝরছে, এখনো মাথা মোছেনি, চুলের ঢাল তো দেখার মত। এমন চুলের মহিমাতেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত এককালে। গন্ধে গন্ধে সীতাংশু এগোলেন, নিচু হয়ে গাছটার তলার ছায়ায় দাঁড়াতেই তাঁর মাথায় টপ! একফোঁটা দুফোঁটা জল, সীতাংশুর চোখের পাতায় পড়ল, কেননা তিনি তখন দেখছিলেন কয়েক হাত উপরে ডালের গায়ে পাতার আড়ালে একটি বড়সড় ছাই রঙের মৌচাক, মৌমাছি বিন বিন করছে। তার গা দিয়েও জল ঝরছে। সীতাংশুর গা ভিজে যাচ্ছে পাতার কোষ থেকে নিবেদনের মত নেমে আসা জলের বিন্দুতে। তিনি গুড়ি মেরে বেরিয়ে এলেন।

উঠোনের অন্যদিকে বহু পুরনো একটি সজনে গাছ, তার পাতা ঝরছে একটি দুটি করে। একটা কাঠবিড়ালি হঠাৎ থমকে পাঁচিলের উপর মুখ গুঁজে চুপচাপ। হঠাৎ বৃষ্টি, তার উপরে উঠোনে ঘুরছে দুজন মানুষ, থমকে যাওয়ার কথা তো বটে।

সীতাংশু বললেন, বেশ বড় মৌচাক, ভেঙে দাও।

দুর্গাদাস হাসলেন। জবাব দিলেন না।

সীতাংশু বললেন, একেবারে গোড়া থেকে কাঁঠাল, একটা তো পেকে ফেটে যাওয়ার

জোগাড়, কেটে নাও।

দুর্গাদাস ঘাড় বাঁকিয়ে গাছটার দিকে তাকালেন, তারপর ঘুরে বললেন, দেখেছ সীতাংশু, গাছটার ফল ধরার ক্ষমতা কী রকম, বয়সও কম না, সেই যেবার সোহাগ হয়, এখন একেবারে গা থেকে মাথা পর্যন্ত ফল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সীতাংশু প্রমাদ গুনলেন। আবার কি ছেলেপুলের কাহিনী শুরু হবে। কিন্তু সত্যি গাছের চেহারাটি দেখার মত। স্নান সারা, চুল এলানো, কোলে কাঁখে ছেলে মেয়ে—সীতাংশু চমকে উঠেছেন ভেতরে। চোখ জোর ক'রে ঘুরিয়ে নিলেন গাছটি থেকে। টিনের চালটি এখন জল ধোয়া, পুরনো পায়রাটিকে দেখা যাচ্ছে না। আছে বোধহয় অন্য ধারে।

সীতাংশু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নয়জনের নাম?

সোহাগ, গোলাপ, আদিত্য, মৃগাঙ্ক, বিশাখা, ধ্রুব, শ্যামল, পলাশ ও মৃত্তিকা।

সীতাংশু হাসলেন নামের তালিকায়। ন'টি নাম খুঁজে পেয়েছো এও ভাল। আমি তো হাতড়াতাম।

দুর্গাদাস বললেন, হেডস্যারের দেওয়া।

কাঁঠাল কাটবে না?

থাক না, পাখিতে খাক, ফেটে যাক আপনা আপনি, তারপর পাখিতে বীজ ছড়াক।

জঙ্গল হয়ে যাবে যে সব। সীতাংশু বললেন।

হোক না, জঙ্গল আর পাখি, আর পাকা ফলের গন্ধ, উফ্ ভাবতে পারো তুমি!

কথা বলতে বলতে দুর্গাদাস বাইরে। পিছনে সীতাংশু। দুর্গাদাস সদরে তালা লাগালেন। দুজনে এবার পথে। নিঝুম হয়ে বাড়িটা প'ড়ে থাকল। দুপা এগিয়ে সীতাংশু আবার ফিরলেন। পাঁচিল টপকে কাঁঠাল গাছটি মাথা তুলে তাকিয়ে আছে বাইরে। হাওয়ায় পাতা দুলছে। সীতাংশুর মনে হল অনেকগুলি হাত। হাত নাড়ছে যেন নিঝুম বসত বাটি থেকে নানারকম বয়সের মানুষ। ডিঙিয়ে তাকাচ্ছে যেন তাঁদের পথের দিকে। দুটি মৌমাছি এলোমেলো হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সীতাংশুকে এবার রাস্তার বাঁক ঘুরতে হল। বাঁক ঘুরে এগিয়ে যেতেই দুর্গাপুর যাওয়ার পিচঢালা হাইওয়ে। আগে এ রাস্তা মোরামের ছিল, লাল ধুলো উড়ত খুব।

দুর্গাদাস হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ালেন, 'বুঝলে প্রথমে সোহাগের সন্তান, তার পর ভালবাসার গোলাপ।'

এরপর তুমি নামের জন্য আকাশে পাড়ি দিলে? সীতাংশুর গলায় যেন ব্যঙ্গের সুর।

আমি নই হেডস্যার, ভাঙা পায়ে প্রায় ছুটেই এসেছেন ক'বার। দুর্গাদাস বললেন।

সীতাংশু বৃষ্টি ধোঁয়া আকাশ দেখলেন, ধুলো ময়লা সাফ, সুগন্ধ নামছে যেন ওপর থেকে। তাঁর মুখে প্রসন্নতা জেগে উঠল। তিনি দেখছিলেন, এখন আদিত্য অস্ত গেছে, মৃগাঙ্ক জাগেনি, ধ্রুব, বিশাখা ঘুমিয়ে—।

সীতাংশু আকাশের মধ্যে আদিত্য মৃগাঙ্ক ধ্রুব বিশাখাদের খোঁজ করতে করতেই বললেন,

এরপর তুমি মাটিতে নামলে?

হেডস্যার, আমি নই।

সীতাংশু দেখছিলেন তাঁদের মাথার উপরে আকাশটা সত্যি শূন্য, নিরাভরণ, নিঝুম, থমথমে, না সূর্য না চাঁদ, না গ্রহ নক্ষত্র, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একেবারে খোলা পতিত জমি যেমন, অনেকটা তাই।

আমরা কোনদিকে যাচ্ছি? সীতাংশু জিজ্ঞেস করলেন।

কেন শালি নদীর দিকে।

এতক্ষণে সীতাংশু কেমন ঘোরে পড়ে গেছেন। দুর্গাদাসের টানে হেঁটে চলেছেন তাঁর পিছনে পিছনে, কিন্তু শালি নদীর কথা শুনে থামলেন। অস্ফুট গলায় বললেন, না গেলে হত না, যদি মন খারাপ হয়?

কেন ও ও! হঠাৎ ঘুরে তাকিয়েছেন দুর্গাদাস, সীতাংশু শুনলেন মেঘ ডেকে উঠল যেন মহিষের বিক্রমে। দুর্গাদাস কাঁপছেন থরথরিয়ে।

সীতাংশু বললেন, নদী ধরে পশ্চিমে তো আমাদের গ্রাম।

দুর্গাদাস স্থির হলেন, ধীরে শ্বাস নিতে নিতে বললেন, এই মন খারাপে তো আনন্দ আছে সীতাংশু।

সীতাংশু বিমর্ষ মুখে মাথা নামালেন। চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। দুর্গাদাস আবার বিড়বিড় করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর কথার ঝুলি যেন ফুরোবার নয়। সীতাংশুর মনে হচ্ছিল বয়স যেন বাড়ছে সত্যি।

আটাত্তরে প্রবল বন্যা হয়, সেবার শ্যামল হল। ওই বছরই পঞ্চায়েত ভোট হয় বহুদিন পরে, ভোটের পরে বন্যা, কী অবস্থা তুমি ভাবতে পারবে না, কী লড়াই! বন্যাও সামাল দেওয়া গেল, এরপর অনেক বছরের মাথায় মৃত্তিকা, এতদিনে আবার সব বদলাতে শুরু করেছে,

সীতাংশু তুমি মানুষ দেখেছো? শিখ মরছে, খ্রিস্টান, মুসলমান মরছে, মানুষ ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, মায়া মমতা ফুরিয়ে যাচ্ছে,.... আমার সন্তানেরা এরই ভিতর জন্মাতে থাকে পরপর।

সীতাংশু এই এত বছরের কথা ভাবেননি। তাঁর আক্ষেপ নেই সেই জন্য। ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে কখনো তিনি উজ্জয়িনী কখনো গোয়ালিয়র কখনো বস্তার জেলার খনি অঞ্চলে। পঁয়ষট্টির পর চলে গিয়েছিলেন মেঘদূতের জন্মভূমিতে, যখন এখানে আকাশের মেঘ ঠাট্টা করছে মাটির সঙ্গে, বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই, যখন ছেষট্টিতে এখানে আগুন জ্বলছিল খাদ্যের জন্য তখন সীতাংশু দেখেছিলেন বর্ষায় মহাকাল মন্দিরের মাথায় কীভাবে মেঘ ঠাঁই নিয়েছে বিন্ধ্য থেকে হিমালয়ের দিকে যেতে যেতে। তিনি জানতেন না সেই সময়, খরা, আগুন, লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, জিভে প্রথম গম আস্বাদ করতে করতে কেউ তার প্রথম সন্তানের নাম রাখছে সোহাগ।

সীতাংশু দেখলেন বড় সোনার থালার মত চাঁদ উঠছে নদীর ওপারের জঙ্গলে, একটু টাল খেয়েছে এক ধারে। অনেকদিন আগে হয়ত হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল শানের মেঝেতে। তিরিশ বছর আগের চাঁদের সঙ্গে দেখা হল সীতাংশুর, চাঁদ অভিভূতের মত জ্যোৎস্নার ঢেউ

গড়িয়ে দিল চরাচরে।

দুর্গাদাস বললেন, দাঁড়াও সীতাংশু।

সীতাংশু আকাশ থেকে চোখ নামালেন। দেখলেন কয়েক হাত দূরে নদীর ঢালে দুর্গাদাস দাঁড়িয়ে। তাঁর কানে এল ১৯১৮ সনে চালু হওয়া ন্যারোগেজ ট্রেনের বুড়ো ইঞ্জিনের ঘসঘস। বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ের ভোঁ ভোঁ শব্দটা যেন তিরিশ বছর পিছন থেকে আসছে।

দুর্গাদাস বললেন, তুমি আমাকে ঘেন্না করছ, তাই না। ন'টা বাচ্চার জন্ম দিয়েছি।

সীতাংশু না বলতে পারলেন না। চুপ করে আছেন। দুর্গাদাস সীতাংশুর মনোভাব বুঝে ঘাড় নুয়ে নদীর বালিতে চেয়ে আছেন।

সীতাংশু বললেন, ঘেন্না না হোক, কাজটা কি ঠিক করেছ, তারা কে কোথায় কী করছে বলো দেখি, ন'জনকে মানুষ করা তো তোমার কম্মো নয়।

দুর্গাদাস বাধ্য ছেলের মত সীতাংশুর মাস্টারি বকুনি শুনছেন।

তোমার ওই ঘর, নয় ছেলেমেয়ে, ন'জন যখন একসঙ্গে হয় প্রায় ওই গাছটারই মত অবস্থা হয়ে ওঠে তোমাদের, বাড়িটার ইটে ইটে যেন মানুষের গন্ধ।

মাথা তুলেছেন দুর্গাদাস, পেয়েছো মানুষের গন্ধ?

সীতাংশু থমকে গেছেন, সত্যি! এমন গন্ধ কি ছিল ওই বাড়িতে?

দুর্গাদাস নীরবে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। তার পিছনে অন্ধকারের নদী চালচিত্রের মত। ক্ষীণস্রোতের শব্দ, জ্যোৎস্নায় সব স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটু একটু করে।

দুর্গাদাস বিড়বিড় করছেন, মানুষের গন্ধ কেমন, বলতে পার তুমি?

সীতাংশু দেখলেন, দুর্গাদাসের দুচোখ ক্রমশ জ্বলতে আরম্ভ করেছে ঘা খাওয়া বুনোজন্তুর মত। থরথর করে নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে কাঁপছে দুর্গাদাস, যেন পা রেখেছে চোরাবালির গায়ে। সীতাংশু বুঝতে পারছিলেন, তিনি সত্য বলেননি, দুর্গাদাসের বাড়িতে পুরনো চুনসুরকি আর কাঁঠালের গন্ধ, পায়রার ডানার শব্দ। নয় পুত্রকন্যা যার, তার বাড়ির চেহারা অত থমথমে তো হওয়ার কথা নয়।

দুর্গাদাস কয়েক পা এগিয়ে এলেন, একটু চাপা গলায় বললেন, 'জানো সীতাংশু, যখনই স্বপ্ন আর বাস্তব এক হয়ে গেছে, তখনই সব ভেঙে চুরমার, এই জীবনে এ পর্যন্ত আমি শুধু হারিয়েছি আর হারিয়েছি, যখনই পেয়েছি তা যেন হারানোর জন্যই পেয়েছি, আমার ঘরে কেউ থাকে না, বাপকে সবাই ত্যাগ করেছে।

সীতাংশু আন্দাজ করছিলেন এমন, তাই কৌতূহল সম্বরণ করেছেন অভ্যাসে। যদি বলে দুর্গাদাস তবে তিনি শুনতে পারেন, তিনি নিজে জিজ্ঞেস করবেন না। দুর্গাদাস শালি নদীর তীরে বসে পড়েছেন দু হাঁটু মুড়ে। সীতাংশু আস্তে আস্তে ভীত হয়ে উঠছেন। অভ্যাসে এক পা পিছিয়েছেন।

তুমি যখন একটু একটু করে ভাগ্য গড়েছো, আমি তখন এক এক করে, বছর বছর—

সীতাংশু আর পারলেন না, এগিয়ে এলেন, দুর্গাদাসের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নত হলেন, নদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, কী হয়েছে তোমার দুর্গাদাস, তারা সব কোথায়?

দুর্গাদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করলেন, আছে কাছাকাছি, সব শুয়ে আছে এই নদীর বালিতে, সোহাগ থেকে মৃত্তিকা, ধ্রুব, বিশাখা সবাই, ন'টির একটিও বাদ নেই হে।

সীতাংশু ধরথর করে কেঁপে উঠেছেন এ-কথায়। কী বলছে ও? একি সত্য না মায়া! কঠিন মায়া, দুঃস্বপ্ন! স্বপ্নের মতো তো দুঃস্বপ্নও সত্য হয়না কখনো।

বিশ্বাস করো তুমি, সন্তান নিয়ে কেউ মিথ্যে বলেনা, তাতে তাদের কল্যাণ হয়না সীতাংশু, নটিকেই আমি নিজে হাতে করে এই বালিতে পুঁতেছি।

সীতাংশু আর পারলেন না, থামো দুর্গাদাস থামো, আমিও বাবা কারোর কারোর।

তুমিতো সব গড়ে নিয়েছো হে, চোখ বুঁজে থেকেছ, খাদ্যের অভাব দ্যাখোনি, খরায় পোড়নি এদেশে। মিলিটারি মার্চ করাও দ্যাখোনি, এটুকু দ্যাখো। তিন চারদিনের বেশি আয়ু দিতে পারেননি ওদের মা ওদের, তার যেমন দুর্বল হৃদপিণ্ড, ওদেরও তেমন। পৃথিবীটাকে সহ্য করতে না পেরে বাতাসে খাবি খেতে খেতে আমার কাছ থেকে নাম নিয়ে সব ফিরে গেছে অন্ধকারে, ওরা যত মরেছে, আমারও রোখ যেন তত বেড়ে উঠেছিল সীতাংশু, পৌঁছে যে ঘা লাগছিল বারবার।

দুর্গাদাস তুমি থামো, আমার লাগছে ভীষণ, আমি সহ্য করতে পারছি না দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস হাঁপাচ্ছিলেন, শেষটা শুনে যাও সীতাংশু, মৃত্তিকা হওয়ার সময় ওদের মাও শেষ হয়ে গেছে, শেষের দিকে সে আমাকে থামতে বলত। কী করে থামব? এতগুলো ছেলেমেয়ে যে নিজের হাতে পুঁততে পারে মাটিতে তার কতটা শক্তি আন্দাজ করতে পার? আর এই এতো বছর ধরে মানুষও আরো মায়া মমতাহীন হয়ে উঠেছে, মানুষ বদলেছে, জল মেঘ হয়ে আবার জল হয়ে ফিরে এসেছে হে, শুধু আমিই দিন দিন ক্ষয়ে গেছি। কিন্তু ইচ্ছেটা যায় না কখনো, দিনে দিনে বাড়ছে আমার আর সেই পাভাঙা হেডস্যারের, যিনি নামের খাতা খুলে বসে আছেন সবসময়।

সীতাংশু চক্রবর্তী ভাবতে পারেননি তাঁর নির্বিবাদ জীবনে এখন একটা সন্ধে এসে হাজির হবে, তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন একেবারে।

দুর্গাদাস তখন কথা থামিয়ে নদীর দিকে এক পা দু পা এগিয়ে ডাক দিয়েছেন চাপা স্বরে, 'আয়রে আমার সোহাগ গোলাপ আয়রে আমার ধ্রুব।'

সীতাংশু দেখলেন মেঘ ভেসে যাচ্ছে নদীর হাওয়ায়। সেই মেঘ ডাকছে গুরুগুরু, ও শ্যামল ও গোলাপ ও ধ্রুব, আয়, তোদের আবার ভাই-বোন দেব, আয়, উঠে আয়....।

সীতাংশু এতক্ষণে ভয় পেলেন। অনেক হয়েছে, আর নয়। তাঁর মনে হচ্ছিল, নদীর অতল থেকে বোধহয় সেইসব সোহাগ গোলাপ শিশুরা উঠে আসবে এখনি। ভয়ে তিনি শহুরে অভ্যাসে পিছিয়ে গেলেন, তারপর মেঘ জ্যোৎস্না ভেদ করে দৌড়লেন নদীতীর ধরে। না, দিক ভুল হয় নি তাঁর। পশ্চিমে নয় পুবে ছুটেছেন, তারপর দক্ষিণে, যেদিকে হাইওয়ে। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত তিনি নিতে জানেন। ঠিক সময়ে এই গঞ্জ, এই দেশ তিনি ছেড়েছিলেন, ঠিক সময়ে ছাড়ছেন নদীঘাট। নতুন জুতোয় একটু অসুবিধে হচ্ছিল ঠিক, মানিয়ে নিলেন। তাঁর কান থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল বৃষ্টির জন্য মেঘের ডাক, দুর্গাদাসের কণ্ঠস্বর, বাতাসের সোঁ সোঁ, নদীর বয়ে যাওয়া।

ধরা যাক, সীতাংশু চক্রবর্তী বলে কেউ আসেনি আজ এই গঞ্জে। ধরা যাক, সীতাংশু চক্রবর্তী নামের কেউ কোনোদিন ছিল না এই গঞ্জে। এ নামে যদি কেউ থাকে তবে সে অন্য কোনখানে, অন্যগঞ্জে, অন্যগ্রামে। তাকে নিয়ে কাহিনীটা লেখক বানিয়েছে।

কিন্তু সন্ধেয় যে নদীর বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এক দুর্গাদাস নন্দী নেমে যায় জলের ভিতরে, এর মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই। ফিরবে যখন, তখন এই গঞ্জের চোখে ঘুম, হাইওয়ে পড়ে থাকবে মরা সাপের মত। বাড়িটি দুর্গাদাসের জন্য অপেক্ষা করে আছে অন্ধকারে, শুধু বাড়ি নয়, উঠোনের মৌচাক, কাঁঠাল গাছটিও। দোরগোড়ায় তার অপেক্ষা সারাদিনের, কখনো স্নান করে কখনো রোদপোড়া হয়ে মৌচাকের মৌমাছিগুলির হিসেব রাখতে রাখতে। কাঁঠাল গাছটির গন্ধে, ক'টি মৌমাছির গুনগুনানিতে দুর্গাদাসের কোনোদিন বাড়ি চিনতে ভুল হয় না, তা রাতের অন্ধকারে যতই পেঁচ পড়ুক অন্ধকারের। মৌমাছিগুলি তাকে রাস্তা থেকেই ডেকে আনে। আনতে যায়।

(গল্পপত্র—১৯৮৯)

বাদশা ও মধুমতী

ধ-বনি অপেরা যাচ্ছে মৌচুরিয়া। নদীর কূল যেয়ে দশমাইল হাঁটা পথ, তারপর জালবিন্টি মৌজার কাছে নদী পার হয়ে মৌচুরিয়া। পালা আরম্ভ রাত্রি নয় ঘটিকায়, পৌঁছে দুপুরবেলা পেট পুরে খেয়ে ঘুম। সন্ধেয় সাজনগোজন।

নদীর নাম সুবর্ণরেখা। এই পৌষের সকালে তা কলিভাসা। নদী খুব পুরোন, তা-এর কূল দেখলেই ধরা যায়। ধ-বনি অপেরার বয়স ও কম হলো না। অধিকারী নরোত্তম দাসের নিজের পার্টি, অর্ধেক শেয়ার তার, বাকি অর্ধেক ধ-বনি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার মোহন মাইতির। অর্ধেক শেয়ার হোল্ডার হওয়ার কারণে সব পালার মুখ্য চরিত্রের আভিনেতাও এই মোহনকুমার।

আগে চলেছে ড্রেসার, ড্রেসবাক্স সমেত মেকাপম্যান, নরোত্তম দাস আর অন্য অ্যাক্টররা। অনেকটা দূরে দূরে তাকে অনুসরণ করছে সেন্টভুরভুর টেরিকটনের চোস্ত পায়জামা পাঞ্জাবি আর নিউকাট পরা মোহনকুমার। কাঁধে পড়ে রয়েছে চওড়া পাড়ের কাশ্মিরী শাল, হাতে কমদামী সিগারেটের প্যাকেট। পাশে পাশে এবারের পালার মূল আকর্ষণ অভিনেত্রী মন্দাকিনী।

মন্দাকিনীর আসল নামটি জবা। মোহন মাইতির বুদ্ধিতেই লিফলেটে এই নামটি ছাপানো হয়েছে, লোকে নেবে ভাল, জবা মাজি কোনো নাম হলো নাকি! ওই নামে লোকে ভীড় করবে?

এবার ধান হয়েছে ভাল। বানে যায়নি, শুখায় যায়নি, আশ্বিন কার্তিকের ঝড়েও যায় নি। তাই যাত্রা পার্টির বায়না খুব। হাইওয়ের ধারে, মফস্বলী গঞ্জে আসছে কলকাতার সুবিখ্যাত অপেরা....আর মৌচুরিয়া, আটাঙ্গী, অমর্দা, সাতমা, জালবিন্টিতে যাচ্ছে ধ-বনি অপেরা, দলং অপেরা, ঝাড়গ্রাম অপেরা, সাঁওতাল গ্রাম পায়রাচালিতে সাঁওতালি পালা আসছে পর্যন্ত সিংভূম, চাকুলিয়া থেকে কেননা ওইসব গাঁয়ে বাসে ঢোকবার পথ নেই, গো গাড়ি এক নাগাড়ে চলার পথও নেই। ঝোরা, ঝর্ণা, ধানক্ষেত নদী, সব পার হয়ে তবে ঢোকা যায়। আর দশ হাজারি বিশ হাজারি কলকাতার অপেরা আনার ক্ষমতাও ওদের নেই, সুতরাং বছর বছর যেমন যায় ধ-বনি অপেরা, এবারও যাচ্ছে তেমন। যাচ্ছে বটে, কিন্তু এবারের যাওয়ার একটু আলাদা মাত্রা আছে, নায়িকার ভূমিকায়, লাস্যময়ী যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো রূপসী মন্দাকিনী। মোহন মাইতির দেওয়া এই বিশেষণ লিফলেটে ভুল বানানে ছেপে বেরোনর পর যেন সাড়া পড়ে গেছে। ধ-বনি অপেরায় 'ফিমেল' একবার মাত্র এসেছিল, সেই বছর পাঁচেক আগে, কিন্তু প্রথম রাত্তিরের পর তাকে দূর ক'রে দেয় অধিকারী, পালার নির্দেশক নরোত্তম দাস, না পারে গান গাইতে না পারে কোমর দোলাতে, জড়োসড়ো মুখস্থ ডায়ালগই ঠিক ঠিক বলতে পারে না। এর চেয়ে শ্যামল দন্ডপাটই ভাল। অপেরার জন্ম

থেকে ফিমেল সে নিজে, কণ্ঠস্বরটি বাদ দিলে কে বলবেনা সে ফিমেল, বুকে দুই নারকেল মালা, চোখে কাজল, ঠোঁটে রঙ মাখিয়ে সে যেন ফিমেলের উপর, রং ঢং কী! কিন্তু এবারে আর তা চলল না। মৌচুরিয়া থেকে সতীশ বেরা এসেছিল অঘ্রানের প্রথমে কনট্রাক্ট করতে। বলে গেছে, ধান মার খেলনি, ইবারে টাকা বরং বাড়ায়ে দিবো, কিন্তু ফিমেল চাই, দাড়ি গোঁপ কামানো দড়পাটের নাথ নাথ বুলে চিৎকার লকে শুনবেনি দাস মশায়। গাঁয়ে ভিডিও ঢুকত্যে আরম্ভ করিছে, ডায়নামো দিয়া ভিডিও দিখানো হলো অমর্দায়, পাঁচকানিয়াতে হয়ে গেল গিরাউন্ড সিনিমা, দু দিনা চারটা উত্তম সুচিত্রার বই, সত্যিকারের ফিমেল আনুন, আমরা পালায় ডায়নামো লিয়ে আসব।

অঘ্রানের সেই সময় নদীর তীর জুড়ে গ্রাম গ্রামান্তরের মাঠ সোনা হলুদ, ধান পেকে টসটসে ভাবটি শুকিয়ে যাওয়ার মুখে। সেই ধান কাটা প্রায় শেষ, কোথাও এখনো কাটা চলছে। নামাল খাটতে যাওয়া পরিবার হাত গরম ক'রে ফিরছে ঘরে, ধ-বনি অপেরা যাচ্ছে মৌচুরিয়া। অপেরা পৌঁছলেই এত ফসলের গরম একটু ঠান্ডা হয় বটে।

দুই

ফিমেল চাই। এই দাবী নরোত্তম বলেছিল তার অপেরার লোকদের।

অপেরার সকলে চাষীবাসী মানুষ। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে, যখন মাঠ নিয়ে নিশ্চিন্ত নিষ্কর্ম, রিহার্সাল আরম্ভ করে। কার্তিকের শেষ পর্যন্ত বা দরকারে অঘ্রানেও গড়িয়ে যায় রিহার্সাল। তারপর তো ধান কাটা শুরু। কেউ নিজে নেমে পড়ে কাস্তে হাতে মজুর কামিনের সঙ্গে। কেউ বা মাঠের ধারে ব'সে তদারকি করে, ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে কামিন মজুরের সঙ্গে। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বিড়ি ধরায়, ডায়ালগ আওড়ায়, শুনো শুনো কনিয়া, আমু, দিল্লির বাদশা, আসমুদ্দরো হিমাচল আমোর বুকির ভিতরে, তাই লিয়ে আমু তুমার পনয় পাখি, তিষণা মিটটাবেনি?

ডায়লগের ছিরিতে হাসতে হাসতে ধানে গড়িয়ে পড়ে যুবতি কমিন, মজুর, ঠায় দাঁড়িয়ে বলে 'উরম ভাষা বললে হবেনি মাইতি বাবু, বাদশার মত বলো।'

হা হা করে হাসে প্রাইমারি মাস্টার মোহন মাইতি, লগড় করছিলাম।

মজুর নবীন সিং এর বউ কুসুমি ধানের গোছা বাঁধতে বাঁধতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, কালো টসটসে মুখ, এই শীত সকালে ঘামে একাকার, যেন বিন্দু বিন্দু শিশির ধরে আছে নাকের পাটায়, চওড়া কপালে, গলার কাছে বুকের খাঁজে, হেসে জিজ্ঞেস করল, কী পালা হইছে ইবার মাস্টারবাবু, কী পালার ডায়লক দিচ্ছ?

মোহন মাইতি তার দিকে তাকিয়ে আবার ডায়ালগ আওড়ায়...'আমু তুমার পনয় পাখি, তিষণা মিটাবেনি...পালার নাম দিল্লির বাদশা।

টলটলে শিশির বিন্দু যেন হাওয়ায় ধানের ডগা থেকে চলকে মাটিতে পড়ে, হাসি চাপতে চাপতে কুসমি বলে, দিল্লির বাদশা ইখন নাই, উর অবস্থা খারাপ, ইখানের বাদশার কথা বুলো।

মোহন মাইতি গম্ভীর হয়, ইখানের বাদশা তো লালপাট্টি।

উয়াদের ডায়লক বুলো। নবীন সিং ও বউ এর সঙ্গে মসকরায় যোগ দেয় ধানের

গোড়ায় কাস্তে চালাতে চালাতে, মিটিন হলো শুনোনি, দিল্লির বাদশা যায় যায়।

মোহন মাইতি উঠে দাঁড়ায়, রসের কথা রাজনীতিতে গিয়ে মিশছে, সে আল বেয়ে হাটতে থাকে বলে, উয়াদের ডায়লকে পনয় ভালবাসা নাই, রস নাই, শুধু লড়াই আর লড়াই, শুন ইবার ফিমেল আসচে, লড়াই উয়ার সঙ্গে হব্যা।

ফিমেল! দাঁড়িয়ে পড়েছে আর সব মজুর কামিনও। মোহনের এখানে এক লপ্তে ছ'বিঘা জমি। তার সর্বমোট তিরিশ বিঘা, তা বাদে পুকুর, ভিটেবাস্তু, পতিত মাটি তো আছেই। বর্গা হয়েছে মাত্রা পাঁচ বিঘেয়। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাকি পঁচিশ বিঘের বর্গাদার উচ্ছেদ করেছে অনেক কায়দায়। সে এখন আল ঘুরে ঘুরে সব জমিতেই যাবে। ফাঁকি মারছে কিনা মজুর কামিনে তা দেখাশোনা করবে। আর হ্যাঁ, খবর দেবে ধ-বনি অপেরায় এবার নারী চরিত্রে, ফিমেল রোলে ফিমেল। নরোত্তম দাস গেছে বালিচক, কনট্রাক্ট ক'রে ফিরল ব'লে, লে লে সাফ ক'র্য়ো ফেল, ফিমেল এস্যা গেলে মোর আর টায়েম হবেনি ধানের হিসাব নিয়ার, পালা ইবার সুপার হিট।

অবাক খবর! মোহন মাইতির কথায় সব মজুর কামিনের হাত থেমে গেছে। আঁচলে গলা মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়েছে কামিনের দল নানান জমিতে। তাদের গায়ে খড় শিশির মাটি একসঙ্গে ঘামে জড়িয়ে গেছে। ঘাম টসটসে ধান গন্ধ নিয়ে পর পর সব যেন উঠে দাঁড়াতে থাকে, উ মাস্ট'র বাবু সাচ বুলছো?

তিন

হাঁ হাঁ সাচ বলছি, জবা মাজি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধলা, কলাপাকার মত, চব্বিশা অঘ্রান আসব্য রিহাস্যালে, বলল নরোত্তম দাস, বালিচকে কনট্রাক্ট করে সে ফিরল এই শেষ বাসে।

তুমি চিনতো আগে? চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল মোহন মাইতি।

যখন খড়্গপুরের শিল্পীচক্রে ছিলাম, তখন উয়ারা দুই বুন এস্যাছিল আকটিং করত্যা, সে ধর, দশ বছর আগে, জবা, চামেলি দুই বুন, ষোল সতেরো বয়স ছিল, দিখেছিলাম, সেই বড় বন্যার পরের বছর।

তাহলে তো ইখন বয়স অন্যাক। চলব্যা? সন্দেহ প্রকাশ করেছে মোহন।

খুব চলব্যা, উ বয়েসের মেয়্যা ইখন পাব কুথায়, রিহাস্যালে আসুক দিখবে তখন, বুঝতেই পারবেনি চাষা ঘরের মেয়্যা।

নরোত্তম দাস তার পুরোনো ডায়েরি ঘেঁটে নাম ঠিকানা বের ক'রে চ'লে গিয়েছিল বালিচক। চাষা ঘরের মেয়ে, বাপ বিছানায় শুয়ে, তাই দুই বোনকে তখনই যাত্রাপার্টি ধরতে হয়েছিল। অনেকবছর কেটে গেছে। এখন দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। চামেলির অনেক দূরে, নাড়াজলে। জবার ওই বালিচকেই।

বিয়া হই গিইছে! ভ্রূ কোঁচকায় মোহন মাইতি।

তা তুমরা পাঁচ হাজার দশ হাজার দিতে পারবেনি, ইদিকে চাও টাটকা ফিমেল, তাতো হওয়ার লয়।

অন্ধকারে তাকাল নরোত্তম। জবা মাজিকে চলবে, ভালই চলবে। তার সেই বিছানায়শোয়া বাপ এখন বেঁচে নেই। দুটি ছোট ভাই বড় হয়েছে, তারা ক্ষেত মজুরি করে। জবা চামেলির

বিয়ে না হলে ধান কেটে, ধান রুয়ে পেট চালাতে হতো। কিন্তু বিয়ের পর জবারই বা দিন যাচ্ছে কীভাবে? স্বামী ময়দা কলে কাজ করে, তা এখন বন্ধ। নরোত্তমকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছে, বলল, কাকাবাবু পারব খুব, করছি তো ডেবরার এক পার্টিতে, তবে উয়াদের বায়না কম, নোতন দল তো, ধ-বনি অপেরার তো নাম আছে, কি র'ম বায়না ইবার?'

বিয়াঅলা ফিমেল, দাস ই ঠিক হলোনি? নাচতে পারব্যা? গান করত্যা পারে? রোমান্টিক সিনে জড়োসড়ো হয়ে থাকবেনি তো! মোহন খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

সব বুলে এসেছি, কী করত্যা হব্যা।

লাগবে কত? জিজ্ঞেস করল মোহন মাইতি।

রিহাস্যালের দিন তিরিশ, ইবাদে টিফিন আর দুফরের মিল, দু পিঠের বাস ট্রেন ভাড়া, আর পালার জন্য পঞ্চাশ, টিফিন মিল আর বাস ট্রেন ভাড়া তো দিতে হব্যা, সব মিলে শ' টাকার উপরে যাবে।

তা হোক, এখন জবা মাজিকে চোখে দেখার দরকার। মোহন মাইতি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ফিগার কিমন, গায়ে মাংস আছে তো?

শ ট্যাকার যা পাওয়া যায় তার চেয়্যা খারাপ লয়, বরং ভালই। নরোত্তম দাস অন্ধকারে পা বাড়ায়। তার চিন্তা আসবে তো, টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে দশ, না এলে ওটা লস, এছাড়া তার আজ বালিচক যেতে আসতে খরচ কম হয়নি। একশো টাকা একটু বেশিই খরচ হচ্ছে। আরো কমদামী ফিমেল খোঁজ করলে পাওয়া যেত হয়ত। কিন্তু এখন আর সময় নেই।

চার

মোহন মাইতি কেন অপেরার আর সবাই অবাক বাস থেকে জবা মাজি আর তার স্বামী ননীগোপাল নামতে। জবা যদি হয় চাঁদ, ননীগোপাল তার কলঙ্ক। একদমই মানায় না। আর নরোত্তম যেদিন কনট্রাক্ট করতে গিয়েছিল সেদিন এই চাঁদের চোদ্দ কলা পূর্ণ হয়নি যেন, আজ একেবারে পূর্ণিমা লেগেছে জবা মাজির চাঁদ অঙ্গে।

মোহন মাইতি অবাক হয়ে শুধু জিজ্ঞেস করল, গার্ড নিয়ে এস্যাছে, উ স্বামীর সামনে দিল্লিশ্বরের গলাবেড় দিতে পারব্যা?

নরোত্তম কথা ঘুরোয়, কিন্তু ফিমেল কিমন, পছন্দ হইছে?

তা হইছে তবে উ মর্কট সঙ্গে এল কেনে? মোহন কথা বলতে বলতে জবা মাজির এক এক অঙ্গের সুষমায় এক একবার মুগ্ধ হয়।

কুঠিঘাট সুবর্ণরেখার সেতুর উপরে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে স্বামী-স্ত্রী! স্বামী দেখছে নদীর বালির ঢেউ, স্ত্রী দেখছে দূর পশ্চিমে জেগে থাকা সিংভূমের পাহাড়ের নীল। জবাকে লাগছে ঠিক বড় ঘরের মেয়ের মত। এস, ডি, ও সাহেব একবার তার শালি নিয়ে এসেছিল এই নদী দেখাতে। সেই রূপসীর ছিরি ছাঁদ যেন একেবারে জবার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে পিছন থেকে। ঠিক বলেছিল নরোত্তম, কলাপাকার মত রংই বটে, তাতে হলুদ ফিনফিনে ব্লাউজ মানিয়েছে বেশ, ভিতরের কালো অন্তর্বাস ফুটে বেরোচ্ছে। দলামলা পাট সিল্কের হলুদ শাড়ি, কমদামী কিন্তু জবা মাজির গায়ে উঠে যেন তার দাম বেড়ে গেছে। ধ-বনি অপেরার দামও

এবার বাড়বে। বাড়বে তো বটেই, যেমন আশঙ্কা করেছিল মোহন মাইতি তা নয়, গায়ে মাংস আছে ঢের, তাকালে চোখ যেন কাঁঠালের আঠায় আটকে যায়। মোহনের সন্দেহ ছিল, সেই বছর পাঁচ আগে পরিহাটি থেকে ফিমেল এনেছিল নরোত্তম, তার মতো হবে হয়ত। সে মেয়ের না ছিল রূপ, না ছিল অ্যাকটিং-এর ক্ষমতা। তবু তাকে ঘষে মেজে তৈরি করছিল নরোত্তম, রিহার্সালে যতবার বলো আসবে, শুধু ভাড়া, খাওয়া আর পাঁচটাকা দিলেই হবে। কিন্তু ফার্স্ট নাইটের পর তাকে দূর করে দিয়েছিল নরোত্তম, কেননা সে নাকি কেঁদে পড়েছিল তার কাছে, পালার পর মাইতিবাবু জঙ্গলে ডেকেছিল তাকে। ডেকেছিল মোহন, তবে সকলের সামনে তো নয়।

মোহন মাইতির কাঁধে হাত দিল নরোত্তম, ইবার তুমি কিন্তু অ্যাকটিং ছাড়া অন্য কথা বলবেনি, অপেরার বদনাম হই যাব্যা!

মোহন নিঃশব্দে হেসে অন্যদিকে ঘুরে তাকায়। নরোত্তম এই ভয়ে ফিমেল আনা বন্ধ করেছিল। অভিনয় যে একটা আর্ট তা মোহন মাইতির বুঝবার সময় নেই। সে টাকা ঢালে অপেরার পিছনে, তার নিজস্ব মতামত অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে যাবে কেন? যতই বলুক না নরোত্তম, শিল্পীচক্রের ডিরেক্টর নির্মল পাল কী বলেছিল, নট্ট কোম্পানির মাখন নট্টই বা একবার কী উপদেশ দিয়েছিল তাকে।

নরোত্তম ডাকল হেঁকে, এস হে, টিফিন কর্যা পাঁচ মিনিট রেস্ট লিয়ে লাও, নদী দিখলে তো চলবেনি, তুমার অ্যাকটিং চলবে কিনা আগে তা তা দিখার দরকার, আমি অ্যাকটিং চাই।

নরোত্তমের কণ্ঠস্বর একটু ভারীই। একদম ঢিলে দেওয়া চলবে না। টাকা উশুল করে নিতে হবে খাটিয়ে। ফিমেল আর্টিস্ট একটু ফাঁক পেলেই সুযোগ নেবে। তা যেন না নিতে পারে।

নরোত্তম আবার কণ্ঠস্বর ভারী করে, আসার কথা একজনের, এলে দু'জনা, দুটা মিল টিফিন তো লাগবেই, দাম কাটার কথা, তবে কাটবোনি, বদলে রিহাস্যালটা বেশি সময় ধর্যা হোক, তিনটার জায়গায় পাঁচটা পর্যন্ত, শেষ বাস খড়্গপুর যায় পাঁচটা পনেরোয়, উতে গেলেও লাস্ট ট্রেন পাব্যা।

শেষ কথাটায় ভীতমুখে আগে ঘুরে দাঁড়ায় ননীগোপাল, পরে তার বউ। বউ এগিয়ে এল, ননীগোপাল মন্থর পায়ে বেশ তফাতে।

কথাটা কানে যাচ্ছে, টায়েম নষ্ট করছ। নরোত্তম আবার দাবড়ে দিল।

জবা বলল, ইদিকটা চিনা নাই তো, একা আসত্যা দিতে উর ভয় করছিল, পাঁচটা পর্যন্তই রিহাস্যাল দিবো দাস মশায়, তবে যদি পারেন দুপিঠের না হলেও উর এক পিঠের ভাড়াটা যদি দেন, একা মেয়েমানুষ, প্রথম দিন আসতে দেয় কী করে ইটা ভাববেন তো!

নরোত্তম ফিরল মোহন মাইতির দিকে, দিখলে, ফিমেল মানেই টাকা আদায়, কনট্রাক্ট হলো একজনের ভাড়া দিবো, ইখন বলছে, উয়ার সোয়ামীরও লাগব্যা, চলো চলো, আগে পাট বলো দেখি।

নরোত্তম জোর পায়ে হাঁটে প্রাইমারি স্কুলের দিকে। জবা মুখ কালো করে একবার পিছনে ফিরে তার স্বামীকে দেখল, তারপর হাঁটতে লাগল নরোত্তমের পিছনে। তার পাশে হাঁটতে

আরম্ভ করেছে মোহন মাইতি, প্রথমেই বিনা ভূমিকায় বলল, ভাড়া দিয়া যাব্যা, তবে ল্যাংবোট লিয়ে আসা তুমার ঠিক হয় নাই, দরকারে আমি গিয়ে লিয়ে আসতাম।

জবা ভীরু চোখে মোহনের দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টিটা একটু ধারালো তবে তার উপর সহানুভূতিশীল, তাই জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পালায় আছেন?

হাঁ, হিরো, মোহন মাইতি আমার নাম, পালায় দিল্লিশ্বর, তা তুমার মুখখানি কিন্তু মন্দাকিনীর মত, উ নামেই লিফলেট ছাপব, জবা নামে চলবেনি।

জবা চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ননীগোপাল কত দূরে। সে মোহন মাইতির কথার জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটছে।

পাঁচ

মোহন মাইতি কমদামী ফিল্টার সিগারেট বাড়িয়ে ধরল নরোত্তমের দিকে, বলল, লিফলেটে মন্দাকিনী নাম ছাপা হব্যা, নামেই আসর ফাটব্যা।

মাথা নাড়ল নরোত্তম, উঁহু, মুখখানি ঠিক বৈজয়ন্তী মালার মতো নাম দাও বৈজয়ন্তী, কুমারী বৈজয়ন্তী।

মাথা ঝাঁকায় মোহন, তুমি মন্দাকিনীর বই দ্যাখোনি, তাই বৈজয়ন্তীমালার কথা বুলছ, রাম তেরি ...।

পাশের ঘরে তালপাতার চাটাই-এ তখন মুড়ি চপ পিঁয়াজ আর আখের গুড় নিয়ে বসেছে জবা, ননীগোপাল। ননীগোপাল খুব ভয় পেয়ে গেছে। নরোত্তমের কথায় গুটিয়ে গেছে কেন্নোর মত, বউকে বলছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে বসো দেখি, বাবুরা এমনি এমনি ট্যাকা দিবেনি।

সে কথা নরোত্তম শুনেছে। যেন নরোত্তম কে শোনানোর জন্যই গলাটা একটু জোর করেছিল ননীগোপাল, তুমি কাজ ঠিকমত করলেই তো দু পাঁচটাকা বেশি চেয়ে লিবে।

যতটা বোকা ভাবা হয়েছে ননীগোপালকে ততটা যেন সে নয়। তবে বুদ্ধি জাহির করতে ও ভয় পাচ্ছে রীতিমতো। মুড়ি পিঁয়াজ চপ দু'থালা এলে সে প্রথমে বলেছিল খাবেনা, তার খিদে নেই, শেষে বউ জোর করতে আর মোহন মাইতি বলতে তবে না নিল। এখন খাচ্ছে গো-গ্রাসে। সকাল থেকে কারোর পেটে কিছু পড়েনি তা বোঝা যাচ্ছে।

নরোত্তম বলল, গঙ্গা যমুনা দিখেছো তবে বুঝতে বৈজয়ন্তীমালা কেমন ছিল, কেমন অ্যাকটিং, দিখেছো রাজকাপুরের সঙ্গম, সাঁতার পোষাক পরা বৈজন্তীমালা!

উসব বিটিশ আমলের বই, সে আমলে তুমার বৈজয়ন্তী, সায়রাবানু, আর ই আমলে হলো....., ইখন আর অ্যাকটিং দ্যাখেনি লকে, দ্যাখে ফিগার, রংঢং, যাকে বুলে গ্ল্যামার, আর ...., খুব চাপাগলায় বলল মোহন মাইতি, সেক্স, ইখন উটাই চলছ্যা, তুমার আনা ফিমেলের কিন্তু তা আছে।

কথা হচ্ছিল চাটাই এ বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, তখনই কথার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে জবা, বলল মাইতিকে, বিড়ি হব্যা?

চমকে উঠেছে একসঙ্গে দুজনেই। তাদের শেষ কথাটি কানে গেছে কিনা কে জানে! মোহন ভাবল, যাক না কানে, যা সত্যি তাই বলেছে, বরং এতে খুশিই হবে জবারানী।

কিন্তু বিড়ি চায় কেন? রসে যে ছাই পড়ে যাবে বিড়ি ধরালে।

বিড়ি কেনে? মোহন মাইতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। এত সুন্দর চুল, এত সুন্দর মুখ, কোমর, লেবু কোয়ার মত ঠোঁট, বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস আছে নাকি জবারানীর? হলুদ পাটসিল্কের শাড়ি ছেড়ে ইতিমধ্যেই পরে নিয়েছে আধ ময়লা ছাপা শাড়ি, চুলের খোপা ভেঙে দিয়েছে, তা নেমেছে কোমর অবধি, বুকের ব্লাউজটি আগের মতই আছে, মোহন মাইতির চোখ শেষ পর্যন্ত বুকের কাছে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

জবা আঁচল টেনে বলল, আমার হাজবান্ড খাবে, খুব নেশা, যদি এক বাণ্ডিল বিড়ি আর ম্যাচ এনে দেন...।

নরোত্তম কী বলতে গেলে মোহন তাকে থামায়, সে নিজে পকেট থেকে টাকা বের ক'রে একটা ছেলেকে পাঠালো দোকানে।

নরোত্তম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না, বলল, আর কী চাই, একা আসতে পারনা, পিকনিক করত্যা এসেছো নাকি, লাও আরম্ভ করো, একদম ফাঁকি চলবেনি।

জবা মাথা নামায়, ধরে নিন অতিথি এসেছে আপনার গাঁয়ে, আমি অ্যাকটিং এ পুষিয়ে দেবো দাসমশায়।

নরোত্তমের হঠাৎ খেয়াল হলো সকাল থেকে তাকে দাসমশায় দাসমশায় করছে ননীগোপালের বউ জবারানী। কনট্রাক্ট করতে গেলে কিন্তু কাকাবাবু কাকাবাবু ব'লে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে।

রিহার্সাল আরম্ভ হচ্ছে। বিড়ি আর দেশলাই স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিতে জবা বলল, তুমি বরং একটু ঘুরে এসে, খাওয়ার এখনো অন্যাক দেরি।

ননীগোপাল ঘাড় কাত করে বেরিয়ে যেতেই মোহন মাইতি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন তার বউকে পাহারা দেওয়ার জন্যই সঙ্গে এসেছে। তাতে রসের গুড়ে বালি। সে একেবারে জবার মুখোমুখি বসল, চোখে চোখ লাগছে অবিরত, নরোত্তম বোঝাচ্ছে, কোন সিনের মাহাত্ম্য কী রকম!

জবা বলল, বই তো আপনি দিয়ে এসেছিলেন দাসমশায়, আমি পাট মুখস্থ করেছি, ইখন রিহাস্যাল আরম্ভ করেন, ভুল হলে বুঝায়ে দিবেন, উনি তো দিল্লির বাদশা, আমি চাষীর মেয়ে মধুমতী, দেখা হলো দুজনায়, বলি...., উঠে দাঁড়ান আপনি মাইতিবাবু।

জবা নিজে দাঁড়িয়ে মোহন মাইতিকে দাঁড় করালো, তারপর আবেগ মথিত গলায় ডায়ালগ বলতে আরম্ভ করল, তুমি তো দিল্লিশ্বর, সব মানুষের ঈশ্বর, যদি বাঞ্ছা করো, কতশত রূপসী, সুন্দরী তোমার তৃষ্ণা দূর করবে হে প্রিয়, আমি অবলা চাষীকন্যা, ঘরে অন্ন নাই, কুটীরে ছায়া নাই, তুমি কেন দুয়ারে দাঁড়ালে?

মোহন মাইতি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে জবারানীর দিকে। সত্যিই যেন সে অবলা চাষীকন্যা আর তার সামনে প্রণয় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে দিল্লির বাদশা। গলা খাঁকারি দিয়ে মোহন কোনোরকমে বলল, মধুমতী তোমার রূপই অন্ন, তোমার রূপই ছায়া, রূপে মোর তৃষ্ণা মিটাও.....।

জোর রিহার্সাল চলতে লাগল। প্রাইমারি স্কুলের দরজা জানালা মানুষের মুখে অন্ধকার।

গোটা ধ-বনিই যেন ভীড় করেছে ফিমেল দেখতে। দিল্লিশ্বর মোহন মাইতির বারবার ভুল হতে লাগল, ভুল হবেনা কেন, জবারানী যেন অবলা চাষীকন্যা মধুমতী হয়ে মজিয়ে দিয়েছে তাকে। নাচের মহড়াও হয়ে গেল। নরোত্তমের নির্দেশে হাঁটুর অর্ধেক উন্মুক্ত ক'রে কোমরে শাড়ি গুঁজে জবারানী কোমর দোলাতে লাগল।

বাহ্ বাহ্! ইমন স্মার্ট ফিমেল আর কুনো অপেরায় নাই। চাপা গলায় নরোত্তমের কানে কথাগুলো বলল মোহন মাইতি।

দুপুরে কুমড়োর ঘ্যাঁট, বিউলির ডাল আর পোস্ত বাটা দিয়ে ননীগোপাল আর তার বউ ভাত খেল পেটপুরে। তারপর ননীগোপাল পাশের ঘরে চ্যাটাই-এর উপর লম্বা হলো, নাক ডাকতে আরম্ভ করল ওর।

আবার রিহার্সাল। পাঁচ মিনিটও বিশ্রাম পেল না জবারানী। তাকে টেনে তুলল নরোত্তম ভারী গলায় হেঁকে হেঁকে, এস হে, শীত কালে ঘুমোনো ভাল নয়, ইখনো অনেকগুলান সিন আছে, নাইট হল্ট তো করবেনি।

জবা বলল, বসে বসে বলি, খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে।

বেশি খেলে কেনে, ফিমেলদের বেশি খেতে নাই তাতে ফিগারও যায় আলিস্যিও আসে, নাও দাঁড়াও, আর একবার গানটা ধরো, না, না গান লয়, উটা ঘরে অভ্যেস করো, নাচটা আর একবার হোক, ততক্ষণ মোহন মাইতি একটু রেস্ট লিয়ে লিক।

ভরা পেটে কোমর দোলাতে লাগল জবারানী, নরোত্তম সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নির্দেশ দিতে লাগল, আহা ঘুরে ঘুরে করো, শুদু সামনে হল্যে তো হবে না, পিছনটাও দিখবে লকে, অপেরার ফিমেল দিখতেই না ভীড় করবে লকে, তা ফিমেল যদি লজ্জাবতী হয়....।

জবার বুকে ভয় এল। সে হাঁপাতে লাগল নাচতে নাচতে। তখন মোহন মাইতিই রক্ষা করল তাকে, থাক, বাড়িতে অভ্যেস করো ইটাও, খাওয়ার পর ইসব হয় না দাস।

তবে বাসে উঠার আগেই ভাত খেলে পারত। বলল নরোত্তম, রিহাস্যাল তো ফোকটে দিয়া হচ্ছেনি, তিরিশ টাকা, তারপরে....।

রিহার্সাল চলতে লাগল। মোহন মাইতি উঠে দাঁড়াল আবার। সে এতক্ষণে স্বাভাবিক, জবাও তার উপর নির্ভর করছে একটু, তাতে চাষীকন্যা মধুমতীর প্রণয় সম্ভাষণ আরো গাঢ় হচ্ছে যেন। মোহন মাইতি, দিল্লির বাদশা, গলা বেড় দিয়ে টেনে এনেছে চাষীর মেয়েকে বুকের উপর, বলছে, দিল্লির বাদশা, আমি সব ছেড়ে দিবো।

এ তুমার মোহমায়া বাদশা।

মোহন মাইতির চাপে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে জবার। বুকে পিষে ফেলছে তার হাসফেসে শরীরটাকে। হিন্দি সিনেমার অনুকরণে এ পালাতে কোনো রাখঢাক নেই। সে কোনোরকমে দিল্লির বাদশার বাহুবন্ধন মুক্ত হয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বুকের দলামলা আঁচল ঠিক করতে লাগল, হালুকচালুক তাকাতে লাগল একবার পাশের ঘরের দিকে, আর একবার প্রাইমারির বারান্দায় জমা দর্শকের দিকে। কোনো কথা বলল না। এত লোকের মাঝখানে তাকে যে প্রায় এলোমেলো করে দিল বাদশা, মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়, তবে হ্যাঁ, লোক ছিল বলেই না বাদশা তাড়াতাড়ি ছাড়ল।

ছয়

বিকেল পাঁচটায় নদী অন্ধকার। বাস এল ওপার গোপীবল্লভপুর থেকে, নদীর উপর সিধু কানহু সেতু পেরিয়ে।

বাসে ওঠার সময় মোহন বলল, আর গার্ড আনার দরকার নাই, চিনে গেল্যে তো, পালার দিন ফাস্ট বাসে আসব্যা, ফার্স্ট ট্রেন পেলেই ফাস্ট বাস পাব্যা।

ঘাড় কাত করল করল জবারানী।

নরোত্তম বলল, রিহাস্যালটা মনোমত হলোনি, শেষ দিশ্যটা আরো ভাল করে করত্যা পারতে, না করলে স্টেজে মাত করব্যা কী কর্যা?

তা তো বটে। সমর্থন করল ননীগোপাল।

নরোত্তম বলল, বউকে একা পাঠিয়ো, ভয় নাই, কত ফিমেল একা অ্যাকটিং কর্যা যায়, তবে না উ বুঝত্যা পারবে সব, চালাক হব্যা, আরো তো বায়না আছে।

ননীগোপাল ঘাড় কাত করল।

হাঁ জবা, ভাল করে অভ্যেস করো ঘরে, সব সময় মনে করব্যা তুমি ননীগোপালের বউ লও, অবলা চাষী কনিয়া, বাপ গরীব পেটে ভাত নাই, কিন্তু রূপে তুমি গাঁ আলো করো। নরোত্তম উপদেশ দিল।

উতো তাই বটে দাসবাবু, না হলে এ্যাদ্দুর আসবে কেনে আপনাদের নিকট, শিখায়ে পড়ায়ে নিবেন। ননীগোপাল বিড়বিড়িয়ে বলল।

দাস হতভম্ব। মোহন মাইতি নির্বাক। ননীগোপাল বউ এর আগে আগে বাসে উঠে গেছে। কথাটা ও ভেবে বলল, না এমনি বলল!

সাত

ধ-বনি অপেরা চলেছে মৌচুরিয়ায় আসর করতে, নদীর পাড় ঘেষে ঘেষে পশ্চিমে, সিংভূমের পাহাড় শ্রেণীর মুখোমুখি। যাচ্ছে ফিমেল জবারানী, লিফলেটে কুমারী মন্দাকিনী, কুমারী না হ'লে রস গাঢ় হয় না। কোলে তার দেড় বছরের ছেলে, কখনো ঘুমিয়ে কখনো জেগে মায়ের কোলে চেপে সে ও চলেছে মৌচুরিয়া।

বাস থেকে বাচ্চা কোলে জবা নামতেই মাইতি ক্ষুব্ধ, আবার পাহারা নিয়ে এল্যে, তুমি কুমারী মন্দাকিনী, বাচ্চা লিয়ে মৌচুর্যা যাব্যা?

নরোত্তম আরো কঠিন, এই জন্যই ম্যারেড ফিমেল আনত্যে নাই, ল্যাংবোট থাকব্যাই, অ্যাকটিং কিমন হব্যা সে চিন্তা করব্যা কখুন ল্যাংবোট লিয়ে?

জবার মুখ অন্ধকার। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া যে হতে পারে তা সে আন্দাজ করেছিল, তবে এতটা নয়। ননীগোপাল এলে আসরে কোমর দোলানো, দিল্লীর বাদশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে তার বাধো বাধো ঠেকত ঠিক, বাচ্চা নিয়ে তো সে অসুবিধে হবে না। আসরে আজ সবার মন জয় করে নেবে এই ভেবে এসেছে, তাতে আরো ডাক পাবে অন্য সব অপেরা থেকে। কিন্তু দাসমশায় আর মাইতিবাবুর মুখ দেখে সে অসহায় বোধ করল, কোনোরকমে বলল, ছেল্যাটা সঙ্গে থেকে ঘুমায়, কুনো অসুবিধে হবেনি দাসমশায়, আপনি দিখবেন অপেরার নাম আমি রাখব, আগের বার মার কাছে রেখে এসেছিলাম, মার হইছে

ইবার জ্বর, ভাই দুটা ধান কাটত্যা গিইছে হুগলী, রাখি কার কাছে, উপায় হল্যে রেখেই আসতাম।

কেনে ননীগোপাল, উ মদ্দাটা কী করছে, বউ-এর আয় খাবি আর ছেল্যা রাখতে পারবিনি? নরোত্তমের গলায় ঝাঁজ ফোটে।

তাইতো ঠিক ছিল, কিন্তু উর ময়দাকলের মালিক নাকি মিসিন তুলে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করছে, সব লেবারে পাহারা দিতে লেগেছে কল, ঘরে থাকার উপায় নাই, ঘর তালা দিয়া মেয়্যাটাকে রেখে এলাম মার কাছে, উটার বয়স ছয়, দেখে এলাম গা ঘুষঘুষ করছে।

কথা বলতে বলতে জবা মুখ নামিয়েছে। শেষ কথাগুলি খুব আস্তে বলল যাতে বলাও হয় এবং দাসমশায় না শুনতেও পায়।

নরোত্তম এতে গলেনা, ইসব কথা বহু শুন্যাছি, সব এককথাই বলে, কুনো ফিমেল আলাদা নয়, হাঁ কনট্রাক্টের বাইরে কিছু দিতে পারবোনি, নাও রেডি, হও, হাঁটত্যা হব্যা।

মোহন মাইতি ভাবছিল নরোত্তম ঠিকই বলছে। ম্যারেড মেয়েছেলে নিয়ে ঝামেলা বিস্তর। তাছাড়া মন্দাকিনী, বাচ্চা নিয়ে গাঁয়ে ঢুকলে লোকে ঠিক জেনে যাবে এ হলো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফিমেল। তাতে গ্ল্যামার তো যাবে। সমস্যা আরো। পার্টি রওনা হবে এই সময়েই জেগে উঠল জবারানীর ছেলে। একেবারে ননীগোপালের মুখ বসানো, ময়লা রং, মাথায় কোঁকড়া চুল, খুব রোগা। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। জবা এতে খুব বিব্রত, শেষে না পেরে মাইতিকেই আশ্রয় করল, দাদা শুনবেন!

রাগী নরোত্তম বিড়ি টানছে ফস ফস করে। মোহন এগিয়ে আসতেই জবা ইঙ্গিতে ছেলের গা দেখালো, আসতে আসতে ঠাণ্ডা লাগল কিনা, জ্বর এলো কিনা।

তাকে আশ্বস্ত করল মোহন মাইতি, না, ও কুছু লয়, চাদরে ঢাকা ছিল কিনা, তাই একটু গরম গরম লাগছ্যা গাটা।

মোহন মাইতির সহানুভূতি পেয়ে জবা চাপা গলায় বলল, একটু দুধ হতো তো খাউয়ে নিতাম, পথ তো কম লয়।

কথাটা নরোত্তম প্রথমে শুনতে পায়নি। মোহন মাইতির মাথায় চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল, ঘুরে বলল, দাসমশায় রওনা হও, ই বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাউয়ে লিই, এতটা পথ যাবে তো, শিশু বলে কথা, পিছে পিছেই যাচ্ছি।

তাই হলো। নরোত্তম আপত্তি করলনা। তার দরকার অ্যাকটিং। তার জন্য মোহন আর মন্দাকিনীর পরস্পরের কাছে ফ্রি হওয়াও দরকার। আসছে তো পিছনে।

চা-দোকানে জবার ছেলে দুধ খেল এক বাটি। তাতেই ঠাণ্ডা। জবাকেও চপ মুড়ি আর দুটো রসের মিষ্টি খাইয়ে নিল মোহন মাইতি। পালার দিন টিফিনের ব্যাপার রাখেনি দাস মশায়। খাওয়ার পর চা খেতে হলো জবাকে মাইতিবাবুর সঙ্গে। তাতেও সময় গেল। অপেরা পার্টি এগিয়ে গেছে অনেকটা। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে উঠল মোহন মাইতি। জবা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, চলেন দাদা, ইকে লিয়ে আর চিন্তা নাই, শুধু ঘুমায়, শরীরে বল কম।

মোহন বলল, আবার দিয়া নাবল, মৌচুর্যা পৌঁছে এক সের দুধের অর্ডার দিবো, তুমার বাচ্চা খাবে আর ঘুমাবে। কথা শেষ করে হা হা করে হাসল মোহন।

জবা তার গায়ের খদ্দরের চাদরটি খুলে ছেঁড়া ফোমের কাঁধব্যাগে ঠেসে দিল। ওই চাদরেই জড়িয়ে এনেছে ছেলেটাকে। রোদ ইতিমধ্যে গাঢ়, নদীর ধারে হাওয়াও তেমন নেই, পৌষমাসে যেন ফাল্গুনের আনচান করা ভাব। বাচ্চার মাথা থেকে ফ্ল্যানেলের ময়লা টুপি আগেই খুলে নিয়েছিল জবা, ফ্ল্যানেলের জামাটির বোতাম খুলে দিল, তার নিচে ছেঁড়া সোয়েটার তো রয়েছেই। কালো কালো পাদুটি বেশ সরু, নেতিয়ে পড়েছে একেবারে মায়ের বুকে। অপেরা পার্টি অনেক দূরে, এখান থেকে মেঘ ডাকলেও বোধহয় সাড়া পাবেনা।

দাদা আপনি খুব করলেন। জবা আবার কৃতজ্ঞ হয়।

না, না এ আর কী, তা তুমারে দিখলে কিন্তু বুঝা যায় না দুই ছেল্যা মেয়্যার মা, বডিটা রেখিছো চমৎকার, কে বলব্যা তুমি কুমারী না, লিফলেট দিখেছো?

জবা এই ধরণের প্রশংসায় আনত, কোনোরকমে বলল, কে লিখল উসব কথা?

আমি, ভাল হয় নাই? মোহন আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করে।

জবা মুখ তুলতে গিয়েও পারেনা, বাচ্চার গালে হাত বোলায় অন্যমনস্কের মত। মোহন মাইতি হঠাৎ সাহসী হয়, শুনো, যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো...।

জবার মুখ লাল, সে বাচ্চা আঁকড়ে কোন রকমে হাঁটে। পৌষমাসের রোদ্দুর মোলায়েম। এখনো হাঁটা হয়নি বেশি পথ, তবু জবা মাজি ঘেমে একাকার।

তুমি খুব চালাক, ননীগোপালকে আসতে বারণ কর্যাছি তো ইকে লিয়ে এলে গার্ড কর্যা, কী ঠিক বলিনি?

হয়ত কথাট' ঠিক। জবা নিজেই তো আগবাড়িয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এল। ছেলে থাকলে যেন অনেক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত, কিন্তু সেকথা বলবে কী ক'রে তাই বলল, গার্ড তো আর আসরে থাকবেনি, আমি দাসমশায়ের দিয়া টাকা উশুল করে দিবো, সে চিন্তা নাই।

মোহন মাইতি শুনল ওর গলায় ঈষৎ ঝাঁজ, তা হোক, মেয়েমানুষ নেতিয়ে থাকলেই বা ভাল লাগে কার, সে উপদেশ দিল, হাঁ সিটা মনে রেখো, না হলে দাসমশায় আর ডাকবেনি, পরিহাটির বিমলা এসেছিল বছর পাঁচ আগে, এক রাত্তিরের পরই তাকে দূর করে দিল, মোর নামে নালিশ করত্যা গিইছিল দাসের নিকট, দাস অ্যাকটিং ছাড়া আর কিছু বুঝেনি, তার পাওনা উটা, পেলেই হলো।

জবা চট করে মুখ তুলল, নালিশ কেনে?

কেনে আবার, উসব যাক, হাঁটো দেখি।

জবা মাজি চিন্তিত হলো যেন। কোল বদল করল বাচ্চাটা, কাঁধ বদলও হলো। তারপর হঠাৎ অন্যমনস্কের মত বলল, পাহাড় অবধি যেতে হবে?

হাসল মোহন মাইতি, উঁহু, পাহাড় অন্যাক অন্যাক দূর।

জবা ঘাড় উঁচু করল সিংভূমের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস করে বলল, আমি এর আগে কখুনো পাহাড় দেখিনি।

তাই! অবাক হলো সেন্ট ভুরভুরে মোহন মাইতি।

হাঁ, রিহাস্যালের দিন প্রথম দেখলাম।

বুঝা যায় নি তো তা। মোহন সরে এল জবার পাশে।

জবা এবার হাসল মাইতির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে, বলার উপায় ছিল! ভরাপেটে

পর্যন্ত নাচতে হলো, দাসমশায় খুব কঠিন মানুষ।

আর আমি! মোহন মাইতি এবার জবার কাঁধ ছুঁয়ে ফেলল নিজের কাঁধ দিয়ে।

অন্যমনস্কের মত নদী দেখতে দেখতে জবা বলল, আপনি না বললে আমি রেহাই পেতাম! আজ যেমন...! কথা শেষ করতে পারলনা, জবারানী, মোহনের দেহের ধার তার দেহে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার।

মোহন বলল, আজ কিন্তু ঢেলে অ্যাকটিং করব্যা!

জবা একটু সরে গিয়ে বলল, না করলে দাসমশায় টাকা দিবেন?

তা যখন বুঝেছো তুমার দ্বারা হব্যা, আজ দুজনায় আসর মাত!

মাথা তুলল না জবা, হঠাৎ চাপা গলায় বলল, শেষ সিনটায় অতটা না করলে হতনা মাইতিদা, গাঁ ঘরের লোক দেখবে।

হা হা ক'রে হাসল মোহন মাইতি, কালো ছেলের গাল টিপে দিল আলতো করে, লকে তো উ সিনের জন্যই টাকা দিবে, অ্যাকটিং করতে অতো রাখঢাক করলে চলে, যা বলেছো, বলেছো, দাসকে বলোনি কিন্তু।

না, না, তা কেন, আপনাকেই বলছি, জবা একটু সরে গেল।

ইতে তো লজ্জার নাই, তুমি চাষীর মেয়্যা মধুমতী, আমি দিল্লির বাদশা, অ্যাকটিং করতে গেলে ফ্রি হত্যা হব্যা। মাইতি আবার সরে এল জবার দিকে।

জবা যেন শুনতে পেলনা কথাগুলো, বাচ্চাকে আবার কোল বদল করতে করতে বলল, দাদা পঁচিশ টাকা বেশি দিবার বেবস্থা করবেন দাসমশায়কে বলে, পরের বার না হয় কেটে নিবেন।

নরোত্তম দাস বলেছিল, এইসব ফিমেলের টাকার খাঁই খুব, যেদিক থেকে পারে চুষে নেবে অপেরাকে...। নরোত্তমের কথাগুলো সত্যি মনে হচ্ছে এখন। মোহন মাইতি প্রকাশ করলনা তার মনের ভাব। শুধু আরো সরে এসে জবারানীর ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। বাচ্চাটা একহাতে খামচে ধরেছে মায়ের অনাবৃত কাঁধ, সে বাচ্চার হাতের পাশে আচমকা নিজের হাত রাখল, বলল, আমিই দেব, দাসমশায়কে আজ বলতে হবেনি।

জবা যেন কুঁকড়ে যায়। কলের পুতুলের মত দম নিয়ে সে হাঁটছে একটি কচি হাত আর একটি শক্ত থাবা কাঁধে নিয়ে। বাঁদিকে মাইলের উপর চওড়-বালি-ভাসা নদী। ডাইনে ধানক্ষেতের ধানকাটা শেষ, কাটা ধান উঠছে গো গাড়িতে, কোনও ক্ষেতের ধানে এখনও কাস্তে পড়েনি। নুয়ে আছে এই জবারানীর মত। আকাশটা হাল্কা নীল, তা সাঁতরে পাখির ঝাঁক নামছে ক্ষেতের উপর। মাঠের মানুষ হাঁ করে দেখছে দুজনকে, অপেরায় তাহলে সত্যি ফিমেল এল।

মোহন মাইতি হঠাৎ যেমন হাত রেখেছিল ঘাড়ে, তেমনি নামিয়েও নিল তা। জবা যেন স্থির হয়ে শ্বাস নিল, একটু হেঁটে জিজ্ঞেস করল, ই নদীতে বান হয়?

হয়, খুব বান, এক্কেরে যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো!

জবার মুখ লাল হয়েছে আবার তা দেখতে পেল মোহন। আরো দেখল ছেলেটা জেগে উঠেছে হঠাৎ, নড়ছে ক্রমাগত, পিটপিট করে তাকাচ্ছে অচেনা পৃথিবীর দিকে। জবা থাবা দিল, ঘুমো বাপ ঘুমো, না ঘুমুলে তোর শরীর খারাপ হবে।

নদীর ধারে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হাঁটছে ধ-বনি অপেরার ফিমেল। বাচ্চাকে জাগতে দেখে মোহন একটু তফাতে। তফাতে বলেই জবা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমন্ত বাচ্চার দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস [illegible], [illegible] আপনার ক'বিঘা জমি?

তিরিশ বিঘা, পুকুর বাস্তু [illegible] অবশ্য। মোহন ভারীগলায় জবাব দেয়।

জবা অবাক চোখে তাকায় মোহন মাইতির দিকে! মোহন মাইতি তার সম্পত্তির হিসেব দিতে পেরে খুবই খুশি, উল্টে জিজ্ঞেস করে, ননীগোপালের নাই?

জবা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, সব জমি বর্গায়?

পাঁচ বিঘা ছাড়া রিকড হয় নাই।

জবা আরো অবাক, জিজ্ঞেস করল, আপনার তাহলে চিন্তানাই, আচ্ছা দাদা, বর্গা কাটানো যায়নি?

মাথাদোলায় মোহন, উঁহু, উ হলো কলঙ্কের মত, মেয়্যামানুষের গায়ে যা লাগলে আর উঠেনি।

মোদের দুই বিঘার সবটায় বর্গা লিখা হয়ে গেছে, বিষণ্ণ জবা বিড়বিড় করতে করতে হাঁটে, আপনি পার পেয়ে গেলেন, অথচ মোদের দুবিঘা চলে গেল, একটা ধানও দেয় না।

মোহন মাইতি এবার সরে এল জবার খুব কাছে, হাত রাখল তার ব্লাউজ আর শাড়ির বাঁধনের মধ্যবর্তী অনাবৃত পিঠে, ঠিক কর‍্যা অ্যাকটিং যদি করত্যা পার, কত জমিন হব্যা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়ে, পেটেই জুটেনি, জমিন হবে কী করে?

না, না, হব্যা! মোহন মাইতি হাত সরিয়ে এনে কোমরের ধারে রাখল, আঙুল সামনে বাড়ালেই পেট, একটু তুললে বুক।

এতক্ষণে যেন জবার খেয়াল হলো তা, সে চট করে সরে গিয়ে চাপা গলায় যেন ধমক দিল মাইতিকে, আপনি বড় গা ঘেষা মানুষ, ছেল্যোটা জেগে যাবে, নিন দেখি, আমি একটু সামলে নিই।

এভাবে তাকে নিরস্ত করে জবারানী তা মোহন মাইতি বুঝেও বাচ্চাটাকে দু হাতে ধরল। জবা তার হাতে বাচ্চা দিতে দিতে অস্ফুট গলায় বলল, কী গন্ধ আপনার গায়ে, গন্ধে না জেগে ওঠে।

চাল্লি সেন্ট, গায় দিবে? মোহন এক হাতে বাচ্চা সামলে অন্য হাত পকেটে ভরল, নাও না, বেলাউজে দাও ভাল লাগব্যা!

না, হাসল জবা। দাঁড়িয়ে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করল। ব্লাউজের কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসা ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ ঢুকিয়ে দিল ভিতরে, নদীর দিকে ফিরে। পিছন থেকে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে ধ-বনি প্রাইমারির হেডমাস্টার, তিরিশ বিঘা জমির মালিক মোহন মাইতি।

আঁচল টেনে জবা ঘুরে দাঁড়াতেই মোহন বলল, নাও না সেন্ট।

না, আমি চাষীর মেয়ে মধুমতী। জবা এড়াতে চাইল।

তো কী হলো, আমি দিল্লির বাদশা দিচ্ছি, আচ্ছা আমি না হয় স্প্রে কর‍্যা দিই মধুমতী, বুকে লাগালে সর্বক্ষণ গন্ধ পাব্যা।

না, না। জবা ভীত হয়ে ওঠে। ছেল্যাটাকে দিন, আপনি যা করছেন উ পড়ে যাবে।

মোহন মাইতির নিঃশ্বাস গরম। চোখ যেন ক্রমশ ঘূর্ণায়মান। সে দেখছিল বালিচকের ননীগোপালের বউ এর সব অঙ্গই প্রখর, নেশায় যেন টানছে তাকে। আঁচলের আড়ালে ভারী দুটি বুক ভয়ে কাঁপছে, গাল দুটি রোদে পুড়ে অথবা মোহনের কথায় যেন রক্তাভ। বেলা অনেক। সূর্য মাথায়। ডানদিকের কোনো ক্ষেতে আর মানুষ নেই, শুধু পাখির ঝাঁক। সে এগিয়ে দু হাতে বাচ্চাটিকে তার মায়ের কোলে তুলে দিতে দিতে আবার সুযোগ নিল, ছুঁয়ে ফেলল জবার বুক, কোমর। জবা শুধু তাকাল একবার। তারপর সামনের দিকে উধাও করল দৃষ্টি। অপেরার মূল পার্টিকে আর দেখা যাচ্ছে না, নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেছে। কেউ

কোথাও নেই। অগণন প্রকৃতি, কিন্তু মানুষ মাত্র দুটি। মোহন মাইতি আস্তে আস্তে জবার কাঁধে হাত রাখল, বসবে ইখানে মধুমতী।

জবা কেঁপে উঠে বলল, দেরি হয়ে যাবে।

যাক! হাঁটা হয়েছে অনেকটা, তুমি আবার ছেল্যা কোলে নিয়ে, ছেল্যাটাকে শুইয়ে দাও মাটিতে, ঘাসের উপর ঘুমাক।

আর কতদূর? জবা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে।

মাইল তিন, নদী পার হত্যা হব্যা উদিকটায়। মোহন তর্জনী তুলে দেখায়।

জবা বলল, না চলেন, দাসমশায় কী বলবে!

তুমি কিছু না বলল্যাই হলো, বিমলা মানে পরিহাটির সেই ফিমেল নালিশ করত্যা গিয়েছিল, উকে দূর কর‍্যা দিল নরোত্তম দাস, অ্যাকটিং ছাড়া উ কিছু বুঝেনি।

মোহন মাইতির ভারী রসস্থ কণ্ঠস্বরে জবার গা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। দাঁড়াতে তার ভয় করল। বসতে আরো ভয়, অথচ বসার কথা বলায় সে যেন খুশিই হয়েছিল মোহন মাইতির উপর। কোমর টনটন করছে। ছেলে কোলে ক'রে এত হাঁটার অভ্যেস তো নেই। সে ঘুরে তাকায় ফসলের ক্ষেতের দিকে। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, টিয়া শালিখ। দুপুরটা ঘন হয়ে উথলে পড়ছে যেন দুধের মত।

মোহন মাইতি আবার বলল, বসো, আমি বসছি, তুমি তো একা যেত্যা পারবেনি!

মোহনের ঠোঁটে চাপা হাসি। সে জমির আলে ব'সে সিগারেট ধরায়। জবা একটু ওধারে কোমর নামিয়ে দিল আলের উপর। আহ্ কী আরাম! বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরল বুকের উপর। তখন দেখল মোহন উঠে আসছে, তার মুখোমুখি উবু হয়ে ব'সে ধোঁয়া ছেড়ে দিল একগাল, তামাকগন্ধী। সিগারেটটা হঠাৎ ছুঁড়ে দিয়ে মোহন যেন শকুনের লাফে এগিয়ে এল উবু হয়েই, দুটো হাত বাড়িয়ে জবার আনত মুখ তুলে ধরে, মধুমতী, আমি দিল্লির বাদশা।

জবা ঢলে যায় পিছনে, মুখ ছাড়িয়ে নেয় মোহনের দুই হাত থেকে, আপনি স'রে বসেন দাদা, আমি গরীব চাষার মেয়ে, গরীব চাষা, লিবারের বউ, ময়দাকল ইখন বন্ধ।

মোহন মাইতি নিঃশব্দ হাসে, চাপা গলায় বলল, ডায়লক ভুল হলো একটু, তবে চলব্যা, ই র'মেই চলব্যা, শুধু বলোনি গরীবের বউ, তুমি কুমারী মধুমতী।

জবা আবার পিছনে ঢলে, আপনি সত্যিই বাদশা, তিরিশ বিঘা জমিন, মাত্তর পাঁচ বিঘায় বর্গা, আমরা ধান পাইনা, সরে বসেন দাদা।

বারবার জবার পিছনে ঢলে যাওয়া ভাল লাগেনা মোহনের, সে বলে, ইতেই তুমি ইমন করছ জবারানী, কথা আছে শেষ দিশ্যে চুমু দিবার, তুমাকে জানান বারণ ছিল, চুমু দিলেই হই হই পড়্যা যাবে, বায়না হব্যা একশোটা।

জবা থর থর করে কাঁপে, বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে খুব জোরে। মোহনের আঙ্গুল চেপে বসছে তার রোদ পোড়া চামড়ায়, জবার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল প্রায়। তাকে এক হাতে বেড় দিয়ে ব্লাউজের বোতাম অন্যহাতে খুলতে যায় বাদশা মোহন মাইতি, তাতে জবা ছটফটিয়ে উঠতেই [illegible]টা তীব্র আর্তনাদে নদীর তীর ভাসিয়ে দিল প্রায়। এতে যেন সম্বিত ফেরে জবা [illegible]রে, সে তীব্র চোখে মোহনকে ভৎর্সনা করে, এ কী করছেন!

মোহন মাইতি হেসে বলল, কাঁদছে কেন?

জবা এবার বি[illegible] হয়ে ছেলের দিকে তাকায়, এ কান্না তার খুব চেনা, সে হঠাৎ কাতর চোখে [illegible] সরেন দাদা!

কেনে, আমি [illegible]

না, না [illegible]

কী মনে করে মোহন মাইতি সরে গেল। গিয়ে বসল বুনো কুলঝোপের ওধারে। ছেলেটা সত্যিই পাহারা দিচ্ছে ওর মাকে। জবা মাজির বুদ্ধি কম নয়। হিশেব করে এনেছে। কিন্তু তার দেহ এখনো উদোম হাওয়ায় আনচান। ঝিমঝিম করছে সর্বাঙ্গ। জবারানীর সর্ব অঙ্গ যে তাকে টানছে ক্রমাগত। বাচ্চা ঘুমোক। রাতটা তো পড়ে আছে। বাচ্চা ঘুমোক। থাবা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে বোধহয় জবা। মোহন ঝোপের আড়ালে ঘুরে বসল। সোজা ভরভরন্ত পাকাধানের মাঠ। ধান কাটা শেষ। এখন গো গাড়ি এসে গেলেই হবে। এর ফাঁকে শালিক, টিয়া ছুটছে, উড়ছে। মোহন মাইতি দেখল জবা তার বুকের আঁচল ফেলেছে, ব্লাউজের কটা বোতাম খুলে ব্রেসিয়ার তুলে, পা মেলিয়ে বসে ঘন রৌদ্রে যেন মেলে ধরেছে কচি তালের মত মসৃণ দুগ্ধঘন রসস্থ বুক। বাচ্চার মুখে তা ঠেসে ধরেছে জবারানী। কোলের ছেলে দুধ টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে। সামনে দুই টিয়া অবাক স্থির চোখে দেখছে জবারানীকে।

মোহন মাইতি কাঁপতে লাগল। এ দৃশ্যের প্রথমটায় যেমন চোখ জুড়িয়ে এসেছিল, তা যেন এখন শত চক্ষু হয়ে খুলে যেতে চাইছে। ধান্যগন্ধী, দুগ্ধগন্ধী পৃথিবীর অঢেল দুপুর ক্রমশ ঘন হচ্ছে। মোহন মাইতি আবার উঠল, ডাকল কুল ঝোঁপের আড়াল থেকে, মধুমতী বড় তিষণা গো!

দাদা আমি গরীব চাষার মেয়ে, গরীব ঘরের বউ, ঘরে ভাত নাই, অন্ন নাই...।

জড়িয়ে যেতে লাগল জবারানীর কথা, আপনি বড় মানুষ, বাদশা মানুষ, কত জমিন, কত মেয়েমানুষ আপনার...। ভুল হয়ে যেতে লাগল কথাগুলি। চাপা কান্না হাওয়ায় লাট খেতে লাগল।

ধ-বনি অপেরার পুরো পার্টি এতক্ষণে পৌঁছল। ওইতো ফিমেল আর হিরো। ফিমেলের চুলে ধুলো বালি, পিঠে ধান খড় মাটি, শাড়িতে পাছার কাছটায় মাঠের ঘাস, খড় মাটি ঘষে লেপটে গেছে। মাথা নামিয়ে হাঁটছে। মুখ তোলো, না হলে গাঁয়ের লোক তোমার দেখবে কী? কাঁধে তার ছেঁড়া ফোমের ব্যাগ দোল খাচ্ছে। ও মা, বাচ্চা রয়েছে যে! কাঁখে বাচ্চা। বাচ্চাটা কাঁদছে, তীব্র রাগে হাত পা ছুঁড়ছে একনাগাড়ে। গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক দাঁড়িয়েছে পথের দুপাশে। তাদের গায়েও ধান, খড়, মাটি, পাখির পালক। ফিমেলের গায়েও তাই। শীতের হাওয়া হঠাৎ আবার বল পেয়েছে যেন, মাঠের খড় উড়োচ্ছে, ধুলো সাঁই সাঁই পাক খাচ্ছে।

নরোত্তম চিৎকার করল, দেরি হলো কেনে?

বাদশা মোহন মাইতি চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়ে জবাব দিল একটু জোরে, 'ল্যাংবোট লিয়ে এস্যাছে যে।'

কাঁখের বাচ্চা সামলায় জবারানী, তার মুখে হাত দেয়, চুপ কর বাপ, চুপ কর, বাবুরা বকব্যা, মারব্যা।

বাচ্চা কোলে জবারানী বসল বটতলায়। নরোত্তম দাস তার দিকে এগিয়ে এল, নরোত্তমকে দেখে জবারানী তাড়াতাড়ি বলে, কুনো চিন্তা নাই দাসবাবু, এমনি খুব ঠাণ্ডা, কেনে যে ইমন করছে।

জবারানীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়। মৌচুরিয়ার লোক ভীড় করছে তার চারদিকে! বাচ্চার কান্না থামছে না।

(শারদীয় পরিচয়—১৯৮৯)

জল ও বায়ু

তলাপাত্রবাবুর বাড়ি পছন্দপুরে নয় বটে, কিন্তু চোদ্দমাস এই গঞ্জ-বাসে তিনি এখানের একজন হয়ে উঠেছিলেন। ফুডের ইন্সপেক্টার, দারুণ ঘুষ খেতেন, কাউকে ঘুষের হাত থেকে রেহাই দিতে জানতেন না এমন মানুষ রামশঙ্কর তলাপাত্র চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থেকে বাঁকুড়া পুরুলিয়া সীমান্তে আমাদের এই পছন্দপুরে বদলি হয়ে এসেছিলেন কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়ে। পছন্দপুরের কথা বলতে হলে তাঁকে বাদ দেওয়া যায়না, কেননা পছন্দপুর তার যাবতীয় রুক্ষতা পাথর টিলা বিলীয়মান জঙ্গল লাল মাটি নিয়ে মুগ্ধ করেছিল নাকি তলাপাত্রবাবুকে। তাঁর মন হরণ করেছিল। তিনি জোর গলাতেই বলতেন, তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি-জীবনে এমন ভালো জায়গায় কখনো পোস্টিং পান নি, এখানে যেমন সহজে শ্বাস নেওয়া যায় তেমন সহজেই বাঁহাত ডানহাত একসঙ্গে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, কেউ কোনো প্রশ্ন করে না, বেনামি দরখাস্ত পাঠায় না ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, এ জায়গায় একশো বছর চাকরি করা যায়।

পছন্দপুরের কথা বলি। আমাদের এই গঞ্জ বলুন, শহর বলুন, এর নাম পছন্দপুর হলেও এখানে আসা বাইরের মানুষ কখনো একে পছন্দ করে নি। এখানে কেউ কখনো চাকরি পায় না, এখানের অফিস-কাছারিতে বাইরের মানুষ চাকরি করতে আসে। আর আসার দিন থেকে হিসেব কষতে থাকে কবে মুক্ত হতে পারবে এই নির্বাসন দণ্ড থেকে। হাইস্কুলের টিচার তারাপদবাবু তো বলেনই, আর পাঁচ বছর চাকরি আছে, কাটাতে পারলেই হয় দুর্গাপুর না হয় বার্নপুর কোথাও গিয়ে জমি কিনে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। পছন্দপুরে কী আছে মশায়?

পছন্দপুরে কী আছে তা আমরা ঠিক জানি না, তবে এ দেখেছি অফিস কাছারি আর ছোট মাপের রেললাইন থাকায় আমরা কখনো বাইরের মানুষের মুখ থেকে বঞ্চিত হই না। যারা আসে তারা থাকে না, চাকুরে বাবুই হোক আর নিষ্কর্মা ভবঘুরেই হোক। কেন যে থাকবে তাও বুঝি না। সত্যিই তো, পরিষ্কার বাতাস ছাড়া পছন্দপুরে আর কী আছে? ছোট মাপের খেলনা রেলগাড়ি তো কয়েকদিনের ভিতরেই পুরোন হয়ে যায় লোকের কাছে। যারা এখানে আসে তাদের আমরা রাখতে চাইলেও পারি না। চলে যায়। না যেতে পারলে ও পছন্দপুরের নিন্দা করে করেই বুড়ো হয়ে যায়। শুধু একমাত্র ফুড ইন্সপেক্টার তলাপাত্রবাবু আর কিছু ভবঘুরেকে দেখেছি অন্যরকম বলতে। পছন্দ পসন্দপুর-পছন্দপুর উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের গাল ভরে ওঠে হাসিতে। তলাপাত্রবাবুও তো বলেন, যারা তাঁর সন্ধের তাসের আড্ডার সঙ্গী তারাও কেমন দিনের বেলায় তাঁর পাওনা ঘুষের টাকা নিয়ে এসে নিম্নস্বরে বলে, নেন স্যার, পাঁচশোই আছে। এমনটি আর কোথাও দ্যাখেননি ফুড বাবু।

হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় রবিলোচনবাবু একথা শুনে বলেছেন, 'বাহ্, এ তো আপনার হকের পাওনা, ব্যবসা করবে আমার ভাগ্নে এমনি এমনি, পাওনা দেবেনা!'

তলাপাত্রবাবু হাতের তাস দেখতে দেখতে বলেছেন, সব জায়গার লোক তো এসব বোঝে না, হেসে কথা বললেই মনে করে খালি হাতেই কাজ উদ্ধার করবে! আরে মশায়, ডাক্তারের ভিজিট, পুরুতের দক্ষিণা, মাস্টারের মাইনে ক্লিয়ার না করলে যেমন....

কথাটা মাঝপথে থামিয়ে তলাপাত্রবাবু সমর্থন চাইতেন তাসের সঙ্গীদের কাছ থেকে। সবার আগে মাথা দুলোতেন হেড স্যার, ঠিকই তো, ঠিকই তো....।

হেড স্যারের ভাগ্নের কেরোসিন তেলের ডিলারশিপ। তেলের কোটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে ধরে পড়েছিল ইন্সপেক্টারবাবুকে, তিনি যদি সদরে তদ্বির করে ব্যবস্থা করে দেন। আর তেল সে কার্ডের লোককে না দিয়ে চোরাপথে বেশি দামে বাইরে পাঠিয়ে দেয় বটে, না দিলে উন্নতি করবে কী করে ব্যবসায়? বলে ফেলেছিলেন তলাপাত্রবাবু। বাঁ হাত বাড়িয়েও দিয়েছিলেন। তাতেই সব মিটে গেল। নেটার আগে টাকার পরিমাণ নিয়ে রীতিমত দর কষাকষি করেছিলেন তিনি ওই ভাগ্নের সঙ্গে। শেষে টাকা পকেটে নিয়েই তাসের আড্ডায়। হেড স্যারের ভাগ্নে-বউ-এর হাতে চা-চানাচুর। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছেন, চাকরির সঙ্গে সন্ধের আড্ডার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না মশায়, ওটা হলো দিনের বেলার, সার্ভিস ম্যাটার....।

ঠিকই তো ঠিকই তো! ভালোমানুষ হেড স্যার হাসতেন ইন্সপেক্টারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে, ভাগ্যিস আপনি ঘুষ নেন, তাই কাজ হয়, আগের ইন্সপেক্টার আমার ভাগ্নেকে কম ঝামেলায় ফেলেছিল! শেষে কোমরে দড়ি পড়ে আর কী, থানায় টাকা ঢেলে তবে রক্ষে।

চোদ্দমাসের চাকরিতে একদিনও পছন্দপুরের বাইরে রাত্রিবাস করেন নি তলাপাত্রবাবু, তিনি বলতেন, এ জায়গা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, চাকরির শেষ কটা দিন নিশ্চিন্ত করেছে, তিনি যাবেন না।

যাবেন কেন, ভাগ্নেটাকে একটু দাঁড় করিয়ে দিয়ে যান স্যার। হেড স্যার কেমন বিনীতমুখে ইন্সপেক্টারবাবুরকে বলেছেন, নিরাশ্রয় হয়ে তো নেই আপনি।

পছন্দপুর আশ্রয় দেয়। ভবঘুরেরা এখানে আশ্রয় নেয়। চাকুরেবাবুরা ছাড়া আর যেসব বাইরের মানুষ আসে এখানে তারা সকলেই প্রায় ভবঘুরে। এ আসছে, ও যাচ্ছে। তাদের কারোর মাথা একেবারে শূন্য কলসের মতো ঠং ঠং, কারোর বা কানায় কানায় ভরা, অতি সাবধানে ভারি মুন্ড মস্তিষ্ক কোবাদি ধরে নেমে আসছে ছোট লাইনের পাল্কির মতো রেল বগি থেকে। দুই বগির ওই ছোট রেলগাড়িই পছন্দপুরে কখনো চাকুরে কখনো বেকার ভবঘুরে বয়ে আনে। এনেছিল রামশঙ্কর তলাপাত্রকে। একদিন উদভ্রান্তের মতো বাক্স-বিছানা সঙ্গে আধ বুড়ো তলাপাত্রবাবু নেমে এসেছিলেন বিকেলের ট্রেন থেকে। সারা গা কয়লার ধোঁয়ায় কালো, পাকা গোঁফ ঝুলঝুল, তাতেও কয়লার ধোঁয়াধুলো, রঙ-জ্বলা বহু পুরোন টেরিকটনের প্যান্ট ঢলঢল করছে কোমরে, গায়ে খাঁকি ফুলহাতা সোয়েটার, পায়ে বেল্ট লাগানো পুরোনো ছেঁড়াফাটা সেলাইএ জোড়া কাবলি জুতো, মাথার অর্ধেক পাকা চুলে তেল পড়েনি কতদিন! লোকে ভেবেছিল ঘরপালানো ভবঘুরে, সন্দেহের চোখে তাকিয়েও

ছিল। পরিমাপ করেছিল—আধপাগল না ধুমপাগল, সেয়ানা না সরল, থাকবে না যাবে আবার। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেই মানুষটা যখন চারদিকে তাকিয়ে অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিল, বাহ্, বেশ তো জায়গাটা। লোকের সন্দেহ তাতে কমে এসেছিল। শুধু অপছন্দ করতে এ নামে নি পছন্দপুরে।

পছন্দপুর ভবঘুরে আধপাগলের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল যে কবে তা কেউ জানে না। বোধহয় ওই ছোট লাইনের আরম্ভ থেকে। ওই খেলনাগাড়ির মতো ট্রেন প্রায়ই এক একজন ভবঘুরে শূন্য অথবা ভরাট মাথার মানুষকে ঠিক দুপুরে অথবা সন্ধের সময় নামিয়ে দিয়ে কু ডাকতে ডাকতে চলে যেত পরের স্টেশনের দিকে। এখানে একটা ষ্টেশন আছে বটে কিন্তু তা ফাঁকা মাঠ, না আছে স্টেশন ঘর না আছে রেলের লোক। ষ্টেশনমাস্টার নেই পয়েন্টসম্যান নেই টিকিট নেই। ট্রেন আসা-যাওয়ারও ঠিকঠিকানা নেই। দু দিন বন্ধ থাকার পর হঠাৎ একদিন এল হয়তো কুহু ডেকে ডেকে। এসে থেমেই থাকল এখানে সারারাত। শুধু ফোঁস ফোঁস শব্দ আর ধোঁয়া। সারারাত ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দে ঘুম চটকে যায় হেড স্যারের। তিনি বিয়ে করেননি, ভাগ্নে-ভাগ্নি নিয়ে থাকেন। এক ভাগ্নে দাঁড়িয়েছে, আর একজন দাঁড়ায় নি। এক ভাগ্নির বিয়ে হয়নি এখনো। চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় খুব পাতলা। ওই ট্রেন-ইঞ্জিন-বগিকে পছন্দ করেন না হেড স্যার রবিলোচনবাবু। একবার ওখান থেকে এক ভীষণ পুরুষ ভবঘুরে নেমে তাঁর আরএক ভাগ্নিকে প্রায় ছিঁড়ে খেয়েছিল জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে। তা নিয়ে কত কান্ড! লোকটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পছন্দপুরের মানুষ। তাতে খুনের মামলা চালু হয়ে যেতে পারে এই ভেবে হেড স্যার বলেছিলেন, থাক, ওকে আবার গাড়িতে তুলে দাও, মানুষ কি সত্যিই মারতে পারবে পছন্দপুরের মানুষ?

সে এক কান্ড বটে। পছন্দপুরের মানুষ এখনো সেই প্রসঙ্গে কথা এলেই বলতে আরম্ভ করে। কী আর আছে এখানে, ওই ট্রেন আর বাইরের মানুষ ছাড়া! শিলাবৃষ্টিও এখন আর আগের মতো হয় না। হয়েছিল সেই বহুকাল আগে একবার। বিশ কে. জি. ওজনের একটি বরফ পড়েছিল আকাশ থেকে জঙ্গলের ভিতর। রাখালরা দেখে এসে খবর দিয়েছিল। সেই বরফ গলতে নাকি সময় নিয়েছিল বাহাত্তর ঘন্টা। সেই একবার। আর একবার সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর ভীষণ পুরুষ ভবঘুরের কান্ড। ধরে বেঁধে তাকে ট্রেনে তুলে দিতেও কম বিপত্তি হয়নি। গার্ড ড্রাইভার তুলতে চায় না, বলল, কোথায় নিয়ে যাব?

যেদিকে ইচ্ছে, এ অপরাধী।

না, ফুঁসে উঠেছিল লোকটা, তাহলে সুন্দর বলে এই জগতে কিছু থাকে না।

লোকে হেসে বলল, পাগল! পাগলের কাম বেশি হয়, ও অপরাধী তো বটেই।

তাহলে পুলিশে দিন, রেলের লোক বলল।

পুলিশে দিলে খবর রাষ্ট্র হয়ে যাবে, তাতে জড়িয়ে যাবে তাঁর ভাগ্নী, এ আশঙ্কায় হেড স্যার ওদিকে যান নি, বলেছিলেন, আপনাদের গাড়িতে করে এসেছিল, ফেরত দিলাম।

ভবঘুরে কিন্তু যেতে চায়নি, আশ্চর্য হেসে বলেছিল, 'ফের ঘুরে আসব, এখানকার মেয়েদের মতো ভালোবাসতে পারে না কেউ, আহা কী অপরূপ আঁখি দুটি, কী সুন্দর হাসে সে, কী মোলায়েম তার বুক! এ জায়গার একটা মানে বোঝা যায়।

হেড স্যার লাল হয়ে গিয়েছিলেন। বিড়বিড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী বোঝা যায়?

মানে বোঝা যায়। —এখানকার রোদ এত গরম কেন, এখানে এত হাওয়াই বা ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে আসে, এখানকার মেয়েরা ভিতরে ভিতরে এত সুন্দর কেন?

হেড স্যার কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। শুনেছিলেন ভবঘুরে জোর করে টেনে নিয়ে যায়নি তার ভাগ্নিকে। মেয়েই প্রলুব্ধ করে ওকে জঙ্গলের দিকে যেতে বাধ্য করেছিল। তেমন রূপ ছিল না তার, কিন্তু চোখে মায়া ছিল জলের। ঘোর বৈশাখ। দুজনে জঙ্গলের ভেতরে উল্লাসে ফুল ফুটিয়ে দিয়েছিল পলাশ গাছে। পরস্পরকে পরস্পর ছুঁয়ে দেখেছিল, বাতাস যেমন ছুঁয়ে যায় ফুলপাতা। এক রাখালের চোখ পড়ায় সব জানাজানি হয়ে যেতে গোলমাল। লোকজন ছুটে গিয়ে দেখেছিল যুবতী দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছে ভবঘুরের উদোম পাহাড় শরীর। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে রুক্ষ বুক। পছন্দপুরে বৃষ্টি নামলে যেমন শব্দ হয়, চুম্বনের শব্দ সেইভাবে জঙ্গলময় ছড়িয়ে যাচ্ছিল যেন। বৈশাখের পোড়ামাটি থেকে উঠে আসছিল সোঁদা গন্ধ। রাখাল না দেখলে আরো কী যে ঘটে যেত! সব পোয়াতে হত হেডমাস্টার মশায়কে। সেই মেয়ে এখন দু সন্তানের মা, থাকে বার্নপুর। পছন্দপুরে আসে নি বহুদিন। কেননা এলে নাকি তার আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। স্বামী সংসার সব ভুলে যায়।

এখন হেডস্যার হলেন ইন্সপেক্টার তলাপাত্র বাবুর সঙ্গী। সেই ভবঘুরে আর এই ফুডবাবু ছাড়া পছন্দপুরকে ভালবাসেনি কেউ। হেড স্যার কখনো সখনো রেখে ঢেকে ভবঘুরেটির কথা বলে ফেলেন, সে বলেছিল, এই যে তেজীয়ান রোদ্দুর, নরম বাতাস, সুন্দর হৃদয়ের যুবতি, জলের মত তার টলটলে দুই আঁখি, এ তো এমনি হয় নি—কেন হয়েছে তাও জানি না, আচ্ছা, পছন্দপুরে যে হাওয়া ঘোরে তার আসল ঘরটি কোথায়?

তলাপাত্র বলেন, না না, সোনারপুরে আমার ঘর নয়, সেখানেও তো একা থাকতাম। ঘর আমার মেদিনীপুরে, কতদিন যে যাইনি!

যাবেন না?

যদ্দিন ভালো লাগে থাকি এখানে, কেউ তো আমি ঘুষখোর বলে, চোর বলে পিটিশন দেয়নি উপরে যে আবার বদলি হবো!

দুই

হেড স্যার রবিলোচনবাবু একদিন সন্ধেয় তলাপাত্রকে ধরে পড়লেন, উপকার করবেন একটা?

ফুড ইন্সপেক্টারের অভিজ্ঞ চক্ষু বুঝে ফেলেছে, সত্যিই বিপদ হয়েছে হেড মাস্টার মশায়ের, সত্যিই উপকার চান তিনি তাঁর কাছে। গম্ভীর হয়ে বললেন, কাল দুপুরে অফিসে আসবেন।

না না এটা আমার ভাগ্নের ব্যাপার নয়।

তাস ফেলে দিয়ে তলাপাত্র বললেন, তা আমি জানি, ভাগ্নের সব খবর আমার জানা, আড়াই টাকার কেরাসিন যে ছটাকা লিটারে বিক্রি করছে বাজারে তাও আমার জানা।

হেড স্যার বিপন্নমুখে বলেছেন, কী করি বলুন দেখি, পয়সার নেশা ওর, কিছুতেই শুনবে না।

শুনলে তো শুধু কেরাসিন ডিলার হয়েই থাকতে হবে, সিমেন্ট নামাচ্ছে বাজারে সে খবর জানেন?

হেড স্যার বললেন, কী করবে, লেখাপড়া করল না, আমার ভাগ্নে কিনা এইচ.এস. পার হতে পারেনি, লোকের কথা শুনলে কি আমার ভালো লাগে? টিটকিরি মারে না অন্য মাস্টাররা!

হিহি করে হেসেছেন তলাপাত্র, সব হিংসেয় বলে, তারা কি জানে, এই এলাকার ছাব্বিশটা ডিলারের ভিতরে আমাকে মানথ্লি পেমেন্ট সবচেয়ে বেশি করে আপনার ভাগ্নে।

হেড স্যার ডাকলেন ভাগ্নে বউকে, ললিতা আর এক কাপ চা দাও দেখি মা, ইন্সপেক্টারবাবুর আজ যেতে দেরি হবে।

তলাপাত্র বললেন, না না চা লাগবে না, আমি এখন উঠছি রবিবাবু, কথা কাল দুপুরে হবে।

হেড স্যার ছাড়লেন না। পিছনে পিছনে হাঁটছেন। হাঁটতে হাঁটতে ধরে ফেলেছেন তলাপাত্রকে, এটা ঠিক ওসব ব্যাপার নয়, মানে আমার ছোট ভাগ্নিটার বিয়ের ব্যাপারে একটু কথা বলতাম।

তাহলে কাল দুপুরে কথা হবে।

দুপুরে কথা হয়েছিল। কথা শোনার জন্য অবশ্য দক্ষিণা গ্রহণ করেননি তলাপাত্রবাবু। তবে বলেছিলেন ঘটকবিদায় নেবেন, ওটা ঘুষ হবে না। দিতেই হবে কেননা হেড স্যার এক ডিলারের কথা বলেছিলেন, পছন্দপুরের কাছেই রাঙামাটিতে ঘর, বয়স কম, বিবাহযোগ্য। তার সঙ্গে যদি ভাগ্নির বিয়ের সম্বন্ধটা ঠিক করে দেন তিনি, তবে একটা শর্ত পণের টাকা কমাতে হবে।

এই কথা, হয়ে যাবে, ওকে তো বাগে পেয়েছি আমি। তলাপাত্রবাবু হেসে বলেছিলেন, রেশনের চাল গম সব বাইরে বেচে দেয়, দেখুন না কী করি ওকে।

সব কথা পরে হেড স্যার বলেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনকে। যদি তলাপাত্রবাবু না মাথা গলাতেন তবে সম্বন্ধটা ভেঙে যেত। ইন্সপেক্টারবাবুর কথা ঠেলতে পারেনি ভাগ্নির বর। বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন হেড স্যার। আগেরটার মতো এই মেয়েটিও স্টেশনধারে, পলাশ জঙ্গলের দিকে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল। যদি কিছু ভালোমন্দ ঘটে যায় তো সহ্য করা কঠিন হত তাঁর পক্ষে।

তলাপাত্রবাবুর লাভ হয়েছিল দু পক্ষ থেকে। ঘটক বিদায় মোটা টাকা আদায় করেছিলেন তিনি। বলতেন টাকার দরকার। টাকা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। অথচ স্বপাকে খেতেন, দড়ির খাটিয়ায় শুতেন, সপ্তাহে একদিন কাচা জামা পরতেন, কাচা প্যান্ট দুমাসে একবার। মাসের প্রথমে মেদিনীপুর থেকে কে যেন আসত, তাঁর ছেলেই বোধহয়। সন্ধের ট্রেনে চলে যেত টাকাপয়সা সংসারখরচ নিয়ে। এ বাদে মানিঅর্ডারও করতেন তিনি মাসের মাঝখানে। ব্যাঙ্ক একাউন্ট ছিল না এখানে। মাসের প্রথম কটা দিন তিনি একটু উদ্বিগ্ন থাকতেন, টাকা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। সারা মাস ধরে তিনি খোঁজখবর রাখতেন তাঁর ছাব্বিশটা ডিলার কী কীভাবে বে-আইনে যাচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই তিনি তাদের চেপে ধরতেন, এবারে আর দুশোয় হবে না পরিমল, আরো এক বাড়াও, যা তুমি করলে চিনি

নিয়ে, চোখে দেখা যায় না।

একটি ভাঙা সাইকেল যোগাড় করেছিলেন তিনি হেড মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে, যখন চলে যাবেন, ফেরত দেবেন এই শর্তে, সেই সাইকেল ফরফর করে পছন্দপুর, রাঙামাটি শালতোড়া, ন' পাহাড়ি সব চক্কর মেরে বেড়াতেন, একবার টায়ার ফাটলে তা কিনিয়ে নিয়েছিলেন হেড স্যারের ভাগ্নের কাছ থেকে। বলতেন, পছন্দপুরের মতো এ ক্লাস মানুষ আর কোথাও নেই!'

একদিন বললেন, আশ্চর্য, আমি যখন নেমেছিলাম ট্রেন থেকে, সেই যে আগের শীতের সময়, সেই সময় আমার কত চুল পাকা ছিল, গায়ের চামড়া কত ঝুলঝুলেই না ছিল, এক বছরে কত বদলে গেছে বলুন দেখি হেড মাস্টার মশায়!

হেড স্যার অবাক, তাই নাকি!

হ্যাঁ দেখুন না।

সত্যি তো! হেড স্যারের যেন মনে হতে লাগল কথাটা সত্যি। একেবারে শাদা মাথা নিয়ে এসেছিলেন তো ইন্সপেক্টারবাবু! কুঁজো হয়ে আধ বুড়ো মতো একটি মানুষ এই তো গেল শীতে নামল ট্রেন থেকে। দেখে মনে হয়েছিল ভবঘুরে। অথচ আজ বোঝার উপায় নেই।

হেড স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কী তেল মাথায় দেন?

তেল তো দিই না।

তবে কী করে হল?

পছন্দপুরের জল-হাওয়ায়, এমন ভালো হাওয়া আমি কোথাও দেখিনি, এমন জলও নয়, ভিতরের কলকব্জার যেসব ময়লা জমেছিল সব ধুয়ে মুছে সাফ।

হেড স্যার খুশি হলেন। তিনি পছন্দপুরের আদিবাসিন্দা, নিন্দা শুনতে পারেন না। খুশি হতে হতে তাঁর যে কী হল, জিজ্ঞেস করলেন, কী যেন বলছিলেন হাওয়ার কথা?

শুধু হাওয়া কেন, রোদ্দুরও, শরীর সব সময় গরম থাকে, খুব উপকারী।

রোদ্দুরও! বিড়বিড় করতে লাগলেন হেড স্যার, বললেন, এই হাওয়া, রোদ্দুরের মানে কী বলতে পারেন?

হা হা করে হাসলেন তলাপাত্রবাবু, এর আবার মানে কী, হ্যাঁ, মানে হয় নাকি?

কোথা থেকে আসে?

আবার হাসলেন তলাপাত্রবাবু, আসে মানে কোথা থেকে আসবে আবার? কী যে বলেন আপনি? হ্যাঁ, আমারও দিন শেষ হয়ে এল মশায়, আর দেড় মাস।

দেড় মাস! তারপর?

রিটায়ার করে যাব, চিঠি তো চলে এসেছে, এ মাসে পেমেন্টটা একটু বেশি করে দিতে বলবেন মশায় আপনার ভাগ্নেকে।

হেড স্যার জিজ্ঞেস করলেন, রিটায়ারের পর?

বাড়ি চলে যাব। তলাপাত্রবাবুর কথায় কেমন বিষণ্ণতা ফুটে উঠল।

পেনশন তো হবে?

সে আর কটা টাকা, মাইনে আর টাকা পাই মশায়, আসল আয় তো ডিলারের কাছ থেকে। মাইনে হল চাকরি করছি তার প্রমাণ। আর আয় হল, আমার ঘুষের টাকা। এর

জন্যে সাইকেলে কত ঘুরতে হয় বলুন! টাকা কী কেউ এমনি ছাড়ে? আপনার ভাগ্নেও ছাড়ে না। কেউ না! তবে হ্যাঁ, এই পছন্দপুরে ঘুষ আদায় একটু সহজ। ধরুন আমি দোকানে গিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে যদি বলি অমুক ডিলার দিয়ে দেবে, দোকানদার আপত্তি করে না, ছেলে এসে টাকার সঙ্গে তেল-সাবানও তো নিয়ে যায়।

হেড স্যার বললেন, এ হল হাওয়ার গুণ, কী বলেন!

উঠতে উঠতে ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, আপনার ভাগ্নেকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, এ মাসের পেমেন্টা যেন ডবল....।

ঘাড় কাত করেছেন হেড স্যার, বলব।

তিন

দিন পনেরো বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির তলাপাত্রবাবু, মাস্টারমশায়, আপনি বলেন নি?

বলেছিলাম তো!

পনের দিনেই রোগা হয়ে গেছেন ইন্সপেক্টারবাবু, সাইকেলে যেন তল্লাশী করে বেড়াচ্ছেন গোটা এলাকা, ফিরতে ফিরতে রাত হয়, তাসের আড্ডায় অনিয়মিত। ভাগ্নে বলেছিল, মামা ইন্সপেক্টারবাবু টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, রিটায়ার করতে যাচ্ছে, ওকে এখন কেন লোকে বেশি টাকা দেবে?

না না, মানুষটা থাকল এতদিন পছন্দপুরে!

হেড স্যারের ভাগ্নে ধমকে উঠেছে তার মামাকে, লোকটার হয়ে কথা বলবে না তো?

হেড স্যার তাই বসালেন ইন্সপেক্টারবাবুকে, ছেড়ে দিন আর তো কটা দিন।

বিড় বিড় করলেন তলাপাত্র, বাড়িতে লিখেছিলাম রিটায়ার করছি পরের মাসে, তাতে বউ লিখেছে, টাকা যোগাড় করে এনো।

আপনি তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, গ্রাচুইটি....

মাথা নাড়লেন তলাপাত্রবাবু, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ফাইনাল উইথ ড্র করে নিয়েছি মশায়, আর সামান্য কমাসের টাকা জমা পড়েছে, হাজার দুয়েক হবে হয়তো।

আর গ্রাচুইটি?

কবে পাব ঠিক নেই, তা থেকে কেটেও নেবে অনেক, একবার সরকারি ক্যাশ ভেঙেছিলাম বড় ছেলে ব্যবসা করবে তাই, তা সেই ব্যবসাও তছনছ, আমারও সব্বোনাশ, ইনক্রিমেন্ট তো চার বছর বন্ধ, গ্রাচুইটির থেকে বড় অংশ কেটে নেবে, মাইনে আর কপয়সা পাই যে মোটা পেনশন পাব!

হেড মাস্টার মশায় দেখলেন তলাপাত্রের চুলগুলি হঠাৎ যেন বেশি শাদা লাগছে। মুখের সামনের দিকের নিচের পাটির দাঁত যে বাঁধানো তা আজ টের পেলেন তিনি। উত্তেজনায় পরে আসতে ভুলে গেছেন ইন্সপেকটারবাবু, তাই খুব বুড়ো লাগছে, গাল চুপসে গেছে, চোখ ঘোলাটে। বয়স বেড়ে গেছে পনের দিনে অনেক। কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছেন তলাপাত্রবাবু।

হেডস্যার কথা দিতে পারলেন না কোনো। কদিন আবার ইন্সপেক্টারবাবুর দেখা নেই। ভাগ্নে একদিন সন্ধেয় এসে বলল, লোকটা হন্যে কুকুরের মতো ঘুরছে যেন, রাতদুপুরেও

হানা দিচ্ছে ডিলারদের বাড়ি।

হেডস্যার বললেন, ঝামেলায় পড়ে গেছে, তোরা বরং যাওয়ার আগে।

ভাগ্নে বলল, ফেয়ারওয়েল দেব।

কিন্তু কে দেবে ফেয়ারওয়েল? রিটায়ারমেন্টের তখন দশদিন বাকি, ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, এক্সটেনশন পাচ্ছি।

বাহ্ বেশ বেশ তাহলে তো আরো ছ মাস কী বলেন। কথা বলতে বলতে খুঁটিয়ে দেখলেন হেডমাস্টার মশায়। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে লোকটা, ঘাড় বেঁকে গেছে যেন। দাড়ি কামায়নি অন্তত দিনসাতেক, ভ্রূ পেকে গেছে হঠাৎ। ঠিক যেভাবে নেমেছিল রেলগাড়ি থেকে শীতের বিকেলে একেবারে সেই রূপ। কেমন যেন কাঁপছে চায়ের কাপ হাতে তুলতে তুলতে।

চায়ে চুমুক দিয়ে তলাপাত্র বললেন, এবার খাতির নয় মশায়, রেট বাড়িয়ে দিচ্ছি কালই আদায় চাই।

ওসব আমাকে বলছেন কেন? হেডমাস্টার বিরক্ত হলেন যেন।

না না, আপনাকে কেন, ভাগ্নেকে বলে দেবেন, কথাটা বলেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন মানুষটা। তারপর চাপা গলায় বললেন, মাস্টার মশায়, পছন্দপুরের মতো জায়গা দেখা যায় না। এখানকার মানুষও তাই, আপনি তো আমার বন্ধু বটে।

হ্যাঁ। অস্ফুট গলায় বললেন হেডমাস্টার মশায়।

তাহলে শুনুন, বউ চিঠি দিয়েছে, যা টাকাপয়সা পাব সব তাকে আর দুই ছেলেকে লিখে দিলে তবে বাড়িতে ঢুকতে দেবে, আচ্ছা টাকা আর কটা পাব বলুন? তা জানিয়েছিলামও, বিশ্বাস করছে না।

বাড়ি তো আপনার, ঢুকতে দেবে না মানে?

আজ্ঞে না, স্ত্রীর নামে বসতবাটি। ছেলেরা লিখেছে, রিটায়ার যে করছ, কটা টাকা এখন দিতে পারবে, কাজ দ্যাখো আবার, কী যে করি।

হেডস্যার চুপ করে থাকলেন। পরামর্শ দেওয়ার বুদ্ধির অভাব বোধ করতে লাগলেন মনে মনে।

পরদিন হেডমাস্টার মশায় তাঁর ভাগ্নের কাছে শুনলেন, সব মিথ্যে, এক্সটেনশন পাবে কেন, ডিপার্টমেন্টের দাগী ঘুষখোর, সোনারপুরে ডিলাররা ওকে পিটিয়েছিল পর্যন্ত, সদর অফিসে সে খবর আছে।

যাকগে, লোকটা তো চলে যাচ্ছে।

তাই কিছু বলছিনা, তবে অন্যায় আবদার করছে, আগে জানলে আমরাও ওকে পিটিয়ে তাড়াতাম। তবে তাড়াবই বা কী করে, আগের অনেস্ট ইন্সপেক্টর তো লম্বা বাঁশ দিয়ে দিয়েছিল প্রায়, সেই জোরে তো ও পার পেয়ে গেল।

হেডস্যার বললেন, ফেয়ারওয়েলটা ভালো করে দে কী চায় জেনে দ্যাখ একটা টেলিভিশন যদি পারিস, বোধহয় বাড়িতে নেই।

নেবে না ওসব, নগদে ধরে দিতে বলেছে, আমরা তো ভেবেছিলাম শেষ মাসের মাসোহারা না দিয়ে ফেয়ারওয়েলটা দেব ভালো করে, পছন্দপুরের নাম থেকে যাবে।

রিটায়ারমেন্টের আগের দিন আবার হাজির ইন্সপেক্টারবাবু। ঢলঢলে প্যান্ট, খাঁকি সোয়েটার, না-আঁচড়ানো চুল, চুপসানো গাল, কেমন যেন কাঁপছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ মশায় মিথ্যে বলেছিলাম, এক্সটেনশন হবে না তো জানা কথা, আমি চেয়েছিলাম তিনমাসের উপরি অ্যাডভান্স যদি এই কথায় তুলে নেওয়া যায়, তা জানতে পেরে গেছে সবাই, আমি তো একটা চোর, কেন এক্সটেনশন হবে?

হেডস্যার দেখলেন অসংলগ্ন কথা বলছেন ইন্সপেক্টবাবু, টাকাওয়ালা আত্মীয় স্বজন দেখে টাকা খেতে আরম্ভ করলাম মশায় রাণাঘাটে, তারপর অভ্যেস, নিজে চাল পাচার করেছি পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে থাকার সময়, সব অভ্যেস, ফুড মুভমেন্টের সময় সরকারি গোডাউনের চাল ঘরে এনে তুলেছি, সব অভ্যেস, ইস! তাতে শুধু আমার নয় বউ-ছেলেমেয়েরও অভ্যেস হয়ে গেছে। লিখেছিলাম রিটায়ারমেন্টের পর শূন্য হাতেই যেতে হবে, তাতে জবাব এসেছে নিজের পথ নিজে দ্যাখো, মিথ্যে বলে পার পাবে না....।

বাদ দিন বাদ দিন, কফি খাবেন?

মাথা নাড়লেন তলাপাত্রবাবু, না না, আমি কিনা আপনার কাছ থেকেও টাকা খেয়েছি, অবশ্য তা একটা সৎকাজে লেগেছে, এখন যে আমি কী করি, এমন ফেরে পড়ে গেলাম, দেখি কত নিয়ে যেতে পারি, পছন্দপুরের হাওয়া ভালো রোদ ভালো....

একত্রিশ তারিখে রিটায়ার করেও নড়লেন না তলাপাত্রবাবু। ফেয়ারওয়েল কেন, শেষবারের মাসোহারাও পাননি তিনি। তাঁর পরিবর্তে যিনি হাল ধরেছেন, তিনি বারণ করে দিয়েছেন সব ডিলারকে। বেটা চোর, একদম দেবে না কেউ। ভালোভাবে ব্যবসা করলে টাকা দিতে হবে কেন? আর যদি দাও তো আমাকে দাও, আমিই এখন পছন্দপুরের ইন্সপেক্টর অফ ফুড।

হেডস্যার বলেছিলেন, তা মিথ্যে কথা বলতে গেলেন কেন?

হেডস্যারের প্রশ্নে তলাপাত্রবাবু হাসলেন মুখ কুঁচকে, মিথ্যে বলতে হয়েছিল, ভেবেছিলাম এসব বলে যদি কিছু বেশি আদায় করে নিতে পারি।

আদায় তলাপাত্রের হল না। একদমই নয়। শেষ কদিন ঘুরতে লাগলেন এর ওর দোকানে, গোডাউনে, বাড়িতে। আর ফিরতে লাগলেন শুকনোমুখে। সকলে আজ দেব, কাল দেব, পরশু দেব করে ঘোরাতে লাগল। শেষে কেউ আর বসতে বলে না। দিন ফুরিয়ে গেল। বসতে বললেও কথা বলে না। কথা বললেও সামান্য দু একটা, কবে যাচ্ছেন বাড়ি ইত্যাদি। চা খেতেও বলল না কেউ। ফেয়ারওয়েল হল না। যারা এবেলা ওবেলা সেলাম ঠুকত, তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে লাগল।

তিনি বলতে লাগলেন, পেমেন্টটা দাও, বাড়িতে খুব দরকার টাকার, চাকরি শেষ হয়ে গেল।

কথা কেউ কানে নেয় না। শেষে তিনি একা একা বসে থাকেন পথের ধারের একটি চায়ের দোকানে। বেঞ্চিতে পথ মুখো হয়ে। শীত চলে গেলেও তখন তার শেষ কামড় যায় নি। সকালে হু-হু উত্তুরে বাতাস দেয়। তাতে তাঁর সব পাকাচুল খাড়া হয়ে গেল। মাথা ঝুলে গেল, শরীর কাঁপতে লাগল। তাঁকে তখন মনে হত ঠিক যেন একটি রুগ্ন অথর্ব বুড়োবাঘ। দাঁত নেই, মাংস খাওয়ার লোভ রয়েছে ষোল আনা। ডাকছেন ক্রমাগত, ও সাহাবাবু শুনে যান, ওহে নিতাই, শুনে যাও, ও মণ্ডলবাবু আপনি নাকি গমের কোটা

বাড়িয়ে নেবেন বলেছেন...।

রেশন দোকানের মালিক হনহন করে হেঁটে যায় তাঁকে নজর না করেই। নজরে এল শুধু হেডস্যারের, স্কুল-ফিরতি দাঁড়িয়ে পড়েছেন, এ কী তলাপাত্রবাবু, এখানে কেন চা খাচ্ছেন, চলুন আমার বাড়ি চলুন।

মলিন হেসে উঠে দাঁড়িয়েছেন ইন্সপেক্টারবাবু, আজকে আর নয়, গোবিন্দ সাহা ফিরবে, শালতোড়ার ডিলার, তিন মাস টাকা বাকি রেখেছিল ও, ধরব বলে বসে আছি।

ছিহ্, খবর পাঠান ঘরে এসে দিয়ে যাবে।

আসবে না, বেটা খুব কঞ্জুষ, বেইমান, কী আর করি বলুন, বাড়িতে শূন্য হাতে তো ঢুকতে পারি না।

হেডস্যার বললেন, পছন্দপুরের লোকতো এমন নয় যে বেইমানি করবে, আচ্ছা দাঁড়ান, ওকে ডেকে পাঠাব, ওর ছেলেটাতো আমার ইস্কুলে পড়ে।

না, পছন্দপুরের লোক এমন হবে না-ই ধারণা ছিল, আচ্ছা মাস্টার মশায়, চলে তো যাব, আমি বরং এখানে বসে হাওয়া রোদটা দেখে নিই কী বলুন, আপনি ঘরে যান, আহ্! শ্বাস নিয়ে কী আরাম! এ জায়গার একটা মানে আছে কী বলুন!

হেডস্যারের মনে পড়ে যায় সেই ভবঘুরের কথা। সেও এরকম কী একটা কথা বলতে বলতে চলে গিয়েছিল পছন্দপুর থেকে দূরে। কেমন যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই মায়ায় জড়িয়ে গেছে ইন্সপেক্টরবাবু।

হেডস্যার সন্ধ্যেবেলায় তাঁর ভাগ্নেকে বললেন, তলাপাত্রবাবুকে সকলে মিলে কিছু সে, খারাপ লাগছে, ওভাবে বসে থাকে সারাদিন।

মাথা ঝাঁকায় ভাগ্নে, টিভি নেবে না, টাকা নেবে, এখন আর ডিলাররা ইনটারেস্টেড নয়, নতুন ইন্সপেক্টারবাবুর পিছনে ঘুরছে সকলে।

বল সকলকে আর একবার।

সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে ভাবছে রিটায়ার তো করেই গেছে, ওর পিছনে ফের পয়সা খরচ করব কেন, বারো মাসে কম তো নেয় নি।

হেড স্যার মানতে পারলেন না। তাঁর ভাগ্নেও এড়িয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেন। কিন্তু পছন্দপুরে তো আরো মানুষ আছে। তারা শুনে বলল, এ হতে পারে না, দিনভর বসে থেকে থেকে মানুষটা শুধু ধুলো খাচ্ছে, আরো বুড়ো হয়ে গেছে, চোখে দেখা যায় না। পছন্দপুরে এসে কেউ মনখারাপ করে ফিরবে এ হতে পারে না। আমরা যারা পছন্দপুরের আদি বাসিন্দা, বৃত্তান্ত শুনে বললাম, কত চাই ওঁর, চাঁদা করে তুলে দিচ্ছি, ঘরে ফিরে যান।

তলাপাত্র এ কথায় মাথা নাড়তে লাগলেন, না না, দেবে ডিলাররা, আপনারা কেন, আপনাদের তো কোনো উপকার করিনি আমি।

তা হোক, আপনি এক বছরের উপর পছন্দপুরে থাকলেন, আমরা আপনাকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি, ঘরে ফিরে যান।

মাথা নাড়তে লাগলেন তলাপাত্রবাবু, বিড় বিড় করতে লাগলেন, কার কাছে যাব ঘরে? তারা তো টাকা চেনে, আমাকে নয়। খুব ভুল হয়ে গেছে, যদি আমি আগে আসতাম পছন্দপুরে, সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে, তাহলে হয়তো এই অভ্যেসটা হত না, ঘুষের অভ্যেস।

এখানকার আলো-বাতাসের একটা মানে আছে, কী বলেন, আমি অবশ্য এখানে এসে তাই ঘুষও কমিয়ে দিয়েছিলাম, সোনারপুরে আরো অনেক বেশি পেতাম...।

একই কথা বলতে লাগলেন তলাপাত্রবাবু কদিন ধরে, পথের ধারে বসে। মানুষটা ক্রমশ আলাদা রকমের হয়ে যাচ্ছিল। আক্ষেপ করছিল, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এলে হয়তো ঘুষ ও ছুঁয়েও দেখত না আর। ঘুষ নিয়ে নিজের তো কোনো লাভ হয় নি। স্ত্রী পুত্র আর টাকার দাস হয়ে গেছেন তিনি। আহ্! পছন্দপুর কী সুন্দর জায়গা, আমার পাকা চুল কালো হয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত!

এরপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেছেন ইন্সপেক্টার তলাপাত্র। মানে রেলগাড়িতে চেপে বসেছেন সবার অলক্ষ্যে। আমরা পরের দিন সকলে মিলে গার্ড আর ড্রাইভারকে ধরেছি, আপনারা কি ইন্সপেক্টারবাবুকে ফেরত নিয়ে গেছেন?

কয়লামাখা বুড়ো ড্রাইভার আর বুড়ো গার্ড খিকখিক করে হাসতে লাগল, ফেরত নিয়েছি, আগেরবার আপনারা তুলে দিয়েছিলেন এক ভবঘুরেকে জোর করে, এবার আমরাই ফেরত নিলাম, বললাম উঠে পড়ো হে তলাপাত্র, আর এখানে কেন?

উঠে গেল?

গেল বটে, কিন্তু বলে গেছে ফের আসবে, ছাড়বে না এ জায়গা, এখানে সহজে ঘুষ যেমন পাওয়া যায়, ইচ্ছে করলে ঘুষ না নিয়েও আনন্দে থাকা যায়, এখানে পাকা চুল কালো হয়, নড়বড়ে দাঁত শক্ত হয়ে এঁটে বসে মাড়িতে, গায়ের ঝোলা চামড়া টান-টান হয়ে যায়, চোখের পাওয়ার নাকি বাড়ে, এখানে থাকার মানে আছে নাকি একটা, এখানের...। বকবক করতে লাগল গার্ড, ড্রাইভার দুই বুড়ো।

হেডস্যারের চোখ ছলছল করে উঠেছে, আর এসেছে তলাপাত্র।

এসেছিল রামশঙ্কর তলাপাত্রর যন্ডামার্কা দুই ছেলে, প্রায় দেড় মাস বাদে তাদের অকৃতজ্ঞ পিতার খোঁজ করতে। এসে চিৎকার করতে লাগল, শুয়ারটা পালিয়েছে! যাবে কোথায়, টাকা আদায় করবোই।'

পছন্দপুরের মানুষ তাদের মারতে মারতে তুলে দিয়েছিল রেলগাড়িতে। তারা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলেছিল, 'শোধ নেবে বাপের উপর, নতুবা এই পছন্দপুরের উপর, এখানকার থেকে সোনারপুর অনেক ভালো ছিল, ওখানে পিটানি খেলেও বাবা টাকা আয় করেছে অনেক বেশি, বাবা এখানে এসেই নষ্ট হয়ে গেল।

পছন্দপুরের হেডমাস্টার মশায় এখন চেয়ে থাকেন রেললাইনের দিকে দিনভর। তিনি তো রিটায়ার্ড। বারান্দা থেকে রেললাইন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কী যে দেখেন! দুহাত দূরের মানুষ না চিনলেও, হঠাৎ ডেকে ওঠেন ভাগ্নেবউকে, দ্যাখো তো, কুঁজোমত কয়লার গুঁড়োমাখা একটা ভবঘুরে মনে হচ্ছে না? তলাপাত্রবাবু কি? না সেই আগের জন সেই রূপবান...এই যে ইন্সপেক্টারবাবু এদিকে-এ-এ-এ...।

শূন্যপথে তখন ধুলো ওড়ে। [illegible] হাওয়া ঢুকছে পছন্দপুরে প্রতিদিন একটু একটু করে। চোখ ঝাপসা হয়ে যায় ভাগ্নে বউ-এরও। [illegible] আঁচল চাপা দেয় সে।

([illegible] — ১৯৯০, শিরোনাম পরিবর্তিত)

কোকিল

দাঁত খুঁটতে খুঁটতে অচিন্ত্য বোস জিজ্ঞেস করল, কবে জয়েন করলে যেন?

আজ্ঞে, হপ্তাখানেক হয়ে গেল বাংলা পনেরোই কার্তিক, বুধোবার। হাত কচলে হাসতে চেষ্টা করল গৌর মিদ্যে। হাসি আর ভয় মিলে মিশে মুখখানি ক্রমশ ভাবলেশহীন।

টেবিলের নীচ দিয়ে টান টান করে দিল অচিন্ত্য তার দু'টি সবুট পা। জুতোর ডগা যেন সামনে দাঁড়ানো গৌর মিদ্যের হাওয়াই চটির অগ্রভাগ ছুঁয়ে আঙুল স্পর্শ করল। তাতে নতুন পিয়ন না পারছে সরতে না পারছে বলতে, টের পেয়েও অচিন্ত্য পা সরায় না, হেসে বলল, লগ্ন তো বিচার করেই ঢুকেছো, তবে বাবা এ হলো গভমেন্ট অফিস, ওসব বাংলা কারবার এখানে চলে না।

গৌর মিদ্যে সামান্য নড়ল যেন, অতি সন্তর্পণে অচিন্ত্যর নর্থস্টারের ডগার নীচ থেকে সরিয়ে নিল তার বাঁ পায়ের পাতা। ইউ. ডি. বাবু কী বলেন শুনতে হবে তাকে।

অচিন্ত্য বোস ব্যাগ থেকে খবরের কাগজ বের করে পা টেনে নিল স্বাভাবিক ভাবেই। গম্ভীর হয়ে বলল, 'এক গ্লাস জল আনো দেখি, তুমি এ টেবিলের পিয়ন, ডাকামাত্তর হাজির থাকবে।'

গৌর মিনমিন করে বলল, 'আজ্ঞে দিদিমনিও যেন বলেচেন ওই কতা।'

দিদিমণি, এ অফিসের এল, ডি. বন্দনা চ্যাটার্জী, তাকে অচিন্ত্যর না পছন্দ, কথাটা কানে না নিয়ে ফের পা বাড়িয়ে দিল, সরে দাঁড়াও, অত ঝুঁকে দাঁড়াবে না, গায়ে পা লাগছে, জল নিয়ে এস।

অফিসটা মফস্বলি গঞ্জে। গঞ্জ এখন শহর হওয়ার মুখে। এ অফিসে ইউ. ডি. অচিন্ত্য বোসের দাপট খুব। জয়নগরে বাড়ি, জমি পুকুর বাগান, সবই পৈতৃক। যায় মাসে একবার। এখন এই গঞ্জে দোতলা বাড়ি হাঁকিয়ে একতলার জন্য ভাল ভাড়াটে খুঁজছে, যে বললেই উঠে যাবে, ভাড়া আর সেলামি দেবে বেশি। গিয়েছিল দক্ষিণ ভারত ট্যুরে, ছুটির মধ্যেই নতুন চাকরি পাওয়া পিয়ন জয়েন করেছে।

বাড়ি কোথায়? অচিন্ত্য জল ঢকঢক করে গৌরের দিকে তাকায়।

আজ্ঞে কাছেই, মাঠেমাঠে হেঁটি গেলি সাত মাইল, পুরন্দরপুর, থানা মগরাহাট।

হেঁটে আসা হয়?

হ্যাঁহ্! বর্ষাকালডায় একটু অসুবিধে হবে। গৌর মিদ্যের মুখে যেন হাসি ধরে না।

তা চাকরিটা পেলি কী করে? অচিন্ত্য আর তুমি বলার প্রয়োজন বোধ করে না, এ বেটা খাঁটি চাষা, হাল দিয়ে যেন মাঠ থেকে উঠে এসেছে সরকারি অফিসে।

গৌর বলল, আজ্ঞে সার, মধুবাবু করি দেছেন।

কে মধুবাবু? অচিন্ত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

আজ্ঞে মধুসূদন ঘোষ, যাঁর ছেলে বিকাশদা, ব্যাঙ্কে চাকরি করে, পঞ্চাতে মেম্বার হলো ওঁর পরের ভাই বিমলদা, মটোর সাইকেলে নেচে বেড়ায়।

চেনে না অচিন্ত্য বোস। এ থানার লোক নয়। তবে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল নিশ্চয়ই। এ বাজারে পিয়নের চাকরিরও কম দাম নয়। জেনে নেওয়া ভাল কার লোক এই গৌর মিদ্যে, সেইমত কাজে লাগাতে হবে। না হলে হঠাৎ যদি ফোঁস করে পার্টির জোরে।

কত টাকা লাগল চাকরি পেতে?

মাথা নাড়ে গৌর, আজ্ঞে লাগেনি, তিনি খুব ভালমানুষ, আমরা তাঁর সাতপুরুষের ভাগচাষী।

কথা বলতে বলতে গৌর মিদ্যে খালি চেয়ারটায় বসবে বসবে করেও বসতে সাহস পায় না। এ চেয়ার বাইরের পার্টির জন্য, তারা অচিন্ত্যবাবুর সামনে এসে বসবে, ফুসফাস করবে, সিগারেটের প্যাকেট দেবে। অচিন্ত্য গৌরকে বসতে বলায় সে অভিভূত প্রায়, না বসে হাত কচলে বলল, 'আর এক গিলাস জল দেব?'

মাথা নাড়ে অচিন্ত্য, তারপর আচমকাই জিজ্ঞেস করে, 'ইয়ের চাকরি?'

আঁজ্ঞে! গৌর যেন হকচকিয়ে যায়।

ইয়ে মানে বুঝিস না? অচিন্ত্যর নাকমুখ কুঁচকে যায়।

আজ্ঞে আমরা হচ্ছি গে চাষা, পুনড়ু ক্ষত্তিয়ো। গৌর যেন বুঝতে চেষ্টা করছে।

তাহলে আর কী, ঢুকলি পিওন হয়ে, বেরোবি আমার উপরঅলা হয়ে।

গৌর চেয়ারে বসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় অপরাধীর মত। বিপন্ন মুখে হাসতে চেষ্টা করে, 'কী যে বলেন সার, তা কি কখনো হয়, এমুন অধম্মো ভগমানেও সহ্য করবে না, আপনারা দেলেন বলেই তো চাকরি পালাম, আমাদ্দের চোদ্দপুরুষি কেউ কোনোদিন চাকরি পায়নি।'

গৌরের কথার ভিতরেই অন্য প্রান্ত থেকে ডাক এল মিহিন নারীকণ্ঠে, 'গোউর!'

বন্দনা চ্যাটার্জী এই এলেন। গৌর ছুটল। এখন জল দিতে হবে, চা দিতে হবে, টেবিল মুছতে হবে, আর যদি তিনি ইচ্ছে করেন তো র‍্যাক থেকে দুটি একটি ফাইল—ইচ্ছে ওঁর হয় না তেমন একটা। শীত এখনো পড়েনি বটে, তাই ওঁর অনেক কাজ। শীতের হাত থেকে লোকজনকে রক্ষা করার সব দায়িত্ব যেন ওঁর কাঁধে। গৌরের ইচ্ছে হয় জানতে, এত সোয়েটার কি একজন গায়ে দেবে?

গৌর খাটতে পারে খুব। খাটতে খাটতে জিভ বেরিয়ে গেলেও খাটবে। একেবারে চরকির মত ছুটে বেড়ায়। চাকরি করার আনন্দই যে আলাদা। এই আনল অচিন্ত্যবাবুর সিগারেট, তো বন্দনা দিদিমণির পান। পানের পর দত্তবাবুর মাথা ধরার ট্যাবলেট, তারপর, ঝর্ণা দিদিমণির টিফিন, আলুকষা আর পরোটা, দেখে আনতে হবে, খারাপ হলে উপায় নেই, তাঁর মুখ খুব খারাপ, রাখঢাক কম। এত সবের পরে এ চিঠি ও টেবিলে, ও ফাইল এ টেবিলে, এসব আনা নেওয়া তো আছেই, আর আছে অচিন্ত্য বোসের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বাবুর টেবিলের সামনে নিয়ে আসা। আরো বাড়তি কাজ বন্দনা দিদিমণির সিনেমার টিকিট, কালীবাবুর জন্য কেরোসিন আনা কত কী! যদি কেউ বলে, রাগ করছো না তো গৌর?

না, না, রাগ করলে কী চাকরি করা হবে, তা বাবু আজ একটু শিগগির ছাড়বেন।

কেন? অচিন্ত্য বোসের ভ্রূ বঙ্কিম হয়ে যায়।

হাত কচলায় গৌর মিদ্যে, 'আঁজ্ঞে ডিলারের ঘর থে সার তুলতি হবে।'

সার! সার কী হবে?

আজ্ঞে কপি পালং-এ লাগপে। গৌর বলে।

সে তো জানি কিসে কী লাগে, কিন্তু তোর কী হবে তা?

আজ্ঞে চাষ আছে তো, আমি চাকরি পাবার পরে ভাই করে, তবে ছুটিছাটায় আমিও হাত লাগাই, ভাগের জমি সব।

অচিন্ত্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করে গৌর মিদ্যেকে, চাষার ভাব অত সহজে যাওয়ার নয়, তিনপুরুষ চাকরি করা দরকার।

গৌর বিড় বিড় করে, আঁজ্ঞে এক অন্নে আছি সব, বাপ আছে মাথার পরে, আপনাদের আশীব্বাদে চলে যাচ্ছে, চাকরি পালাম, যদি ইঁট কেটে কোঠা বানাতে পারি।

বলতে বলতে গৌর মিদ্যের চোখ দুটি বেশ বড় হয়ে যায়। সরল পুঁটির গায়ের মত যেন আঁশ চকচক করে। কোঠা বাড়ি মানে, দেওয়ালটা ইঁটের, কাদায় গাঁথনি দিয়ে দেবে, উপরে টালি, মেঝে মাটিরই থাকবে। তবে কিনা খুব খরচ, মাইনের টাকা যদি রাখা যেত— ভিটে সারাতিই হবে বাবু, এ বছরটা অভাবে গেল, বোশেখ জষ্ঠিতে নোতন ছাউনি দিয়া হলো না।

বন্দনা চ্যাটার্জী ডাকে, গোউর।

যাই। দিদিমনির ডাক এল।

ডাকলেই ছুটতে হবে? অচিন্ত্য দাঁড় করায় ওকে।

গৌর ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায়, বলল, এই যা, জল চেইলো, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতি গে ভুলি গিচি।

অচিন্ত্য বলল, দিদিমনিকে বল একটা সোয়েটার বানিয়ে দিতে।

বলিচি। হাসল গৌর।

এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে। অচিন্ত্যর মুখ কঠিন হাসিতে বুঁজে এল প্রায়, তুই পারবি।

কী পারব? গৌর অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করে।

গুছিয়ে নিতে। সিনেমার ম্যাগাজিন খুলল অচিন্ত্য।

গৌর মিদ্যে মাথা নাড়ে, 'কিন্তু দিদিমনি যে না করে দিয়েছে, বাবার জন্যি বলিলাম, সে বুড়ার খুব ঠান্ডার ধাত, বললাম উল কিনে দিচ্ছি, করে দেন।'

অচিন্ত্য ম্যাগাজিনের লাস্যময়ী নায়িকার শরীরচিত্র থেকে মুখ তোলে, গৌর না সরলে আরো দুঃসাহসিকাদের গোপন চিত্রগুলির পাতা খুলতে পারছে না, বলল, 'যা দেখি এখন, দিদিমনির খুব ডিমান্ড, সেবা কর তবে তো হবে।'

গৌর হাসল, 'সব সময় তো উনি উলবোনে, এডাই ওঁর চাকরি কী বলেন।'

অচিন্ত্য হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গৌরের দিকে। কেমন যেন লাগে ওর। হেলে চাষার ছেলে হেলে চাষা, অফিসে চাকরি করতে আসে যে কেন? তার জয়নগরের জমিতে এরকম তিনটি লোক খাটে। তারা কিন্তু কথা বলে না একদম। গৌর কথা বলে একটু বেশি।

অচিন্ত্য ধমকে ওঠে, যা এখান থেকে, [illegible]

দুই

বাড়ি করে অচিন্ত্যর একটু হাতটান যাচ্ছে। আগের পিয়ন নরেন দাস ছিল খুব এক্সপার্ট। পার্টি ধরা, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা, এসবে ছিল তুখোড়। কথাবার্তায় পালিশ, জামাকাপড় দেখে ফোর্থগ্রেড বলে ধরার উপায় ছিল না। অচিন্ত্যর হাত দিয়ে লোন স্যাংশন হয়, দশ বিশ পঁচিশ হাজার কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, পাম্পসেট কেনার ঋণ। টেন পার্সেন্ট অচিন্ত্য নেয়। ঋণ তো শোধ করে না কেউ। তারপর ওই টাকার অর্ধেক থাকে সাবসিডি, সুতরাং অচিন্ত্য কেন পাবে না শেয়ার। সে তো পার্টিকে বুঝিয়ে দেয় কী কী পথে গেলে ঋণ শোধ না করেও আরামে থাকা যায়, অন্য নামে আবার সরকারের টাকা নেওয়া যায়।

অচিন্ত্য বলে, শোন গৌর, যা বলবো তাই করবি, অন্যথা যেন না হয়।

গৌর ঘাড় কাত করে, আমার বাবা ওই উপদেশই দেয় বাবু, আপনারা যা বলবেন তাই যেন করি, সেবা করি যেন, বাড়িতি গে সব তো বলতি হয়।

অচিন্ত্য অবাক, 'বলতে হয় মানে?'

কী র'মভাবে আপনাদের কাজ করি বলতি হয়, কী কী হলো আপিসে তা বলতি হয়, কোন বাবু কী র'ম, দিদিমনি কেমন উল বোনে সব বলতি হয়।

কে শোনে?

কেন বাপ শোনে, আপনার বউমা শোনে, মা শোনে, আপনার বউমার খুব শখ দিদিমনিরে দেখার, জিজ্ঞেস করে, রঙ ফস্সা না কালো, আমি বলি বড় ঘরের বামুন ঘরের মেয়ে কী কালো হবে তোর মত।

অচিন্ত্য হাহা করে হাসে, জিজ্ঞেস তো করবেই, তোর ঘরে তো কেউ আর চাকরি করেনি কোনোদিন।

হ্যাঁ বাবু! গৌর হাত কচলায়।

অচিন্ত্য ভাবছিল একে দিয়ে হবে কি না। না হলেও হওয়াতে হবে। বোকাসোকা ছেলে। গা দিয়ে ধানের গন্ধ যায়নি এখনো। নরেন দাসটা ছিল অতি চালাক। শেষে নীলমণি পাত্রর কাছ থেকে পাওয়া পাঁচশো টাকা দিলই না, স্রেফ বলে দিল, পাওয়া যায়নি। তার দুদিন বাদেই রিলিজ নিয়ে নিল বদলির অর্ডারের। পরে জানা গেল মিথ্যে বলেছে।

অচিন্ত্য বলল, 'শোন, রতন মুখার্জী বলে যে লোকটা আসে...।'

ওই ফসসাবাবু?

হ্যাঁ, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

অচিন্ত্য গৌরকে বোঝাতে থাকে। গৌর নিবিষ্ট হয়ে শোনে। শোনে আর মাথা নাড়ায়, হ্যাঁ বুঝতিছি। রতনবাবুর কানে কথাটা তুলতে হবে, হাজার টাকা ছাড়া ও ফাইল নড়বেই না। তারপর টাকাটা আদায় করে আনতে হবে।

গৌর কথা বুঝতে বুঝতে টক করে বলে, 'আঁজ্ঞে, এরে ঘুষ বলেতো?'

অচিন্ত্য হাসে, এই তো বুঝেছিস।

আঁজ্ঞে বাবু আপনি ঘুষ লিবেন?

অচিন্ত্য গম্ভীর [illegible] যা বলছি তাই করবি।'

গৌর যেন চিন্তি[illegible] বলে, 'আঁজ্ঞে আপনি উচ্চবংশ, বড় ঘরের লোক, খাঁটি কুলীন কায়েত, ঘুষ [illegible]?'

অচিন্ত্য হতভম্ব, হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে গৌর মিদ্যের দিকে। ছোট ছোট দুটি চোখের পাতা অনবরত ফেলছে, মুখখানিতে কোনওরকম ভাব নেই। কথাটা ভেবে বলল, নাকি বলার তাই বলে ফেলল। তার হঠাৎ রাগ হয়ে যায়, 'শালা চাষাই রয়ে গেলি, কথা বলতে শিখিসনি।'

গৌর ঈষৎ ভয় পায় যেন, হাত কচলে বলে, 'না না বাবু, আমার মনে হলো তাই বললাম, ভুল হতি পারে, লেখাপড়া শিখিনি, আমি হলাম চাষার বেটা, পুড়ু ক্ষত্তিয়ো, মনে কিছু করবেন না।'

অচিন্ত্য আরো রাগে, 'থাম, শালা, আমড়াগাছে কী আর আম ফলে, যা বলছি তাই করবি।'

গৌর মিদ্যের মুখ কালো হয়ে যায়। ভয়ে কাঁপে, তারপর বলে, 'ঠিক আছে বাবু আমি করবো, যা বলতেচেন তাই করবো।'

অচিন্ত্যর মুখে হাসি ফোটে। নরেন দাসটা শেয়ার নিত অনেক, গৌর মিদ্যেকে নিয়ে ভাবনা নেই।

তিন

ক'দিন বাদে গৌর অচিন্ত্যকে বলল, 'আপনি খুব ভাল মানুষ।'

অচিন্ত্য অবাক, কেন?

এই যে হাজার টাকা ঘুষ পালেন, তার থে পঁয়তাল্লিশ টাকা আমারে দেলেন, বেতনের উপরি, বাড়িতি বলতি আপনার বউমা বললে, টাকা মানে লক্ষ্মী, যেভাবে আসুক না কেন, সত্যনারাণ দেবে।

বাড়িতে সব বললি?

বাহ্ বলবো না, লুকুবার উপায় আছে, বাপ তো শুধু শুনতি চায় বাবুদের আপিসে কী র'ম কাজ করি আমি।

অফিসের কাউকে বলেছিস?

জিভ কাটে গৌর, 'না বাবু, বন্দনাদি খুব জিগ্যেস করতিলেন, আপনার পার্মিশান ছাড়া কি বলতে পারি।'

অচিন্ত্য তবুও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বললে কী আর হবে, বন্দনা চ্যাটার্জী এসে বলবে, শ'দুই টাকা ধার দেবেন অচিন্ত্যবাবু ও মাসেই দিয়ে দেব। মহিলা খুব চতুর। সামনে ঝুঁকে পড়ে আঁচল একেবারে ফেলে দেবে প্রায়, বলবে আপনার হাতে তো এখন টাকা আছে।

গৌরকে ঠিকমত ট্রেনিং দেওয়া দরকার। সামনের চেয়ার দেখালো অচিন্ত্য। গৌর যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বসল। অচিন্ত্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, টের পেতে চেষ্টা করতে লাগল, আসলে ছেলেটা কী রকম? দু'দিন বাদে বেশি দাবি করে বসবে না তো। গাঁ গঞ্জ থেকে মাঝে মধ্যে এই রকম দু একটা চাষার ছেলে চাকরি পাচ্ছে ইদানীং। খুবই কম। তারা প্রথমে এই রকমই থাকে, পরে হয় বিভীষণ। আর যদি কেউ কেরানি হয় তো দেখতে হবে না, কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আরে বাবা চাকরিটা পেয়েছিস তো আমাদের কৃপায়।

অচিন্ত্য বোস একটু স্নেহের স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিস?'

আজ্ঞে সিক্স, সার্টিফিকেট অবিশ্যি এইট পাশের আছে।

তবে! সিক্স পর্যন্ত পড়ে পিয়নের চাকরি পেলি, দেখেছি একটা বি.এ. পাস পিয়ন আছে

জানিস?

তা পাচ্ছি। গৌর দাঁত বের করে হাসল, 'মধুবাবু না করে দিলে তো হত না।'

তবে দ্যাখ, অন্য লোকে তোর চাকরি করে দিল, আমার ভাইটা এম.এ, তাকে ঢোকাতে কত কষ্ট হয়েছিল জানিস?

গৌর মিদ্যে আবার হাসে, 'ধরা করার লোক আছে আপনাদের, এই ধরেন মধুবাবুর ছেলে বিকাশদা, তিনবার ফেল করিলো এইচ.এস.এ, তারপর পাশ হলো, ওর এক জ্যাঠার ছেলে এমেলে হইলো, সেঁই পাশ করায়ে দিল, বিকাশদা বি.এ পাশও করল এরপর, এখন ব্যাঙ্কে ঢুকে গেছে, কী লোন না নেচ্ছে ব্যাঙ্ক থে।

সে তো তুই সিক্স পাশ, এইট পাশের সার্টিফিকেট পেয়েছিস ধরে করে।

আঁজ্ঞে বাপ পড়াতি পারলি আমি এগারো কেলাসও পেরুয়ে যেতাম, ধরা করার লোকও নেই, টাকা নেই।

এইবার তোকে ধরবে তোর আত্মীয়রা।

গৌর গালভরে হাসে, আমিতো পিয়ন, অবিশ্যি তার বেশি হবে কী করে, ধরাকরার লোক হতি এখনো চারপুরুষ লাগপে, সবেতো একজন চাকরি পালাম, আমরা বাবু হাতে পায়ে ধরতি পারি খুব, একবার থানার ও.সি পেরায় চালান করি দেয় আর কী, ডাকাতি হচ্ছিল পাশের গাঁয়, আচ্ছা আমারে দেখলি কী ডাকাত মনে হয়!

কী করলি তখন? অচিন্ত্যর হাতে কাজ নেই। টাকা পেলে সে কাজ করে, নতুবা এইভাবে কাটিয়ে দেয় আট ঘন্টা।

পায়ে ধরলাম, তবে দুটো কুকড়োও নেল দারোগাবাবু।

অচিন্ত্যর সিগারেট ধরায়। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'পুলিশের চাকরিই সব চেয়ে ভাল, টাকার দরকার হলেই বেরিয়ে পড়।'

হ্যাঁ। গৌর কথাটা শুনতে পেয়ে বলে, 'থানার ও.সি ওর'মই করেন।'

খুব অন্যায়। অচিন্ত্য, যেন সম্বিত ফেরে।

কেন? গৌর প্রতিবাদ করে, 'দারোগা পুলিশ তো লেয়ই, কুকড়ো লেবে তো অন্যায় কী আছে?'

কিছু বলতে পারিসনি? অচিন্ত্য গলায় একটু দার্ঢ্য আনে যেন।

বাহ্ বলবো কেন, বলতি গে মরি, তবে হ্যাঁ আমাদের গাঁর সাধু কাপালীর ছেলে যুধিষ্ঠির কাপালী, সে একবার রুখি দাঁড়াইলো, মুখ ফসকে বলি ফেলিলো ডাকাতদের আপনি খুব চেনেন দারোগাবাবু, তবে শুদুমুদু আমাদ্দের ধরতি আসেন কেন?

তারপর? অচিন্ত্য যেন গল্পের স্বাদ পায়।

আবার কী, তারে তুলে দে চালান করি দিল, সাধু কাপালী তখন মধুবাবুর পায়ে পড়ি গেল, বাবু বাঁচান, তিনির শালীর ছেলে হলো দারোগাবাবুর উপরে এস.ডি.পি.ও, ছাড়া পেল যুধিষ্ঠির, তবে খুব মার খেইলো, কিন্তু পরের বারও সেই এক কান্ড, তখন মধুবাবুই রেগে কাঁই, যত বড় মুখ না তত বড় কথা, শালারে পিটানো দরকার। কথা বলতে বলতে গৌর মিদ্যে যেন হাঁপাতে লাগল। ঘেমে গেল শীতের ভিতর। চোখ দুটি থর থর করতে লাগল উত্তেজনায়।

থামলি কেন? অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করে।

বলতিছি, হাঁপ লেগে যাচ্ছে বলতি, তা বাবু তখন যুধিষ্ঠিরের বাপ সাধু কাপালী কারে

আর ধরবে, তার কেন আমাদ্দের সবার ধরার লোক তো ওই মধুবাবু, যুধিষ্ঠিরটারে থানায় পিটোয়ে মেরেই ফেলে দিল, বললো হার্টফেল হই গেছে. দ্যাখেন মধুবাবুর কথা যদি শোনতো, যুধিষ্ঠির তো মরত না, তিনি তো লোক ভাল, কত ক্ষ্যামতা, ওই যে বিকাশদার কথা বলছিলাম, তিনি আমাদ্দের তাঁতি ঘরের এটটা মেয়েরে ধরে কালীপুজোর রাতে জোর করে টেনে নিয়ে গেল আমবাগানে....।

বন্দনা চ্যাটার্জী ডেকে উঠল, গৌউর।

অচিন্ত্য হাত বাড়িয়ে বসায় গৌরকে, গল্পটা এখন জমে উঠেছে। আমবাগানে টেনে নিয়ে গেছে তাঁতি ঘরের মেয়েকে মধুবাবুর ছেলে বিকাশ। এ সময়ে গৌরকে উঠতে দেওয়া যায় না, বলল, 'শেষ করে যা।'

বিকাশদা রেপ করল তাতে কী হলো, দারোগাবাবু এল গেল, তাঁতিরা খুব হম্বিতম্বি করল। তাতে গলা মিলালো আরো অনেকে, তবু ধরল না বিকাশদারে, কেন বলেন দেখি?

কেন?

ওই যে বললাম আপনাদের চিনাজানা অনেক আছে, ধরা করার লোক অনেক আছে, এস.ডি.পি.ও হলো বিকাশদার মাসতুতো দাদা, আপনাদের কত আত্মীয়, আপিসে কাছারিতে মন্ত্রীতে সব আপনাদের আত্মীয়...।

অচিন্ত্য চুপ করে থাকে, কথাগুলো আর ভাল লাগছে না। রেপের লাইনে না গিয়ে গৌর মিদ্যে আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে। কিন্তু তাকে থামায় কে? বন্দনা আবার ডাকল, তবুও কানে গেল না গৌরের, বিড়বিড় করছে, 'কত ধরা করার লোক, যেখেনে যাবেন, লতাপাতায় একটা সম্পক্কো, বন্ধুবান্ধব বেরুয়ে পড়বেই, তা তো হবেই চাকরিবাকরিতে সব লেখাপড়া জানা লোক, লেখাপড়া না জানলে হবেই না, আমাদের তো তা নেই, গাঁ ছেড়ে বেরুইনি কখনো, তবে মধুবাবু লোক ভাল, তেনার জমি বাপ ঠাউদ্দার আমল থেকে চষি আমরা, ভাগ রিকড করাইনি তেনার কথায়, আর ওই রেপের কালে আমরা চুপ করেছিলাম, বাপ দেখিলো ব্যাপারডা, মুখ খোলেনি, তাতে তিনি খুশি হয়ে এই চাকরিডা করে দেলেন...।'

এবার অচিন্ত্য বলল, খুব অন্যায় করেছে তোর বাবা।

যে রেপ করিলো তার চেয়েও? হাঁ করে তাকিয়ে আছে গৌর মিদ্যে, সাক্ষী দিলি ডাকাতির কেসে চালান, জমির থে উচ্ছেদ, সেডা পোয়াতো কেডা?

বন্দনা চ্যাটার্জী আবার ডাকল, গৌউর।

গৌর মিদ্যে উঠে পড়ল চট করে, 'যাই উনার মাথা ধরার ট্যাবলিট আনতি হবে।'

অচিন্ত্য বোস ভাবছিল একবার জয়নগর যাওয়ার দরকার। কেমন হলো ধান? ধান কাটার সময় তো হয়ে এল। এবার গিয়ে ভাগ চাষী বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে হবে নরমে গরমে পার্টির লোক নিয়ে। নামটা কাটিয়ে দেওয়া যায় যদি কিছু টাকা বুড়োর হাতে ধরিয়ে।

চার

বন্দনা চ্যাটার্জী খুব ধমকাচ্ছে গৌরকে। কী হলো আবার? অচিন্ত্য টয়লেটে যাওয়ার পথে দাঁড়ায়।

গৌর হাতজোড় করে আছে, আঁজ্ঞে দিদিমনি যা বলিচি ভুল বলিচি, আর কোনোদিন

হবে না।

বন্দনার হাতের উলের পিন্ড টেবিলের উপর গড়িয়ে গেছে। মেরুন রং. দলাপাকানো কেঁচোর মত উল জড়িয়ে আছে কাঠের পাটাতনে। আঁচল দুবার সামলে বন্দনা ধমকাচ্ছে, গৌরকে, তুই ফোর্থগ্রেড, তোর চোদ্দ পুরুষ চাকরি করেনি কোনোদিন, আমাকে শেখাবি কী করতে হবে, কী করা উচিত।

আঁজ্ঞে তা না দিদিমনি, বুড়োদাদু রোজ ঘুরে যাচ্ছে, মাসটাক হবে, আমার হাত ধরে বলিলো যদি আপনারে বলে দিই, টাকা দিবার ক্ষ্যামতা উনার নেই, আপনি যদি ওর কাজডা করি দেন।

বন্দনার ক্রিমঘষা তেলতেলে ফর্সা মুখখানি লাল, গর্জে উঠল 'মিথ্যে বলছিস, আজকেই প্রথম এসেছে লোকটা।'

না দিদিমনি, আপনি ভুলি যাচ্ছেন, খুব খাটেন, উল বুনা খুব খাটনির কাজ তাই মনে পড়তেছে না।

আমি মিথ্যে বলছি! বন্দনা রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অচিন্ত্য সিগারেট ধরিয়ে টয়লেটের দিকে পা বাড়ায়। চোখেমুখে জল দিয়ে ফেরার সময় দেখল, গৌর মন খারাপ করে একটি টুলে বসে আছে। বন্দনা তার উলের গোলা গুছিয়ে নিচ্ছে।

অচিন্ত্য টেবিলে ফিরতেই বন্দনা হাজির, ছেলেটা কেমন বলুন তো?

অচিন্ত্য একটু সাবধান হলো. বন্দনা কী টের পেয়ে টাকা ধার করতে এল, জেরায় কি গৌর বলে দিল সব কথা তখন।

অচিন্ত্য বলল, মোষের মত, খুব খাটতে পারে।

তা পারুক, খাটবেই তো, চাকরি পেয়েছে ওর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে আমায় বলে কিনা একমাস ঘুরছে, কাজটা করে দিন দিদিমনি, কী স্পর্ধা!

বাদ দিন। অচিন্ত্য নিরীহ মুখে বলল।

আমি সোয়েটার বুনি কী ঘুমোই তা দেখার ও কে, ডি-গ্রুপ স্টাফ, সেদিন বললাম দুটো সিনেমার টিকিট কেটে এনে দে, বলে কিনা 'পেরাই তো দেই, আজ ছেড়ে দেন', রোগী দেখতে নাকি হাসপাতালে যাবে।

অচিন্ত্য চুপ করে থাকে।

বন্দনা বকতে বকতে চলে গেল। গৌর মিদ্যে আর এদিকে এল না। অচিন্ত্য একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো যে বন্দনা এখনো আঁচ করতে পারেনি যে গৌর মিদ্যের হাত দিয়ে অচিন্ত্য টাকা খেতে আরম্ভ করছে আবার।

দুদিন বাদে গৌর ভেঙে পড়ল হঠাৎ অচিন্ত্যর সামনে, বাবু আমি সব বলে যে বেপদে পড়ে গেছি।

সব বলে দিয়েছিস মানে? অচিন্ত্যর কপালে ঘাম জমে গেল।

দিদিমনির সাথে ও সব হলো, সেডা বাড়িতি বলতি বাবা খুব ভয় পেয়ে গেছে, ধরেন আমরা হলাম চাষামানুষ, কথাবাত্তা ঠিক মতন বলতি পারিনে, তার জন্যি তো যুধিষ্ঠির কাপালী দারোগাবাবুর পিটুনি খেয়ে মলো, বাবা ভাবতেছে আমি কাজকম্মো করিনে তাই এসব হচ্ছে, চাকরি চলে যাবে আমার, বাবা এসে দিদিমনির হাতে পায়ে ধরে মিটোয়ে লেবে বলতেছে।

সে কী! অচিন্ত্য অবাক উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে, তুই বন্দনাকে গিয়ে বল, তোর বাবাকে

আসতে হবে কেন?

বলতি ভরসা পাচ্ছিনে, উনি নামডা ধরে পর্যন্ত ডাকতেছেন না।

গৌরের হয়ে বন্দনাকে, বলতে যাবে ভেবে ভেবেই অচিন্ত্য চেয়ার থেকে উঠল না। তার কী দরকার? তাকে যদি বন্দনা সন্দেহ করে ধার চেয়ে বসে। ধার মানেই তো শেয়ার। বন্দনা চ্যাটার্জীর স্বামী রাইটার্সে আছে, বন দপ্তরে, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। ক্ষমতাশালী ইউনিয়নের প্রতিপত্তিশালী লোক। ওকে ঘাঁটানো ঠিক নয়।

আরো দিন কয় বাদে অচিন্ত্য আর একটি জবাই করার মতো মুরগি পায়। পাম্প সেটের জন্য লোন, শোধ দিতে হয় না। মুকুব হয়ে যাবে। আর পনেরো হাজারে সাড়ে সাত হাজার হলো সরকারি সাবসিডি।

অচিন্ত্য ডাকল, গৌর।

গৌরের হাতে ঠিকানাটা তুলে দিয়ে বলল, চলে যা, বলবি দুহাজার ছাড়া হবে না, এবার তুই একশো পাবি।

আবার নিয়া হবে উপরি?

কথা বলিস না, কাল অফিসে আসবার আগে লোকটার বাড়ি হয়ে আসবি, বন্দনা দিদিমনিকে নিয়ে তোর ভাবতে হবে না, আমি তো আছিই।

গৌর চলে গেল। অচিন্ত্য উত্তেজিত হয়ে রাত কাটালো। এই কেসটা হয়ে গেলে বোঝা যাবে গৌর মিদ্যে হলো রত্ন বিশেষ। অচিন্ত্য বোস তার হাতে পুরো তামাকটাই খেতে পারবে। কোনও ঝুঁকি থাকবে না।

পরের দিন গৌর এসে বলল, হলো না বাবু।

কেন? অচিন্ত্য চাপা গলায় তেজ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

গরিব, খুব গরিব, পাম্পের টাকা দিয়ে মেয়ের বে দেবে।

ওসব বলে, আসলে তো পেটে খাবে, বলিসনি দুহাজার না পেলে হবে না।

বললাম, কিন্তু ধরে পড়ল আমার হাত, চাষাঘর আমাদ্দের মত, ফাল্গুন মাসে বে'র ঠিক হয়েচে, বলল, কিছু দেবে কিন্তু টাকা পালি, তবে অত দিলি বে' আটকে যাবে। গৌর মিনমিনে গলায় বলল।

ননসেন্স, তুই জোর করে বলিসনি, যা আবার যা।

গৌর গেল, আবার ফিরেও এল শূন্য হাতে। অচিন্ত্য রাগে কাঁপতে লাগল, বলল, তুই নিজে নিয়ে মিথ্যে বলছিস না তো!

গৌর মিদ্যে দু হাত জোড় করে, অধম্মো সইবে না বাবু, আমার বাবারে মধুবাবু বিশ হাজার টাকা লোন পাইয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বাবা লেয়নি ভয়ে, যদি শোধ না করতি পারে, যদি কোমরে দড়ি পড়ে তাতে।

অচিন্ত্য বোস নিজের হাত কামড়াতে লাগল, নরেন দাস হলে পনেরো হাজারে তিন হাজার গুনে নিয়ে আসত। চাষাকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। এদিকে বউকে কথা দিয়ে ফেলেছে এপ্রিল মাসে ছেলের পরীক্ষার পর সিমলা নিয়ে যাচ্ছেই। হোটেল বুক করা দরকার এখনই। শুধু শুধু ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ভাঙতে হবে। আর নতুন কেনা ফোমের গদির টাকাও এ দিয়ে শোধ হতো। পুরোন ছোবড়ার গদিতে শুতে এখন ভাল লাগে না কারোরই। এসব কি মাইনের

টাকায় হয়?

অচিন্ত্য বলল, তোকে টাকাটা নিয়ে আসতেই হবে, না হলে ধরে নেব তুই নিয়ে আমাকে দিচ্ছিস না।

গৌর মিদ্যের চোখে জল চলে এল, সে বিড়বিড়িয়ে বলল, বিশ্বাস করেন।

টাকা নিয়ে আয় তারপর বিশ্বাসের প্রশ্ন। অচিন্ত্য চাপা গলায় ধমকায়।

পরের দিন গৌর অফিসে আসে না বরং লোন-পার্টি অচিন্ত্যর কাছে এসে দাঁড়াল ভীত মুখে, বলল, গৌরবাবু বলেচে দেখা করতি, বিশ্বাস করেন বাবু হাত শূন্য একেবারে।

অচিন্ত্য কোনওক্রমে তাদের ফেরত পাঠায়। আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে, অফিসসুদ্ধ লোক তাকাচ্ছে, তারা আঁচ করার চেষ্টা করছে কত নিচ্ছে অচিন্ত্য বোস। বন্দনা দুবার ঘুরেও গেল। অচিন্ত্য সবাইকে সামলায়। রাগটা তার ক্রমশ বাড়তে থাকে। কী আক্কেল ছেলেটার।

গৌর মিদ্যে দিন তিনেক বাদে অফিসে এল। অচিন্ত্য দেখল সে একা নয়, সঙ্গে একটা হেঁপো বুড়ো। নিশ্চয়ই বাবাকে নিয়ে এসেছে। ঠিক তাই। ছেঁড়া তালি মারা ধুতি, ময়লা শার্ট, তার উপরে খদ্দরের চাদরে শরীর লুকোন বুড়ো সোজা অচিন্ত্যর টেবিলে চলে এল, খুব ভুল করেচে বাবু, খুব ভুল করেচে আমার গৌর।

খুব ভুল করেচে দিদিমনি, সব তো ঘরে গিয়ে বলে, ওরে মাপ করে দেন।

পাগল নাকি! অচিন্ত্য গৌরকে ধমকে উঠেছে, যাও বাবাকে পৌঁছে দিয়ে এস, কে আনতে বলেছিল?

কেউ বলেনি বাবু আমিই আলাম ওরে নে, নেশ্চয় ও কোনও কাজ করে না, তাই আপনারা এত রেগে যাচ্ছেন ওর পরে, খাটায়ে নেন, আমি আছি বসে। বুড়ো দুহাত জোড় করে বলে।

কে নড়ায় বুড়ো ফকির মিদ্যেকে। সে যাবেই না। এসেছে যখন দেখেই যাবে ছেলে কাজ করে কি না। তার বদ্ধমূল ধারণা গৌর গোলমাল করছে। অফিসের এককোণে গিয়ে আশ্রয় নিল বুড়ো। পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বের করে কী মনে করে আবার পকেটে চালান করে দিল। বাবুদের সামনে বিড়ি খায় কী করে, তা নিজের মনেই বলতে লাগল। দুপুরভর ছেলেকে ধমকাতে লাগল, অ্যাই বসে আছিস কেন, দাঁড়া, দাঁড়ায়ে থাক, এমনি এমনি চাকরি করে দেছে তোরে মধুবাবু, জল দে বাবুরে, দিদিমনির দরকার আছে কি না দ্যাখ...।

শীতের বেলা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়। সাড়ে পাঁচটার অফিস সাড়ে চারটেয় ফৌত। বুড়ো তার ঘোলাটে চোখে দেখতে লাগল সব। বন্দনা উল ছড়িয়ে আবার দিনের আলোর মত গুটিয়ে নিল তার কাঁধে ব্যাগে। তার কাছে এক বুড়ো ঘুর ঘুর করে আবার ফিরে গেল কথার জবাব না পেয়ে। অচিন্ত্য খবরের কাগজ, সিনেমা ম্যাগাজিন এবং অফিস ফাইল সব একসঙ্গে নিয়ে আর একজনের সঙ্গে তর্কে বসল মাধুরী ভাল না জুহি ভাল, সরকার ঠিক করছে না বেঠিক করছে, কোন সিনেমায় সেনসার বেশি উদার...।'

গৌর সারা দুপুর ছুটোছুটিই করল শুধু।

সাড়ে চারটের পর অচিন্ত্য উঠতে বুড়ো ফকির মিদ্যে উঠল, বাবুরা এবার যাবেন?

অচিন্ত্য বিরক্ত মুখে তাকায়।

বাবু থালে ছেলেরে নে যাই আমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কোনদিন এস না। অচিন্ত্য বিরক্তি চাপতে পারে না।

বুড়ো হাসল, বড় ভয় হইল বাবু, বড় ভয় হইল।

অচিন্ত্য জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। লোকটাকে দেখে তার স্বস্তি হচ্ছে না কেমন যেন লাগছে! বুড়োটা সুবিধের নয়।

বড় ভয় হইল বাবু, চেরকাল খেটে অন্ন জোগাড় করিচি, শেষে গৌর কি না বিনা কাজে পয়সা লেবে।

অচিন্ত্য কোনওক্রমে বলে, হয়েছে এবার যাও।

যাচ্ছি, আপনারা ছেলেডার ভুল সংশোধন করায়ে দেন, যদি কথা না শোনে ঘাড় ধরায়ে করে নেবেন, কাজ করে নাই বলেই তো বেপদে পড়িছে, আজ আমার পেরান জুড়োল, এই যে আপনারা বসি আছেন, বসে ওরে খাটাচ্ছেন এডাই লেয্য, আপনাদের জমিন, যা বলবেন তাই করবে, দরকারে জুতো মুখে লিয়ে হাঁটপে. আপনারা বসে বসে ওরে খাটাবা তবেই না বোঝপে ওর বাপ ঠাউদ্দা কী র'ম ভাবে লেয্য জেবন কাটায়ে গেছে। বিনা খাটনিতে ভগবান অন্ন দেন না এডা ও জানুক।

অচিন্ত্য কাঁপা হাতে সিগারেট ধরায়, ঠিক আছে, এবার যাও।

হ্যাঁ যাবো, যাবার আগে বলি যাই, দ্যাখেন বাবু মোরা হলাম পুনডো ক্ষত্তিয়ো চাষা, এসব কোঠাবাড়ি বেতন লিয়ার জন্য খাড়া করা, চুন-ঘরের আপিস সব তো মধুবাবুর সম্পত্তির মতন আপনাদের সম্পত্তি, জমিন, যেমন বলবেন গৌর তেমন চষে দেবে, চষতি দেচ্ছেন সে বড় ভাগ্যি, যা বলবেন তাই করবে, থানা পুলিশি আপনাদের হয়ে সাক্ষী দেবে পেয়োজনে, না হলি যে জমিন চলে যাবে এডা ও জানুক।

থা-থামবে। অচিন্ত্য যেন গর্জে উঠেছে চাপা স্বরে।

হ্যাঁ হ্যাঁ থামতিচি বাবু, তবে বলে যাই, কবে ফের দেখা হবে জানিনে, কদ্দিন বাঁচপো জানিনে, ওই গৌর হারামজাদারে এট্টু বুঝায়ে দে যাই বাপ ঠাউদ্দা কী র'ম জেবন কাটায়ে গেছে, চাষা কেমনভাবে বাঁচে, মধুবাবুর জমিন চষতি চষতি আমার বুকি দোষ হই গেল, তবু কি কাজ বন্দ করিচি, খাটাতো এরেই বলে, খাটায়ে খাটায়ে ওর বুকি দোষ করি দেন দেখি...।

অচিন্ত্য থরথর করে কেঁপে ওঠে। বুড়ো তো থামছেই না। জানলার ধারে চলে গেছে কথা বলতে বলতে। কথা তো বলেই যাচ্ছে। বাইরে আঁধার নেমে এল প্রায়। বুড়োর চোখ আঁধার ঘেরা পৃথিবীর পথে। অচিন্ত্য দেখল অফিস প্রায় ফাঁকা। এক প্রান্তে গৌর মিদ্যের কোমর থেকে মাথা অবধি পাথর, পায়ের পাতা থেকে কোমর অবধি ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। তার বাপ বুড়ো ফকির মিদ্যের কথা থামছে না। বলছে, বলতে বলতে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে যেন বুড়ো।

অচিন্ত্য আবার চিৎকার করে ওঠে, তুমি থামবে?

এবার ঠকঠকানো পায়ে ছুটে এল গৌর, কী হচ্ছে বাপ, তুমি থামবা, এ তুমার হেলে গরু আর জমি লয় যে বকেই যাবা নিজির মনে, ও বাপ....।

অচিন্ত্য দ্যাখে বুড়ো তবুও থামছে না। বড় কর্কশ কণ্ঠস্বর। অচিন্ত্য দু'কানে আঙুল দেয়।

(শারদীয় আনন্দবাজার—১৯৯১)

নির্বাসিতা

ধর্মদাস বলল, রত্নার বিয়ে ঠিক করে ফেললাম।

সক্কালবেলায় একটি ডাহা মিথ্যে। কতবার যে ঠিক হল রত্নার বিয়ে। নিরীহ মুখে মিথ্যে বলতে ধর্মদাসের সমকক্ষ কেউ নেই। ধর্মদাস রায় অরুণাভর প্রতিবেশী। এমন প্রতিবেশী ভাগ্যে জোটে। পরিবারের কর্তা যেমন, আর সকলেও তার ছায়ার মতো। এমন কী ধর্মদাসের নয় বছরের ছেলেটিও ক্রমশ হয়ে উঠছে তার বাবার মত। ব্যতিক্রম ছিল ওর বউ। এখন নাকি পালে মিশে গেছে। দেখে আর ধরার উপায় নেই যে হলুদ পুখরিয়া থেকে ঘর করতে এসেছে বেলগাছিয়ার সবচেয়ে পুরনো এই ফ্ল্যাট বাড়িতে। আগের বছর লেকটাউন হাইস্কুল থেকে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে এনে এখানকার প্রাচীন ভূতনাথ ইন্সটিটিউশনে যখন ভর্তি করল, অরুণাভর বউ অলকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অত ভাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলে কেন?'

ভূতনাথ ওর চেয়েও ভাল। ধর্মদাসের বউ-এর সাফ জবাব।

কিন্তু লেকটাউনের রেজাল্ট দ্যাখো।

ভূতনাথের রেজাল্টইবা খারাপ কিসের, আগেরবার মাধ্যমিকে কুড়িটা স্টার, একজন ফরটি সিক্সথ্ হয়েছিল।

অলকা বুঝেছিল তর্ক করা বৃথা। সে তো ভালই জানে ভূতনাথের অবস্থা এখন কী। মেরে কেটে গোটা পাঁচেক সেকেন্ড ডিভিশন। আর সব থার্ড...অগুনতি ফেল। পাঁচটা প্রাইভেট স্কুলের হাল যেমন হয়েছে আর কী! তাছাড়া অরুণাভ নিজে তো স্কুল টিচার। কোন স্কুলের হাল কেমন তা তার চেয়ে বেশি কে জানবে? ধর্মদাসের বউ যুক্তি তথ্য বুঝবে না, ধরা পড়ার উপক্রম হলেই ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ, কথা বন্ধ। মুখোমুখি ফ্ল্যাট, তবু এরকম হয়েই থাকে। অরুণাভ অলকাকে থামিয়েছিল, 'কী দরকার এসব খোঁজে, ফেল করেছে হয়ত, বলতে পারছেনা, তুমি খুঁচিয়ে ঘা করছ শুধু শুধু।'

ধর্মদাস বলল, পিয়ালি টাউনের ছেলে, এখন এম পি-তে সেট্‌লড, খুব ভাল ফ্যামিলি পেয়েছি।

পিয়ালি টাউন! অরুণাভর মাথা বোঁ বোঁ করে ওঠে। সে তো ভাবছিল দর্জিপাড়ার কথা। সেখানে অবশ্য বিয়ে হওয়া কঠিন। কিন্তু পিয়ালি টাউন কোথায়? কত আশ্চর্য জায়গার খোঁজই না রাখে ধর্মদাস। আর তার তিরিশোর্ধ্ব বোনের জন্য পাত্রও আসে ওইসব জায়গা থেকে। একবার সম্বন্ধ হলো চন্দ্রবিল-এ। পুরুলিয়ায় নাকি জায়গাটা। একবার বাদাম পাহাড় থেকে দেখতে এল লোকজন। এই তো পুজোর আগে এল ন'পাহাড়ি নামে এক জায়গা

থেকে। নিজেই তো বউ এনেছে হলুদপুখরিয়া গিয়ে। ধর্মদাসের বউ বলে পুখরিয়া। ধর্মদাস বলে পুকুরিয়া। এইসব জায়গাগুলোর নাম যেন স্বপ্নের ভিতরে শোনা। ন'পাহাড়ির নাম তো অরুণাভ শোনেইনি এর আগে। যেমন এই পিয়ালি টাউন! পারে বটে ধর্মদাস। খোঁজও রাখে। কলকাতায় যেন বিবাহযোগ্য পাত্রের অভাব।

ধর্মদাস বলল, অবাক করলে, পিয়ালি টাউনের নাম জান না, এই তো বারুইপুরে।

পিয়ালি যেন কোনও নদীর নাম। খুব আবছা গলায় বলল অরুণাভ।

নদী! না না নদী-মদি নেই, বারুইপুর স্টেশনে নেমে অটোয় ওঠো, মিনিট পনেরো বাদে পৌঁছে যাবে পিয়ালি টাউনে, ওরা খাসমল্লিকের জমিদার ছিল, এখন এম. পি-তে হোটেল বিজনেস, খাসমল্লিকের চৌধুরীদের নাম শোননি?

অরুণাভ জানে কথার অনেকটাই মিথ্যে। তবু শুনতে বেশ লাগে। বিচিত্র সব তথ্য এনে হাজির করে ধর্মদাস তার কথার ভিতরে। তাতে মিথ্যেটা ক্রমশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, খাস মল্লিক মানে, পিয়ালি টাউন, মল্লিক, চৌধুরী, বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা।

হা হা করে হাসে ধর্মদাস। এই বিদ্যে নিয়ে তুমি মাস্টারি করো, খাসমল্লিক হলো একটা জায়গা, পিয়ালি টাউন যেমন, তবে দুটো জায়গা কাছাকাছি, সেখানকার জমিদারি কিনেছিল চৌধুরীরা, তাদেরই এক শরিক থাকে এম. পি-তে।

অরুণাভ অবাক হয় আবার। কত কিছু জানে ধর্মদাস। জমিদারির খোঁজও রাখে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও। সে কী করে জানবে কে কোথাকার জমিদার ছিল। দেশভাগের পর থেকে তারা তো উত্তর কলকাতার প্রান্তে টালা পার্কের ধারে এই রংহীন অনুজ্জ্বল ময়লা দরজা জানালার ফ্ল্যাটবাড়িতে বন্দী। ধর্মদাসরাও তাই, তবু সে খোঁজ রাখে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে কে কোথাকার কত অংশের জমিদার ছিল তা বিয়াল্লিশ বছরের ধর্মদাস অক্লেশে বলে দিতে পারে। কোর্টে মুহুরিগিরি করে ধর্মদাস, লোক চরিয়ে জীবন ধারণ করে, তার পক্ষে কত কিছু জানাই না সম্ভব। বাদামপাহাড়, ইন্দ্রবিল, ন'পাহাড়ি...পিয়ালি টাউন।

অরুণাভ জিজ্ঞেস করে পিয়ালি টাউন নাম কেন?

বিরক্ত হয় ধর্মদাস, হচ্ছে রত্নার বিয়ের কথা, তুমি জিজ্ঞেস করছ ভূগোলের কোশ্চেন, আচ্ছা আমার নাম ধম্মোদাস হলো কেন, আর ওই মাঠের নাম টালা হলো কেন, খোঁজ রাখো?

অরুণাভ হাসে, না না এমনি মনে হলো, তাই এতো খুব ভাল খবর।

ধর্মদাস বলে, এবারে কেস সেট্‌লড।

অরুণাভ কিছু বলে না। ধর্মদাসের কথায় 'কেস সেট্‌লড' বহুবার শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারে না হলে বিশ্বাস নেই। বাদামপাহাড়, ইন্দ্রবিল, ন'পাহাড়ির মত এ পাত্রকেও রত্নার না পছন্দ হতে পারে। ক'দিন বাদে ধর্মদাসই তা বলবে। অথচ দিন দিন মেয়েটার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ও তো অরুণাভর বোন ঝুমুরের বয়সী। তার বিয়ে হয়েছে এগারো বছর আগে। এত বয়সের কোনও মানুষ বিনা কাজে ঘরে বসে থাকতে পারে না। রত্নাও পারে না। সঙ্গী আছে। পুরুষ! বয়স্ক।

অলকা বলে, কী যে হবে মেয়েটার, আচ্ছা ও নাকি বি. এ. পাশ, চাকরি-বাকরি না পাক, টিউশানি করতে পারে তো!

বি. এ. পাশ! হ্যাঁ ধর্মদাস বলে। রত্নাও বলে। কিন্তু অরুণাভ জানে কথাটা ডাহা মিথ্যে। হায়ার সেকেন্ডারিতে কমপার্টমেন্টাল। ও তো ঝুমুরে সঙ্গে পড়ত। ঝুমুর শুনে অবাক, দাদা ও তো কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষাই দেয়নি, বি. এ. পাশ করল কবে, কোন কলেজ থেকে?

কে যাচাই করতে যাবে। যাচাই করতে গেলে কথা বন্ধ। দরজা বন্ধ সশব্দে। কিন্তু বি. এ. পাস হোক বা না হোক, একটি মেয়ের বিয়ে তো তাতে আটকানোর কথা নয়। বিয়ে না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা, এমন একটি যুবতি কোনও ভারতীবাসীর যোগ্য হবে না একথা বলবে কে? কত মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কোলে বাচ্চা নিয়ে ছ'মাস অন্তর বাপের বাড়ি আসছে। এ ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়েটি তেমন হবে না কেন? খারাপ লাগে অরুণাভর। চোখের সামনে একটি মেয়ে অবিবাহিতা থেকে ক্রমশ বুড়ি হয়ে যাবে, একথা ভাবতেই কেমন লাগে। ঝুমুরের মেয়ে তো আট বছরের, ক্লাস টু-তে পড়ছে।

ধর্মদাস বলল, ফেব্রুয়ারির বারো তারিখে দিন ঠিক হলো।

সে কী, এত তাড়াতাড়ি! অরুণাভ প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে ভাবল তাড়াতাড়িই বা কী। রত্নার তো বছর পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল। কিন্তু কবে পাত্র দেখা হলো, কবে ঠিক হলো বিয়ের কিছুই যে জানতে পারেনি সে মুখোমুখি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়েও। ধরতে পারল ব্যাপারটা। গত দেড় মাস কথা বন্ধ আছে। এর ভিতরই বোধহয় সব হয়ে গেছে। বিয়ের খবর দিয়েই মৌনতা ভাঙল ধর্মদাস।

ধর্মদাস বলল, শুভস্য শীঘ্রম, রত্নারও পছন্দ হয়েছে পাত্র, বড় হোটেল ব্যবসা ওদের উজ্জয়িনীতে, অবস্থাপন্ন, বাদামপাহাড়, ইন্দ্রবিল, ন'পাহাড়ির ছেলের চেয়ে ভাল .....।

বলে যাচ্ছিল ধর্মদাস। সব কথা কানে যাচ্ছিল না অরুণাভর। সে ভাবছিল বাদামপাহাড় থেকে পিয়ালি টাউন হয়ে উজ্জয়িনী। ক্ষমতা আছে বটে ধর্মদাসের। অরুণাভ নিজে বিয়ে করেছে বেলঘরিয়ায়, ঝুমুরের বিয়ে দিয়েছে বর্ধমানে। তার অতদূর প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা নেই। ঈর্ষা হলো যেন ধর্মদাসের দিকে তাকিয়ে। উজ্জয়িনী তো তার কাছে স্বপ্ন মাত্র। মহাকবির দেশ, ইতিহাসের সোনার বিন্দু..... বিন্ধ্যাচল, মালওয়ার মালভূমি....। এমন নগরে বোনের বিয়ের ঠিক করেছে ধর্মদাস। বিশ্বাসই হয়না সেই প্রাচীন পৃথিবীতে বাস করতে যাবে তাদের ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়ে।

অরুণাভ জিজ্ঞেস করে, উজ্জয়িনীই তো প্রাচীন অবন্তিকা ছিল, তাই না।

ধর্মদাস হা হা করে হাসে, তুমি মাস্টারি ছাড়া আর কিছুই কি জান না অরুণাভ, রত্নার বিয়ে হচ্ছে সেইটাই খবর, হ্যাঁ দিতে হচ্ছে অনেক, ছোট বোন আমার!

কথাটা অরুণাভকে শুনিয়ে দিল ধর্মদাস। অরুণাভ আগে তো স্কুলের মাইনেই পেত না ঠিক মতো। সেই অনিশ্চিত সময়ে ঝুমুরের বিয়ে দিতে হয়েছিল তাকে। এগারো বছর আগের কথা। নূপুর রেজিস্ট্রি করেছিল। শুধু শাড়িতে গিয়ে উঠেছিল স্বামীর ঘরে। ঝুমুরের বিয়ে সম্বন্ধ করে। নূপুরের খবরে ধর্মদাস গলাবাজি করেছিল খুব, আমার বোন হলে মেরেই ফেলতাম, তোমরা বামুন, কায়েতের ঘরে গিয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ফ্ল্যাটবাড়ির মান থাকল না আর। ঝুমুরের সময়ে বিয়ের দিন সকালে টাকার টান। বাজেটে আসল কয়েকটি খরচ বাদ চলে গিয়েছিল ভ্রান্তিবশত, তখন ধর্মদাসই এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, চলো টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। [illegible] নিয়ে গেছে এক কাবুলি দেশীয়র কাছে।

অবাক ব্যাপার! এখনো যে কলকাতা শহরে কাবুলিওয়ালা টাকা ধার দিয়ে বেড়ায় এ খবর ধর্মদাস ছাড়া জানবে কে? কাবুলির খবরটা বাড়িতে চেপে গিয়েছিল অরুণাভ। কিন্তু পরের মাসে ধর্মদাসই তাকে নিয়ে এসেছে দরজায়। কী অপমান! টাকা দিতে দু'দিন দেরি হয়েছিল মাত্র। বাবা তখন বেঁচে। মুখখানি অন্ধকার করে ছিলেন সারাদিন। একটি কথাও জিজ্ঞেস করেননি।

পরে অরুণাভ জিজ্ঞেস করেছিল, লোকটাকে বাড়ি নিয়ে এলে কেন ধর্মদাস?

বাহ্, চিনিয়ে দিলাম, আমাকে বিশ্বাস করেই তো টাকা দিয়েছিল, কী হয়েছে তাতে?

কী হয়েছে তা অরুণাভ বোঝাবে কীভাবে। ঘটনাটা এখনো বুকে বেঁধে।

ধর্মদাস বলল, বাড়ি আছ তো?

হ্যাঁ, রোববারে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না।

নেমন্তন্ন করতে যাব, কাল কার্ড পেলাম ছাপা, তোমাদের থেকেই আরম্ভ করি কাজটা।

তাহলে কথা সত্যি! তাদের ফ্ল্যাট বাড়িতে বিয়ে লাগছে! হ্যাঁ তাই, ধর্মদাস বলছে, একটু দাঁড়িয়ো পাশে, রত্না তো, তোমার বোনেরই মত...।

হাঁটল ধর্মদাস কথাটা জনে জনে বলতে।

দুই

কোথায় হচ্ছে বিয়ে, দর্জিপাড়ায়? অলকার প্রথম জিজ্ঞাসা বিয়ের খবরে।

না, না উজ্জয়িনীতে। অরুণাভ বাজার রাখতে রাখতে বলল।

সত্যি, না কি দর্জিপাড়ায়? অলকা আবার জিজ্ঞেস করেছে।

বলল তো পিয়ালি টাউন না কোথাকার জমিদার, উজ্জয়িনী থাকে। অরুণাভ সোফায় বসতে বসতে জবাব দেয়।

অলকার সন্দেহ যেন যায় না। 'পিয়ালি টাউন, উজ্জয়িনী, ঠিক মিথ্যে বলেছে, ধর্মদাসদা দুটো কথা বললে তার একটা মিথ্যে হবেই, দর্জিপাড়ার মৃণাল আচায্যির খবর তো ওরা জানে, এ নিয়ে গোলমালও হয়েছে বাড়িতে দু'একদিন।'

অরুণাভর চেয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির খবর বেশি রাখার কথা অলকার। সে সারাদিন এই ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দাদের নিয়েই থাকে। তবু অলকার সন্দেহটা অরুণাভর ভাল লাগে না যেন, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে হঠাৎই, ওসব কথা এখন তুলছ কেন? বিয়ে হচ্ছে, কোন কথা কার কানে যাবে অনর্থ বাঁধবে।'

অলকা বিড়বিড় করতে করতে সরে যায়, লোকটা যে ম্যারেড, কী করছে ধর্মদাসদা কে জানে, ওরা তো খুব জড়িয়ে গেছে।

অলকা রান্নাঘরে। অলকার সন্দেহটা অরুণাভর ভিতরেও যেন প্রবেশ করতে আরম্ভ করল। হতেও তো পারে সেই লোকটার সঙ্গে। ধর্মদাস চাপা দেওয়ার জন্য বলছে পিয়ালি টাউন, উজ্জয়িনী। ধর্মদাস জানে মৃণাল আচায্যির খবর তাদের অজানা। অজানা তো নয়ই, বরং বেশি জানা অলকার, অরুণাভর। দর্জিপাড়ায় যে অলকার দিদি থাকে। সে তো খবরটা দিয়েছিল। লোকটা ম্যারেড, কিন্তু ওর বউ পাগল। অনেক চেষ্টা করেছিল, চিকিৎসার ত্রুটি রাখেনি, শেষে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটা বাচ্চা। অরুণাভ দেখেছে লোকটাকে। হাতিবাগানের থিয়েটার হল থেকে রত্নার হাত ধরে বেরিয়ে আসছে। মাথাভরা টাক, কেমন যেন হা-হুতাশে ভরা মুখ। ওর যে দর্জিপাড়ায় বাড়ি সেই খবরের সূত্রও তো অলকার দিদি। এ বাড়িতে এসে হঠাৎ তাদের ফ্ল্যাটে রত্নাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। রত্না চলে যেতে দিদি খোঁজ নিয়েছিল মেয়েটা কে? তারপর সব কথা।

অলকা চা নিয়ে এলে অরুণাভ বলল, অত মিথ্যে হবে কি, দর্জিপাড়া আর উজ্জয়িনী কি এক হল, খামোকা ওসব বলতে যাবে কেন?'

অলকা চিন্তিত, কী জানি, তবে ধর্মদা সব জেনে গিয়েছিল।

সতর্ক করল অরুণাভ তার বউকে, ওসব কথা এখন তুলো না।

না না, আমি ভাবছি বিয়ে হয়ে গেলে লোকটার কী হবে?

কিন্তু লোকটারও তো বিয়ে করার ক্ষমতা নেই...। অরুণাভর গলায় রাগ।

এত কথার ভিতরে অরুণাভর মা এসে দাঁড়িয়েছেন। বিয়ের খবরে বললেন, এই তো রাজি হলি, তবে ওই বাদামপাহাড় ইন্দ্রবিলে রাজি হলি না কেন?

অরুণাভ চট করে বলেছে, তুমি কি জান রত্না রাজি হয়নি, সব তো ধর্মদাসের কথা।

মা বললেন, আমি তো মেয়ের কথা বলছি না, বলছি ধর্মদাসের কথা, বয়সকালের মেয়ে, বিয়েয় রাজি না হয়ে পারে, পঁয়ত্রিশ বছরে কি অত বাছাবাছি করে কেউ।

না, না ধর্মদা তো চেষ্টা করেছিল খুব। অলকা বলতে চেষ্টা করল।

মা মাথা নাড়লেন, চেষ্টা করেছিল বোধহয় বিনি পয়সায় পার করানোর, এবার বোধহয় তোমার দিদি যে লোকটার কথা বলেছিল তাকে ধরেছে।

অলকা অরুণাভ পরস্পরের দিকে তাকায়। মা জানে সব। মায়ের সঙ্গে রত্নার কথা য় বেশি। মায়ের কাছে রত্না বোধহয় মৃণাল আচার্যর কথা বললেও বলে থাকতে পারে।

অলকার আগে মা ওদের ফ্ল্যাটের খবর জেনে ফেলে। রত্নার চেয়ে বয়সে ছোট, বিবাহিতা অলকার উপর গোপন ঈর্ষা থাকতেই পারে মেয়েটার। ধর্মদাসের বউ-এর সঙ্গেও তো ওর বনে না।

মা বিড়বিড় করতে করতে ওঘরে চলে গেলেন। অলকা তখন আবার তার সন্দেহটা প্রকাশ করল, মা বলছেন পর্যন্ত দর্জিপাড়ার লোকটার কথা।

অরুণাভ কথা বলল না। নিমন্ত্রণ পত্র পেলেই ধরা যাবে আসল ঘটনাটা কী। বলা তো যায় না। ধর্মদাসের পক্ষে কোনও কিছুই করাই অসম্ভব নয়। যে হলুদ পুকুর, বাদামপাহাড়, ইন্দ্রবিল, ন'পাহাড়ির খোঁজ রাখে, তার পক্ষে দর্জিপাড়ার লোকের পরিচয় বদলানো কঠিন নয়। অন্তত মুখে। কে জানে, ওই মৃণাল আচার্যর বাড়ি পিয়ালি টাউনে কিনা। ওরাই খাসমল্লিকের চৌধুরী কিনা, ওদের কেউ উজ্জয়িনী থাকে কিনা। তবে চৌধুরীর মত আচার্যও তো পাওয়া উপাধি। ভাবতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে অরুণাভ। ওরা কি আচার্য চৌধুরী? বসুচৌধুরী, রায়চৌধুরী, পালচৌধুরীর মত আচার্য চৌধুরীও তো উপাধি পদবি হতে পারে। দর্জিপাড়ার লোকটা হয়ত 'চৌধুরী' ছেঁটে দিয়ে 'আচার্য' লেখে। ধর্মদাস আবার তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে চৌধুরীর মহিমা।

অলকা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তুমি কি ওই সময় থাকবে?

তাই তো! সম্বিত ফেরে যেন অরুণাভর। তার তো শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন আছে বহরমপুরে এই তারিখ থেকে। সে কলকাতার প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্য। না গেলেই নয়। ষাট, পঁয়ষট্টি বছর নিয়ে এখন জোর বিতর্ক চলছে। এবারের সম্মেলনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেশীর বিয়ে বলে তা বাদ দিতে তো পারবে না। অরুণাভ ভাবল বেঁচে যাচ্ছে সে। ধর্মদাসের ব্যাপরে না জড়ানোই ভাল। মা থাকবে, অলকা থাকবে, সে না থাকলে ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। থাকলে দায়িত্ব এসে পড়বেই ঘাড়ে। মুখোমুখি ফ্ল্যাট, এ বাড়িতে বিয়ে। অরুণাভ উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। তিনতলা এই বাড়িটিতে পাশাপাশি দুটি করে ছ'টি ফ্ল্যাট। তারা একদম মাথায়। বাড়িটির বয়স কম নয়। মা তাকে কোলে করে পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে এসে উঠেছিলেন বাবার সঙ্গে। তখন ধর্মদাসরা এসে গেছে। তারা কেন এই ফ্ল্যাটবাড়ির পুরনো বাসিন্দারা কেউ নড়েনি আর। শুধু একতলার দুটি ফ্ল্যাটে দুবার ভাড়াটে বদল হয়েছে। তাও তো অনেকদিন হলো। বাড়িটি সকলের যেন নিজের মত। প্রতিবেশীরা এখানে বড় গা ঘেঁষাঘেষি করে আছে। খুব কাছাকাছি। এক ফ্ল্যাট অন্য ফ্ল্যাটের কাছে গোপন রাখতে পারে না অনেক কিছুই। দরজা খুললেই যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বাসিন্দাদের অন্দরমহল পর্যন্ত দেখা যায়।

অরুণাভ দেখছিল মাঠ। টালা পার্ক এখন খণ্ড খণ্ড, তবুও সামনে এখনো বিস্তৃত সবুজ। অনেকটা আকাশ। অরুণাভ নিঝুম হয়ে পড়ে বাইরে তাকিয়ে। ফ্ল্যাটবাড়িটা ঠিক যেন আগের মতো নেই। লোকজনও কমে গেছে। মেয়েগুলি তো কেউ নেই। ঝুমুর, নূপুর, দোতলার নীলা, বেলা, করবী, একতলার শিউলি, সুজাতা—সবার শেষে যাচ্ছে রত্না। ধর্মদাসের ছোট ভাই রামদাস চলে গেছে এবাড়ি ছেড়ে। ছেলেটা জুট মিলে চাকরি করে। ধর্মদাস তাকে থাকতে দেয়নি এবাড়িতে। একতলার নীলাঞ্জন খুব ভাল ফুটবলার, ফ্ল্যাট পেয়েছে কাঁকুড়গাছিতে। এ বাড়িটা ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ অন্ধকার।

অলকা ডাকল, ধর্মদা এসেছে নেমন্তন্ন করতে।

তিন

ক'দিন বাদে অরুণাভর সঙ্গে ধর্মদাসের আবার কথা হলো বাজারে। মুখোমুখি ফ্ল্যাট হলও বাড়ির বাইরের কথা হয় বেশি।

ধর্মদাস বলল, ক্যাটারার ঠিক করেছি, ষাট টাকা প্লেট।

হাঁ হয়ে গেছে অরুণাভ, ষাট টাকা!

হ্যাঁ, তাও মিষ্টি ছাড়া, মিষ্টি ধরলে পঁয়ষট্টি থেকে সাতষট্টি পড়ে যাবে।

অরুণাভ বুঝল মিথ্যে বলতে আরম্ভ করেছে তার প্রতিবেশী। বড়লোকি দেখাচ্ছে। এত দাম হওয়ার তো কথা নয়।

পাঁচশো লোক হয়ে যাবে।

করছো কী, এত লোক আজকের দিনে বলে!

ধর্মদাস নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তারপর এগোতে এগোতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, হ্যাঁ অরুণাভ তুমি যেন কী বলছিলে সেদিন, কী জিজ্ঞেস করছিলে।

অরুণাভ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের সন্দেহের কথা কানে গেছে নাকি ওর? তাই বা কী করে হবে! আর সন্দেহ তো মিটেই গেছে, পাত্রের নাম মৃণাল নয়। পাত্র উজ্জয়িনী নিবাসী। দর্জিপাড়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না।

জবাবটা ধর্মদাসই দিল, পিয়ালি টাউনের নাম, পিয়ালি নদী, তুমি ঠিকই বলেছিলে, ওখানে একটা নদী ছিল পিয়ালি নামে, এখন অবশ্য মাঠ, হ্যাঁ নামের কারণ থাকে বটে।

অরুণাভর মুখে হাসি ফোটে, খোঁজ নিয়েছিলে?

কেন, নিতে পারি না, জিজ্ঞেস করলাম পাত্রর কাকাকে, বলল ওই নদীর নামেই তো টাউন,তবে নদী যদি সব তো শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই নাকি? ওর কাকা তোমার মত বিদ্বান বটে।

অরুণাভ বলল, হ্যাঁ, কাগজে পড়ো না।

কাগজ পড়ার আর সময় পাই কই, হ্যাঁ উজ্জয়িনীতেও একটা নদী আছে।

শিপ্রা, জানি, তুমি খুব ভাল জায়গায় বিয়ে দিচ্ছো রত্নার।

হে হে করে হাসতে থাকে ধর্মদাস, 'তাহলে বলো, বাদামপাহাড় ইন্দ্রবিলের চেয়ে ভাল হলো কিনা, দূরও অনেক, টু নাইট জার্নি।'

চলে যাও, ঘুরে এস বিয়ের পর। অরুণাভ বলল।

পরে দেখা যাবে, আগে আমি গোয়ায় যাব, অনেকদিনের ইচ্ছে যাওয়ার, ও জায়গাটায় নাকি সাহেব-মেমরা সব জামা-কাপড় খুলে রোদ পোহায়।

অরুণাভ মাথা নাড়ে। এ নিয়ে তার কোনোরকম জানা তথ্য প্রকাশ করতে গেলেই বিপদ হয়ে যাবে। ধর্মদাস ছাড়বে না। সে গোয়ায় যাবে যাবে করছে বহুদিন। যার যেথা মজে মন! অরুণাভ ভাবছিল পিয়ালি নদী মরে গেছে। পিয়ালির চৌধুরীরা উজ্জয়িনীতে। সেখানে শিপ্রা এখনো বহমান। নদী মরে গেলে মানুষের খুব বিপদ হয়। সেই বিপদে পড়েই কি চৌধুরীরা অতদূর উজ্জয়িনীর অন্ধকারে পা বাড়িয়েছিল। এখন কী বিবাহসূত্রে আবার ফিরতে চাইছে গঙ্গাতীরে।

চার

কেমন বিয়ে হলো?

অলকা গম্ভীর, তুমি ছিলে না ভালই হয়েছে।

কেন হলো কী? ফ্ল্যাটবাড়িতে পা দেওয়ার সময়ই অরুণাভ কেমন থমথমে ভাব দেখেছে। তিনতলায় উঠে ধর্মদাসদের ফ্ল্যাটে তালা দেখে কেমন যেন লেগেছে তার। বাড়িতে ওই হাওয়া ঢুকে পড়েছে বোধহয়।

অলকা বলল, ধরে করে একটা পুরুষমানুষ গছিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করল, শুধু মিথ্যে কথা।

কেন উজ্জয়িনী থেকে বর আসেনি?

তা কেন আসবে না! অলকা ফোঁস করে ওঠে।

অরুণাভর গলা শুনে মা চলে এসেছেন এ ঘরে, অলকাকে থামতে বললেন, 'বাদ দাওনা, ওসব কথা তুলছ কেন?'

হলো কী? অরুণাভ জিজ্ঞেস করল আবার।

বলল অলকা। একটু চাপা গলায় গোপন খবর দিতে লাগল যেন। তার মনে হয়েছে বরের কঠিন অসুখ আছে। সুস্থ নয়। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। বয়সে মানিয়ে গেছে, কিন্তু লোকটার চোখমুখ কী রকম যেন, পুরনো অসুখের কালো ছায়া।'

তুমি কী করে বুঝলে? অরুণাভ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে খবরটায়। বিষাদে মন ভরে গেল। ফ্ল্যাট বাড়িটা কেমন যেন নির্জন পুরীর মত হয়ে গেছে। সব ফ্ল্যাটের

দরজা বন্ধ। ধর্মদাসের ফ্ল্যাটে তালা। অথচ বিয়ে গেছে তো পাঁচ দিন আগে। এখনো বাঁশ নামাচ্ছে ডেকরেটরের লোক ছাদ থেকে। উৎসব হঠাৎ যেন ভেঙে গেছে।

অরুণাভর মা বললেন, আমি তো বলে দিলাম স্বামীকে ডাক্তার দেখাতে ভাল করে।

সত্যিই অসুখ! অরুণাভ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

অলকা মাথা দোলায় হ্যাঁ, বিয়ের রাত্রে হঠাৎ ঘামতে আরম্ভ করল, অথচ সেদিন তো ঠাণ্ডা ছিল ভাল, ঘেমে যেন চান করে যেতে লাগল, ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে আমি বরকে এনে বসিয়েছি এ ঘরে, জামা গায়ে রাখতে পারে না, শেষে না পেরে ডাক্তার ডাকতে হলো, এমন দেখিনি কোনোদিন।

ওরা কোথায়?

মেয়ে জামাইকে উজ্জয়িনীর ট্রেনে তুলে দিয়ে ওরা বোম্বে গেল, গোয়া যাবে। অষ্টমঙ্গলা হলো না, শোনা যাচ্ছে বরপক্ষই নাকি টাকা দিয়েছে, ও ছেলের বিয়ে হচ্ছিল না অসুস্থ বলে, রত্না তো আগে ছেলে দ্যাখেনি।

অরুণাভর মন খারাপ হয়ে গেল। জানালায় দাঁড়িয়েছে সে। মা আর অলকার কথার অংশ অংশ কানে আসছে। মা স্মৃতির ভিতরে ডুবে যাচ্ছেন ক্রমশ। এই ফ্ল্যাটে আসা, ওই মেয়েটিকে জন্মাতে দেখা, ওর বাবা মা-দিদি....মা ফিসফিস করছেন, ভাল হয়ে যাবে, ঠিক ভাল হয়ে .... বিয়ের পর অনেক সময় পুরনো অসুখ সেরে যায়। শরীরের একটা ধর্ম; আছে তো! মা চোখে আঁচল দিয়েছেন। মা কাঁদছেন। মায়ের মন খুব নরম। এ বাড়ির পুরনো মানুষ তিনি একমাত্র বেঁচে আছেন। সবাই তাঁর সন্তানের মত। রত্না, ঝুমুর, নুপুর, করবী, শিউলির কথা বলছেন মা ... বলতে ... বলতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধে, সন্ধে ঘন হয়ে রাত। দিন গেল রাত গেল। গেল পক্ষকাল, মাস, ঋতুও। বসন্ত এরমধ্যে ঢুকে পড়েছিল এই সিমেন্টবন্দী শহরে, টালা পার্কের কৃষ্ণচূড়ার মাথায়। তা মিশে গেল রৌদ্রময়তায়। কলকাতায় গ্রীষ্ম অতি দীর্ঘ, যায় যায় করেও যায় না। মা দুপুরে হাঁই তুলতে তুলতে বলেন, 'বউমা, মেয়েটার কোন খোঁজ এল?'

কী করে জানব মা, ওরা তো এখন কথা বলে না।

হ্যাঁ তাই হয়েছে। তুচ্ছ জিজ্ঞাসায় ধর্মদাসের বউ সশব্দে দরজা বন্ধ করে মুখেও কুলুপ এঁটেছে। অলকা জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, 'জামাই-এর শরীর কেমন আছে বউদি?'

সেই থেকে দরজা বন্ধ। দরজা খুলল ও বেশ কিছু দিন বাদে। প্রতিবেশী যখন, কতদিন বিনা আলাপে থাকতে পারে? যে জবাব চেয়েছিল অলকা ধর্মদাসের বউ-এর কাছে, তা পেল দেড়মাস বাদে, খুব ভাল আছে জামাই মেয়ে, তবে এখন ওখানে খুব গরম।'

অরুণাভ শুনে বলল, হতে পারে, মালওয়া মালভূমি অঞ্চল, তবে নগরটা তো নদীর ধারে।

অলকা চোখ উজ্জ্বল করে বলল, হ্যাঁ, শিপ্রানদী, তার তীরে তীরে নাকি শুধু মন্দির, সব দেবদেবী নাকি জাগ্রত, বহুকালের পুরনো।

তুমি এসব জানলে কী করে?

কেন রত্নার চিঠি তো পড়লাম, ও প্রতি সোমবার মহাকাল মন্দিরে যায়।

মহাকাল মন্দির! মহাকাল এখনো আছে? অরুণাভ আচ্ছন্নের মতো জিজ্ঞেস করে।

তুমি চেন? অলকা অবাক হয়ে গেছে অরুণাভের কথায়।

অরুণাভ বাইরে অন্ধকার শূন্যতায় তাকিয়ে। ধোঁয়াধুলোয় আচ্ছন্ন আকাশে গ্রহ নক্ষত্র এই শহরে স্পষ্ট নয়। উজ্জয়িনীর আকাশ নিশ্চয়ই ঝকঝকে, গ্রহ নক্ষত্ররা চোখের জলের মত মুক্তোবিন্দু। মেঘদূতেই তো রয়েছে মহাকালের কথা। মেঘ দাঁড়িয়েছে তার মাথায়, কবি উজ্জয়িনী নগরের রূপ বর্ণনা করেছেন। মহাকাল-উজ্জয়িনীকে চেনে অরুণাভ। এ যেন তার পূর্বজন্মের স্মৃতি। অরুণাভ ফিসফিসিয়ে বলছিল সব অলকাকে, অলকা মাথা নাড়ছিল, সে তো জানে না, মেঘদূত পড়েনি।

অরুণাভ বলল, এবার উজ্জয়িনী যেতে হয়।

তুমি তো শুধু বলেই খালাস, অলকা বালিকার মত ঠোঁট ফুলোয়, পিয়ালি টাউনেই তো নিয়ে গেলে না।

অরণাভ হাসে, সেখানে তো নদী নেই।

অলকা বলে, রত্না লিখেছে শিপ্রার ঘাটে ঘাটে মন্দির, কাঁসর ঘন্টা, ধূপের গন্ধ, নগর জুড়ে যেন উৎসব সব সময়....।

এখনো! অরুণাভ ফিসফিসিয়ে বলে, চিঠিটা আনো দেখি ওদের ঘর থেকে।

এইভাবে দূর উজ্জয়িনীর সঙ্গে মনে মনে জুড়ে যায় এই ফ্ল্যাটবাড়িটি, এই শহর। দিন যায়, মাস যায়, বর্ষায় আবার কথা ওঠে রত্নার। অরুণাভকে অলকা বলল, শ্রাবণে মহাকাল মন্দিরে খুব ভিড়, কত দেশ থেকে লোক যায়, রত্না লিখেছে জামাই ভাল আছে, সে ভাল আছে, প্রতি সোমবারে সে মহাকালে যায়, পুজো দেয়, মহাকালে সে মানত করেছে স্বামীর জন্য, কী যে ভাল মেয়েটা, এখানে ধরা যেত না, ও নাকি সকলের জন্য পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছে মন্দিরে মন্দিরে, প্রার্থনা করছে সকলের জন্য।

তার মানে? অরুণাভর ভিতরে যেন আশ্চর্য আনন্দ জেগে ওঠে।

তাই তো লিখেছে, এই দ্যাখো না। অলকা চিঠিটি বাড়িয়ে দিল।

দুপাতা চিঠি। গোটা গোটা অক্ষরে। অরুণাভ পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে তার বুকের ভিতরে যেন বর্ষণ শুরু হলো। ভিজে যেতে লাগল এই কঠিন নগরের বুক। সব লিখেছে খুঁটিনাটি। শিপ্রার তীরে মঙ্গলনাথের মন্দির, সেখানে মানত করেছে, গণেশজীর কাছে মানত করেছে, দুর্গামন্দিরে মানত করেছে, মহাকাল তো সবার মাথায় আছেন। শিপ্রানদী বর্ষায় ফুলে উঠেছে, সব দেবদেবীর চরণ ধুইয়ে নদী বহে যচ্ছে অনন্ত উল্লাসে। সে নদীর কাছেও মানত করেছে, স্বামী যেন সুস্থ থাকে, দূর কলকাতার স্বজনপরিজন, ফ্ল্যাটবাড়ির মানুষগুলি যেন সুখে থাকে, নীরোগ থাকে। অতদূরে বসে এছাড়া সে আর কীই-বা করতে পারে, সকলের মঙ্গল কামনা ছাড়া।

পরের খবর এল নভেম্বরে। জানুয়ারিতে তারিখ। বাচ্চা হবে রত্নার। ও আসছে কলকাতায়। প্রথম সন্তান বাপের বাড়ি মানে ফ্ল্যাটবাড়িতেই হোক, এই তার ইচ্ছে। সন্তান কলকাতায় ভূমিষ্ঠ হোক। স্বামী মত দিয়েছে। সে মানুষ ভাল আছে। আসুক রত্না। এসেওগেল। ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়ে ফিরে এল পূর্ণগর্ভা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে। সব খবর দেয় অলকা।

অলকা বলল, জানুয়ারিতেই আসবে নিরঞ্জন, রত্নার স্বামী।

অরুণাভ বলল, [illegible] সময় নিতে হবে উজ্জয়িনী ভ্রমণের, তবে বর্ষায় যাব, অন্য সময় নয়।

শীত এল কলকাতায়। ডিসেম্বরে শীত পাথর হয়ে থাকল ক'দিন। তারপর তা কমতে

শুরু করলেই অলকা ছুটেছে নার্সিং হোমে, রত্না ভর্তি হলো। দুদিন বাদে সকালে এসে ধর্মদাস সোল্লাসে খবর দিল, রত্নার মেয়ে হয়েছে কাল রাত্তিরে, ওহে অরুণাভ শুনেছ?

মা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, জামাই এল না?

আসবে, এখন তো ওখানে টুরিস্ট সিজন, ব্যবসায়ে খুব চাপ, টেলিগ্রাম করে দিয়েছে, এসে নিয়ে যাবে।

এসে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে। নিয়ে....।

ফেব্রুয়ারির প্রথমে সন্তান কোলে রত্নাকে দেখল অরুণাভ। রত্না বলল, ওর বাবা আসত, তবে এখন লিখেছে একবারে নিয়ে যাওয়ার সময় আসবে, সামনের মাসে।

পুরনো বাড়িটি থরথর করছে উল্লাসে, সুখে। অরুণাভ বলল, আলাপ হয়নি, এবার এমন আলাপ করব যে....।

মুখ টিপে হাসতে লাগল রত্না, তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, সত্যি ওখানকার দেবদেবী খুব জাগ্রত, মঙ্গলনাথে ওর বাবা মানত করেছিল যেন মেয়ে হয়, মেয়ে হলে মঙ্গলনাথের কপালে সোনার চাঁদ দেবে বলেছিল, সত্যিই তাই হলো, আপনার কী ইচ্ছে অরুদা?

অরুণাভ বলল, আমার জন্য, আমাদের জন্য তো তুমিই দিচ্ছো পুজো, আবার ফালতু খরচ করতে যাব কেন?

রত্না মাথা নামায়, 'হ্যাঁ দিই, প্রতি সপ্তায় তো যাই মহাকালে,আমার খুব মন খারাপ লাগে এক এক সময়, তখন আমি কী করব?'

অরুণাভ চুপ করে যায়। রত্নাকে যেন এই শহরে আর মানায় না।

পাঁচ

চলে গেছে রত্না। কবে, না আজ দুপুরে। মার্চের প্রথম। এর ভিতরেই বাতাস আগুন। আগে কলকাতা এমন ছিল না।

কেন, হঠাৎ চলে গেল যে? অরুণাভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

অলকা চাপা গলায় বলল, প্লেনে ইন্দোর, ওখান থেকে বাসে উজ্জয়িনী যাবে, এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেল, পিয়ালি টাউন থেকে ওর খুড়তুতো দেওর এসেছিল নিয়ে যেতে।

কিন্তু কেন সেটা বলবে তো। অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে অরুণাভ।

বলছি, একটু আস্তে, ধর্মদাসরা আবার দরজা দিয়েছে ; রত্নার স্বামী নিরঞ্জন খুব অসুস্থ।

ধর্মদাস যায়নি?

না, খবর তো এসেছে কাল রাতে, এ নিয়ে কান্নাকাটি করেছে মেয়েটা খুব, কিন্তু ধর্মদাসের নাকি যাওয়ার উপায় নেই।

একা গেল?

অলকা চুপ করে থাকে। ঘরের বাতাস হঠাৎ খুব ভারী, বাইরের অন্ধকার কালিমা লিপ্ত, তীব্র ঘন। মা এসে দাঁড়িয়েছেন এ ঘরে, ধরাগলায় বলছেন, মেয়েটাকে ঘাড় থেকে নামাতেই তো অতদূরে ওই রকম একটা রোগীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, যাবে কেন, গেলে যদি খরচ হয়, কী যে হলো অতদূরে?

অরুণাভ বলল, ভাল হয়ে যাবে ঠিক।

হ্যাঁ, অত মন্দিরে পুজো দেয় যখন। বলতে বলতে অলকা মাথা নামিয়েছে, 'না, না কিছুই হবে না, আসলে আমার মনে হয় ওর স্বামী আসতে পারবে না, তাই এই বলে নিয়ে গেল তার বউকে, এ সময় তো সত্যিই প্রচুর ট্যুরিস্ট যায় ওদিকে।'

মা ধরাগলায় বললেন, যাওয়ার সময়ে বলে গেল মাসিমা আমার খুব বিপদ!

এরপর আর কোনও খবর নেই। শহর পুড়ে গেল পশ্চিমী হাওয়া ও রোদে, তবু কোন খবর নেই। ধর্মদাসেরা হঠাৎ কেমন গুটিয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে, হাঁ হুঁ করে উত্তর দেয়, বলে, অত দূরের খবর কি রোজ রোজ রাখা যায়, তুমি তোমার বোনের খবর রাখ, কী দিয়ে ভাত খেয়েছে কাল?

ধর্মদাসের কু যুক্তির কাছে অরুণাভ হেরে যায়। নিজেকে সংবরণও করে। কথা বানিয়ে লাভ কী, শুধু শুধু ধর্মদাস রাগবে। রত্না তো তার কেউ নয়। কেউ নয় বটে তার, কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির তো!

খবর নেই। চিঠিও না। কিন্তু খবর এল একদিন। কলকাতায় তখন বর্ষা নেমেছে। তাপিত শহর ভিজছে মেঘের নিচে দাঁড়িয়ে। অলকা গিয়েছিল দিদির বাড়ি দর্জিপাড়ায়। দুপুরেই ফিরে এসেছে হাঁপাতে হাঁপাতে। ক্ষোভে বেদনায় মুখখানি কালো। ফ্ল্যাটে ঢুকেই সশব্দে দরজা দিয়েছে, তারপর আছড়ে পড়েছে বিছানায়, 'ওগো খবর শুনেছো!'

ছুটির দিন। অরুণাভ জানালার ধারে চেয়ার টেনে খবরের কাগজ মুখে নিয়ে বসেছিল। বাইরের আকাশ এখন ছাই ছাই, বাতাস উঠেছে এলোমেলো। অলকার কণ্ঠস্বরে হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, আশঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী খবর, তুমি এর মধ্যে ফিরে এলে যে?'

পুত্রবধূর কণ্ঠস্বরে অরুণাভর মা-ও চলে এসেছেন এ ঘরে, 'কী হলো বউমা?'

অলকা ফুপিয়ে উঠেছে, ওর সব ঘুচে গেছে।

কার কথা বলছ? আশঙ্কায় বুক কেঁপে গেছে অরুণাভর।

অলকা বন্ধ দরজার দিকে আঙুল তুলেছে, 'ওই রত্নার, রত্নার সব ঘুচে গেছে, সাধ আহ্লাদ, কী পাষণ্ড ওরা! কথাটা চেপে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উজ্জয়িনী যায়নি পর্যন্ত, খবরও নেয়নি।'

অরুণাভর মা কপাল চাপড়ালেন, 'তুমি এ কী খবর আনলে বউমা, কে বলল?'

দর্জিপাড়ার মৃণাল আচায্যি, রত্নার স্বামী মারা গেছে, মৃত্যুসংবাদ নিয়েই এসেছিল ওর পিয়ালি টাউনের দেওর, ধর্মদা, ওর বউ জানত, রত্নাকে জানায়নি, উজ্জয়িনী নিয়ে গেল স্বামী অসুস্থ বলে। আহা রে একা একা পাঠাতে বুক কাঁপল না ওদের, ছোট বোনটা বিধবা হলো ...।

মৃণাল আচায্যি অলকাকে ধরেছিল আজ তার দিদির বাড়িতে। রত্না তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে খবরটা যেন কেউ না জানে। আর কেউ না। ওর দাদা বউদি, ফ্ল্যাটবাড়ির প্রতিবেশীরা যেন খবর না পায়। জানলে ওরা কষ্ট পাবে।

ধর্মদাস জানে না? অরুণাভ জিজ্ঞেস করে।

বলছি তো জানে, সব জানে, পিয়ালি টাউনে গিয়েছিল মৃণাল আচায্যি রত্নার চিঠি

পাওয়ার পর, সব শুনে এসেছে, কিন্তু রত্না জানে যে ধর্মদাসরা জানে না, মৃণালকে বার বার লিখেছে তার খবর কেউ যেন না শোনে।

অরুণাভ ফিসফিস করল, বলল কেন তাহলে?

অলকা কান্নায় ভেঙে পড়ে, বলবে না ভেবেছিল, কিন্তু না বলে পারছিল না। আমাকে দিয়েও প্রমিস করিয়েছে আমি কাউকে বলব না, মৃণাল আচায্যি যে রত্নাকে খুব ভালবাসে, কথা বলতে বলতে তার চোখে জল চলে এলো গো...।

অরুণাভ থরথর করে কাঁপল অলকার কথায়। মায়ের মুখ থমথমে, মেঘভারী। অলকাও হঠাৎ স্থির, ক্রমশ ধাতস্থ হচ্ছে, কথাগুলি আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলছে। মেয়ে লিখেছে সবাই যেন জানে সে সুখে আছে, ভাল আছে। দাদা বউদিরা তো দেখে শুনে সুপাত্রর হাতে সমর্পণ করেছিল তাকে, ভাগ্যে সব সুখ সয় না।

রত্না আরো লিখেছে কলকাতায় আর ফিরবে না। ফ্ল্যাটবাড়ির মানুষগুলির সামনে বৈধব্য নিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে না। কলকাতার মানুষকে সে কষ্ট দিতে পারবে না। সন্তান কোলে সে এখনো পূজো দিয়ে যাচ্ছে মহাকালে, মঙ্গলনাথের মন্দিরে, শিপ্রার কূলে কূলে মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়। সে খুঁজছে আরো প্রার্থনার জায়গা, আরো, আরো। মসজিদ খুঁজে পেয়েছে, গির্জা পেয়েছে, আরো পেয়ে যাবে, জগতে কত না প্রার্থনার জায়গা, গাছগাছালি নদী পাহাড় মাটি। তার প্রতিবেশীরা যেন ভাল থাকে, তার স্বজন পরিজনেরা যেন ভাল থাকে, তার সন্তান যেন ভাল থাকে....।

দমকা ভিজে বাতাস অরুণাভর বুকে ঝাপটা মারে। সে মাথা তোলে। পশ্চিমে চিৎপুর রেল ইয়ার্ড পেরিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে আসছে মেঘ, পুঞ্জে পুঞ্জে, দলে দলে। উজ্জয়িনী, প্রাচীন অবন্তিকায় তার আর যাওয়া হবে না। এ জীবনে আর কখনো না। বৈধব্য সে সহ্য করতে পারবে না। বিধবা নগরনন্দিনীকে সে দেখতে পারবে না ওখানে গিয়ে। সে দেখল মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে জানালার ওপারে। বাতাস আবার ঝাপটা মারে। বিছানার চাদর উড়ল, খসে পড়ল ক্যালেন্ডার। মেঘ যেন পূর্বদেশীয় এই নগর চিনে চিনে এখানে এসে থামল। মেঘ দেখছে নগরের জীর্ণ ফ্ল্যাটবাড়িটিকে, যেখানে মানুষ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাঁচে, কেউ কাউকে ভুলতে পারে না কখনো। বৃষ্টি নামল অঝোরে। বৃষ্টির শব্দে শব্দে নগরময় উচ্চারিত হচ্ছে মেঘের খবর, কী খবর?

অরুণাভ কান পাতে। বৃষ্টির অক্ষরে অক্ষরে উজ্জয়িনীর খবর, সে ভাল আছে... খুব ভাল আছে, বিন্ধ্যাচলের মেঘ তার খবর নিয়ে এসেছে এত দূর। অরুণাভ দুহাতে চেপে ধরেছে জানালার গরাদ। কানে আসছে আকুল কণ্ঠস্বর, বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে নগরের আনাচে কানাচে.... মেঘ, হে মেঘ, তুমি পূর্ব দেশে গিয়ে হুগলীনদীর কূলে একটি নগর দেখতে পাবে, সেই নগরে খুঁজে খুঁজে পেয়ে যাবে আমার স্বজনপরিজন প্রতিবেশীরা আছে যে জীর্ণ অট্টালিকায়, তা। অট্টালিকাটি দেখলেই চিনবে, বহুকাল তার গায়ে রঙ পড়েনি, বহুদিন তার বাসিন্দাদের বুকে আনন্দ জাগেনি, এক নিঝুম থমথমে পুরী যেন বা, মেঘ, তুমি বলো আমি সুখে আছি, তুমি আকুল ধারায় ভাসিয়ে দিয়ো ওই নগর, ওই নগর বড় তাপিত, শুষ্ক, মানুষ বড় কষ্টে আছে সেখানে।

(শারদীয় আজকাল—১৯৯১)

হনন-আত্মহনন

মাছের দোকানদার বুড়ো হাবুল দাস চলে যাওয়ার আধঘন্টা পরেও রাগে কাঁপছিল নির্মল। দাম না দিয়ে জিনিশ নিয়ে চলে এসেছে এমন কোনোদিন হয়েছে? বরং জিনিশ কিনে দাম দিয়ে ফেরত টাকা পয়সা সে ফেলে এসেছে দোকানে, পরে আবার ছুটতে হয়েছে। বাজারে কোনো লোকের কাছে ধার আছে তার? কেউ বলতে পারবে কারোর কাছ থেকে দশপয়সাও বেশি হাতে পেয়ে সে ফিরিয়ে দেয় নি? এই তো কদিন আগে একশো টাকার নোট ভাঙানোর আধঘন্টা বাদে ঢের পেয়েছিল কুড়িটার বদলে একুশটা পাঁচটাকার নোট দিয়েছে আলুর দোকানি মনসুর। সে ফিরিয়ে দেয় নি? মনসুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করুক হাবুল দাস। সে ইলিশের দাম দিয়েছিল। হাবুল হারিয়েছে কিংবা হিশেবে গোলমাল করছে,অন্য কেউও তাকে টাকা না দিয়ে মাছ নিয়ে চলে যেতে পারে। তার কাছে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করল কেন পঞ্চাশ টাকার জন্য?

সুচরিতা বলল, তুমি ভুল করছ, ওরা গরিব মানুষ, সামান্য ব্যবসা করে খায়, পঞ্চাশ টাকা ওদের কাছে অনেক।

রাগে গরগর করে ওঠে নির্মল, আমি তো নিতেই চাইনি শেষ মাসে ইলিশ, জোর করে থলের ভিতরে দিয়ে দেওয়ার সময়ে কী কাকুতি মিনতি, হসপিটালে ভর্তি ছিল নাকি আড়াইমাস, পেটে ঘা, পুঁজি নেই, দিনেরটা দিনে না বেচতে পারলে বাঁচবে না, ওষুধের দাম উঠবে না.....।

সুচরিতা কাটা ইলিশের টুকরোয় নুন হলুদ মাখাতে মাখাতে বলল, তুমি ভুল বলছ, গরিব মানুষে ওরকম করবেই, ও বলছে তুমি খেয়াল না করে চলে এসেছ, দাম দিতে মনে ছিল না তোমার।

পঞ্চাশটাকার নোটটা হাত পেতে নিল, এখন বলছে আমি দিইনি!

আহা ভুল তো ওখানেই, তুমি বলছ দিয়েছ, ও বলছে তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে এসেছ। ওর ও খেয়াল হয়নি তখন টাকা দাওনি তুমি!

লায়ার, দ্যাখো ও আবার টাকা আদায় করতে চায়, বলে না অভাবে স্বভাব নষ্ট।

হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, তবে লোকটাকে দেখলে মনে হয় সরল, বলছিল, তোমার বাবার আমল থেকে মাছ দেয়, ওরকম লোক পঞ্চাশ টাকার জন্য মিথ্যে বলবে?

নির্মল বলল, তুমি ও তো উল্টো বকছ। একবার বলছ গরিব মানুষ, পঞ্চাশ টাকার দাম ওদের কাছে অনেক, এখন বলছ পঞ্চাশ টাকার জন্য মিথ্যে বলবে কী করে।

হাসে সুচরিতা, ওতো কথার কথা, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? তুমি যখন বললে বুধবারে দিয়ে দেবে, ও তো বলল যদি দিয়ে থাকেন তো আবার দেবেন কেন?

বিরক্ত হল নির্মল। সুচরিতা যেন তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মাছওয়ালা বুড়োর হয়ে সওয়াল করতে আরম্ভ করেছে। সুচরিতার মন নরম তাই বুড়ো লোকটার কান্নায় গলে গেছে। আজ মাসের আঠাশ তারিখ না হলে বোধহয় নিজের তহবিল থেকে টাকাটা দিয়েই দিত তার বউ। ইলিশের জন্য না হয় অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা গেল। লোকটা তো বলছে নির্মল দাম না মিটিয়ে এসেছে। নির্মলের পাঞ্জাবির পকেট থেকে টাকাটা পড়েও তো যেতে পারে।

নির্মল বোঝায় সুচরিতাকে, আমি তো একা মাছ নিইনি। অন্য খদ্দেররাও তো কেউ ভুলে ....।

হতেই পারে, যে কোনো খদ্দের একজন ভুল করে ওকে টাকা দেয় নি, সেই যে কোনোর একজন তুমি ভেবে বুড়ো মানুষটা এসেছিল কেননা ওর হারিয়েছে পঞ্চাশ টাকা তোমার মাছের দাম ছিল উনপঞ্চাশ, ও বলছে ফেরত একটাকা তুমি আগে নিয়েছ,পঞ্চাশ টাকা তোমার হাতেই ধরা ছিল, তখন তোমার বন্ধু এসে ডাকল আর অন্য একজন ওর ইলিশের দর করতে আরম্ভ করেছে।

এতটা সিম্পল নয়, ও টাকা .ফেরত দিল আগে, আমি কত দেব জানবে কী করে ও?

আহা এত তর্কের তো কোনো ব্যাপার নেই, দিয়েছ তো আর দিতে হবে না।

নির্মল এবার রেগে গেল, আমি যাচ্ছি দিতে, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ?

অবিশ্বাস করব কেন? আচ্ছা একটা বুড়ো লোক, এই বয়সে পেটে আলসার হলে সারে না, কদিন বাদেই ওকে আবার হসপিটাল যেতে হবে, বাড়িতে এসে যখন শুনল টাকা দিয়ে দিয়েছ, কেঁদে ফেলল, তোমার কষ্ট হয় নি লোকটাকে দেখে? আবার পঞ্চাশ টাকা না হয় ওর রোগের চিকিৎসার জন্যই দিলাম।

নির্মল নরম হল। দেওয়া যেতেই পারে এভাবে। ওকে তো মাস চারেক বাজারে দেখে নি নির্মল, ভেবেছিল ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে বুড়ো, হয়তো মরেই গেছে। এরকম তো হয়। যাকে মানু বলত, সেই মধ্যবয়সী আনাজপাতিওয়ালার জায়গা দিন পনের ফাঁকা দেখে পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে খবর পেয়েছিল বেঁচে নেই। বাজারের লোকগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক তো আজকের নয়। এ এলাকায় তাদের বাস চল্লিশ বছরের উপরে। নির্মল নিজে বিয়াল্লিশ। বাবার হাত ধরে বাজারে গিয়ে যে সবজিওয়ালা মাছওয়ালার সামনে গিয়ে দাঁড়াত, সেই পুরনো লোকগুলির মধ্যে আছে শুধু এই হাবলু দাস। আর আলুওয়ালী বুড়ি। বুড়ি আছে বটে. কিন্তু ভিখিরি হয়ে। ব্যবসাপাতি গেছে। বাজারের এক কোণে বসে হাত পেতে থাকে প্রায়ই।

সুচরিতা বলল, লোকটাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় খাঁটি।

হাসল নির্মল, ওরকম মনে হয়, মাছ তরকারি বাড়িতে মেপে দেখলে ধরা যাবে কে কত খাঁটি।

রোববারের সকালটা বিস্বাদ হয়ে গেল। হাবুল দাস বুড়ো বোধহয় গোটা পনের ইলিশ নিয়ে বসেছিল। পাইকারি বাজারে যেতে পারে নি। কিনেছিল আর এক ব্যবসায়ী ননী দাসের কাছ থেকে। এ বাজারে এরকম হয়। বুড়ো হাবুলকে ননী দয়া করেছিল তার চেহারা দেখে। পনেরটা ইলিশে বারো কেজি-র মত ছিল। বারো কেজির দাম সত্তর টাকা হিশেবে আটশ

চল্লিশ টাকা হওয়া উচিত। সব বিক্রি করে হাবুল পেয়েছে সাতশ নব্বই টাকা। পাকা পঞ্চাশ টাকা শর্ট। তখন ভাবতে ভাবতে বের করেছিল দত্তবাবুর পঞ্চাশ টাকা বোধহয়—। দত্তবাবু তো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন দাম না দিয়ে।

কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার? সুচরিতা তেলের কড়ায় ইলিশ ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল।

ও তুমি চিনবে না, অমলেন্দু পাল, বাঁকুড়ায় থাকে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

সুচরিতা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে ইলিশের কড়ায় নিমগ্ন হল, মাছটা ভালো, গন্ধ বেরিয়েছে, পাচ্ছ?

গন্ধ নিয়ে উঠে গেল নির্মল। মন খারাপ হয়ে গেছে। অমলেন্দু ন মাসে ছ মাসে কলকাতায় আসে। খুব খারাপ খবর দিয়েছে আজ। তাদের বাল্যবন্ধু দিলীপ নাকি সুইসাইড করেছে। জানত না নির্মল। দিলীপের কথা তো ভুলেই গিয়েচিল। ওরা এ পাড়া থেকে উঠে গেছে প্রায় কুড়ি বছর হল, বাগুইআটির দিকে বাড়ি করেছিল ওর বাবা এইটকু শুনেছিল। তারপর একবার দেখা হয়েছিল হাতিবাগানের থিয়েটার হলে। সেও তো বছর ছয় আগে। এই মার্চে মেদিনীপুরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গেছে দিলীপ। কাগজেও নাকি দিয়েছিল। সে ছুটে গিয়েছিল মেদিনীপুর। ওই কথাই তো বলছিল অমলেন্দু, দিলীপের আত্মহত্যার কারণ। সুচরিতাকে ঘটনাটা বলতে যাবে তখনই বাজার থেকে এসে হাজির বুড়ো হাবুলদাস।

সুচরিতা এসে জিজ্ঞেস করল, চা খাবে আবার?

নির্মল বলল, মেজাজটা এমনিতেই খারাপ ছিল, ও এসে তাতে যেন ইন্ধন জোগাল, আমার এক বাল্যবন্ধু দিলীপ ঘোষ আত্মহত্যা করেছে মেদিনীপুরে, তোমার মনে আছে? স্টারে নাটক দেখতে গিয়ে...

সুচরিতা মনে করতে পারল না। কিন্তু নির্মলের রাগের কারণ যেন এবার ধরতে পারল। সে আর কথা না বাড়িয়ে রান্না ঘরে চায়ের আয়োজনে গেল। বাড়ি ভরতি ইলিশের গন্ধ। নির্মলের একমাত্র পুত্র ড্রয়িং স্কুল থেকে ফিরল উল্লাস নিয়ে। নির্মল গায়ের পাঞ্জাবি খুলে সোফায় শরীর এলায়। হাবুলদাস তাকে বিশ্বাস করে নি তা স্পষ্ট। ওর চোখে যে বিস্ময় জেগে উঠেছিল নির্মল অস্বীকার করতে তা সুচরিতা দেখেছে। সুচরিতাও অবাক চোখে দেখেছিল নির্মলকে। বুড়ো হাবুল দাস হাসতে হাসতে দরজায় কড়া নেড়েছিল। দরজা খুলেছিল নির্মলের বউ। তাকে বলেছিল, মা আমি বুড়ো হাবুল, দাদাবাবুকে বলুন উনি ভুল করে দাম না দিয়ে—। নির্মল রেগে গিয়েছিল হাবুলের কথায়। তার অত রাগ হল কেন? রাগটা কি অস্বাভাবিক হয় নি? নির্মল উঠে ধীর পায়ে রান্না ঘরের সামনে গেল আবার, দিলীপ খুব ভাল ক্রিকেট খেলত, ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেছে, রনজি ট্রায়ালে ডাকও পেয়েছিল।

সুইসাইড করলেন কেন, কী হয়েছিল? সুচরিতা কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অস্ফুট গলায় বলল, কোন মানুষের যে কী হয়! ভালো চাকরি করতেন না? বিয়ে করেছিলেন?

হ্যাঁ, দুই ছেলেমেয়ে, ওর বউ অবশ্য চাকরি পেয়েছে, বি-এ পাশ ছিল।

কারণ জানা যায়নি? চায়ের কাপ হাতে উঠে এল সুচরিতা, মানুষের যে কী হয়! চায়ের কাপ নিতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল নির্মলের। কী হল তার? শরীর খারাপ লাগছে?

নির্মল বসে পড়ল সরু প্যাসেজের মেঝেয়। আজকাল তো মেঝেয় বসাই হয় না। খাওয়া টেবিলে, বসা সোফায় শোয়া খাটে। মেঝের ঠাণ্ডায় যে আরাম আছে তা প্রায় ভুলেই গেছে মানুষ।

কিছুই হয়নি নির্মলের। তার দিলীপের কথা মনে পড়ছিল। অমলেন্দুও জানে না কেন ঘুমের ওষুধ খেল সে। না, বাড়িতে খায় নি। ঝাড়গ্রামে গিয়েছিল সরকারি কাজে। রাতে সরকারি বাঙলোয় একা একা...। মানুষের যে কী হয়! খুব জনপ্রিয় মানুষ ছিল দিলীপ তার দপ্তরে। সে যে এভাবে নিজেকে শেষ করে দেবে ভাবতেই পারেনি কেউ।

কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল, এমনিএমনি লোকে আত্মহত্যা করে? সুচরিতা বলল।

অমলেন্দু হয়তো ভেঙে বলল না, নিশ্চয়ই কারণ আছে, বিনা কারণে কী হয়?

নির্মলের সামনে ড্রইং স্কুল ফেরত তার পুত্র মেলে ধরল ছবি। অপটু হাতে আঁকা মানুষ। ভাঙাচোরা, কিছুটা মানুষ কিছুটা অন্য কিছু, অচেনা কোনো জীব। ধরা যায়,বোঝা যায় না।

দুই

পরের দিন বাজারে হাবুল দাসের মুখোমুখি হল না নির্মল। অন্য এক স্বল্প পরিচিতের কাছ থেকে চারাপোনা। হ্যাঁ, হাবুল দাস আছে। ডিঙি মেরে তাকে দেখছে। ওর কাছে থেকে আর কোনোদিনই মাছ নেবে না সে। গম্ভীর গম্ভীর মুখে মাছের বাজার থেকে বেরিয়ে ভিখারিনী আলুওয়ালীকে কুড়ি পয়সা দিয়ে নির্মল সাক্ষী মানল গন্ধলেবু কলা থেড়ে নিয়ে বসা ছেলেটিকে, এমন হয়েছে সব, মাছের টাকা নিয়ে বলছে নেয়নি।

ছেলেটি একজোড়া গন্ধলেবু দিতে দিতে বলল, কার কথা বলছেন স্যার?

হাবুল দাসকে চেন? বুড়ো হাবুল, টাকা দিতে দিতে নির্মল ঘটনাটা বলতে থাকে, পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে একটাকা ফেরত দিল, আমার বন্ধু দেখেছে, সে জিজ্ঞেস করল কত ওজন হয়েছে।

গন্ধ লেবুর ছেলেটির মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। যেন তাকে দায়ী করেছে নির্মল, বলল, ভুল তো হয় মানুষের!

ভুল হতেই পারে, কিন্তু ভুল স্বীকার ও তো করবে, আমি কি আর মাছ নেব ওর কাছ থেকে?

আর কথা বলল না ছেলেটি। নির্মল সরে গেল অন্য পশারীর কাছে। হাতে সময় কম। নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে হয় অফিসে। বাজার থেকে ফিরে আর দাঁড়ানোর সময় থাকে না। সুচরিতা যেন জিজ্ঞাসার জন্য তৈরি হয়েই ছিল, টাকার হিসেব মিলেছে ওর? কিছু বলল?

মাথা নাড়ে নির্মল, বলবে আবার কী, আমি ওর সামনেই যাইনি।

সামনে যাওনি কেন? আজ ওর কাছ থেকে মাছ নাওনি?

মাথা খারাপ, আবার এসে হয়তো বলবে দাম দিইনি, যদি টাকার দরকার থাকে তো চেয়ে নে।

সুচরিতা বাজার ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল?

ও তো ভোরের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধরেছে, আসে কখনো-সখনো।

জানতে পারলে না ব্যাপারটা, কেন সুইসাইড...?

নির্মল মাথা নাড়তে নাড়তে বাথরুমের দিকে এগোয়, কী হবে জেনে? অমলেন্দু চেপে গেছে মনে হয়।

অফিসেও কথাটা তুলল নির্মল সহকর্মীদের কাছে। লোক কীরকম অসৎ হয়ে গেছে আজকাল। তাকে কেউ সমর্থন জানায়, কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে। এরকম সাধারণত হয় না। মাঝেমধ্যে নোটের ভাঙানি না পেলে বকেয়া টাকা তো রেখেই আসা হয় মাছওয়ালা কিংবা সবজিওয়ালার কাছে। নিজে ভুলে গেলেও ওরা কিন্তু ভোলে না। ঠিক ফেরত দিয়ে দেয় পরদিন। এই কথার প্রতিবাদ করে অন্যজন, এসব দশ বছর আগে ছিল। এখন সকলের ধান্ধা কী করে ইনকাম করা যায়। সে একবার ভুল করে পাঁচটাকা ফেরত নেয়নি এক ডিমওয়ালার কাছ থেকে। পরদিন স্রেফ অস্বীকার করল। এই কথারও বিপক্ষে বলল একজন। তা হবে কেন? চেনা ডিমওয়ালা এরকম করে কখনো? খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় নেই তাদের? তার অভিজ্ঞতা তো অন্যরকম। কলা কিনে খুচরো ফেরত নেয় নি, মনেই ছিল না। পরদিন সেই খুচরো লোকটা তাকে ফেরত তো দিয়েইছে, উপদেশও দিয়েছে এত ভুলো মন হবেন না বাবু। সবাই তো ভালো নয়। হ্যাঁ সবাই ভালো নয়। হতেই পারে না সবাই ভালো। তাহলে তো দেশের চেহারাই বদলে যেত। নির্মল বলল, সবাই ভালো নয় বলেই তো মুশকিল। ভালো লোকের রেফারেন্স আমরা খারাপ লোকের সঙ্গে দিই; বুধবারে টাকা দিয়ে দেব, শেষমাসে হাতটান তো থাকে, তা না হলে দিয়েই দিতাম, পঞ্চাশ টাকাটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল গিয়ে বিশ্বাস, লোকটার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।

তা ঠিক। সহকর্মীরা এ ব্যাপারে সকলেই একমত। ক্ষমা চেয়ে নিলেই যেন নির্মল ওর দোকানে মাছ নিতে যায়। পঞ্চাশ টাকা কেন একশো টাকাও নির্মল দিতে পারে ওর চিকিৎসার জন্য। লোকে খুব খারাপ হয়ে গেছে। সেদিন বোর্নভিটা কেনা হল এক দোকান থেকে, অন্য দোকানে গিয়ে দেখা গেল পাঁচ টাকা দাম কম।

কী করলে তখন, বলনি দোকানদারকে? নির্মল উন্মুখ হল।

বলিনি আবার, সে বলছে নতুন মাল তাই দাম বেশি। অন্য দোকানে নাকি ওল্ড স্টক।

সারাদিন ধরে নানান আলোচনার পর বিকেলের দিকে সকলে একমত হল যে লোকে অসৎ হয়ে গেছে। নির্মল যেন মাইনে পেয়ে টাকা না দেয়। ওতে লোভী হয়ে যাবে লোকটা। অন্য একদিন আর একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। ঠকাবে। অপমান করবে শিক্ষিত লোককে। এসব ব্যাপার একদম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বরং ওই মাছ বিক্রেতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া উচিত অন্যজনকে।

তাই করবে নির্মল। পঞ্চাশ টাকা দেবে, না দিলে সুচরিতা অসন্তুষ্ট হবে, তাই দিতে হবে, দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেবে। মঙ্গলবার মাইনে পেয়ে বুধবার সকালেই সে টাকাটা দিয়ে দিল হাবুল দাসকে। দিতে দিতে বলল, দুবার দিলাম একমাছের দাম, এটা মনে রেখ।

বুড়ো হাবুল উঠে দাঁড়ায় মাথা নাড়তে নাড়তে, তাহলে তো নেবনা বাবু।

নেবে না মানে, নিতেই হবে, তুমি আমার বাড়ি পর্যন্ত গেছ। নির্মল নোটটি ফেলে

দিয়ে চলে এসে আলুর দোকানি মনসুরকে বলল সব। মনসুর ঘাড় নাড়তে লাগল এতো ঠিক নয় দত্তদা, একমাছের দাম দুবার নেবে কেন, আপনাকে তো আমি চিনি, ও কি নিয়ে নিল টাকাটা?

হ্যাঁ, তোমায় কিছু বলতে হবে না, কত টাকা তো যায়, এটাও না হয় গেল।

না, না তা কেন, আপনারা পুরোন লোক, আপনাদের সঙ্গে তো এভাবে ব্যবসা হবে না। মনসুর ঈষৎ উত্তেজিত।

তা কি সবাই বোঝে, আমার মনে আছে, তখন বোধহয় ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ি, বাবার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, হাসপাতালে, কী করে যে খবর পেয়েছিল বাজারের ক'জন, তার মধ্যে তোমার বাবাও ছিল, যতদিন হাসপাতালে ছিলেন আমার বাবা, বাজার বয়ে দিয়ে এসেছে মাছওয়ালা, সবজিওয়ালারা, দাম নেয়নি পর্যন্ত, মার কাছে শুনেছি আমি, ওই যে বুড়ি ভিক্ষে করে, সে তখন আলু বিক্রি করত, পরে বাবা অফিসে জয়েন করে তিন মাস বাদে দাম মিটিয়েছিলেন।

ঠিকই তো করেছিল, মনসুর খুব গল্পবাজ, এরকমই তো হবে দাদা, আজ যদি আমার কিছু হয়,আমার পরিবার গিয়ে যদি সাহায্য চায় আপনি কি দেবেন না? আবার উলটোটাও হতে পারে। এই যে সেদিন পাঁচটাকা গুনতিতে ভুল করে আপনাকে বেশি দিয়ে দিলাম, চেনা মানুষ বলেই তো দুবার গুনিনি। জানি বেশি গেলে ফেরত পেয়ে যাব, পেয়েও তো গেলাম, আমি হাবুলবুড়োকে বলছি, আপনারা পুরোন খদ্দের, আপনাদের কথায় যদি বিশ্বাস না রাখতে পারে তো নতুন খদ্দের এলে কী করবে?

রাজ্য জয় করে যেন ফিরল নির্মল। ফিরেই সুচরিতাকে বর্ণনা করতে লাগল সব। কীভাবে টাকা ছুঁড়ে দিয়েছে, মনসুর কী বলেছে, কী বলেছে সবজি ওল নিয়ে বসা আর এক বুড়ো। সুচরিতা শুনতে শুনতে যেন বিরক্ত হল, তুমি সব্বাইকে বলছ কেন, বুড়ো ভুল করেছে তোমার কাছে চেয়ে, কিন্তু তার টাকা যে হারিয়েছে তা তো সত্যি, রুগ্ন মানুষ, আগের মতো বড় ব্যবসা করতে পারে না...।

সত্যি যে তাই বা বুঝছ কী করে, আজ মাথা নিচু করে ছিল। কথাটা একটু বানিয়ে বলল নির্মল।

সত্যি না হলে কেঁদে ফেলত না তুমি অস্বীকার করলে, বুড়ো মানুষ কাঁদছে, মিথ্যে হতে পারে?

তাহলে সে হারিয়ে ছিল, অন্য কেউ দেয়নি হয়তো। নির্মল তর্ক করতে লাগল।

একই কথা রোববার থেকে চলছে। একই বাক্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে নির্মল প্রমাণ করতে চাইছে তার দাবি সত্যি। আর সুচরিতা মেনে ও যেন মানতে চাইছে না। হাবুল দাসের সঙ্গে নির্মলের কথা বন্ধ। সে হাবুল দাসের পাশের দোকানে গিয়ে মাছ নেয়। হাবুল দাসের দিকে ফিরে ও তাকায় না। একদিন হাবুলের সামনে জ্যান্ত ট্যাংরা। এগিয়েও পিছিয়ে এল নির্মল। তার পাশের লোকের কাছ থেকে কাটাপোনা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি অন্য মাছ আনো না সুধীর?

কী মাছ চান বলুন দাদা, আগে তো আমার কাছে আসতেনই না। সুধীর উৎসাহিত হল।

নির্মল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল হাবুল দাস কোটরগত চোখ, ভাঙা গাল শরীর নিয়ে হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে তার পাশের লোকটির দিকে। নির্মল তাকে শুনিয়েই বলল, ধরো জ্যান্ত ট্যাংরা, বেশ কালো রঙের, বেগুন কচু দিয়ে ঝোল খাব, ডিমভরা যেন হয়।

সুধীর অবাকই হয়েছে তার কথায়। পাশেই বুড়ো হাবুলদার কাছে ওই ট্যাংরাই তো রয়েছে। যেন ওই ট্যাংরা মাছ দেখেই বিবরণ দিচ্ছে নির্মলদা, সে বলল, আনব, আজ নেবেন?

আজ! না আজ নেবে না। আজ তো নেওয়া হয়ে গেছে কাটাপোনা। আসলে নিয়ে কীই বা ক্ষতি হত নির্মলের। কাটাপোনা ফ্রিজে ঢুকে যেত। কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে সুধীর এক্ষুনি হাবুলদাসের কাছ থেকে মাছ এনে তার থলেতে ভরে দেবে। তাতে হাবুল দাস তো জব্দ হবে না। বরং মনে মনে হাসবে। বাড়ি ফিরে কথাগুলো রসিয়ে বলতে লাগল নির্মল তার বউকে। এও একরকম তৃপ্তি। যে তৃপ্তি হয়েছে সুধীরকে কালো ডিম ভরা ট্যাংরা আনতে বলে সেই তৃপ্তিই যেন ঘরে এল কথাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সুচরিতাকে বলার ভিতর দিয়ে। হাবুল দাস কীভাবে তাকিয়ে ছিল তা বলতে বলতে নির্মল দেখল সুচরিতার মুখখানি অন্ধকার হয়ে এল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কথাগুলো শুনতে শুনতে সুচরিতা ধীরে ধীরে অন্য ঘরে চলে গেল।

পরের দিন সুধীর বলল, ট্যাংরা কাল আনব দাদা, রোববারে কী মাছ নেবেন যেন বলছিলেন?

আজ যদি মউরোলা থাকত নিতাম। নির্মল ইতিমধ্যেই দেখে নিয়েছে হাবুল দাসের সামনে চকচকে মউরোলা, লাল ডোর দিশি পুঁটি। সে আজ অন্যদিকে ফিরে আছে। তাকাচ্ছে না এদিকে। কথাটা আবার সুচরিতাকে, সুচরিতার মুখ আবার অন্ধকার, শেষে না পেরে বলল, এতে তোমার টাকা ফিরে পাবে?

দুদিন এ-বিষয়ে কথা হয়নি সুচরিতার সঙ্গে। আজ হল। কথা চাইছিল নির্মল, সুচরিতার চুপ করে থাকা ভালো লাগছিল না, বলল, টাকা কোন্ ব্যাপার নয়, ভুল তো স্বীকার করবে।

তুমি ভুল করলে স্বীকার করতে? উল্টে জিজ্ঞেস করেছে সুচরিতা, কণ্ঠস্বর সামান্য তীব্রতায় ভরা।

ভুল করলে স্বীকার না করার কী আছে? ঢোক গিলল নির্মল, তাতে তো অপরাধের কিছু নেই।

লোকটা গরিব, ভুল করলে ও স্বীকার করত, আমি বুঝতে পারছি না তুমি এমন করছ কেন ওর সঙ্গে?

ভুলতো ও করে নি, ইচ্ছে করে টাকা আদায় করেছে, আমাদের গায়ে ভদ্দর লোকের চামড়া, দিতেই হবে। নির্মল হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরের কর্কশতা নিজেই টের পেয়ে সামলে নিল পরক্ষণে, যাক গে ও নিয়ে আর আলোচনা করতে হবে না, হ্যাঁ জানো, সত্যিই জানা যায় নি দিলীপ কেন সুইসাইড করেছে, তারক বলল।

তারকদা জানল কী করে? জিজ্ঞেস করল সুচরিতা স্বাভাবিক হতে হতে।

ওকে অমলেন্দু বলেছে, সিনিয়র বি. সি. এস. হয়ে গিয়েছিল দিলীপ, রাইটার্সে এসে বসত এবার।

সুচরিতা প্রসঙ্গে ফিরল, তুমি বুড়োর সঙ্গে মিটিয়ে নাও, ওর কাছে মাছ নিয়ো এবার থেকে।

আমি মেটাব না, ও মেটাবে, মনসুর তো আমাকে বারণ করল ওর কাছে যেতে, আমি যদি যাই প্রমাণ হয়ে যাবে ওর কথাই সত্যি, আমার কি দায় পড়েছে ঘাড়ে দোষ নেওয়া।

সুচরিতার মুখ আবার অন্ধকার।

তিন

অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল নির্মলের। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার। রাস্তায় আলো নেই। তাই একটু শ্লথ পা হয়েছিল সে। গলির মুখে যেন ধাক্কা খেল একজনের সঙ্গে! তার হাত ধরে ফেলেছে একজন, দাদাবাবু!

চমকে উঠেছে নির্মল। ভয়ও পেয়েছিল। ভয় পাওয়ার কারণ নেই কেননা লোকটাকে তো চিনতে পেরেছিল সামনের ফ্ল্যাটের জানালার আলো তার গায়ে এসে পড়াতে। আর তো কেউ নেই। শুধু বুড়ো হাবুল দাস তার হাত ধরেছে, ভয়ের কী আছে! তবু সে চিৎকার করে উঠেছিল চাপা গলায়, তুমি এখানে কেন এখন?

আমারই ভুল হয়েছিল বাবু, আপনি টাকাটা ফেরত নিন। বুড়ো হাবুল তার ময়লা জামার বুক পকেট থেকে ময়লা অনেকগুলি দুটাকা একটাকা পাঁচটাকা মুঠো করে বের করল, পঞ্চাশ আছে।

তোমার ভুল হয়েছিল, পেয়েছ টাকা? নির্মলের গলায় যে কেন বিস্ময় তা সে নিজেই ধরতে পারে না।

আপনি নন, কুণ্ডু লেনের এক বাবু, তিনি নিজে এসে দিয়ে গেছেন আজ সকালে। হাবুল মাথা নামাল।

কে বল তো, কার কথা বলছ? জিজ্ঞেস করল নির্মল জেরার ভঙ্গিতে।

আপনি চিনবেন না, নোতন এয়েছেন, আমি মার কাছে গিয়েছিলাম, মা বললেন আপনাকে টাকাটা দিতে তাই দাঁড়ায়ে আছি সন্ধে থেকে, আপনি আমার দোকানে না আসেন না আসবেন, সুধীর ছোঁড়াটার সঙ্গে ওসব বলবেন না, ও বাজারে রটাচ্ছে, ওজনে মারে, তা মারুক যিনি কিনছে তিনি বুঝবে, কিন্তু আমি তো পঞ্চাশ বছর ধরে এই বাজারে বসছি, কোনো লোকে আমারে কিছু বলতে পারে নি কোনোদিন, আপনার বাবা, বড়বাবু সেবার হাসপাতালে ভরতি হলেন, আমিই তো বিনি পয়সায় মাছ দিয়ে গেছি, পরে বড়বাবু বেশি টাকাই দিয়েছিলেন সত্যি.... চোর, মিথ্যেবাদি অপবাদের চেয়ে যে আমার মরাই ভাল দাদাবাবু।

নির্মল আর দাঁড়াতে পারে না। প্রায় দৌড়ে গলির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কেন যে ভয় পেল সে! আসলে তার ধন্ধ যাচ্ছে না! কুণ্ডুলেনের সেই নতুন বাসিন্দাটি কে? দরজা খোলা ছিল। দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল তার পনের বছরের পুরোন সঙ্গিনী। গলার স্বর শুনে বেরিয়ে এসেছে সুচরিতা, হাঁপাচ্ছ কেন?

ঘরে ঢুকে মাথা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল নির্মল। হাবুল দাস এখন দরজায়। সে সুচরিতার সঙ্গে কথা বলছে। সুচরিতার হাতে টাকা দিয়ে হাবুল দাস চলে গেল। দরজা বন্ধ হল। নির্মল হাতের ব্যাগ ফেলে দিয়ে খাটে বসে পড়েছে। সুচরিতা ঢুকল, এই নাও তোমার টাকা, দিয়ে গেল হাবুল দাস।

লোকটা একদম মিথ্যেবাদী। মাথা তুলল নির্মল, দিন দশ বাদে কেউ টাকা ফেরত দেয়!

সুচরিতা তাকে অবাক করে বলল, হ্যাঁ মিথ্যেবাদী, আমি ওকে কম বলিনি, এসব গল্প ফাঁদার মানে কী, টাকাটা না নিলেই পারতে তখন হাবুলবাবু, যাক! তুমি তো জিতলে, মনসুর ওকে খুব ধমকেছে, সন্ধে থেকে দোর গোড়ায় বসেছিল বুড়ো, মনসুর বলেছে তুমি কবে তাকে টাকা ফেরত দিয়ে এসেছিলে, তুমি ভুল করতেই পার না, বুড়ো বলছিল তার মরা ভাল, বুড়ো বয়সে এ হেনস্থা সহ্য হয় না।

মুখ তুলতে পারল না নির্মল। সুচরিতা বলছে, বুড়ো নাকি মরার কথা ভেবেছিল পর্যন্ত, এ বাড়িতে দুমাস মাছ দিয়েছিল সে টাকা না নিয়ে, তা ভুলে গেল বড়বাবুর ছেলে, পঞ্চাশ টাকা সে ঠকিয়ে নেবে!

নির্মলের ঘাড় ঝুলে গেছে। চোখ ঝাপসা। চশমা ঝুলছে চোখের উপর। দিলীপ ঘোষ মারা গেছে খবরটা দিল অমলেন্দু। সে শুনতে শুনতে চলেই এসেছিল। এক টাকা ফেরতও নিয়েছিল। এই পর্যন্ত তো জানা যাচ্ছে। যা জানা যাচ্ছে না তা হল শেষ মাসের টান। ভেবেছিল পরদিন হাবলুকে বলে দেবে টাকাটা মাস ফুরোলে নিয়ো। কিন্তু হাবুল এসে যখন দাঁড়াল দরজায়, কী ভাবে যে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা, কই নাতো! পঞ্চাশ টাকার নোট যে দিলাম। কথা তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। নির্মল মাথা তুলল, স্তিমিত গলায় জিজ্ঞেস করল, টাকাটা নিয়েছ?

না নিয়ে কী করব, তোমার বাবার কথা বলতে লোকটার চোখে এখনো জল আসে, তার মান রাখতে নিতেই হবে, নিয়ে প্রমাণ করতে হবে টাকা ও হারিয়েছে, তোমারও তো মান আছে, তা রাখতেই নিতে হল, আমরা যে পরিষ্কার জামাকাপড় পরি, লেখাপড়া জানি....।

পাঁচ টাকার লোভ ছাড়া যায়। পাঁচটাকা ফেরত দিয়েছিল নির্মল আলুওয়ালা মনসুরকে। পঞ্চাশটাকা শেষ মাসে স্বাস্থ্য দপ্তরের নিম্ন করণিকের কাছে অনেক। সামলাতে পারেনি নিজেকে নির্মল। কথা তো বদলানো যায় না। তর্ক করতে আরম্ভ করল বুড়োর সঙ্গে, সুচরিতার সঙ্গে। তার যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। সেই জেদে সুধীরের কাছে মাছ কিনেছে। সুধীরের কাছে মাছ নিয়ে প্রত্যেকদিন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে বুড়ো হাবুল দাসই মিথ্যে বলেছে।

সুচরিতা বলল, বুঝতে পারছ মানুষ কেন আত্মহত্যা করে বিনা কারণে?

নির্মলের মুখে কথা নেই।

সুচরিতা বলল, বুঝতে পারছ মানুষ কোন কৌশলে মানুষকে মারে?

নির্মলের ঘাড় হেট। মুখ কালো।

(শারদীয় নবান্ন—১৯৯২)

উড়োমেঘ

নিচের তলায় জল আসে টালার জলাধার থেকে সরাসরি। দোতলা থেকে চারতলায় জল যায় দু-ঘাট হয়ে। প্রথমে নিচের রিজার্ভার, সেখান থেকে পাম্প মারফত ছাদের জলট্যাঙ্কি হয়ে ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে। পাম্প খারাপ হয়ে গেছে গত সন্ধে থেকে। ছাদের জলট্যাঙ্কি সকাল থেকেই শূন্য। ওপরের মানুষ নিচে নামছে। খাওয়ার জল, রান্নার জল একতলার ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিয়ে তোয়ালে সাবান হাতে মালাদের স্নানঘরে ঢুকছে। দোতলার সন্দীপ পালিত স্নান করে গেছে নটা নাগাদ। তার জন্য আবিরের আজ বেরতে দেরি হয়েছে। গজগজ করছিল আবির। অন্যের বাথরুমে স্নান করতে লোকে এত সময় নেয়! মালা তাকে থামিয়েছে, এমন করছ কেন? রোজ রোজ তো নামে না নিচে।

হ্যাঁ নামে না। আগে সন্দীপের বউ নন্দিনী নামত। এখন সেও না। যদি মালা যায় উপরে তো কথা হয়, নতুবা নন্দিনী শপিং করে ফিরছে হয়তো, মালা দরজা খুলে তখন বাসনওয়ালার সঙ্গে সসপ্যান নিয়ে দরাদরি করছে, সেই সময়। কোথায় গিয়েছিলে? এই শ্যামবাজারে...ধর্মতলায়। না, না ধর্মতলা বলে না নন্দিনী, এসপ্ল্যানেডে, পার্ক স্ট্রিটে।

কাল কী বই ছিল বউদি? মালা হাতে নতুন সসপ্যান নিয়ে বাসনওয়ালাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে।

এলে না কেন, মায়া মেমসায়েব, এখনো রিলিজই করেনি।

ইস্ মায়া মেমসাব! অস্ফুট আপসোস বেরিয়ে এসেছে মালার মুখ থেকে।

কথাগুলো এইরকম। মালার হয়তো ইচ্ছে ছিল জিজ্ঞেস করবে সত্যি সত্যি কি দীপা শাহী ন্যুড...। তাকে প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে নন্দিনী উঠতে আরম্ভ করেছে সিঁড়ি দিয়ে, যাই ভাই ভীষণ টায়ার্ড, চান করতে হবে, বাব্বা কী প্যাচপেচে গরম।

চান করতেই নেমেছে নন্দিনী। মালা হাসি মুখে ডাকল, এসো বউদি।

নন্দিনী তোয়ালে সোপকেস কাচা শাড়ি জামা নিয়ে ঢুকল। মালা সদর দরজার দু-পাল্লাই খুলে দিল। সে যেন অপেক্ষায় ছিল কখন উপরের সন্দীপদার বউ নামে। তার মন খচখচ করছিল, আবিরের বিরক্তি কি সন্দীপদার কানে গিয়েছিল, না হলে নন্দিনীবউদি নামছে না কেন? নেমেছে দেখে চিন্তা গেল। নন্দিনী বলল, তোমাদের খুব অসুবিধে...।

না না অসুবিধে কী, রোজ রোজ তো আসো না।

বাব্বা, রোজ রোজ আসতে বলো না, তোমাদের কী আরাম! পাম্পের ঝামেলা নেই। বলতে বলতে নন্দিনী বাথরুমের দিকে এগোয়। এগোতে এগোতে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কাল দুপুরে তো গেলে না, দিওয়ার ছিল, অমিতাভ, ভাবলাম ডাকি।

মালা বলল, ডাকলেও যেতে পারতাম না আমার ভাই এসেছিল, সেই যে বোকারোয় থাকে।

নন্দিনীর ভ্রূর নিচে ঈষৎ কুঞ্চন দেখতে পেল যেন মালা। কথাটা সত্যিই। বিশ্বাস করল না নাকি? না বিশ্বাসই করেছে। তবু মালার মনে ঈষৎ অভিমানের ছায়াপাত ঘটে যায় যেন। ভেবেছিলে যদি ডাকবে, ডাকলে না কেন? তার ভাই তো দুপুরে খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমল। ডাকলে সে হয়তো যেত। নন্দিনী স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। মালা সদর বন্ধ করে দিয়ে ভিতরের ঘরে গেল। এই সময়ে তার কাজ বিশেষ থাকে না। ছেলে ইস্কুলে, আবির অফিসে। সে একা। আজ বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় কাচবে ভেবেছিল। কিন্তু হবে না। চৌবাচ্চায় জল ভরতি হওয়ার সময়টুকু যেন আজ নেই। মালা টুকটাক কাজ সারতে লাগল। প্যাসেজে এসে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল জল আছে তো?

জবাব পেল না। কিন্তু জলের শব্দ শুনতে পেল। মগ দিয়ে জল ঢালার শব্দ। মালা ডাকল, ও বউদি, আমাদের কিন্তু শাওয়ার নেই।

স্নানঘরের ভিতর থেকে হাসি উড়ে এল, কী যে বলো!

মালা খুশি হয়। শাওয়ার নেই তাদের বাথরুমে। নন্দিনীদের আছে। তাদের জল সরাসরি টালার ট্যাঙ্ক থেকে আসে বলে চাপ একটু কম। বিনা পাম্পে সিলিং পর্যন্ত জল তোলা কষ্টকর। তাই তাদের আদ্যিকালের ব্যবস্থা, জলে সব সময় ভাসছে চৌবাচ্চা।

মালা জিজ্ঞেস করে, আজ দুপুরে কী বই?

বোধহয় শুনতে পেল না নন্দিনী। শুনবে কী করে জলের শব্দে যে ধুয়ে গেল মালার কণ্ঠস্বর। মালা আবার ঘরে এল। যে বই-ই থাক, যাবে না, অন্তত আজ তো নয়ই। দুপুরে সে আজ খুব ঘুমবে। আজ অন্তত জিতে থাকুক সে। তার ঘরে কেবল টিভির কানেকশন নেই, উপরে আছে, তার ঘরে রঙিন টিভি নেই, উপরে আছে। থাকুক উপরে,আজ সে যাবে না। সন্ধেয় যদি পাম্প ঠিক না হয় তখনো আসবে সন্দীপদা, নন্দিনীবউদি। নন্দিনীবউদি হয়তো গল্পই জুড়ে দেবে তার ঘরে বসে, দুপুরে জি-টিভির সিনেমাটা কেমন হল। আবির পছন্দ করে না। আবির তো জানেই না বোধহয় সে যায় উপরে। ঠিক দুপুরে সে সিনেমা দেখে। আবির কি জানে দিনকুড়ি হল দোতলার ফ্ল্যাটে ডিশ-অ্যাটেনার মাধ্যমে দেশবিদেশ ঢুকে পড়ছে সকাল-দুপুর-সন্ধেয়। তা হয়তো জানে। সন্দীপদার সঙ্গে বাজারে তো যায় সপ্তাহে তিনদিন।

হয়ে গেছে, যাই মালা। বাহির থেকে মিহি কণ্ঠস্বর উড়ে এল।

মালা দুদ্দাড় বেরিয়ে এল ঘর থেকে, হয়ে গেল এর ভিতরে?

এর ভিতরে মানে? আধঘন্টা তোমার বাথরুম দখল করে ছিলাম। হাসল নন্দিনী।

মালা এগিয়ে এসেই গন্ধটা পায় নন্দিনীর গা থেকে। ভিতর থেকেই শুকনো শাড়ি জামা পরে বেরিয়ে এসেছে উপরের বউ। গন্ধটা কি শাড়ির? উহু! তা হবে কেন? ও তো আটপৌরে ছাপা। গন্ধটা কি সেন্টের? উঁহু তা হবে কেন? স্নান ঘরে কেউ সেন্টের শিশি আনে? আর ঘরের জামাকাপড়ে কেউ সেন্ট ছিটোয়? মালার মনে হল গন্ধটা আসছে নন্দিনীর গা থেকে। খোলা হাত-মুখ গলা থেকে। সাবানের গন্ধ। এমন গন্ধ হয় সাবানের? কী সাবান? এমন গন্ধ তো তার ব্যবহার করা সাবানে নেই। এই গন্ধ তো সে পায় নি কখনো। মালা অবাক হয়ে নাক টানতে লাগল। নন্দিনীর হাতে সোপকেস। সাবানটা দেখলে হত। তার লজ্জা করল চাইতে। নন্দিনী বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, দুপুরে এসো দুপুরে

জি-টিভির সিনেমা দেখার ডাক দিয়ে গেল নন্দিনী। বিহ্বল মালা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেল, কী সিনেমা? মনেই পড়ল না। সাবানের গন্ধটা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নন্দিনী চলে যেতে দরজা বন্ধ করতে গেল মালা। দরজার কাছেও যে রয়েছে গন্ধটা। খোলা দরজা দিয়ে মুখটি বাড়িয়ে দিল সে বাইরে। গন্ধটা রয়েছে। এখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলে গন্ধটা পাওয়া যাবে। অচিন সৌরভে বাতাস যেন নরম হয়ে গেছে এখানে, এই দরজার কাছে, দরজার বাইরে।

মালা এবার স্নানে যাবে। শাড়ি জামা তোয়ালে নিয়ে তার ছোট্ট অপরিসর স্নানঘরে আলোর সুইচ দিয়ে পা বাড়াতেই মাথাটা যেন টলে যায়। যে গন্ধ বাইরে হালকা হয়ে ভাসছিল তা ভিতরে ঘন হয়ে আছে চৌবাচ্চার জলেই লেগে আছে যেন, লেগে আছে পুরনো নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে, পঁচিশ ওয়াটের লালচে আলোয়। সে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাবানের গন্ধ! জলের গায়ে অতিসূক্ষ্ম গোলাপি সর যেন ভাসছে। সাবান কণিকা। হাতে ফেনা লেগেছিল, সেই হাতে মগে করে জল তুলেছে নন্দিনী। সে জলের দিকে মাথাটা নামিয়ে আনে। গন্ধটা ভাসছে। গোলাপি তার রং।

দরজায় কড়া নড়ার শব্দ। কে এল? মালা বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। আবার নন্দিনী এসেছে। হাসছে। এক হাতে চিরুনিল মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে নেমে এসেছে নিচে। কী ব্যাপার? না ভুল করে ফেলে গেছে ভেজা শাড়ি। বাথরুমের কোণেই রয়েছে। নন্দিনী বাথরুমের দিকে এগোয়। পিছনে মালা, ঠিক তার ঘাড়ে ঘাড়ে, পিঠেপিঠে, ব্লাউজের উপরে ঘাড়ের নিচে খোলা ত্বক থেকে গন্ধটা উঠে আসছে। গন্ধ একটুও কমেনি। নন্দিনী যেন ওই গন্ধের ভিতর ভাসছে। মালা আর পারল না নিজেকে চেপে রাখতে, কী সাবান গো বউদি?

ভেজা শাড়ি এক হাতের চিরুনি মাথার চুলে আটকানো, নিস্পৃহ গলায় নন্দিনী জিজ্ঞেস করে, গন্ধটা খারাপ নয়, কী বলো?

দারুণ! দারুণ গন্ধ, কোথায় পেলে? বিদেশের? মালা কৌতূহল প্রকাশ করল চকচকে চোখে।

বিদেশের বলতে পার, তবে এখানেও তৈরি হচ্ছে, নতুন বেরিয়েছে, এখন হয়তো এ পাড়াতেও এসে গেছে, আমি পার্ক স্ট্রিট থেকে কিনেছিলাম।

বাব্বা! খোঁজও রাখো বটে, কী নাম?

মালাকে চমকে দিয়ে যে নামটি বলল নন্দিনী তার সঙ্গে সে যেন আবছা পরিচিত। মনে হয় শুনেছে! নাকি দেখেছে? কোথায়? তার শাদাকালো টিভিতে? উঁহু তা হলে কোথায়? মনে এল, নন্দিনীর কাছ থেকে যে ইংরেজি ফিল্ম ম্যাগাজিনটা একবেলার জন্য চেয়ে এনেছিল, তার ভিতরে যেন। পাতাজোড়া রঙিন ছবি। খুব সুন্দরী একটি মেয়ে, যার গা থেকে হলুদ তোয়ালে যেন খসে যাচ্ছে সাবানের ছোঁয়ায়, সেই সাবানটা কি?

হাসল নন্দিনী, ও আর কী বিজ্ঞাপন, স্টারে যা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এটার, ভাবতেই পারবে না, তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট ধরে একটা অ্যাড প্রায় গল্পের মতো যেন, কেবল এনেছিলাম ভাগ্যি!

সাড়ে তি-ই-ইন মিনি-ই-ইট! এত সময়?

হ্যাঁ, আর এটা তো এক্সক্লুসিভলি ফর উইমেন, মেয়েদের সাবান, মেয়েদের জন্য তৈরি

হয়েছে, তোমার দাদা খুব জব্দ এবার।

বলতে বলতে বেরিয়ে যায় নন্দিনী। মালা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর দরজা বন্ধ করে ভিতরে এল। অলস পায়ে বাথরুমের দিকে এগোল।

দুই

মালা আবিরকে বলল, কেবল নেবে আমাদের বাড়িতে?

অবাক হয়ে গেল আবির, কেবল মানে?

কেবল টিভি, ডিশ অ্যানটেনায় দেখায়, পৃথিবীর সব দেশের চ্যানেল।

মালার কথায় আবির আরো অবাক হয়, এ পাড়ায় এসেছে নাকি ওসব?

বাইরে গিয়ে দেখে এস। মালা সবজান্তার মত পরামর্শ দেয় আবিরকে।

আবির আরো আরো অবাক হয়েছে। বাইরে গিয়ে কী দেখবে? ডিশ অ্যানটেনা? সে তো অনেক উঁচুবাড়ির মাথায় থাকে। ইদানীং তার দশতলা অফিস বাড়ির নতলা থেকে দেখতে পাচ্ছে কাছেপিঠের মাথা উঁচু খোপ খোপ আকাশ ধরা বাড়িগুলির মাথায় উলটানো ব্যাঙের ছাতার মতো অ্যানটেনা বসানো। ওগুলো নাকি আকাশ থেকে ছবি ধরছে সর্বক্ষণ। এর-একটার দাম? শুনে চমকে গিয়েছিল আবির। অত টাকা! তার কলিগ বুঝিয়েছিল আসলে ওটা ব্যবসার পারপাসে বসানো হয়। একটা ডিশ-অ্যানটেনা বসাতে পারলে পুরো এলাকার টিভিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অন্য দেশের টিভির প্রোগ্রাম, নাচগান। তবে হ্যাঁ, কানেকশন নিতে হবে।

আবির জিজ্ঞেস করে, ডিশ-অ্যানটেনা তো থাকে ছাদে, বাইরে গিয়ে কী দেখব?

মালা হেসে ফেলেছে তার অজ্ঞতায়, ডিশ দেখবে কেন? দেখবে তার, কেবল টিভির তার, অনাথবাবু লেনে একটা ছেলে খুলেছে কেবল টিভি, বাড়িতে বাড়িতে কানেকশন দিচ্ছে।

এমনি? আবির কেমন বিহ্বলতায় ভরে যায় যেন, আকাশ থেকে ধরা বিদেশী টিভির ছবি ঘরে। পৃথিবী এত ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার ঘর আর বিলেতের ঘরে তোনো তফাত থাকল না।

এমনি কেন দেবে? নিতে হবে, পাঁচশ টাকা ইনস্টলেশন চার্জ, তারপর মাসে মাসে মাত্র একশ, তাতেই সারাদিন টিভি চলবে, সারারাত্তিরও।

চুপ করে থাকে আবির। আসলে সে নিজে টিভির খুব ভালো দর্শক নয়। টিভির সামনে বসে থাকলে তার হাঁই ওঠে। এত কথা, এত শব্দ, এত ছবি প্রতিদিন কারো সহ্য হয়? মন বলে কোনো পদার্থ থাকবে এরপরে? চুপ করে ভাবতে দেবে না যে বিলেত দেশটা কেমন। কিন্তু মালা একেবারে বিপরীত। তার কোনো কিছুতেই আলস্য নেই, কোনো অনুষ্ঠানেই বিরক্তি নেই। কত রাত পর্যন্ত যে সিনেমা দেখে মালা একা একা তা টেরও পায় না আবির। তার তখন গভীর ঘুম চলছে। দু-একদিন বসে থাকার চেষ্টা করেও পারেনি। এর চেয়ে কোনো কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়া যেন আরো আরামের। কোনোদিন সকালে সে হয়তো মালাকে জিজ্ঞেস করে, কী বই দেখছিলে অত রাত পর্যন্ত?

মালা জবাব দেয়, চাইনিজ সিনেমা।

চাইনিজ সিনেমা মানে চিনে সিনেমা! অবাক হয়ে মালার দিকে তাকিয়ে থাকতে সে গম্ভীরভাবে জানায়, সাব-টাইটেল ছিল, তবে বইটা [illegible]

শেষপর্যন্ত দেখেছ?

না, আরো আধঘন্টা হয়েছে বোধহয়। বলতে বলতে মালা রান্নাঘরে ঢুকে যায় হয়তো।

অতরাত পর্যন্ত জেগেও মালা ছবিটা শেষ অবধি দেখে নি। কী হয়েছে শেষে তা না জেনেই নিশ্চিন্তে ঘুমতে গেছে। তার নিজস্ব টিভি তারই অধীন। সিনেমা, চিত্রহার-চিত্রমালা থেকে নাটক, সিরিয়াল, সংসদ সমাচার, কৃষিকথা, পল্লীকথা, খেলার আসর সব যেন তার অধীনে। সে ইচ্ছেমতো দেখে, ইচ্ছেমতো দেখে না। দেখতে দেখতে উঠে যায়, তখন টিভি চলতে থাকে। টিভি চলে ওঘরে, মালা তখন গ্যাস জ্বালিয়ে চা বসিয়েছে হয়তো। ঘরে মালা নেই, তা দেখে আবির যদি নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দেয় টিভি তো রান্নাঘর থেকে মালা চিৎকার করে উঠবে, বন্ধ করলে কেন আমি যাচ্ছি তো।

টিভি তো মালার অভ্যেস। টিভি চলছে ঘরে, তার সামনে কিংবা আড়ালে, তাতেই যেন মালার টিভি দেখা হয়ে যায়। টেলিভিশন সম্পৃক্ততা তার এমন ঘন গভীর। টেলিভিশন চললেই হবে। সামনে ছবি আর শব্দ থাকলেই হল, সে তখন টিভির দিকে পিছন ফিরেও কথা বলতে পারে আবিরের সঙ্গে। অথবা টিউনিং করতে করতে আধঘন্টা সময়ও কাটিয়ে দিতে পারে। এসব করতে করতে, আবিরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হতে সে আবিরকে ধমকাতেও পারে, একটু চুপ কর না, সিরিয়ালটা দেখতে দেবে তো।

কোন কোনদিন কোন কোন সময়ে কী কী ধারাবাহিক অনুষ্ঠান তা মালার মুখস্থ। কোন দিন কী সিনেমা, এমনকি মারাঠি কিংবা তামিল ছবি যেটি দেখানো হবে রোববার দুপুরে তার নামও অবিকল বলতে পারে সে। সুতরাং ডিশ-অ্যানটেনার খবর যে রাখবে তা তো স্বাভাবিক।

মালা বলল, নেবে তো বলি নন্দিনীবউদিকে।

নন্দিনীবউদি! দোতলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সন্দীপ পালিতের বউ। সন্দীপ পালিত পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী, তার চেয়ে অন্তত বছর পাঁচেকের বড়। নন্দিনী সন্দীপ পালিত কি ডিশ-অ্যানটেনা বসিয়েছে এই চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে? ছাদের খোঁজ অনেকদিন রাখে না আবির। সে ভূমিতলের বাসিন্দা। চারতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাদের হাওয়া খাওয়ার শখ তার হয় না।

না, না নন্দিনীবউদি বসাবে কেন, বললাম না অনাথবাবু লেনে....। তুমি কথাটাও ঠিক করে শোন না, একটা ডিশ-অ্যানটেনার দাম জান?

অবাক হল আবির। সে যে খোঁজ পেয়েছে ঘরের বাইরে বেরিয়ে নতলার অফিস ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, সেই খোঁজই মালার কাছে এসেছে আপনা-আপনি। এর জন্য মালাকে বেরতে হয়নি বাড়ির বাইরে। কে বলেছে? না সন্দীপ পালিতের বউ নন্দিনী।

মালা বলল, সক্কালবেলা থেকে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তুমি বিবিসি-র নিউজ দেখে অফিসে বেরতে পারবে, বাচ্চাদের জন্যও দারুণ-দারুণ প্রোগ্রাম হয়।

এত খবর পেলে কোথায়?

কেন নন্দিনীবউদি, ওরা তো নিয়েছে, তুমি জানো না? যদি নিউজ দেখ, অবাক হয়ে যাবে।

হাসি এল আবিরের। মালা তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। মালা তো জানে সে টেলিভিশনের পৌনে দশটা আর সাড়ে দশটা, ইংরিজি বাংলা দুটি সংবাদ দুই চ্যানেলে নিয়মিত শোনে। তখন মালা কথা বললে কিংবা মালা চ্যানেল ঘুরিয়ে অন্য অনুষ্ঠান দেখতে

চাইলে সে বিরক্ত হয়। মালা উল্লাস বিনোদন পছন্দ করে। রাত্রে প্রথম চ্যানেলে ইংরিজি খবর যখন শুনছে আবির, মালা বলে, সাড়ে দশটায় বাংলাটা শুনো, সেকেন্ড চ্যানেলে দিই, মেট্রো আওয়ার চলছে।

আবির জিজ্ঞেস করে, সন্দীপদারা কবে নিল কেবল-টিভি?

আহা তুমি যেন সত্যিই জানো না, একমাসের উপর হয়ে গেল।

জানি না তো? সে সত্যিই অবাক হল সন্দীপ পালিতদের কেবল-কানেকশন নেওয়ার খবরে। এখন তাহলে ডিশ-অ্যান্টেনা তার অফিস এলাকার অভিজাত পল্লীতে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, তাদের এই পুরনো পাড়াতেও বিবিসি ও স্টার-টিভি ঢুকে পড়েছে, এই ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরে। আবির মালাকে বলল, ওরা যে নিয়েছে তা তুমি বলনি তো?

আমি কি জানতাম, আজ দুপুরে পানের চুন আনতে বউদির কাছে গিয়ে দেখি সিনেমা হচ্ছে, আমি তো প্রায়ই দুপুরে শুনি সিনেমার গান কথাবার্তা, ভাবতাম ভিসিপি চলছে, কিন্তু না, নন্দিনীবউদি বলল জি-টিভি, কেবল নিয়েছে ওরা। কথাটা একটু থেমে থেমে বলে মালা। গলা যেন জড়িয়ে যায়।

একটু গম্ভীর হল আবির। সে ঠিক পছন্দ করে না উপরে ফ্ল্যাটে খুব যাওয়া-আসা করুক মালা। ভিসিপি এই ফ্ল্যাটবাড়িতে একমাত্র সন্দীপ পালিতের ঘরেই আছে। আনার পর প্রথম প্রথম প্রায়ই মালাকে ডেকে নিয়ে যেত নন্দিনী। পরে নন্দিনীই আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয়। মালাও। মালা ঠিক জানে কেন নন্দিনী ঠিক আগের মতো আসে না। মালা কেন যায় না আগের মতো তা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে সে। মালার পিসতুত দাদা একটা টেলিফিল্মে কয়েক মিনিটের জন্য অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিল। সে শখের অভিনেতা। ফিলমের ক্যাসেট নিয়ে হাজির, দেখবি? মালা তার দাদাকে নিয়েই উপরে গিয়েছিল, অফুরন্ত উৎসাহ তার। নন্দিনী সেই ক্যাসেটের নির্বাচিত সামান্য অংশ দেখিয়েছিল মালাকে তার ভিসিপি আর রঙিন টিভির সাহায্যে। যতক্ষণ, তা প্রায় মিনিট পনের তো হবেই, ক্যাসেটের ছবি, তার পিসতুত দাদার ছবি ভেসে থেকেছিল নন্দিনীর রঙিন টিভিতে সে ছিল ঘরের বাইরে। মালা আর তার দাদাকে বসিয়ে, ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে নন্দিনী অন্য ঘরে টুকটাক কাজ সারছিল।

আবির ভাবছিল, সে সব কথা ভুলে গেছে মালা। প্রায় দেড় বছর আগের কথা তো। তাই কাল দুপুরে চুন আনতে গিয়ে ওখানেই বসে গিয়ে পান সাজতে-সাজতে জি-টিভিতে শাম্মি কাপুরের তিসরি মনজিল দেখেছে। দেখতে দেখতে গল্প করেছে নন্দিনীর সঙ্গে। গল্প করতে করতে কেবল-টিভির সব খবর জেনে নিয়েছে। নন্দিনী খবর দেয়নি তারা কেবল নিয়েছে, দেয়নি কারণ সে নাকি জানত তারা জানে। তারা জানবে না কেন? আবিরই-বা জানবে না কেন? কেবল-টিভির তার নন্দিনীদের ব্যালকনি থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে রাস্তা দিয়ে এসে, তা কি দেখে নি সে? দেখলেই তো ধরা যায়। আর সন্দীপও কি বলে নি?

অবাক হয়েছে মালা।

না বলে নি। তবে হ্যাঁ, তার' তার বোধহয় দেখেছে সে। দেখেছেই শুধু, এর বেশি কিছু নয়। ওই তার দেখে তো কোনো কৌতূহল হয়নি আবিরের। কৌতূহলোদ্দীপক তো নয় কিছু কালো তারের জট। রাস্তার ধারের লাইট পোস্ট, দেবদারু গাছ, সারোগি বাড়ির জানালার নিচে বসানো হুকে জড়িয়ে যে তার এসে ঢুকেছে এই বাড়ির দোতলার ব্যালকনি

হয়ে ভিতরে, তা দেখে কৌতূহল হবে কেন আবিরের? তারগুলো কেন তা কে জানে? কী দরকার? হ্যাঁ, মালাও তো বেরিয়েছে প্রায় প্রত্যেকদিন ছেলেকে ইস্কুল-বাসে তুলে দিতে, ইস্কুল-বাস থেকে নামিয়ে আনতে, তারও খেয়াল হয়নি। চুন আনতে না গেলে জানতেই পারত না। মালা বলছে দিনে তিনটে সিনেমা, দুটো হিন্দি আসে জি-টিভিতে, একটা বাংলা হয় লোকান ট্রান্সমিশনে। এই তো বুধবার দুপুরে দেখিয়েছে ঝিন্দের বন্দী, হ্যাঁ কেবল-টিভি বন্ধ হয় না কখনো।

আবির শুনছিল না মালার কথা। তার খারাপ লাগছিল, সন্দীপদা তো বলেনি। এই ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রথম এল কেবল-কানেকশন, বলবে না? ভিসিপি এনে তো ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তার উষ্মাতে মালা একটু থমকায়, নিম্নগলায় বলল, ওরা চায় না ওদের ঘরে গিয়ে দেখি, এই তো প্রতিবেশী, কে যাচ্ছে দেখতে, আমি কালই জানলাম। বলতে বলতে ঢোক গেলে মালা। থমকায়। বানিয়ে কথা বলতে, মিথ্যে বলতে যে তার খুব অসুবিধে।

গিয়েছিলে কেন, তুমি নিশ্চয়ই....।

বলছি তো চুন আনতে, পানের চুন ছিল না। বিড়বিড় করল মালা।

আবিরের মনে হল ঠিক তা নয়। যদি কালই জেনে থাকে মালা, হয়তো শাম্মি কাপুরের সিনেমার গান শুনেই চুনের ছল করে উঠে গিয়েছিল উপরে। মালা কোনো মান-অপমান মনে রাখতে পারে না বেশিদিন। খুব খোলা মনের। বাসনওয়ালাকে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে এনে গল্প জোড়ে। জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তা সাফাই করা বুড়ো জমাদারের কাছে খোঁজ নেয় তার মেয়ের বিয়ে কবে, খোঁজ নেয় বিহার মুলুকে তার সংসারে কজন আছে। জামাইরা কী করে? ছেলের বিয়েতে কত পণ নিল। এ হেন সরল প্রকৃতির মেয়ে মালা তো চুনের ছলে তিসরি মনজিলের গানের টানে দরজায় তালা মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে যাবেই। একা ঘরে বসে করবে কী?

আবির বলল, সারাদিন সিনেমা? সারাদিন কেউ সিনেমা দেখতে পারে?

আহা ইচ্ছে হলে দেখবে, না ইচ্ছে হলে ঘুমবে, দেখতে দেখতে কত কাজ করা যায়। মালা আর দাঁড়ায় না। কথাটা বলতে বলতে আলনার জামাকাপড় পাট করতে থাকে, বিড়বিড় করে নিম্নস্বরে, আমাদের টিভিটা তো গেছে, হয় শাদা না হয় কালো, তুমি বললে দেখাবে কোম্পানিতে, নিয়ে গেলে না তো, সময়ই হয় না তোমার, হ্যাঁ এই সাবানটা। এনো দেখি কাল বাজার থেকে।

আবির খবরের কাগজ টানে। কান পাতে। ওপর থেকে দূর পৃথিবীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কি?

তাকে মালা একটুকরো কাগজ দিল। আবির বলল, শার্টের পকেটে রেখে দাও।

তিন

সন্দীপ পালিত হাসল, কেন তুমি জান না? তোমার বউ তো রোজ দুপুরে আসে, বলেনি?

আবির আর কোনো কথা বলতে পারে না। তার মনে হচ্ছে মালা খবরটা অনেকদিন ধরে, মানে যেদিন কেবল-কানেকশন নিয়েছে তার প্রতিবেশী, সেদিন থেকেই জানে। মালা তাকে বলে নি, বললে জেরায় যদি সব ফাঁস হয়ে যায়। মানে মালা প্রতি দুপুরে ওপরে গিয়ে নন্দিনীর সগে ওই প্রোগ্রামের দর্শক হয়ে ওঠে। হয়তো নন্দিনী আবার বিরক্তি প্রকাশ

করেছে। মালা তার কাছে তা গোপন করে জানিয়েছে কেবল-টিভির সংবাদ।

সন্দীপ পালিত বলল, নিয়েই নিলাম, নন্দিনী তো সারাদিন বাড়ি থাকে, তারও তো একটা রিক্রিয়েশন চাই, আমরা তো বাইরে ঘুরছি, বাইরেই থাকছি সারাদিন, মেয়েরা যে কী করে কাটায়!

আবির হাঁটতে থাকে। বাজারের কাছে এসে দুজনে দুদিকে চলে যায়। তার প্রতিবেশীর আয় বেশি, তার সঙ্গে বাজার করতে চায় না আবির বড় একটা। তার ভিতরে কী যেন সূক্ষ্ম কিছু খচখচ করছিল, চোখে ধুলো পড়লে যেমন হয়। সত্যিই কি মালা প্রতিদিন যায় উপরে ওই জি-টিভির সিনেমা দেখতে? নাকি ওই একদিনই গিয়েছিল চুন আনতে। বিশ্বাস হয় না, হয়ত প্রথম দিন মালাকে ডেকে নিয়েছিল নন্দিনী। তারপর সেই আগের মতো আর আমল দিচ্ছে না। ঠিক দুপুরে উত্তমকুমারের যে সিনেমাটা দেখিয়েছে, হয়তো সেই ঝিন্দের বন্দী, তৈরি হয়েই গিয়েছিল মালা। গল্প করবে, পান খাবে, সিনেমা দেখবে। নন্দিনী তো প্রায় তারই বয়সী, দু-এক বছরের তফাত তো তফাতই নয়। মালা সিনেমার পোকা। আর সেই সিনেমায় যদি উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থাকে তো মালা তা দেখার জন্য সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবিরের তা জানা। টিভিতে সিনেমা হবে সাড়ে পাঁচটায়, মালা সকাল থেকে বলতে থাকে। আজ হারানো সুর আছে, দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে। দুপুরের খাওয়ার সঙ্গে বিকেলের হারানো সুরের যে কী সম্পর্ক তা আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারে নি সে। দুপুরের খাওয়া, রোববারে দেরি হবেই। কিন্তু তা তো বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে গড়ায় না। আসলে এসব কথা বলতে বলতে মালা বিকেলের সিনেমা দেখার সুখ যেন অগ্রিম আস্বাদ করতে থাকে। সেই সুখে জারিত হয়েই সে দুপুরে উঠে গিয়েছিল ঝিন্দের বন্দী প্রত্যক্ষ করতে, হয়ত নন্দিনী বলেছে, নারে আজ খুব ঘুম পাচ্ছে, ঘুমব। ঝিন্দের বন্দী তো কতবার দেখা! তুই দেখিস নি?

মালা তো দেখেছে, কিন্তু আবার দেখতে দোষ কী? তরুণ সৌমিত্র ঘোড়ার পিঠে বসে উত্তমকুমারের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য এক সংলাপে বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছে, উত্তম তার চাহনি দিয়ে সেই সংলাপের মোকাবিলা করছে, এ দৃশ্য মালা বারবার দেখতে পারে। যতবার দেখাবে ততবার দেখবে। কী রূপ ওই দুই নায়কের! দুই রাজপুত্রের। কী অপরূপই না ছিল সৌমিত্র ওই বয়সে। এখনো দেখলে হৃদয় সমর্পিত হতে চায় যেন সিনেমার পরদায়। নন্দিনী ঘুমবে তাই মালার দেখা হয়নি ঝিন্দের বন্দী। অথচ খবরটা তো দিয়েচিল নন্দিনীই। সে যেন ইচ্ছে করে মালাকে আশাহত করে সুখ পেল। মালা ঘরে বসে টিভি দেখে তার ইচ্ছায়, উপরে গিয়ে কেবল-এর সিনেমা দেখা তার ইচ্ছার অধীন যে নয় তা বুঝিয়ে দিয়ে নন্দিনী ঘুমতে গিয়েছিল। আশ্চর্য! ঠিক আধঘণ্টা বাদে খোলা জানালা দিয়ে অশ্বারোহী তরুণ সৌমিত্রর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল সে ঘরে বসেই। তার সঙ্গে মন ভাসিয়ে দেওয়া আবহসংগীত, যা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ফেলে আসা কৈশোরের স্মৃতি। মন খারাপ হয়েছিল তো খুব। এইরকম কতবার যে মনখারাপ হয়েছে তার কে জানে? এখন, যদিও বলে না, আবির নিশ্চিত যে ঘরের দশ বছরের পুরনো শাদাকালো টেলিভিশনটা তার ভালো লাগে না। মন বসে না। সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে উপর থেকে কী সংগীত ভেসে আসে। না বললেও নিশ্চয়ই নন্দিনীর সঙ্গে তার দেখা হয়। নন্দিনী তো নামবেই। সারাদিন ইচ্ছেমত যে ছবির রাজ্য খুলে দেয় সে তার ঘরে সেই ছবির কাহিনী না বলে পারে না নিশ্চয়। টেলিভিশন তো মালার একরকম সঙ্গী। টেলিভিশনে সে একাগ্রমনা না হলেও টেলিভিশন ছাড়া তার

সন্ধে তো কাটে না। সে সঙ্গীটি পুরনো হয়েছে। উপর থেকে নানা আশ্চর্য জগতের কথা ভেসে আসছে, হঠাৎ দুপুরে অগ্নিপরীক্ষা সিনেমায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মন মন্থন করা গান, কখনো ইংরিজি ভাষায় নাটকের ডায়ালগ। ঘরে বসে তো শোনা যায়ই। শব্দ শুনে হয় না, পাত্র-পাত্রীর মুখ দেখতে ইচ্ছে হয়। দুপুরে অল্প ঘুমের অভ্যেস আছে মালার। সেই ঘুমের ভিতরে হঠাৎ যদি শোনে, আয়াম এ কমপ্ল্যান গার্ল ... সে দুম করে উঠে বসে ভাবে নাকি সন্ধে হয়ে এল?

ফেরার পথে আবার দেখা সন্দীপের সঙ্গে, বলল, ইলিশ উঠেছে?

হ্যাঁ, তবে ভাল না, খুব ছোট।

বড়ও আছে, ননীর কাছে দেখেছিলে?

আবির কথা বলল না। ননীর কাছে সে গোনাগুনতি কয়েকবার মাছ কিনেছে। সে হল অভিজাত মৎস্য ব্যবসায়ী। তার কাছে যেতে হলে ঘরে রঙিন টেলিভিশন রিমোট কন্ট্রোলে যার ছবি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, ভিসিপি, কেবল-কানেকশন এসব তো থাকতেই হবে। যে মাছ বাজারে আর কারোর কাছে নেই, তা আছে ননীর কাছে, পাবদা, ডিম ভরা জ্যান্ত কালো ট্যাংরা, নীলচে টাটকা বাগদা, বড় মৌরলা, পুঁটি, পার্শে, গলদা, ভেটকি থেকে পাকা রুই তো থাকেই। যেমন ভালো মাছ, তার দামও তেমন। দেখতে ইচ্ছে করে, কিনবার সাহসও হয় না। কিন্তু দেখাও তো হয় না। এ তো ধর্মতলার বড় বাটার শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে জুতো শার্ট দেখা নয়। এ অভ্যেস আবিরের আছে। শো-কেসে জুতো, শার্ট প্যান্ট, স্টিরিও, রঙিন সালোয়ার কুর্তা, বালুচরির জমি দেখে দেখে বেড়ায় আবির, অবশ্য হাতে যদি সময় তাকে। তার বন্ধুরা দেখে রমনী, সে দেখে শো-কেসের ভিতরে সাজানো পুরুষ রমণীর মন বিহ্বল করা বস্তুসামগ্রী। মালা জানে না তার এই অভ্যেসের কথা। এ তার নিজস্ব গোপনীয়তা। কিন্তু এই সুখ তো বাজারে পাওয়া সম্ভব নয়। ননীর দোকানে দাঁড়িয়ে সে হালকা বেগনি রঙের পাবদার খবর নিচ্ছে, দেখছে নাকিনে তা তো হওয়া অসম্ভব। দূর থেকে দৃষ্টিপাত করে আবির সস্তার দিকে এগোয় প্রত্যহ।

সন্দীপ বলল, তুমি যদি স্টার, বিবিসি দেখ, এখানকার প্রেগ্রাম আর দেখতে ইচ্ছে করবে না, জানো কী দারুণ সব খবর দেয়?

কৌতূহলে তাকায় আবির, কী রকম?

কাগজে পড়নি? মেটেবুরুজে রায়টের যে সব দৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছিল বিবিসি তা ভাবতেই পারবে না। স্পট থেকে খবর পাঠিয়েছিল ওরা ডাইরেক্ট, দাঙ্গা কীরকম হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কীভাবে আগুন লাগানো হচ্ছে বস্তিতে ....।

আবির সিগারেট ধরায়, নেবেন সন্দীপদা?

মাথা নাড়ে সন্দীপ পালিত, উঁহু, কমিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ শোনো, বাবরি মসজিদটা কীভাবে ভাঙা হয়েছিল সব দেখিয়েছিল ওয়ালর্ড নিউজে, পালটা যেসব হিন্দু মন্দির ভাঙা হয়েছিল বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, তাও, এমনকি রেপ পর্যন্ত ... ধর পাকিস্তানে মুসলমানরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে হিন্দু মেয়ে, এখানে হিন্দুরা মুসলমান মেয়ে, স-অ-অ-ব, ডাইরেক্ট দেখিয়েছে, দাঙ্গার স্পট থেকে, পারবে আমাদের টিভি?

আপনি দেখেছিলেন?

মাথা নাড়ে সন্দীপ, না, না তখন তো এ-পাড়ায় কেবল টিভি আসে নি, নন্দিনীর বোন দেখেছিল, ও থাকে লেকপ্লেসে, কার্ফুর পরে এসে সব বলে গেল, তখন যদি কেবল

আসত!

আবির চুপ করে থাকে। এসব গল্প কি নন্দিনী করেছে মালার কাছে? মালা কি তাই উৎসাহী হয়ে উঠেছে! মালা কি চা খেতে খেতে মুড়ি চানাচুর চিবতে চিবতে, চুল বাঁধতে বাঁধতে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পুরো ঘটনাটা না দেখতে পেয়ে আপশোস করছে। মালা কি নিস্পৃহ চোখে বাসনওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বস্তি কীভাবে লুট হচ্ছে তা না দেখতে পেয়ে ভাবছে কোনো সাধই তার পূরণ হল না এ-জীবনে। খবরে শুনতে পেল না হিন্দু মেয়ে কতগুলো ধর্ষিতা হয়েছে, বদলে কতগুলো মুসলমান মেয়ে....।

মালা কি তা শুনতে না পেয়ে সেই খবর না পেয়ে কষ্ট পেয়েছে মনে মনে, নন্দিনী আর সন্দীপ পালিতের মতো।

সন্দীপ বলল, আর একটা ব্যাপার আছে আবির, কেবল ছাড়া তা দেখবে কীভাবে তুমি?

কী? অবাক হচ্ছিল আবির। ভূতলে বাস করে সে কতই-না পিছিয়ে গেছে। তার অজান্তে এই নগরের ঘরে ঘরে কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কোনো খবরই পায়নি সে। সপ্তাহে একদিন রগরগে বিদেশী ছবি। এমন ছবি যে তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না আবির। রাত সাড়ে বারটার আরম্ভ হয়ে দুটোয় শেষ। বলতে বলতে হাসছিল সন্দীপ পালিত। খারাপ লাগে না। জীবনে এসবেরও দরকার আছে আবির। বেঁচে থাকতে হলে এসবও চাই।

আবির ভাবছিল বেঁচে থাকতে হলে এসবও প্রয়োজন, এই কথাটি নিশ্চয়ই নন্দিনী মারফত মালার কাছে পৌঁছে গেছে। নিষিদ্ধ জগতের বর্ণনা কি শোনে নি মালা ঠিক দুপুরে উপরে বসে। মালা তা শুনেছে। বলতে পারছে না। আরো অনেক কিছু শুনেছে। বলতে পারছে না। শুধু বলছে কেবল-কানেকশন নিলে হয়। শাদাকালো টিভিতেই নেওয়া হোক। মালা কি অধীর হয়ে উঠেছে নন্দিনীর কথায়। মাসে মাত্র একশ। তাতে তো জগৎ খুলে যাবে। তখন সে ইচ্ছেমত দেখবে, বন্ধ করবে। রাত জাগবে, জাগবে না, ঘুমবে। ঘুমলেও তার আপশোস থাকবে না। তার হাতের কাছেই ছিল সব বিনোদন। সে দেখলে দেখবে, না দেখলেও ক্ষতি নেই। নন্দিনী তাকে শোনাতে পারবে না অচেনা রহস্যময় আলো আঁধারের গল্প! মালা তো বলেই দিতে পারবে, না বউদি ভাল লাগে না, ও পছন্দ করে না, আমার ঘেন্না লাগে, বেডরুম বেডরুমই, তার দরজা হাট আলগা করা কি ঠিক! ভাবতে ভাবতে আবির চমকে ওঠে। মালাকে সামনে দাঁড় করিয়ে সে যেন নিজের কথাই ভাবছে। টিভিতে তার কৌতূহল ছিল যতক্ষণ তা ঘরের বাইরে ছিল। ভিতরে এনে সব কৌতূহল কেটে গিয়েছিল। এখন যেন আবার আশ্চর্য বিনোদনে কৌতূহল জাগছে। সিগারেটের প্যাকেট বুক পকেট থেকে বার করতে যায় উত্তেজিত আবির। কাগজটা হাতে উঠে এল। মালা কাল সন্ধেয় দিয়েছিল খোঁজ করতে। সে বার করে কিছুই বুঝতে পারল না। সাবান! সাবানের নাম? তাই তো বলেছিল মালা।

সন্দীপ পালিত জিজ্ঞেস করল, কী কেনা হলনা আবার?

আবির বাড়িয়ে ধরল কাগজটা, ভুলেই গেলাম, এই নামে সাবান বেরিয়েছে?

সন্দীপ দেখে হো-হো করে হাসল, এপাড়ায় কি পাবে, এসপ্ল্যানেডে দেখ, কে দিয়েছে, মালা?

হ্যাঁ। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল আবির! এমন সাবানের নাম লিখেছে মালা যা

এখানে মেলে না। ধর্মতলায়।

হ্যাঁ। ও তো ফরাসি কোলাবোরেশনের প্রডাক্ট, সবে বাজারে এসেছে, বিজ্ঞাপনটা কী চমৎকার, দেখেছ?

আবির মাথা নাড়ে, না তো?

এস সাড়ে আটটা নাগাদ, স্টার-টিভিতে থাকে অ্যাডটা। বলতে বলতে সন্দীপ উপরে উঠতে লাগল। আবির ঘরে ঢুকে মালাকে জিজ্ঞেস করে, এ সাবানের নাম তোমাকে কে দিল, কোথা থেকে জানলে?

আননি তো? খোঁজ করেছিলে? মালার মুখ গম্ভীর।

চার

মালা কেমন থমথমে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবির বলছে পায়নি। পায়নি দুদিন ধরেও। আসলে তার অত সময়ও নেই। আবির খোঁজ যে করেনি তা তার মুখ দেখেই ধরতে পারছে মালা। ঘনগম্ভীর মুখে কাজ করতে করতে, টিভির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মালা আবিরের দিকে তাকাচ্ছেই না। কেবল-কানেকশনের কথা তো বলেছে দুবার। হ্যাঁ কিংবা না, কোনোটাই বলে নি।

অভিমানে মালার চোখে প্রায় জল এসে যায়। আজ বিকেলও নন্দিনীবউদি জিজ্ঞেস করেছে, কী, পেলে সাবানটা?

আজ বিকেলেও নন্দিনীর গা থেকে সেই গন্ধ পেয়েছে মালা। সেই অচিন দেশের সৌরভ। ভিনদেশী আভিজাত্যের মায়া। সে ঢুকে গিয়েছিল নন্দিনীর স্নানঘরে। সেই গন্ধ। তার স্নানঘরে যেমন ছড়িয়ে ছিল তেমনি। চট করে বেরিয়ে এসেছিল মালা। নন্দিনী ডাকছিল, নেক্সট উইকের প্রোগ্রাম বলছে, তাড়াতাড়ি এস মালা।

ওই স্নানঘর তো তার নয় যে সে বেরবেনা, থেকে যাবে। ওইটুকুর ভিতরেই গন্ধটা যেন গায়ে আবার লেগে গিয়েছিল। সেই দিনের সকালের মতো। নন্দিনী ফিরে এসে ভেজাকাপড় নিয়ে আবার চলে গেল। সে ধীর পায়ে তার স্নানঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ফ্ল্যাটে সে একা। দরজা ভেজিয়ে রাখলেও হয়। কিন্তু চেপে বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল। ব্যতিক্রম হয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল পুরনো দরজার ফাঁকফোকর গুলোও বন্ধ করে দিলে হয়। কেন, না অন্য কোনো ভয়ে নয়। গন্ধটা বেরিয়ে যাবে যেন দরজার ফাঁক দিয়ে। সে বাথরুমে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করেছিল। কী সাবান! সে যেন গন্ধ সমুদ্রে ভাসছিল তখন। নন্দিনী তার বাথরুমে স্নান না করলে তো ধরতেই পারত না এমন কোনো সাবানের খবর কেবল-টিভি, স্টার-টিভি থেকে পাওয়া যায়। তার শাদাকালো টিভিতে কতরকম সাবানের বিজ্ঞাপনই-না দেখায়! সেই তো শুধু দেখেই যায়। তার ঘরে তিনজনের জন্য একই সাবান আসে। সে সাবান নামী কিন্তু অনেক পুরনো। বহুদিন ধরে তারা ব্যবহার করে অভ্যস্ত। এমন গন্ধ তাতে নেই। কোনো সাবানেই নেই। সে তো কল্পনাও করতে পারে নি কেবল টি-ভি এমন আশ্চর্য পণ্যের সন্ধান দিতে পারে। ভাবতে ভাবতে জলের ধারে দাঁড়িয়েছিল মালা। তার মনে হচ্ছিল ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে গন্ধটা বোধহয় লেগে যাবে তার গায়ে, মাথার চুলে। লেগে যাচ্ছিল যেন একটু একটু করে। তখন সে নিরাবরণ হতে থাকে। প্রত্যহের স্নানে যে নিরাবরণতা তার সঙ্গে ওইদিন সকালের নিরাবরণতার তফাত ছিল যেন। সে তো চাইছিল গন্ধটা লেগে যাক তার গায়ে। ছড়িয়ে পড়ুক সর্ব

অঙ্গে। বাহুতে গালে ঠোঁটে গলায় দুই স্তনে, পেটে, পেট থেকে উরুতে, পায়ের পাতায়, নখাগ্রে। ধীরে ধীরে চটনা ওঠা পুরনো মেঝেয় উবু হয়ে বসে পড়েছিল সে। কী এক সঙ্কোচে শিহরনে ভরে যাচ্ছিল তার মন। অন্যের সাবানের গন্ধ তার গায়ে লেগে যাচ্ছে। সাবানে তার কিছু সংস্কার আছে। যে সাবান তারা তিনজনে, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানে মাখে, সেই সাবান অন্য কাউকে ছুঁতে দিতে তার অনীহা। সে নিজেও অন্যের ব্যবহার করা সাবান কখনো ছুঁয়ে দেখে নি। তবুও সেই পঁচিশ ওয়াটের আলোয় আঁধারে পুরনো স্যাঁতসেঁতে বাথরুমের ভিতরে বসে সে ওই গন্ধের ভিতরে যেন ডুবে যেতে চাইছিল আরো। সাবানটা শুধু মেয়েদের। মেয়েদের ত্বকের জন্য বিশেষভাবে তৈরি, সেই কথাই বলে গিয়েছিল নন্দিনী। তাই যেন সঙ্কোচ কাটছিল। পুরনো সংস্কার ভেঙে যাচ্ছিল। নন্দিনী যদি দিত, সে মেখে দেখত কেমন। তার মনে হচ্ছিল স্টার-টিভি থেকে ওই সাবানের বিজ্ঞাপন যা সে দেখে নি তা যদি তাদের শাদাকালো টেলিভিশনে ভেসেও ওঠে কোনোদিন, এই মায়া এই সৌরভ সে পাবে না। শাদাকালো টিভির বিজ্ঞাপনে কত সাবানই-না দেখেছে সে। কৌতূহল তো হয় নি। স্টার-টিভি, কেবল-টিভি ছবি ধরে দূর পৃথিবীর। তার আকর্ষণই আলাদা। সেদিন সে নিরাবরণ শরীরে হাঁটুর উপরে থুতনি রেখে চুপচাপ বসেছিল কতক্ষণ। সাবানের কথা ভাবতে ভাবতে নোনা দেওয়ালের ভিতরে নিঃসঙ্গ ঘুম ঘুম ভাবে জারিত হয়েছিল যেন। সেই ভাবটা কদিন ধরেই যেন যাচ্ছে না। আবির প্রতিদিনই ভুলে যায়। টিভির সামনে চোখদুটি বন্ধ করে অভিমানে নিঃঝুম হয়ে বসে আছে মালা। ঠিক যেন সেই সকালের মত, স্নানঘরে। গন্ধসমুদ্রে।

আবির বলল, বলছি তো আনব, কী এমন সাবান?

কী এমন সাবান তা তো শুনেছে আবির গত সন্ধেয়। তখন মালা বলেছিল। মালা ভেবেছিল ভুলে গেছে আবির, কাল তো আনবে। আনবেই। আবির না আনার অজুহাতে শুনতে চেয়েছিল কেমন গন্ধ? মালা শুনিয়েছিল। শুনতে শুনতে আবিরের মনে যেন বিষাদ জেগেছিল। সে ভাবতে চেষ্টা করেছিল কেমন গন্ধ হতে পারে? ট্রামবাসে ধূপকাঠি ফেরি করে বেড়ায় যে সুদর্শন অথচ ক্ষয়াটে যুবক তার বর্ণনার মতো? তেমন গন্ধ? একটি ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে সে কত কথাই-না বলে। মমতাজ আর সম্রাট শাজাহান তাঁদের শয্যাপার্শ্বে ওই ধূপ জ্বালাতেন। জুলিয়েট একা-একা ওই ধূপ জ্বালিয়ে রোমিওর কথা ভাবতেই চন্দ্রালোকে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছিল তার প্রেমিক। আগ্রা দুর্গে বন্দী সম্রাট ওই ধূপ জ্বালিয়ে যমুনা পারে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তেমন গন্ধের কথাই যেন বলেছিল কাল মালা। গন্ধটা যেন ছিল সেই ধূপ-ফেরি করা যুবকেরও বর্ণনাতীত। মালা কী উৎসাহেই না বলেছে কাল। সারাদিন অপেক্ষা করেছে, সন্ধের হাতে আসবে সেই গন্ধদ্রব্য।

মালা বলল,তোমাকে আনতে হবে না, কিছুই করতে হবে না। কেবল-টিভিও নিতে হবে না।

আবির চুপ করে থাকে। তখন নিচে এল নন্দিনী, মালা আসবে নাকি?

নান্দিনী শপিং করে ফিরেছে। ফেরার পথে ডেকে যাচ্ছে অভ্যাসে। মালা তো যায়ই না কোনো সন্ধেয়। কিন্তু আজ সে উঠল। তাকে উঠতে দেখে নন্দিনী অবাক। সে টের পেয়েছে নিচে ফ্ল্যাটের স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে কিছু একটা হয়েছে, তাই আবিরকেও ডাকল, আসুন না।

আবির ওঠে। তার দেখতে ইচ্ছে হয় কেমন সাবান। সাবান তো নয়, সাবানের বিজ্ঞাপনই

দেখবে। কেবল-টিভিতে কী কী দেখায় তা দেখবে। দরজায় তালা দিয়ে নিচের তলার মানুষরা চলল উপরে কেবল-টিভির রহস্যমালা প্রত্যক্ষ করতে। নন্দিনীর ছেলের সঙ্গে আবিরের ছেলে লুডো খেলতে বসল। আবির, মালা সোফায় বসে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। মালা একটু স্বাভাবিক হয়েছে তা বুঝতে পারছে আবির। সে উপরে আসায় সবচেয়ে খুশি হয়েছে মালা। আবির কৌতূহলী হচ্ছে। আবিরের ভিতরের জগদ্দল পাথরটা যেন সরছে। স্টার-টিভি, জি-টিভি খারাপ হবে কেন? কত সুন্দর সব প্রোগ্রাম। আবির দেখে তারা যত সিরিয়াস, সন্দীপ পালিত আর নন্দিনী ততটা নয়। তারা তো প্রতিদিন দেখে। নন্দিনী যেন মালারই মতো। যত না দেখে কথা বলে তার চেয়ে বেশি। মালা কিন্তু চুপচাপ। এ তো তার ঘরের টেলিভিশন নয় যে সে অবহেলার সঙ্গে দেখতে পারে।

নন্দিনী কথা বলতে বলতে থামে, দেখ মালা, দুপুরে যে অ্যাড থাকে, তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত, এ হল প্রাইম টাইমের অ্যাড, দাম বেশি, কত সময় ধরে দেখায় বল দেখি।

মালা নিশ্চুপ। আবির চোখ স্থির করে আছে রঙিন পরদার দিকে। টিভিটি রয়েছে দেওয়াল ধারে। তাকে ঘিরে ফুটদশেক দূরে সোফা তিনটিকে এমনভাবে বসানো হয়েছে যে টিভি সোফা নিয়ে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে প্রায়। আলোকোজ্জ্বল পরদাটি ঝলমল করে উঠছে নারী-পুরুষের গমনাগমনে।

সন্দীপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আবির বল দেখি কিসের বিজ্ঞাপন?

আবির হকচকিয়ে যায়। তার চোখের সামনে তীক্ষ্ণ এক যুবতি নীল শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। অতি সংক্ষিপ্ত গাত্রাবরণে তার দেহের উপরিভাগ প্রায় আবরণমুক্তই যেন। শাড়ির আঁচল খসে খসে যায়। যৌনতা এবং সৌন্দর্যের এক তীব্র মাদকতা ছড়িয়ে যাচ্ছে পরদা থেকে এই ঘরে। আবির বলল, কিসের আবার? শাড়ির?

হা হা করে হাসে সন্দীপ, হল না, ব্লেডের।

তাইতো। যুবতীকে নানানভাবে দেখানোর পর এল জিনস শার্টধারী দুর্দম পুরুষ। তার ঘনিষ্ঠ হল যুবতি, গালে হাত রাখল। পরদা জুড়ে ভেসে ওঠে ব্লেডের কথা। ঠকে গেল আবির।

কুইজ কুইজ! এইটা কিসের অ্যাড বল দেখি আবির? সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করেছে।

আবির দেখল গর্জমান মোটর সাইকেলে সুঠাম পুরুষের পিছনে স্বল্পবসনা যুবতি। যুবতি আঁকড়ে ধরেছে পুরুষটিকে। মোটর সাইকেল মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে ধুলোবালি উড়িয়ে। কখনো বালির ঝড়ে আচ্ছন্ন যুবক-যুবতি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কখনো সেই ধূসরতা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে মোটর সাইকেলের চাকা। সে বলল, মোটর সাইকেলের বিজ্ঞাপন।

ঠিক হল না, বিজ্ঞাপনের এই তো মজা, এত চমৎকার বিজ্ঞাপন তুমি কেবল ছাড়া দেখতে পাবে না, ধরতেই পারবে না কী বলতে চাইছে, অথচ ধরতে চেষ্টা করবে সর্বক্ষণ, সব এক-একটা গল্প।

গল্পটা দেখল আবির। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে গেল ক্লান্তিহর বিদেশী মদের কথা। সে ঘাড়ে ঘুরিয়ে দেখল মালার দুচোখ চঞ্চল। সে উসখুস করছে। তার বোধহয় এই প্রশ্নোত্তর পর্ব ভাল লাগছে না। তখনই নন্দিনী বলে উঠল, মালা বল দেখি এটা কিসের বিজ্ঞাপন?

মালা বলল না। মালা চুপ করে দৃষ্টি স্থির করেছে টেলিভিশনের পরদায়। চমকে ওঠে আবির। কিসের কথা বলতে চাইছে টিভির পরদা। ফুটে উঠছে গৃহকোণ, বেডরুম থেকে লিভিংরুম, দীর্ঘ করিডোর। করিডোর ধরে হাঁটছে দুটি নগ্ন পা। বোঝা যায় কোনো রমনী।

ক্যামেরা চলে এল এবার নীলের ভিতরে। নীল দেওয়াল। নীল মেঝে। নন্দিনী চাপা গলায় আবার জিজ্ঞেস করে ওঠে, বল মালা কিসের বিজ্ঞাপন?

মালা বলছে না। আবিরের মনে হল মালা যেন জানে। জানে তাই বলছে না। দেওয়াল মেঝে জল এত নীল, পরস্পরে এমনভাবে মিশে গেছে যেন কোনো হ্রদের জল দেখছে তারা। বোঝা গেল ওই নীল দেওয়াল হল স্নানঘরের, ওই জল বাথটবের। টেলিভিশনের গৃহকোণ থেকে স্নানঘর দেখে ঝুঁকে পড়েছে আবির। কী বিপুল বিস্ময়ে সে ভেসে যাচ্ছে! স্নানঘর যেন সমুদ্র। আর ওই বাথটবটি যেন অকুল সমুদ্রে ভাসা এক নৌকো। সেই নৌকোয় পা দিল রাজকুমারীর মতো এক নারী। তাকে সম্পূর্ণ দেখা গেল পরদায়। হলুদ টাওয়েলে নিজেকে সামান্য আবৃত করে আছে সে। ঈষৎ নিচু হল। সমুদ্রতলে, স্নানঘরের মেঝেয় পড়ে আছে পাখির ডিমের মতো একটি মুক্তো। সে নিচু হয়ে সুঠাম হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল মুক্তোটি। সাবান সাবান! চাপা গলায় চিৎকার করে ওঠে নন্দিনী। সেই সাবান! মালা যেটা তুমি দেখলে সেদিন সকালে! মালা কোনো উত্তর দেয় না। শুনল কিনা ধরা যায় না। হাতে ধরা পাখির ডিমের মত সাবান খণ্ডটির দিকে তাকিয়ে স্বপ্নসুন্দরী হাসল। চোখে তার বিলোল চাহনি। আবিরের মনে হল সাবানের টুকরোটি যেন প্রাণ পেল সুন্দরীর দৃষ্টিপাতে। ধারাভাষ্যে পুরুষকণ্ঠ ধীর গলায় বলে যাচ্ছে, ফরাসি আভিজাত্যের কথা। ওই সাবান ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবে সেরা সুন্দরীর দেহের আনাচ-কানাচ। আবির দেখল মালা মাথা নামিয়ে বসে আছে। সাবানের ভিতরে দুর্দম পুরুষ কল্পনার কথা ভাষ্যকার সুললিত ইংরিজিতে শুনিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে সন্দীপ পালিত, এই না হলে বিজ্ঞাপন! মেয়েদের জন্য সাবান, ওফ কী থিম্। সাবানকে কী ভাবে ভেবেছে ওরা, ভাবতে পার? নারী ও পুরুষ!

নেমে এল স্বামী-স্ত্রী। যে উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিল মালা, তা হারিয়ে কেমন মলিন মুখে ঘরে এসে বসল। আসার পর কেউ কোনো কথা বলছিল না। তাদের ঘরের টিভি চলে নি আর। খেতে বসেও দুজনে চুপচাপ। আবির খেয়ে উঠে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, নিয়েই আসব, দেখি কেমন!

মালা কোনো কথা বলল না।

বিজ্ঞাপনের রীতিই পালটে গেছে, সেক্স অ্যান্ড বিউটি কীভাবে পানচ করে দিচ্ছে ব্লেডের বিজ্ঞাপনেও, তোমার ওই সাবানের অ্যাড তো এ্যাডাল্ট থিমের।

মালা তবুও চুপচাপ। অন্য ঘরে বিছানায় গিয়ে জানালার ধারে বসেছে। মশারি টাঙানো হয়নি এখনো। পরদা তুলে দিয়েছে মালা। ঘরের আলো নিভিয়ে রাতের নীল আলো জ্বালিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। জানালার বাইরে জলের রিজার্ভার, পাম্পের ঘর, তারপরে প্রাচীর। প্রাচীরের গা ঘেঁষে দীর্ঘ সব পামট্রির সার। তার তলোয়ারের মত পাতা জ্যোৎস্না ফালাফালা করছিল ক্রমাগত। পাতার আড়াল থেকে চাঁদ ভেসে উঠছিল একনাগাড়ে। আজ আকাশ খুব পরিষ্কার। জ্যোৎস্না এসে পড়ছে তাদের বিছানায়, মালার কোলের উপর।

মালার নীরবতা গাম্ভীর্যে এতক্ষণে অপমানিত বোধ করতে তাকে যেন আবির। তার মনে হয় উপরের ফ্ল্যাটের প্রাচুর্য, রঙিন টিভির বিজ্ঞাপন, চিত্রমালা তার বউয়ের অভাববোধকে খুঁচিয়ে দিয়েছে যেন। খুব চেষ্টা করলে রঙিন টেলিভিশন ঘরে আনতে পারবে সে, ওই কেবল-টিভির লাইনও, তারপর? টিভিটাই ঘরে আসবে, আর কিছু তো নয়। পোর্ট ট্রাস্টের চাকুরে সন্দীপ পালিত তার ফ্ল্যাটটাকে সাজিয়েছে সুন্দর করে। আলোর ঝাড়,

পরদার ঘুঙুর, দেওয়ালের ক্রিম রঙের প্লাস্টিক প্রলেপ তো মালার আগেও দেখা। আজ আবিরের সঙ্গে গিয়ে না পাওয়ার ক্ষোভ যেন বিপুল হয়ে উঠেছে ওর ভিতরে।

মালার থেকে দূরত্ব নিয়ে বসে আবির বলল, কাল সকালেই নিয়ে আসব সাবানটা, তুমি তো বলছিলে দারুণ গন্ধ, তাই না?

মালা বলল, অনেকবার তো শুনেছ, আবার শুনতে চাও?

না, না, এনে দেব ফরাসি আভিজাত্য, বলল সন্দীপদা, কী চমৎকার কথা!

মালা ঝপ করে ঘুরে বসে, আনতে হবে না।

কেন, রাগ করলে হবে, সন্দীপদা পোর্টে চাকরি করে, ইনকাম জানো? ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব কেন? তবে সাবানটা আনব না তো বলিনি, ভুলে যাচ্ছি, বিশ্বাস কর।

মালা চাপা গলায় গর্জে উঠল, তুমি আমাকে অপমান করছ। আমি কি জানি না উপরের সঙ্গে নিচের তফাত, আমি কি বলেছি ওসব এনে দাও, আমি অবুঝ!

না, না বলবে কেন, বল না তো, কিন্তু হলে তো খারাপ হয় না, একটা সাবান তো মাত্র, আনব, এনে দেব।

মালা চাপা গলায় চিৎকার করে ওঠে, না, একদম না।

অবাক হয় আবির। মনে মনে নিশ্চিন্তও হয়। মালা অবুঝের মত যে দাবিটা করেছিল তা থেকে সরে গেছে। বিজ্ঞাপনে মোহিত হওয়ার মেয়ে তার বউ নয়। খুব সামান্যতে খুশি। মাথার থেকে কেবল-টিভি, রোজ সিনেমার ভূত বোধহয় নামছে। ঘোর কেটে যাচ্ছে আচমকা। মন তো আকাশের মত। সেখানে উড়োমেঘ এসে মিলিয়েও গেছে।

মালার কাঁধে হাত রাখল আবির। তুমি রেগে যাচ্ছ, আমি তো না বলি নি, এমন গন্ধের কথা তুমি বলেছিলে যে আমার মনে হল বিজ্ঞাপনটা দেখে আসি, তা অ্যাডটা বেশ ভালো।

মালা কাঁধ থেকে আবিরের হাত নামিয়ে দেয়, বলছি না আনতে হবে না।

আমি তো না বলিনি, একটা সাবান কেনার সামর্থ্য আমার আছে, অপমান করছ কেন?

মালা ফুঁসে উঠল যেন। মাথার খোঁপা ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে ওর কাঁধে, ছিঃ, ওই সাবান আনার কথা বলতে পারছ তুমি? কী বলল বিজ্ঞাপনে? পুরুষ মানুষের মতো সাবান, ঘুরবে শরীরের গোপন সব ... ছিঃ, আমি এতই শস্তা, সন্দীপদা কেমন ব্যাখ্যা করছিলেন টিভির মতো, ... ওই সাবান নিয়ে আমি আমার বাথরুমে ঢুকব, তোমার অপমান লাগবে না, তুমি কি পুরুষ! আমি কি বাজারের ....।

কথা শেষ করতে পারল না মালা। উপুড় হয়ে পড়ল বিছানার উপর। ফোঁপাতে লাগল। আবির স্তব্ধ হল। টের পেল উড়োমেঘ তো যায়নি। বরং স্থিত হয়েছে। ঢেকে ফেলছে চাঁদ। নগরের সমস্ত আকাশ। তার ভয় করতে থাকে। ওই মেঘ সে ঠেকিয়ে রাখবে কী ভাবে? কোন উপায়ে? লেকপ্লেস থেকে এই খেলাৎবাবুর গলি, মসজিদ ভাঙা, রেপ...হিন্দু মুসলমান...ফরাসি আভিজাত্যের সাবান সব একাকার হয়ে এক-এক রকমভাবে ভেঙে পড়ছে যেন এই শহরে।

(শারদীয় প্রতিক্ষণ—১৯৯৩)

সপ্তডিঙা

গৌরী গৌরী ওঠো, বেলা হল কত, ও গৌরী, গৌরী!

ছ-সাত বছর আগে হলে নিবিড় ঘুমে মগ্ন গৌরী সাড়াই দিত না এই ডাকে। কে কখন ডেকে যায় তাকে, শুনতেই পেত না আরাম-ঘুমে। তিন বছর আগে হলে পাশ ফিরে শুত, আবার ঘুমিয়েও পড়ত কয়েক দণ্ডের জন্য, ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে পড়ে থাকত বিছানায়। এখন গৌরী এক ডাকেই ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে চোখ ডলে, যেন এই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল আবোধ ঘুমে তন্দ্রাচ্ছন্ন এই মেয়ে। ডাকটি এলেই তাকে উঠতে হবে। উঠে তৈরি হতে হবে কেন না তার কোথাও যাওয়ার আছে। ঠিক আছে, সে কোথাও যাবে, দূরে অনেক দূরে, এই গঙ্গাতীর ছেড়ে, এই আদ্যিকালের কোঠাবাড়ির অন্ধকার ছেড়ে, এই তিনশো বছরের পুরনো শহর ছেড়ে আর এক শহরে, অন্য এক নদীতীরে কিংবা সাগরকূলে, কোনও এক অরণ্যের কাছাকাছি, পাহাড়তলিতে, নতুন এক বাড়িতে। গৌরী যাবে, তাই দরজার কোলে দাঁড়িয়ে আছে হলুদ রঙের ট্যাক্সি। না না, ট্যাক্সি কেন, সাদা রাজহাঁসের মতো লম্বা একটি গাড়ি, অনাথ বিশ্বাস বাই লেন আটকে গেছে সেই গাড়িতে। রাস্তা ঢেকে গেছে সম্পূর্ণ. রিকশা মানুষজন ঠুনঠুন করছে, গুনগুন করছে সেই গাড়ির পিছনে, গাড়ির সামনে। কে যাবে, কোথায় যাবে, জিজ্ঞেস করছে একে অন্যকে। বাই লেন ছেড়ে ছয়-এর দুই নম্বর বাড়ির মেয়ে যাবে দূরে কোথাও, তাই হুগলি নদীর ওপারে, পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে অজগরের মতো এক ট্রেন, তার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো দেখাই যায় না খালি চোখে। গৌরী পৌঁছলে সেই স্থবির অজগর সচল হবে। স্টেশনে যেতে শুধু কয়েক পা হাঁটতে হবে মেয়েকে। না, হাঁটবেই বা কেন, ঠুনঠুন রিকশায় চেপে সুটকেশ নিয়ে সোজা পৌঁছে যাবে বাগবাজার লঞ্চঘাটে। লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে, ভোঁ মারছে, গৌরীর ঘুম ভাঙল?

কুঁকড়েমুকড়ে শুয়েছিল মেয়ে। খোঁপাভাঙা চুল ছড়িয়ে ছিল আধময়লা রঙজ্বলা বাটিক ছাপ চাদরের উপর। বালিশের কোণে লালা ঝরেছে ঘুমের ঘোরে। ইস! গৌরী, গৌরী, তুই বড় হলি না, এ কী অভ্যেস! কী ময়লাই না হয়েছে বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, মশারি, নিজে না পারিস কাচতে, বের করে দিলেই আমি বুড়ি মা, আমিই কেচে দিই। সারিকেও তো বলতে পারিস, সেও তো শোয় এই বিছানায়। বালিশের হাল দ্যাখো, ওতে আর কিছু আছে! সব আমাকে দেখতে হবে, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হতে পারিস নে, কী করে ঘুমোস এই আঁস্তাকুড়ে, যখন নিজে সংসার করতে যাবি...।

গৌরীর মা মায়া ডাকে, ও গৌরী ওঠ, দ্যাখ কে এসেছে।

উঠল মেয়ে। সে তো এক ডাকেই ওঠে। অথচ না ডাকলে ওঠে না। কখন ভোর হয়েছে, কখন রোদ উঠেছে, কখন ওর বাবা অবিনাশ দত্ত বাজারে গেছে, ছোটোভাই সুবীর

কেড্‌স শর্টস তার হলুদ গেঞ্জি পরে গঙ্গার ধার ধরে তিন মাইল দৌড় শেষ করে বাজারের চায়ের দোকানে ওই পোশাকেই জমে গেছে! তারই ঘুম ভাঙে না শুধু। মেয়েদের এত বেলা পর্যন্ত আলিস্যি রাখতে নেই। গৌরীর বোন সারি তো উঠেছে অনেকক্ষণ, রান্নাঘরের দোর গোড়ায় বসে আটা মাখছে, অথচ গৌরীই ঘুমিয়ে থাকে। বাইরের ঘরে যে চম্পা এসেছে। তার বন্ধু চম্পা, বিয়ের পর ওড়িশার কোথায় যেন থাকে। অদ্ভুত নামের একটা নদী আছে সেখানে। আসবে বলে চিঠি দিয়েছিল না!

গৌরী চোখ ডলতে ডলতে বলল, ইস! এত বেলা হয়ে গেছে, আটটা!

মায়া বলল, তাড়াতাড়ি নে, ও একা বসে আছে, কতক্ষণ কথা বলবে আমার সঙ্গে।

গৌরী বলল, ডাকোনি কেন আগে?

ডাকতে হবে কেন, আচ্ছা এই বিছানায় শুস কী করে, চম্পা যদি এ-ঘরে ঢুকত?

গৌরী হাসে, কী এমন ময়লা।

বিছানা থেকে নামতে নামতে মাথার চুলে আলগা খোঁপা করল মেয়ে। আঁচল ঝাড়ল, ঠোঁটের কোণ আর একবার মুছল। এতক্ষণে মায়ার চোখ পড়ল শাড়িতে, ইস! কী ময়লা! গন্ধ ছাড়ছে যেন, কতদিন কাচিস নে?

তোমার ময়লা বাতিক হয়েছে, এ তো কাচা কাপড়, কাল সন্ধেয় পরেছি টিউশানি সেরে এসে, লোকে ঘরে কী পরবে?

কাচা কাপড়ের এই হাল, সাবান ঘষিসনে?

ময়লা ছাড়ে না, তুমি যেন নতুন দেখছ!

শাড়ি বদলে নে, মাথার চুলে চিরুনি দে, কী রকম হাল হয়েছে নিজের তা দেখিস, আচ্ছা তোর চুল এত লাল হচ্ছে কেন?

রাগ করে গৌরী, জানি নে।

কাল শ্যাম্পু করিসনি কেন?

আমি অন্তর্যামী নই! বিড়বিড় করে গৌরী। পটাপট মশারির দড়ি খুলতে খুলতে মায়ের কথা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে থাকে। মায়া একবার কথা আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না। ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকে। মশারি খুলে এক কোণে স্তূপ করে জানালার কপাট ঠেলে দেয় সে। ঘরে আলো আসে সামান্য। আলো নয় যেন আলোর ছায়া, খুব অদৃশ্য এক মায়া। জানালার ও পাশে আকাশ নেই, আছে আর একটা খুব পুরনো বাড়ির ময়লা দেওয়াল। দুই বাড়ির ভেতরে ফুট চারেক ছাড়, ওটি ময়লা গলি, এ-বাড়ির পশ্চিম দিক। আগে, বহুবছর আগে, ওই কুণ্ডু বাড়ির পুবদিক ছিল খোলা। তারপর মল্লিকদের এই কোঠা উঠে গেলে কুণ্ডুদের পুব বন্ধ হল। কেন যে পশ্চিমের এই জানালা রেখেছিল মল্লিকবাবুরা তা জানে না গৌরী। ঘরে তো জানালা রাখতেই হবে, তাই রাখা বোধহয়, কিন্তু জানালা কোনও কাজে লাগে না। রোদ-আলো-বাতাস কিছুই ঢোকে না, বরং চার ফুট ময়লা গলির গন্ধ আসে একটু একটু করে। ওই গলিতে ময়লা দু বাড়িরই পড়ে। সেই ময়লা সরাতে জমাদারের টাকা ব্যয়ে দুই বাড়ির গড়িমসি। মল্লিকদের এই বাড়িতে দুই ভাড়াটে, অবিনাশ দত্ত এবং শ্রীপতি সরকার, কুণ্ডুদের বাড়িতে তারা একা। তিন শরিকের কথা, সবাই দিক, একা দেব

কেন? যখন ময়লা পাহাড় হয়, মাছি ভনভন করে, তখন এক রোববারে দত্ত, সরকার, কুণ্ডু তিনজনেই পথে নামে লুঙ্গি আর হাফ শার্ট পরে। ময়লা শেষ পর্যন্ত সরে। তখন তিনজনের ভিতরে কথা হয়, ভাব হয়, নস্যি বিড়ি দেওয়া নেওয়া হয়। কিন্তু গৌরীদের ঘরের জানালা বন্ধ কি সেই জন্য?

গৌরী জানে, কী জন্য। সারি, তার মা মায়া, বাবা অবিনাশ, ভাই সুবীর, আর এক ভাই গড়িয়াবাসী আবীরও জানে, কী জন্য। কিন্তু তাদের জানা আর গৌরীর জানা এক নয়। গৌরী সবটা জানে, আর সবাই তার কাছে শুনেছে মাত্র। এই তো গেল ফাল্গুনের কথা।

সে রাতে সারি শোয়নি এ ঘরে। সারি ছিল না বাড়িতে। থেকে গিয়েছিল কোন্নগরে, মাসির বাড়ি। মাসির ছেলে খোকনদার বিয়ের পর বউভাত হল সেদিন। খোকনদা রাইটার্সের ক্লার্ক, তার বউ, যে ছিল তার প্রেমিকা, সেই রাকাও চাকরি করে ভদ্রেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ে। বউভাত সেরে সবাই ফিরে আসছিল বাড়ি, তখন সারিকে আটকে দিল মাসি। গৌরীকেও থাকতে বলেছিল, সে থাকেনি, টিউশানির বাচ্চাদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হচ্ছে। বউভাতের দিন কী না কথা হয়েছিল ও বাড়িতে! সারিকে নতুন বউ বলল, থাকো না দুটো দিন, আবার কবে আসবে ভাই সারি গৌরি।

সারি বলল, থাকতাম, কিন্তু তুমি কি আমার সঙ্গে ঘুমোবে, তা হলে কত গল্প হত।

শুনে সকলেই কী হা হা হাসি! নতুন বউ-এর গাল রাঙা।

সারিটা যে কী রকম কথা বলে! ফিরতে ফিরতে মাকে সেই কথাই বলছিল গৌরী।

সেই রাতে কোন্নগর থেকে ফিরে গৌরী তো একা ঘুমোল এই ঘরে। ফিরছে যখন ফাল্গুনের রাত গাঢ়, ঘন দুধের মতো আঠালো হয়ে গেছে জ্যোৎস্না। অনেকদিন ধরে শীত ছিল এ বার। চাঁদ যেন শীতঘুম কাটিয়ে মুখ দেখাল খোলা আকাশে সেদিনই প্রথম। কী আশ্চর্য! বড় রাস্তা থেকে মাঝারি রাস্তা, তা থেকে সরু অনাথ বিশ্বাস বাই লেন, প্রায় সুঁড়ি পথের মতো যে রাস্তায় বাতাস ঢোকে না, রোদ পড়ে না প্রায়, সেখানে কি না শুয়ে আছে জ্যোৎস্নার লম্বা লম্বা ফালি, যেন শহর ঘুমিয়ে পড়তে তারা গুটি গুটি এসে ঢুকেছিল অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের ছায়ায়, ঠাণ্ডায়, যেভাবে গা জুড়োতে আসে ধবলী গাই। চোখ বুজে আরামে বিশ্রামে থাকে। আর হ্যাঁ, বাগবাজারের এ দিকটা তো কংক্রিটে বোঝাই। মাটি ঢাকা পড়েছে পিচ পাথরে অনেক কাল, তো গাছপালা আসবে কোথা থেকে? সেই যে তিনশো বছর আগে গঙ্গাতীরে পত্তন হল এই নগর, সেই আমল থেকেই যেন গাছপালা উধাও। এক একটা যা ও দেখা যায় এখানে ওখানে, তা তো জলহীন বে-মরসুমি ময়লা ময়লা মেঘের মতো, দলছুট, নিঃসঙ্গ। গাছ নেই, কিন্তু ফুল ছিল যেন অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের কোথাও। ফুল না থাকুক তার গন্ধ ছিল ফাল্গুনের বাতাসে। জ্যোৎস্নার লম্বা লম্বা দাগ মাড়িয়ে অচেনা ফুলের গন্ধ নিতে নিতে ঘরে ঢুকে জানালা খুলেছিল গৌরী। ময়লা গলির পাশে অবশ্য চাঁদের আলো ছিল না, অন্ধকারও তো ছিল না। কেমন ঘোলাটে ভাব গলির চার ফুট পরিমাণ শূন্যতায়। গলিতে ফুলের গন্ধ ছিল না। না থাকুক, সব তো সঙ্গে করেই সে ঢুকেছিল ঘরে। জ্যোৎস্নার গুঁড়ো লেগেছিল যেন তার চুলে গায়ে গায়ে, চোখের পাতায়, ভ্রূতে। জরি গুঁড়োর মতো চাঁদের আলো থিরথির করছিল। গায়ে

লেগে গিয়েছিল ফাল্গুনের অচেনা বাতাসে মেশা অচেনা ফুলের গন্ধ। চুপ করে বসেছিল সে একা। কী আশ্চর্য! তার তখন মনে পড়ল, যখন হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে আসছিল অধীর চলমান বাসের জানালার ধারে বসে, গঙ্গায় দেখেছিল পাল তোলা মস্ত এক নাও। একেবারে আচমকা। কয়েক পলের জন্য। তারপরই তো গঙ্গা অদৃশ্য। বাস ঢুকে পড়ল বড়বাজারের ঢেউ তোলা পাথর বাঁধানো রাস্তায়। নাচতে নাচতে চলল, দু পাশে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। ঘরে বসে সেই পালতোলা নাও এর জল কাটার শব্দ শুনছিল যেন গৌরী। হাঁক শোনা যাচ্ছিল মাল্লাদের। শুনতে শুনতে কখন যে ঢলে পড়েছিল ঘুমে। মুর্শিদাবাদী সিল্ক খোলেনি, খোঁপা খোলেনি, কপালের টিপ খোলেনি।

হ্যাঁ, সেই ফাল্গুনের রাতে ওই ময়লাগলির ভিতরে লুকিয়ে ছিল কোনও বদ পুরুষ। গৌরী বলে, ছিলই তো। পুরনো রেন ওয়াটার পাইপ বেয়ে সে জানালায় উঠে এসে তার কপালে হাত দিয়েছিল। দিয়েছিলই তো! লোক এসেছিল মা, আর তো জানালা খুলে শোয়া যাবে না। কী ভিজে হাত! লোক এসেছিল সারি, কী করব আমি, খাটের এ-ধারে শুয়েছি, হাতটা আমার গালে, মুখে, ঠোঁটে, মাকে তো সব বলা যায় না, ইস! কী দেখেছে কে জানে, ঘুমোই তো এলোমেলো হয়ে, ও জানালা আর খোলা যাবে না।

সারি ফিরে এসে গল্প করছিল দিদির সঙ্গে, খুব মজা হল খোকনদার ফুলশয্যায়।

গৌরী বলছিল, চোখ, খুলতে পারি না ভয়ে, একেবারে জলের হাত, কী ভিজে, নরম!

সারি বলছিল, খোকনদার চেয়ে খোকনদার বউ কম যায় না, আমাকে খাটের তলা থেকে টেনে বের করে বলে, এসো ননদিনী, ঘুমোবে এসো আমার পাশে, গল্প করব, হি হি হি।

গৌরী বলে, কী করে এল বল দেখি, বাগবাজার ঘাটের কোনও মাঝি মাল্লা?

বাদ দে তো, কী একটা স্বপ্ন দেখেছিস তুই, শোন কী হল তারপর ...।

গৌরী বলে, জলের গন্ধ ভুরভুর করছিল।

হি হি করে হাসছিল সারি, জলের আবার গন্ধ কী রে, নতুন বউ সেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছিল না, বাদ দে, শোন কী হল তারপর, রাকা বউদি কী স্মার্ট...!

ফুলশয্যার গল্প বলতে থাকে সারি, আড়ি পেতেছিল কীভাবে। গৌরী গিয়ে জানালা বন্ধ করে। সেই থেকে জানালা বন্ধ হতে থাকল রাতে, খোলা হতে থাকে সকালে। খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগায় গৌরী। এই জানালার অন্য কোনও টান নেই, শুধু রাতের ঘোর ব্যতীত। জানালা বলেই খুলতে হয়। সে ব্রাশ নিয়ে ঝটপট নেমে যায় একতলার জল কলে। দু ঘর ভাড়াটের জল নিচেই। তাদের টেনে তুলতে হয় ওপরে। গৌরী কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করে চোখমুখে জল দিতে দিতে দেখল বাবা অবিনাশ দত্ত বাজারের থলে হাতে ঢুকছে।

অবিনাশ বলল, পেছনের গলির ময়লা পরিষ্কার করার কথা বলছিল কুণ্ডুবাবু।

হঠাৎ যে?

খুকুকে যারা দেখেছিল, মানে সেই গানের মাস্টারের বাড়ির লোক, পছন্দ করেছে, বিয়ের দিন ঠিক হবে, ওরা আসবে।

গৌরী কিন্তু বলে না। আঁচলে মুখ মুছতে থাকে, তখনও তার কাঁধে তো রয়েছে শুকনো

তোয়ালে। অবিনাশ সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে, এই শুনছি নিজেরা পছন্দ করেছে, তা আবার এত দেখাশোনার কী, রেজিস্ট্রি নাকি হয়ে গেছে?

গৌরী বলল, বাবা, থলেটা দেবে?

অবিনাশ যেন শুনলই না, বলল, গানের মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে, তা খুকু আর কেমন গান জানে, কুণ্ডুবাবু বলে, গান শুনেই নাকি পছন্দ হয়ে গেছে, কথার কোনও পারম্পর্য নেই, হ্যাঁ রে, তোরও তো এলাহাবাদের কী ডিগ্রি ছিল।

গৌরী উঠতে উঠতে বলে, সবার থাকে।

তা শেষ পর্যন্ত গানের মাস্টার!

গৌরী বলে, ব্যাঙ্কে কাজ করে বাবা।

করুক গে যাক, আমি টাকা দিতে পারব না, নিজেরা পরিষ্কার করুক। বিড়বিড় করতে করতে অবিনাশ উঠতে থাকে উপরে।

দুই

চম্পা বলছিল, খুব ফাঁকা জায়গা মাসিমা, পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেলেই ওর বদলি হয়ে যাবে মধ্যপ্রদেশে, অবশ্য যদি চায় এই জায়গাতেও থাকতে পারে, আমি তো বলছি ওই ইব-উপত্যকাতেই থাকব,কোম্পানির স্কুল হচ্ছে, বড় কোয়ার্টার, কী খোলামেলা!

জায়গাটার কী নাম যেন? মায়া এই নিয়ে দুবার জিজ্ঞেস করল।

পাঁচকাহানিয়া, ইব বলে একটা নদী আছে, ওই নামে স্টেশনও, ইব নদীর ধারে।

কী বললে, ইব নদী?

তখন ঢুকে পড়ল গৌরী, এমন চিঠি দিয়েছিস যে ঠিকানা নেই, কবে এলি?

চম্পা বলল, ভুলে গেছি রে, এত খোলা জায়গা, এত বাতাস দেয়, এত মেঘ, হ্যাঁ রে তুই এ কী হাল করেছিস নিজের, এত রোগা হয়ে গেছিস!

মায়ার মুখে মেঘ ছায়া ফেলল যেন আচমকা। উড়ান দিয়ে চলে গেল। মায়া বলল, কাপড়টা বদলালি নে?

এ তো চম্পা, কাপড় বদলাব কী? বলতে বলতে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে গৌরী, আগে তুই শিলং ছিলি না, তাই যেন জানতাম।

সে কবের কথা, শিলং-এর জল সহ্য হত না অচিন্ত্যর, তা ছাড়া প্ল্যান্টের কাজও শেষ হয়ে গেল, চলে এলাম ইব-এ, আয় না তুই আর সারি, গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা হবে না, পরের মাসে আমার দাদা-বউদি যাচ্ছে। চম্পা তার শালোয়ার কামিজের ওড়না নাড়াচাড়া করে, বুক থেকে নামায়, গলায় জড়ায়। কী সুন্দর লাগছে চম্পাকে। বত্রিশ পার হয়ে তেত্রিশে পড়ল গৌরী, চম্পাও তো তাই। কিন্তু লাগছে যেন সারির চেয়েও ছোট। কুড়ি বাইশ। এখনও রাধা সিনেমা হলের সামনে ওর জন্য প্রেমিক অপেক্ষা করে থাকতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

মায়া দেখছে তার মেয়েকে। যদি কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। এখন কি চম্পা তোর সেই চম্পা, সেই বন্ধু! এখন তো সে মস্ত এক ইঞ্জিনিয়ারের ঘরনী। যেমন ঘরের মেয়ে, তেমন বরই পেয়েছে। সোনায় মুড়ে ওর বিয়ে দিয়েছিল না বাবা মা। চম্পা এসেছে কাজে। মনে রেখেছে তোর কথা, তাই ই ভাগ্যি ; সব জেনেও এভাবে চলে এলি ওর সামনে। ব্লাউজটা

সেলাই ফাটা, মাথার চুলে জট, চোখ মুখ শুকনো, যেন সারারাত ঘুমোসনি তুই, রোদে হেঁটে এলি দশ মাইল। চম্পা এসেছে তার এক মাসতুতো ভাসুরের জন্য এই বাড়ি। সোদপুরে থাকে, ছোটখাটো ব্যবসা করে, নিজের বাড়ি আছে। বিয়ে করবে না পণ করেছিল, এখন মন হয়েছে। চম্পার মনে পড়েছে গৌরীর কথা। গৌরীকে সে বলত না, তার জন্য ছেলে দেখবে সে। ঠাট্টা করেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! মুখের সেই কথাই সত্যিই হতে যাচ্ছে।

গৌরী বলল, তুই কিন্তু মুটিয়েছিস।

নিঃশব্দে, আলগা করে হাসল চম্পা, কারণ তুই রোগা হচ্ছিস।

গৌরী বলল, শুধু খাস আর ঘুমোস, তাই তো!

সে উপায় আছে, মূর্তিমাণ পুত্র, পাঁচ হল, কী জ্বালান জ্বালিয়েছে হওয়ার পর, দিনে ঘুমোত, রাতে জাগত, ও মাসিমা ছেলেমেয়ে মানুষ করা খুব ঝক্কি, কী করল জানেন, আমরা গেল পুজোয় যাচ্ছি রাজস্থান...। চম্পা বলতে থাকে।

মায়া বলল, একটা নিয়েই এত, চোখে চোখে রাখবে সব সময়, আমরা কী করে পেরেছি, ওরা চার ভাইবোন তো পরপর।

চম্পা গিন্নির মতো বলল, আমার মাও তাই বলে, তবে কি না একটাই এখন দশটার সমান, গুণ্ডা ছেলে, একদিন একা একা নদীর ভিতরে নেমে গেছে।

সে কী! ভয়ার্ত গলায় মায়া গৌরী, মা-মেয়ে দুজনেই আর্তনাদ করে ওঠে।

না, না, জল থাকে না তো ইব-এ, জল আছে মাঝখানে, তাও একটুখানি, তবে ছেলের তো ডুব জল নিশ্চয়, জলের ধারে যায় না, বালিতে ঘুরে বেড়ায়, হ্যাঁ রে গৌরী, রীতার খবর কী, ও আসে? দেখা হয়?

গৌরী মাথা নাড়ে, বারাসতে থাকে বোধহয়।

তা জানি, দিল্লিতে ওদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, ওর ননদ তো সি আর পার্কে থাকে, আমার দেওরও, ওরা যাচ্ছিল সিমলা, পথে দিল্লিতে দুদিন হল্ট, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে ওর মেয়েটা, যেন পরী, কী রং! কী সুন্দর হাসে, আমার বুম্বারই বয়সী।

গৌরীর আচমকা মনে হয় শাড়িটা বদলে আসে, বদলে আসাই উচিত ছিল, সে বলল, একটু বস, আসছি রে এক্ষুনি।

না রে, আমিও উঠব, ছেলে রেখে এসেছি, হ্যাঁ, তোরা আয় ইব-এ, ফরেস্ট আছে, লাল মাটি, ট্রাইবাল, কী বিরাট পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে, রীতা তো অ্যাড্রেস নিয়েছিল আসবে বলে, এলই না।

গৌরী বলল, সারাদিন কী করিস তুই?

মন খারাপ করে খুব, হাজার হলেও শোভাবাজারের মেয়ে তো, অত ফাঁকা জায়গায় থাকি কী করে বল, অত নিঝুম! হাসতে থাকে চম্পা, এখন আবার হয়েছে উল্টো। শব্দ সহ্য করতে পারি না, শোভাবাজারের অত হইচই, জ্যাম, বাস-লরি ধোঁয়া, দম আটকে যায়।

ওখানে লোক থাকে না?

থাকবে না কেন, কিন্তু কলকাতার মতো কী, প্ল্যান্ট এরিয়ায় শুধু প্ল্যান্টের লোকজন, তার ভিতরে আবার সবার সঙ্গে মেশাও যায় না, ও সব নানা রেস্ট্রিকশন আছে অচিন্ত্যর, সারাদিন প্রায় একা আমি, ও ফেরে পাঁচটা নাগাদ, তবে হ্যাঁ, একা থাকতেও তো ইচ্ছে

হয় মাঝে মধ্যে, প্রয়োজনও হয়।

গৌরী অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কোনও দূরের মানুষ, অচেনা কাউকে দেখছে। বিস্ময়ে ভারি হয়ে যায় চোখ দুটি।

চম্পা বলছে, বিয়ে হোক, তখন টের পাবি একা হওয়ারও দরকার, বাবা মা ভাইবোন বন্ধু যে কী জিনিস তা একা না হলে বুঝবি কী করে, তাদের কথা ভাবতে হয়, চিঠি লিখতে হয়, অচিন্ত্য থাকলে তো একা বসার উপায় নেই, এটা দাও, ওটা দাও, তারপর আছে প্ল্যান্টের গল্প, আমাকে শুনতে হবে, শুনতেই হবে।

মায়া ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত হচ্ছে! চম্পা গৌরী গল্প করছে পুরনো দিনের মতো। চম্পাকে সকালে দরজায় দেখে একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল মায়া। অস্বস্তি লেগেই ছিল। গৌরীর বন্ধু হলেও এসেছে তো গৌরীর সম্বন্ধ নিয়ে। আশঙ্কা তো আছেই সেই জন্য। মায়া ঘর ছাড়ে। শুধু চা দিয়েছে, এখন গৌরীর বাবাকে পাঠাবে একটু মিষ্টির জন্য।

চম্পা তার স্বামীর ঘর, স্বামী-পুত্র নিয়ে কথা বলতে বলতে কখনও হাসছে, কখনও আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছে। গৌরী শুনছে যেন দূর দেশের কথা। বাবার দূর সম্পর্কের এক ভাই আমেরিকায় থাকেন, তিনি গতবার মাসখানেকের জন্য এ দেশে ফিরেছিলেন। কী আশ্চর্য! এ বাড়িতে এসেছিলেন। বাবাকে তিনি আমেরিকার গল্প বলছিলেন এই ঘরে বসে। গৌরী সারি সুবীর, মায়া সবাই ঘিরে ধরেছিল যেন সেই জীবনকাকাকে। অবাক হয়ে সে দেশের কথা শুনছিল তারা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিল। গৌরী সেই রকছম মুগ্ধতায় জড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, সেই বিস্ময়ে।

চম্পা বলছে, তার স্বামী খুব ভাল, এত ভালবাসে! তবে ভালবাসার বিপদও আছে। মাঝরাতে তাকে টেনে তোলে অচিন্ত্য, কী? না জ্যোৎস্না দেখবে বারান্দায় বসে, আর গান শুনবে চম্পার। যখন ওই জায়গায় জ্যোৎস্না হয়, সে যে কী সুন্দর! কী দারুণ ব্যাপার! শালবনের মাথায় চাঁদ জাগে। হ্যাঁ, যখন ফাল্গুন চৈত্র হয়!

ফাল্গুন! গৌরী যেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে। গৌরীর মুখের উপরে জ্যোৎস্না জেগে উঠতে থাকে তার অলৌকিক মায়া নিয়ে। কী বলছে চম্পা, না, ওই ইব নদীর উপত্যকায় চাঁদের আলো অনেক অনেক বেশি। যখন ফাল্গুনের বাতাস ওঠে রাত্তিরে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যায় জলহীন নদীর উপর, বালির গায়ে গায়ে, মনে হয় নদীতে যেন বান ডেকেছে। নদীর দু পারের গাছগাছালি গান গাইতে আরম্ভ করেছে। চোখে বিভ্রম হয়, মনে হয় ইবের ভেতর দিয়ে ময়ূরপঙ্খী যাচ্ছে, সপ্তডিঙা ভেসে যাচ্ছে আপন মনে। অচিন্ত্য তখন এমন করে! খুব পাজি! হি হি করে হাসে চম্পা। আচমকা গলার স্বর ছোট করে আনে, এমন না মানুষটা!

গৌরী বলে, তোকে ঘুম থেকে আচমকা জাগিয়ে দেয়!

হ্যাঁ।

ওখানে কাঠগোলাপ আছে?

কাঠগোলাপ! কত যে গোলাপ, কত রকম ফুল, শালফুল ঝরে ঝরে মাটি সাদা হয়ে যায় চৈত্রমাসে, তুই হাঁটবি, তোর মাথায় শালফুল ঝরে পড়বে, কিন্তু এত সত্ত্বেও মন বড় খারাপ লাগে। লাগবে না! এই গঙ্গা, এই বাগবাজার, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, রাধা, উত্তরা, রূপবাণী সিনেমা হল, রঙমহল, বিশ্বরূপা, স্টার থিয়েটার, হ্যাঁ রে, আমি তো জানতামই না স্টার পুড়ে গেছে, পরে, তা প্রায় ছমাস বাদে কলকাতায় ফিরে হঠাৎ কী কারণে হাতিবাগানে

গিয়ে কী মন খারাপই না লেগেছিল। ওখানে না আছে সিনেমা, না আছে থিয়েটার, নিজের ভি সি পি-তে হিন্দি দ্যাখো, ইংরিজি দ্যাখো। গৌরী, গৌরী মনে আছে তোর, রূপবাণী সিনেমায় শাপমোচন দেখতে গিয়ে মেসোমশায়ের চোখে পড়ে গেলাম।

গৌরী মনে মনে বলে, কত কিছু মনে আছে!

হ্যাঁ রে, তুই যাস এখনও?

গৌরী মাথা নাড়ে, একা আমি কবে দেখেছি, তোরা দেখতিস, আমিও যেতাম ফ্রিতে, হাসতে থাকে গৌরী।

চম্পা চুপ করে গেল। মনে পড়ল কি সব কথা? রূপবাণী, রাধা, মিনার, উত্তরা। শেষ পংক্তির দেওয়াল ঘেষা টিকিট। [illegible] সাইডের টিকিট কিনত সুকান্ত। গৌরী মাথা নামিয়ে শ্বাস নেয়। অস্বস্তি হয় তার। কী মনে করল চম্পা কে জানে? কী দরকার তার ও সব কথা তোলার। সে সব তো আর এক পৃথিবীর গল্প। চম্পা কি এ বার উঠে যাবে? সে এখন এক সন্তানের মা, সুখের সংসার ইব নামে এক নদীর কূলে। গৌরী দাঁতে ঠোঁট কাটে।

চম্পা ধীর গলায় বলল, এই মার্চে কলকাতা থেকে একটা ফিল্ম পার্টি গিয়েছিল ওখানে শুটিং-এর জন্য, আমার যে কী হয়েছে, কলকাতার বাইরে বাইরে থেকে কলকাতার কাউকেই চিনি না, নায়ক নায়িকার নামই জানতাম না।

গৌরীর আবার মনে হয় শাড়িটা বদলে আসা উচিত ছিল। চম্পা কি তার উপর রাগ করল সুকান্তর ইঙ্গিত করতে। সে আচমকা উঠে দাঁড়ায়, একটু বস, কাপড়টা সত্যিই ময়লা, জলকাচা করেছিলাম তো!

না, না কোথায় যাবি, হ্যাঁ গৌরী তুই এত কাঠ কাঠ হয়ে যাচ্ছিস কেন?

গৌরী বিনবিন করে বলল, এমনি।

এমনি! আমি বুঝি না, তবে হ্যাঁ, বিয়ে করার এরকম সুখ, না করার আর একরকম, তুই তো সম্পূর্ণ স্বাধীন, তোকে কারও মন জুগিয়ে চলতে হবে না,অবশ্য আমিও চলি না, অচিন্ত্যই আমার কথায় চলে, যা বলব তাই করবে, সিগারেট ছাড়িয়েছি।

চম্পা তার শ্বশুরবাড়ির গল্প করে ; শ্বশুরবাড়ি মানে তার অধিকারে আসা সাম্রাজ্য, যা কখনও চোখেই দ্যাখেনি গৌরী, সেই বিলেত আমেরিকার মতো। শ্বশুর চম্পাকে কী বলে ডাকে, শাশুড়ি কী বলে, দেওর কেমন, ননদ কেমন। ননদের কোথায় বিয়ে হল, দেওর কী রকম প্রেম করছে এক দক্ষিণ ভারতীয় কন্যার সঙ্গে দিল্লীতে। গৌরী ভাবে এ বার বোধহয় বলবে সোদপুরের সেই ভাসুরের কথা, হ্যাঁ এই কথাটির পরই। সে ফুরসত হয় না চম্পার। আচমকা উঠে পড়ে কব্জি উল্টে ঘড়ি দ্যাখে, যাই রে, এত বেলা হয়ে গেল।

মায়া ছিল দরজার কাছেই, অবিনাশকে পাঠিয়েছে মিষ্টি আনতে, ঢুকে পড়ল ঘরে, সে কী, একটু বসো, মিষ্টি মুখ করে যাও।

না মাসিমা, মিষ্টি প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, আবার আসছি তো।

তুমি আসবে, না সারি যাবে?

না, না, আমিই আসব, দায় তো আমার। মুখ টিপে হাসতে থাকে চম্পা।

কবে আসবে বলে যাও।

দু'-চার দিনের ভেতরেই, আমাকে তো যেতে হবে আবার, ও তো একা রয়েছে।

ছবিটা কি দিয়ে আসবে সুবীর?

আমি যেদিন আসব, সেদিনই নেব, সুবীর আবার কেন যাবে, আমি এলে তো আমার আবার আসা হবে। বলতে বলতে চম্পা চাটিতে পা গলায়।

মায়া দ্যাখে চম্পাকে। সকালবেলায় এসেছে তবু কত পরিপাটি হয়ে। হাতের নখে রঙ, পায়ের নখে রং, ঠোঁটে হাল্কা রং, কপাল জোড়া টিপ, গায়ে ভুর ভুর করছে সুগন্ধ। মুখখানি কী চকচকে, চোখের পাতা ভ্রূ সব তাকিয়ে দেখতে হয়। নীল শালোয়ার কামিজটা মানিয়েছে কী সুন্দর! এমনই তো হতে হয়, না হলে সবার সামনে আলো হয়ে দাঁড়াবে কী করে? বর যে মাঝরাত্তিরে ডেকে তুলে জোছনা দেখায় তা তো এই রূপের জন্য। বিয়ের পরও এত রূপ। অথচ তার মেয়ে দুটো যেন যোগিনী হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, বিশেষত এই গৌরী। মুখখানিতে অন্ধকার জড়িয়ে আছে সর্বক্ষণ, চোখের কোলে কালি, চুলে তেল নেই, শাড়ি ময়লা, হাতের নখে রং নেই তো পায়ে! যে চিকন ভাবটি ছিল ক বছর আগেও, তা যেন ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেছে। কী ভাবে, কী যে করে গৌরী! কী ওর মনে আছে কে জানে! নিজের উপর নিজে নজর না দিলে অন্য লোকে ওর উপর নজর দেবে কেন? বিশ পঞ্চাশটা সম্বন্ধ কেটে গেছে যে কেন তা যেন প্রত্যয় হতে থাকে মায়ার। চম্পা বেরিয়ে যেতেই মেয়েকে ধমকে ওঠে, কীভাবে থাকিস!

গৌরী জবাব দেয় না। তাকে এখন বেরোতে হবে টিউশানিতে। মা গজগজ করছে রান্নাঘরে বসে। গৌরীর কানে আসতে থাকে তা। সে দ্রুত শাড়ি বদলায়। বাবা এল বোধহয় মিষ্টি নিয়ে। ক'টা টাকা গেল শুধু শুধু। গৌরী শাড়ি ব্লাউজ বদলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে গলায় পাউডারের পাফ বুলোয়। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায়। সারি বলল, দাঁড়া রে দিদি, আমিও বেরোব, তুই বরং চম্পাদির মিষ্টিগুলো খেয়ে নে।

গৌরী বলল, না, সুবীরের জন্য থাক, নে তাড়াতাড়ি নে, রুটি হয়নি?

মায়া নিশ্চুপ। গৌরী নিচু হয়ে রুটি তরকারি ডিশে নিতে নিতে বলে, চম্পাটা বড় বেশি কথা বলে।

মায়া তার গভীর কালো চোখ মেলে ধরে মেয়ের মুখে।

ওর শ্বশুরবাড়ির কথা শুনে আমরা করব কী? গৌরী বিনবিন করে।

মায়া গালে হাত দেয়। কী যেন ভাবে। ইদানীং ভাবতে ভাবতে ঘুমই আসে না সারি গৌরীর মায়ের। আর তো একবছর মাত্র, তারপরই তো অবিনাশ ঘরে এসে বসবে। বড় ছেলে খোঁজও নেয় না। কতদিন যে আবিরকে দ্যাখেনি তার মা।

তিন

দুই বোনে এখন পথে। মাথায় মাথায় গৌরী সারি একসঙ্গে টিউশানিতে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সারি বলে, চম্পাদি ঠিক আগের মতো আছে, তাই না।

হুঁ। অস্ফুট জবাব দেয় গৌরী, কিন্তু বড় ন্যাকা।

কেন?

শ্বশুরবাড়ি শ্বশুরবাড়ি করেই মরে গেল, আর যেন কারও এসব নেই।

সারি খিল খিল করে হাসে, সে তুইও করবি।

যা যা! গৌরী দাঁড়ায়। চটির তলার কাঁকর ঢুকেছে! পা তুলে কাঁকর বের করে। চটি ফটফট করে এগিয়ে এসে বলল, মাকে বলে দেব তোর কথা ভাবতে, আমি বিয়ে করব না।

সারি হি হি করে হাসে, তোকে তো চম্পাদি ওর শ্বশুরবাড়িতে ঢুকিয়ে নেবে, তুই না করবি, ও তোর বিয়ে দেবেই।

গৌরী বলল, থাম তো, এখন এত! অচিন্ত্য অচিন্ত্য করে দুলছে, মাঝখান থেকে সুকান্তদা মাথা খারাপ করে বেড়াল কিছুদিন।

সুকান্তদা তো বিয়ে করেছে?

করবে না কেন, ওর জন্য বসে থাকবে! গৌরী বলল।

চুপ কর দিদি, ও সব কথা তুলিস নে এখন।

কে তুলতে যাচ্ছে, তবু মুখ দিয়ে যদি বেরিয়ে যায়!

তুই হঠাৎ ওর ওপর রেগে গেলি কেন, তোর জন্যই তো এসেছিল। সারি বলে।

গৌরীর এতক্ষণে যেন খেয়াল হল, তাই তো! হ্যাঁ একটু রাগ হয়েছে বটে। এত কথা বললি, তোর সোদপুরের সেই ভাসুরের কথা বললি না। ইচ্ছে করেই। চম্পার স্বভাব যায়নি। খেলাতে ভালবাসে। কিন্তু গৌরী কি খেলতে চেয়েছে ওর কাছে? বিয়ে-টিয়েতে তার বিশ্বাসই আর নেই। কত লোক এল, দেখল, হাসিমুখে চলে গিয়ে আর কোনও খবর দিল না। তবে হ্যাঁ, চম্পার কথা তো আলাদা। সে যেচে এসেছে। অন্য লোকদের চিঠি দিয়ে ডেকে এনেছিল বাবা। এখন পাত্রপাত্রীর খবর দেখার অভ্যেসটা হঠাৎ চলে গেছে যেন অবিনাশ দত্তর। কেমন নিস্পৃহ হয়ে গেছে। সারির জন্য অবশ্য লিখছে। মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছে সারির যদি আগে হয়ে যায়, যাক।

গৌরী বলল, আমি রাগব কেন চম্পার উপর, মনে হল তাই তোকে বললাম, আর কাকে বলতে যাব সুকান্তদার কথা, তবে চম্পা খুব খারাপ কাজ করেছিল, ওভাবে জবাব দেয় লাভারকে।

ক্ষমতা ধরে তাই জবাব দিয়েছিল। বলল সারি, শুধু ছেলেরাই জবাব দেবে?

সারির কথাটা বেশ লাগল গৌরীর। তাই তো! চম্পা তো জবাব দিয়েছিল একটা পুরুষমানুষকে। ক্ষমতা ছিল তাই দিয়েছে। অত দাপুটে ছেলে সুকান্ত রায়, অত ভাল ক্রিকেটার ছিল, তাকে যেন ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছিল চম্পা। ভেঙেচুরে গুঁড়ো গুঁড়ো। সুকান্ত পা ধরতে গিয়েছিলও পর্যন্ত চম্পার। চম্পার এক কথা, আর না হয়েছে অনেক। সুকান্তর অপরাধ, তাকে নাকি কোন মেয়ের সঙ্গে শ্যামবাজারে দেখেছে চম্পা। সুকান্ত যত বলে সে ছিল বিদিশা, তার ক্লাসমেট, বিবাহিতা একসঙ্গে স্কটিশে পড়ত তারা, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না চম্পা। অবাক হয়ে গিয়েছিল গৌরীও। সে টের পেয়েছিল চম্পা একটা ছুতো খুঁজে বের করেছে। ইচ্ছে করেই সুকান্তদাকে অপমান করছে, কী রোষ তখন সুন্দরী চম্পার, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে যেন, যাও না, বিদিশা শ্রাবন্তীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, আমি অনেকদিন ধরে শুনেছি এ-সব, তুমি তো প্রতারক, কী নিষ্ঠুর, মেয়েরা কি অত সস্তা!

চম্পার তখন কী সব কথা! কোন বই থেকে পেয়েছিল কে জানে, মন ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। সুকান্তর মোহ তার কেটেছে। কেন কাটল তা ধরা গেল মাস দুই বাদেই। তার দাদার বন্ধু শিলংবাসী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, রেজিস্ট্রিও করেছে

সে। বড় মাইনের চাকুরে, চম্পা কোনও ভুল করেনি।

চম্পা খুব অন্যায় করেছিল, তাই তো জানত গৌরী এই কয়েক মিনিট আগেও। সারির কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে ঠিক করেছিল চম্পা। একটা পুরুষমানুষকে তো প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিল, ভিখিরি করে দিয়েছিল। গৌরী তো জানে হ্যাঁ কিংবা না বলার অধিকার শুধু পুরুষের। কতদিন ধরে চুল বেঁধে ঠোঁটে রঙ লাগিয়ে বসছে সে পুরুষমানুষের সামনে। খবরের কাগজ দেখে বাবা চিঠি ছেড়েছে একের পর এক। কই সে তো একবারও বলতে পারেনি ওই চোয়াড়ে চল্লিশের মানুষটিকে তার পছন্দ নয়, বসবে না তার সামনে। চম্পা পেরেছিল। একটা পুরুষমানুষকে নির্বাচিত করবে কি করবে না সেই কথা বলার ক্ষমতা রাখত চম্পা।

সারি বলল, চম্পাদি যখন বলেছে, এবার ঠিক হয়ে যাবে।

গৌরী নিশ্চুপ।

সারি বলল, কথায় বলে না, জন্ম মৃত্যু বিবাহ—।

থাম তো, তুই তোর কাজে যা, আমি আগে লোকটাকে দেখি। গৌরী বিড়বিড় করে বলে।

সারি অবাক। কী বলছে তার দিদি! দিদির কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? গৌরী একা একা গেল টিউশানি বাড়ি। দরজা খুলল কাজের লোক, বাড়িতে কেউ নেই, বলে গেছে সন্ধেবেলায় আসতে।

গৌরী বলল, কিন্তু কাল যে উইকলি টেস্ট, দিদি বলল সকালে আসতে।

অতশত জানি নে, সন্ধেয় এসো তুমি। দরজা বন্ধ করে দিল কাজের লোক।

মুখ কালো করে নিচে নেমে এল গৌরী। অপমান লাগল। রোদে এতটা হেঁটে এল, কোথায় বাগবাজারের গঙ্গা, আর কোথায় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, শ্যামবাজার ও পার। টিউশানি-বাড়ির লোক তো জানে, বাচ্চার মা ভাল জানে হেঁটে আসা ছাড়া উপায় নেই, আর হাঁটা কুড়ি মিনিটের কম নয়। এখন ফিরতে হবে আবার। রোদে ঢুকে পড়ল গৌরী। হাঁটতে লাগল শ্যামবাজার মোড়ের দিকে। কী করবে এখন? বাড়ি ফিরে যাবে? বাড়ি ফেরা মানে মায়ের বিনবিন শোনা। আজ সারাদিন এই চলবে। আশার বেলুন ভর্তি হয়ে গেছে তো। হতেই পারে। চম্পাকে তো তারা ডাকেনি, আচমকা চিঠি দিয়ে এসেছে। বন্ধুর কথা তার মনে আছে। হয়ত এবার কিছু একটা হয়ে যাবে। গৌরী দাঁড়ায়। মানুষটা কেমন হবে? বলল না তো চম্পা। এত নিজের কথা বলে যে অন্যের কথা বলবে কখন? ভাববেই বা কখন? তবুও যে ভেবে ভেবে এসেছে এই যথেষ্ট। গৌরীর মনে হল চম্পার বাড়ি যায়। এই তো কাছেই, ট্রাম ধরে চলে যাবে শোভাবাজার। বাসে গিয়েও হেঁটে একটুখানি। চম্পার কাছে গিয়ে শুনবে নাকি মানুষটার কথা! চম্পা হাসতে হাসতে বলবে। চম্পা তো তার প্রাণের সখী ছিল, একসঙ্গে তারা সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েছে। একসঙ্গে সিনেমা দেখেছে। চম্পার প্রেমের সময় সেই তো সুকান্তর চিঠি চম্পাকে, চম্পার চিঠি সুকান্তকে পৌঁছে দিত। চম্পাই তো অ্যাপ্রোচ করেছিল আগে। চম্পার কথা নিয়ে গৌরী গিয়েছিল বাগবাজার ইউনাইটেডের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন সুকান্ত রায়ের কাছে। হ্যাঁ, ক্ষমতা রাখে বটে মেয়েটা। অনেকদিন তো হয়ে গেল। বারো তেরো বছর। গৌরীর মুখে সব শুনে সুকান্ত রায় বিহ্বল, কাঁপছিল বোধহয়। এখনও সব স্পষ্ট মনে আছে গৌরীর। শোভাবাজারেরই

ছেলে, চম্পাকে চিনত সুকান্ত। চিনত নাই বা কে? গৌরীকে অবশ্য চিনত না, সে নিজেকে চম্পার বান্ধবী পরিচয় দিয়ে কথা আরম্ভ করেছিল সুকান্তর সঙ্গে।

চম্পাকে চিনবে না কেন সুকান্ত, ওই তল্লাটে বিরাম গুহকে কে না চেনে! কত রকম বিজনেস তার, কত দানধ্যান। ক্রিকেট, ফুটবল ক্লাব চলে তো তার টাকায়। বিরাম গুহকে যে চেনে, তার মেয়েকেও সে চেনে। চিনতেই হবে। চম্পা কি কম সুন্দরী যে তাকে না দেখে থাকবে সুকান্ত রায়, রাইটার্সের বড়বাবুর ছেলে, থাকে ভাড়াটে বাড়ির ঘুপচি অন্ধকারে। চম্পাকে ফেরাবে কার সাধ্য। সুকান্তর সেই শক্তিই ছিল না। চম্পা যে তাকে নির্বাচিত করেছে মনে মনে, তাতেই সে ধন্য। চম্পার কত রং! রঙের আবরণে লুকিয়ে থাকত যেন বিরাম গুহর মেয়ে। সুকান্তর মাথায় যেন নীল আকাশ থেকে নীল রং ঝরে পড়ল। এই পৃথিবীতে এমন হয়। হ্যাঁ গৌরী, ঠিক কথা তো?

হ্যাঁ কিংবা না বলুন। গৌরী মাথা উঁচু করে বলেছে।

কী দিনই না গেছে সেই সব। চম্পার চলে না গৌরীকে ছাড়া। গৌরীকে নিয়ে তো যায় প্রেমিকের কাছে। প্রেমে ভীরুতা ছিল সেই আরম্ভের দিনে, গৌরী থাকলে কত সুবিধেই না হয়। আর অন্য আশঙ্কাও ছিল, যদি কেউ দেখে ফেলে? সে না বিরাম গুহর মেয়ে! তাকে চেনেনা কে? গৌরী থাকলে তো যুক্তি খাড়া করা সহজ, তাই সিনেমায় যাবে চম্পা-সুকান্ত সঙ্গে গেল গৌরী! উত্তম-সুচিত্রার অগ্নিপরীক্ষা রূপবানী সিনেমায়, গৌরী বসল, চম্পা বসল, চম্পার পাশে সুকান্ত। ওরা কথা বলছে ফিসফিসিয়ে, গৌরী নিশ্চল পাথর। ভাবে, ওরা কি হাত ধরেছে? চুম্বন করছে সুকান্তকে চম্পা? ওরা চলল শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানে, সঙ্গে চলল গৌরী। ওরা গাছের নিচে বসে প্রেম করছে, গৌরী দূরে একা, একা অন্য দিকে তাকিয়ে। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে, শিবপুর, ভিক্টোরিয়া উদ্যান, বাবুঘাটের গঙ্গাতীর থেকে ফেরার পথে হাতিবাগানের রেস্তোঁরায় খাওয়া। চম্পা তো কিছুই খেত না, গৌরীর প্লেটে তুলে দিত তার প্লেটের আধভাঙা ফিশফ্রাই, কাটলেট, গৌরী তুই পারবি, কখন ভাত খেয়েছিস!

শেষে আইসক্রিম হাতে নিয়ে চম্পা হাসতে হাসতে বলে, গৌরী কি এটাও খাবি, দেড়খানা ফিশফ্রাই খেয়েছিস তুই।

গৌরী চুপ।

চম্পা হাসতে হাসতে বলত, না রে ঠাট্টা করলাম, হ্যাঁ তোর জন্যও একটা সুইট লাভার যোগাড় করতে হবে, কতদিন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবি, সুকান্ত তোমার কোনও বন্ধু নেই খালি, টুয়েলফথ ম্যানও নেই, যে শুধু ফিল্ডিং দেয়।

সুকান্ত হাসত, আছে কিন্তু গৌরীর কি পছন্দ হবে?

ওর আবার পছন্দ, আমি যা বলব তাই হবে। চম্পা চোখ পাকিয়ে বলত।

তাই হোক, তাই যেন হয়! বিরাম গুহর মেয়ে তো খারাপ সম্বন্ধ আনবে না। গৌরী ভাদ্রমাসের রোদ মাথায় হাঁটতে হাঁটতে শ্যামবাজার পাঁচ মাথায়। পার হবে রাস্তা। তখন চোয়াড়ে হিংস্র ভাদুরে রোদ ধীরে ধীরে ঢেকে গেল খুব নরম, পাল তোলা মেঘের আস্তরণে। জোঁকের মাথায় যেন নুন পড়ল, আগুনে জল, বিষধর গোক্ষুর শুনল সাপুড়ের বাঁশি। গৌরী আকাশে তাকায়। মনে মনে আবার বলে, তাই-ই হোক, তাই! কী আশ্চর্য। এই জায়গার পাঁচমুখী পাঁচটি পথ আচম্বিতে খালি হয়ে গেল যেন। ধর্মতলা, শিয়ালদা, বি টি রোড,

যশোর রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ— কোনও দিক থেকেই কোনও বাস আসছে না, কোনও দিকেই কোনও বাস যাচ্ছে না। খালি রাস্তা পারও হচ্ছে না কেউ। একা গৌরী নরম ছায়ায় ঢেকে পার হয়ে যায় মস্ত নদীর মতো দু কূল হারানো রাস্তা। এই রাস্তাই হয়ত চলে গেছে আর এক রাস্তার দিকে, যে রাস্তায় তাকে যেতে হবে আজ না হোক কাল। তাই হয় যেন, তাই।

চার

আজ আর এক রোববার। মাঝে আর একটা রোববার গেছে। পনেরো দিন হয়ে গেল, চম্পা কোনও খবর দেয়নি। চম্পা আর আসেইনি। থাকতে না পেরে মায়া আজ সারিকে পাঠিয়েছিল শোভাবাজারে। চম্পা তো ফিরে গেছে ওড়িশায়।

গৌরী এখন মশারির ভিতর, এক কাত হয়ে শুয়ে। সারি নামল বিছানা থেকে, জানলাটা বরং খুলে দিই দিদি, বড্ড ভ্যাপসা।

গৌরী চুপ। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি এর ভেতরেই।

সারি বলল, আমি বরং জানালার দিকে শুচ্ছি, আজ তো বাইরেটা পরিষ্কার। গৌরী ঘুমিয়েই পড়েছে। সারি মশারির বাইরেই বসে থাকে কিছু সময়। আঁচল দিয়ে হাওয়া খায়। এ-ঘরের পাখাটার জোর নেই একদম। সারি ডাকল, দিদি ও দিদি।

গৌরী সাড়া দেয়, ঘুমোবিনে?

সারি বিন বিন করে বলল, চম্পাদি তো আশ্চর্য, চলে গেল।

যাক, ওর হয়ত পাত্র পছন্দ হয়নি শেষমেশ।

হাসল সারি, পাত্র না পাত্রী, তুই ছেঁড়া ব্লাউজ ময়লা শাড়ি পরে গিয়েছিলি কেন সামনে, জানতিস তো, ও তোকেই দেখতে এসেছে।

ও কি আমাকে দ্যাখেনি?

বাহ্, ও তো পাত্রপক্ষের হয়ে এসেছিল।

বললেই পারত, ওর কাছে সেজেগুজে বসতাম তাহলে। বলতে বলতে গৌরী পাশবালিশ আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে। বালিশে মুখ গুঁজল। সে সারির কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। চম্পা না বলেছিল, তার জন্য একটা 'সুইট লাভার' খুঁজে বের করবে। তা তো ভোলেনি ও। ভুললে কি এতদিন বাদে আসত এ-বাড়িতে? চম্পা না বলেছিল, গৌরীর আবার মত কী, সে যা পছন্দ করে দেবে, গৌরীরও তা পছন্দ হবে। হবেই তো। সারির কথা সে বিশ্বাসই করে না। চম্পা ঠিক আসবে। ইব নদীর ভেতর থেকে খুঁজে আনবে কাউকে। অত বড় প্ল্যান্ট, ওখানে কত পুরুষমানুষ পুরুষমানুষ জুটলেই তো হল না, মনের মতো হওয়া চাই। হৃদয়বান হওয়া চাই। তার চওড়া বুক চাই। এ-সব কথা চম্পা বলত সুকান্তর সঙ্গে প্রেম করার সময়। মনে পড়ছে গৌরীর। পুরুষমানুষ হবে সেই মেঘের মতো, যে ভাদ্র মাসের রোদ আড়াল করে গৌরীকে ছায়া দেয়। আসবেই চম্পা তেমন কাউকে খুঁজে বের করে। সে ভরসা আছে।

সারি বলল, দিদি তুই এবার থেকে তাঁত পর।

কেন? গৌরী অস্ফুটে সাড়া দেয়।

রোগা মেয়েরা তাঁত পরলে ভাল লাগে, মাড় দেওয়া শাড়ি কেমন ফুলে থাকে, তোকে

দেখাবে সুন্দর।

হয়েছে, তুই চুপ কর তো, আমারটা আমি বুঝব।

কিছুই বুঝিস না তুই, মাও হয়েছে তেমন, জোর করে পাঠাল আমাকে, প্রেস্টিজ নেই?

গৌরী আর সাড়া দিল না।

সারি বিড়বিড় করছে, কী দরকার ছিল ওর আসার, মা ভেঙে পড়েছে, বাবাও।

গৌরী বোধহয় সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোল কি? না, ওর মনে পড়ছে চম্পার কথাগুলো। কতদিন আগের কথা। মনে রেখে রেখে এসেছে যখন, আসবেই আবার। তার মন বলছে। এত যে আত্মীয়স্বজনকে বলা, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লেখা— হয়েছে কিছু? বাবা তো ছেড়েই দিয়েছে ওসব। এখন একে ওকে বলে। গৌরী বালিশের তুলোয় নিবিড় হয়!

সারি ধরা গলায় বলল, চম্পাদি দেখতে এল তোকে, আশ্চর্য! সব ভুলে গেছে ও।

গৌরী নীরব।

সারি বলল, বাবা এবার কাগজ বন্ধ করে দেবে।

দিক। গৌরী ফিসফিস করল।

বলছে সব ভুয়ো বিজ্ঞাপন থাকে, ফলস পাত্র চাই, পাত্রী চাই।

গৌরী চুপচাপ।

বলছে এত ছেলের যদি বিয়ে হওয়ার কথা হয়, 'পাত্রী চাই' বেরোয় তো আমাদের হয় না কেন, সত্যিই তো, আমারও মনে হয় ফালতু বিজ্ঞাপন বেশি। সারি বিনবিন করে বলতে থাকে। গৌরীর সাড়া পায় না আর।

সারি চাপা গলায় ডাকে, দিদি, ও দিদি ঘুমোলি?

সাড়া পায় না। চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। সারি মশারির গায়ে মুখ রেখে ভেতরটা দেখে। ওপাশ ফিরে নিশ্চল শুয়ে আছে গৌরী। সারি যেন নিশ্চিন্ত হল। সরে এল। তার ভ্যানিটি ব্যাগটা নিল টেবিল থেকে। বড় ব্যাগের ভিতর থেকে খাম কাগজ বের করে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় আবার মশারির দিকে। গৌরী ঘুমিয়েছে। ভাঁজ করা খবরের কাগজের অংশ বের করল সারি ব্যাগ থেকে। তারপর মেঝেয় বসল। সরে এল বিছানার গায়ে। হাত বাড়িয়ে মশারি তুলে বালিশ বের করে নিল। বালিশ মেঝেয় ফেলে, তার ভিতরে খাম কাগজ সব চাপা দিয়ে টেবিল থেকে ডট পেন নিয়ে আবার ফিরে এল জায়গায়। উপুড় হল মেঝেয়। ঘাড় তুলল আবার কৌতূহলী নাগিনীর মতো। দিদি ঘুমিয়েছে তো? দিদি এই দিদি। সাড়া পায় না।

বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে। খালি মেঝেয় কাগজ রেখে কি লেখা যায়! ওফ! সারি আবার ওঠে, পাতলা একটা সিনেমা-ম্যাগাজিন টেবিল থেকে নামিয়ে আনার সময় কাগজটা উড়ে খাটের নিচে। উপুড় হয়ে কাগজটা টেনে বের করতে গিয়ে হাতে ধুলো লাগল। শব্দ হচ্ছে। দিদির যদি ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ভাঙে না গৌরীর। সারি খবরের কাগজ মেলে ধরে। দাগানো রয়েছে বিজ্ঞাপনগুলো। গোটা দশেক দাগিয়েছে সে। বক্স নম্বরে আছে, আবার ঠিকানাও আছে বহরমপুর, খড়্গপুরের। কলকাতারও। সারি লিখবে। দিদি কোনোদিন লেখেনি, তাই তিরিশ বত্রিশ তেত্রিশও পার

হয়ে গেল ওর। বাবা আর লিখবে না। আর বাবা কী লেখে কে জানে। কী লিখত কে জানে! কাঠখোট্টা মানুষ। ব্লাডপ্রেশার আছে, সুগার আছে। কর্কশ ভাষা লেখে হয়ত। তাই জবাব আসে না। চিঠির ভাষায় তো অনেকটা হয়ে যায়। এই তো বিজ্ঞাপনে লিখেছে পাত্রী নিজেও যোগাযোগ করতে পারেন। সারি নিচু হলো নীল কাগজ মেলে ধরে। কলম থেমে আছে।

কীভাবে লিখবে? কী সম্বোধনে? পাত্রকে তো লিখছে নিজেই, কী লিখবে? কেমনভাবে লিখবে? খুব ঘনিষ্ঠ আপনজনের মতো—প্রিয়তমেষু। সারি কেঁপে উঠল। পাত্র পঁয়ত্রিশ, বে, স, চা, চারহাজার, পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ, প্রকৃত শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই, বক্স নং...।

পাত্র তিরিশোর্ধ্ব, স, চা, বৈদ্য, অসবর্ণ চলিতে পারে, সুন্দরী শিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না বক্স নং...।

বে, স, চা মানে বেসরকারি চাকুরে। স, চা, হল সরকারি চাকুরে। কোনওটাই অপছন্দের নয়। বৈদ্য কায়স্থ, ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ খ্রিস্টান হলেও বা আপত্তি কিসের? কিন্তু লিখবে কীভাবে? প্রিয়তমেষু কি লেখা যায়? বরং শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীচরণেষু। না, না তা কী করে হয়? লিখতে হবে এমনভাবে যেন কাছেরও হয়, দূরেরও হয়। খুব কাছের নয়, আবার খুব দূরের নয়, কোন সম্বোধন তা? দিদি, এই দিদি।

সাড়া এল না তাই সারি আবার নিজের ভিতরে মগ্ন হল। আচ্ছা, 'মাননীয়েষু' লিখলে হয় তো! নাকি 'সুজনেষু'? এই যে বিজ্ঞাপনটা, পাত্র স্কুল শিক্ষক, বিপত্নীক, সন্তান একটি, পূর্ববঙ্গীয় তন্তুবায়, অসবর্ণে আপত্তি নাই, প্রকৃতসুন্দরী স্বাস্থ্যবতী...। সারি লিখতে আরম্ভ করল।

মাননীয়েষু,

....তাং-এর বিজ্ঞাপনের সূত্রে আমি শুচিস্মিতা (সারি) দত্ত ছবিসহ আপনার নিকট আমার সম্পূর্ণ পরিচিতি পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া যোগাযোগ করিলে চিরবাধিত থাকিব। আমার পিতার সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন, অন্যথায় সরাসরি আমার সহিত। কোনও বাধা নাই। প্রয়োজনে অন্যত্রও দেখা হইতে পারে। বিবাহে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। যেমন বলিবেন সেইমতো ব্যবস্থা হইবে। নিম্নে পরিচিতি বর্ণিত হইল।

ক. নাম ঃ শুচিস্মিতা দত্ত (সারি)

খ. বর্ণ ঃ কায়স্থ, অধুনা কলিকাতা নিবাসী, বহু পূর্বে নদীয়া জেলার রাণাঘাটে পিতৃপুরুষের আবাস ছিল শোনা যায়।

গ. পিতার নাম ঃ শ্রীযুক্ত অবিনাশ দত্ত।

ঘ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি.এ. পাশ কোর্স, ইংরিজি, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন।

ঙ. উচ্চতা ঃ পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি।

চ. গাত্র বর্ণ ঃ উজ্জ্বল শ্যাম, গৌরবর্ণাও বলা যায়।

ছ. চোখের মণি ঃ কালো।

জ. অন্যান্য বিবরণ ঃ স্বাস্থ্যবতী, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত জানা আছে, এলাহাবাদ সঙ্গীত একাডেমির ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। হিন্দি বলিতে পারি। দশহাজার অবধি নগদ দিতে রাজি।

ঝ. বিশেষ নিবেদন ঃ পিতার চাকুরি আর এক বৎসর মাত্র। অনুগ্রহ করিয়া বিবেচনা

করিবেন। একাকী সাক্ষাতে আপত্তি নাই।

একটি নয়। দুটি নয়। দশ দশটি লিখতে হবে সারিকে; লিখতে লিখতে হাত ব্যথা হয়ে যেতে থাকে। রাত হয় অনেক অনেক। চোখ ঢুলতে থাকে। কলম থেমে যেতে চায়। কলম সরে যায় হাত থেকে। চোখ বুঁজে যায় ধীরে ধীরে।

মশারির ভিতরে শুয়ে গৌরী হাসে। ধীরে ধীরে খাটের কিনারায় চলে আসে। মশারি তুলে মেঝের উপর ঘুমন্ত সারিকে দ্যাখে, বিড়বিড় করে, ওরকম কত লিখেছি আমি! ও সারি, সারি। তুই যে চিঠি লিখবি তা আমি জানি, কত লেখা হল আমার।

সারি ওঠে না। গৌরী তখন মশারি থেকে বেরিয়ে আলো নেভায়। অন্ধকারে চিঠির কাগজ মাড়িয়ে বিছানায় উঠে আসে। অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকে। খোলা জানালার দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে, প্রিয়তমেষু ডেকেও চিঠি লিখলাম। মাননীয়েষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, সুজনেষু, শ্রীচরণেষু বিজ্ঞাপনদাতা, আমি আপনার আশ্রিতা হইতে চাই...। গৌরীর চোখ বুজে আসে। কতদিন উড়ে গেছে চিঠির খাম!

মাননীয়েষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, প্রিয়তমেষু আসেন। গঙ্গায় ঢেউ ওঠে। গঙ্গার কূলে সপ্তডিঙা রেখে তিনি স্থলভূমিতে পা রাখেন। এসেছেন ইব নদী ধরে হয়ত, চূর্ণী জলঙ্গী, পদ্মার স্রোত ধরে, অজয় দামোদর সরস্বতী যমুনার স্রোতে স্রোতে, রূপনারায়ণে পালতুলে। লবঙ্গ দারুচিনির গন্ধ বয়ে। মসলিন ভরা নাও নিয়ে তিনি আসেন সিংহল সমুদ্র থেকে ধান, পাট, সুজলা সুফলা মাটির লোভে লোভে, তিনি আসেন টেমস নদীর কূল থেকে, অতলান্ত, প্রশান্ত মহাসাগরের নোনা বাতাস মেখে মেখে। আসেন কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আসেন লোভে লোভে। জল আছে, মাটি আছে, আম ধান্য নারিকেল আছে, আছে সুলক্ষণা গৌরী কন্যারা সব। আম নারিকেল ধান্য সুতিবস্ত্রের সঙ্গে সারি গৌরী কন্যারাও চলে যাবে তাঁর নাও-এ নাও-এ নদী, মাটি, অন্ন আর পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করতে করতে। মাননীয়েষু স্থলভূমিতে পা দিয়ে হাঁটাপথে আসেন ময়লা গলির কাছে। আকাশে ভাদ্রমাসের চাঁদ আর মেঘ পরস্পরকে মুখ দেখাচ্ছে অবিরত। কখনও আলো কখনও অন্ধকার। তিনি ঢুকে পড়েছেন গলির ভিতরে। দাঁড়িয়ে পড়েছেন রেন ওয়াটার পাইপের সামনে। আস্তে আস্তে পাইপ বেয়ে উঠছেন উপরে। জানালার মুখে। তাঁর গায়ের গন্ধ টের পায় গৌরী ঘুমের ঘোরে।

ঘুমের ঘোরে চোখ মেলেছে গৌরী। ওই দেখা যায় গঙ্গাতীর, হুগলী নদী, সপ্তডিঙা, রঙিন পাল। ওই আসছে নাও থেকে ডাক, ওঠো, অবিনাশ দত্তের মেয়ে, গৌরী ওঠো—

হাসছে গৌরী স্বপ্নের ঘোরে। তার কপালে নোনা জলের হাত, মশল্লার গন্ধ। ঘরময় চিঠির পাতা, খবরের কাগজ বিজ্ঞাপন সমেত উড়তে থাকে। সেই সব শব্দের সঙ্গে দাঁড় টানার শব্দ হাল ফেলার শব্দ, ছলছল শব্দ একাকার। সারি কেঁদে ওঠে ঘুমের ঘোরে।

(দেশ—১৯৯৫)

বালিকামঞ্জরী

হে, হোয়াট'স্ ইয়োর নেম?

বুলি নিঃঝুম, নিশ্চুপ, রোদে ধাঁধা-লাগা আকাশের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায় পিঙ্কির মুখখানি তার চোখে। মনে করলে এখনো। মাথা নামিয়ে চোরা-চোখে সে দেখছিল নীল স্কার্ট সাদা শার্ট, কলারের নিচে নীল ব্যাচ, মাথায় নীল হেয়ার ব্যান্ড, বইভরা ব্যাগ মেঝেতে অবহেলায় নামিয়ে সোফায় বসে একটু ঝুঁকে বড় মোজা খুলছে আর ঘুরে ঘুরে কৌতূহল কৌতুক-ভরা মুখে তাকে দেখছে। সে বুঝেছিল ইংরেজি বলছে মেয়েটা, বাংলা জানে না নাকি?

নাম বল, নাম জিজ্ঞেস করছে। পিঙ্কির মা ঝর্ণা আন্টি তাকে ধাক্কা দিয়েছিল, ও হলো পিঙ্কিদি, হ্যাঁ দিদিই বলবি, বড় ইস্কুলে পড়ে তো, ইংলিশ মিডিয়াম, ইংরিজিতে কথা বলে।

বুলির ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল আস্তে আস্তে, হয়ত ভোরের আলো ফোটে যেমন, সেই রকম। কোনোরকমে নামটা বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল। হাসছিল ফুলে ফুলে। তার হাসিতে ধর্মতলার সবচেয়ে নামী ইস্কুলে পড়া বালিকা কেমন হতচকিত, মাম্মা—শি ইজ লাফিং! তারপর গড়গড় করে মায়ের সঙ্গে কথা, যেন জলের শব্দ। সব ইংলিশ, মা জবাব দিচ্ছে—ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে। সব বুলি সম্পর্কে। বুলি কে, কখন এল, থাকবে নাকি? বুলিকে তার বাবা পৌঁছে দিয়েছিল যখন এই ফ্ল্যাটে, পিঙ্কি স্কুলে। মুখ থেকে হাত নামিয়ে সে যেন আচমকা বন থেকে বেরুনো টিয়ের মতো অবাক দৃষ্টিতে লোকালয় দেখছিল। কথাগুলো আন্দাজ করছিল পিঙ্কির মায়ের জবাব শুনে। পিঙ্কির কথা তার খারাপ লাগছিল না, বুঝতে পারছিল না তবু মুগ্ধ হচ্ছিল। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে মেয়েটা। বৃষ্টির শব্দের মতো। বুলির মনে হচ্ছিল সেও কথা বলে, কী কথা—ব্যাঙের মাথা—কী ব্যাঙ—সোনা ব্যাঙ—কী সোনা...। বুলির মনে হচ্ছিল সেও বলে, হলুদ বনে কলুদ ফুল—তারার নাম টগর ফুল। সে বলে, ওপারে জন্তি গাছটি জন্তি বড়ো ফলে গো— জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণটি কেমন করে।

ভাবলে এখনো হাসি পায়। কী করে ইংরেজি বলে? কী করে শেখে? পিঙ্কির মন ভাল থাকলে বলে, তুই বা কী করে বলিস, কী ব্যাঙ—সোনা ব্যাঙ?

হি হি হি, ওতো এমনিই জানা যায়।

সেই ন'বছরের বুলি এখন চোদ্দ। এসেছিল সে পিঙ্কির ভাইকে কোলে নিতে। পিঙ্কির ভাই তখন ছ'মাসের। ছ'মাসের বুম্বাকে কোল দিতে বুলি স্বরূপনগর থেকে কাঁকুড়গাছি রেললাইনের ধারে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে উঠেছিল। এই কলকাতার মানুষের তো কোল নেই। বুলির কোল আছে। সাত বছর থেকেই বুলি তার ভাইকে কোল দিত স্বরূপনগরে। একটা ভাই কোল ছাড়তে না ছাড়তেই আর একটা। কখনো-সখনো দুটোকেও টানতে হতো তাকে।

এই ফ্ল্যাটবাড়ির বুম্বার কোনো কোল ছিল না। ঝর্ণা আন্টির সময়ই নেই কোলে ধরার। পিঙ্কির তো নেইই। পড়তে পড়তে, ইংলিশ বলতে বলতে কত সময় যায় তার। বুলি এসে বুম্বাকে কোলে নিল। এখন বুম্বার পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে, কোলে সে ওঠে না। তবু বুলি এবাড়িতে থেকে গেছে। বুম্বা এখন স্কুলে যায়। বুলি তাকে প্যান্ট পরায়, জামা পরায়, টাই বেঁধে দেয়, জুতোর ফিতে বেঁধে দেয়, আর খিল খিল করে হাসে, জনি জনি—ওইটা বলো তো বুম্বা সোনা।

অ্যাই তুই কী বুঝবি রে! পিঙ্কি তাকে ধমকায়।

বুলি বলে, ব্যাঙের মাথা—কলুদ ফুল—জন্তিগাছ কী বলো তো পিঙ্কিদি?

প্যান্ট পরানো জামা পরানো একটা বড় কাজ বুলির। তার চেয়ে বড় কাজ হলো মাঝে মধ্যে বুম্বাকে চেপে ধরা। বুম্বার মা ভাত কিংবা এটা-ওটা নিয়ে তার পিছনে ছুটতে পারে না। ইদানিং বেশ মোটা হয়ে গেছে। হাঁপায়। জল খায় বারে বারে। তখন বুম্বাকে কোলেও তুলে নেয় বুলি। কোল দিতে এসেছিল সে, কোল দিতে তার ভালো লাগে। পাঁচ বছরের বুম্বাকে কোলে তুলতে কষ্ট হয় বটে, বেঁকে যায় বুলি। বেঁকে যেতেও খুব ভালো লাগে।

কী করে পারিস বাবা! পিঙ্কি বলে তাকে।

বুলি হাসে, তুমি নাও না পিঙ্কিদি।

ধুস! বুড়ো ছেলেকে কোলে নেব?

যখন ছোট ছিল তখন কি নিতে?

কোলে ওঠা ব্যাড হ্যাবিট, আমার অত সময় নেই বাবা। পিঙ্কি তার বই গুছোতে থাকে। পিঙ্কির সত্যিই সময় নেই। সাড়ে আটটায় স্কুলে বেরোয়, চারটের সময় আসে। এর পর ঘণ্টা দেড়েক এঘর-ওঘর, স্কুলের কথা মায়ের সঙ্গে। ইংলিশ ইংলিশ! বুলি কিছুই ধরতে পারে না, ঝর্ণা আন্টির কথা থেকে তো পিঙ্কির কথা সব বোঝা সম্ভব নয়। ব্যাঙের মাথা—ইলাটিং বিলাটিং—না, না বোবায় কথা বলছে, হাবায় কথা বলছে। বুম্বার মুখে কথা ফোটার আগে এক দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন গড়গড় করে বলে যেত। আওয়াজ করত মুখে। পিঙ্কির কথা শুনলে তাও মনে হয় যেন বুলির। অথচ সে তো জানতে চায় পিঙ্কির ইস্কুল নিয়ে।

কত বড় বাড়ি পিঙ্কিদি?

পিঙ্কি বলে, পরে শুনিস, এখন সময় নেই, মামা হোয়্যার ইজ মাই গে রিডার, জিওগ্রাফি?

ঝর্ণা আন্টি ঢোক গিলতে গিলতে বলে, সার্চ ইয়োর টেবল, সার্চ।

বুলি বোঝে বোবার ভাষাটা ঝর্ণা আন্টি ভালো করে রপ্ত করতে পারেনি। একটু থেমে ভেবেচিন্তে বলে। বানিয়ে বলে।

কত বই পিঙ্কির! কত খাতা! টেবিল ভরে গেছে প্রায়। তাই প্রায়ই এ-বইটা ও-খাতাটা হারায়। প্রতিদিন রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা, আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে তার পরের দিনের ক্লাসের বই গুছোতে। টেবিল এলোমেলো হয়ে যায় তখন। বুলি বলে, আমি টেবিলটা গুছিয়ে দেব পিঙ্কিদি?

প্লীইজ, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, মাম্মা মাম্মা।

বুলির প্রথম প্রথম হাসি পেত মাম্মা ডাক শুনে। পিঙ্কি যদি এক-একদিন মা বলে ডেকে উঠত, ঝর্ণা আন্টি রেগে যেত, নো নো, টেল মাম্মা।

মানে মাম্মা বলতে বলত পিঙ্কির মা। বুঝতে অসুবিধা হতো না বুলির। বুলি এইসব শুনতে শুনতে এখন কিছুটা ধরতে পারে পিঙ্কির ভাষা। বই হারালে সার্চ, সার্চ পিঙ্কিদি, আমি সার্চ দেব?

পিঙ্কির কী হাসি, খুঁজে দেব মানে সার্চ দেবু'—মাম্মা মাম্মা,সি ইজ স্পিকিং ইংলিশ।

ঝর্ণামাসি বলে, অত কী সহজ রে বুলি, দুশো পঁচিশ টাকা মাইনে, টিচার তিনশো টাকা, এত সহজে হয়!

পিঙ্কিদির ইংলিশ ছাড়া আরো কাজ আছে। নাচ শেখে রবিবার। মানে সান্‌ডেতে। আঁকা শেখে শনিবার মানে স্যাটারডেতে, সুইমিং মানে সাঁতারে ভর্তি হয়েছিল ; ছেড়ে দিয়েছে। সময়ে কুলোচ্ছে না।

পিঙ্কির বাবা, বুলির আঙ্কেল—অধীর বোস, কাকাবাবু, সকাল সাড়ে ন'টায় বাড়ি থেকে বেরোয়, ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। অফিসের পর আর কী যেন করে, ব্যবসা। বাড়ি ফিরে কাকাবাবু, আঙ্কেল ডাকে, বুম্বা, পিঙ্কি পিঙ্কি—ঝর্ণামাসি বলে, সি ইস ডুইং হিজ—না, না হার ক্লাস ওয়ার্ক, হ্যাঁগো কী একটা সিনেমা এসেছে নিউ এম্পায়ার না কোথায়, ওদের ক্লাসের সবাই দেখেছে।

কী ছবি রে পিঙ্কি? হাঁক দেয় অধীর কাকা।

পিঙ্কি কলম হাতে উঠে আসে, এভিল ডেড, লায়লি, মৌমিতা, সুদকসিনা, অল্‌কা, সবাই দেখেছে, হরর পিক্‌চার।

অধীর বলে, ও তো অ্যাডাল্ট ফিল্ম।

ওরা তো বাড়ি থেকেই দেখেছে। বলল পিঙ্কি।

স্পিক ইংলিশ পিঙ্কি। ঝর্ণামাসি বলে ওঠে, স্কুল থেকে কী বলছে?

পিঙ্কির বাবা অধীর কাকা বলে, 'স্পিক ইন্ ইংলিশ', বলো।

তুমি রাখতো, এক্সপ্রেস করতে পারলেই হলো, শোনো আমি স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে ভর্তি হবো, কাঁকুড়গাছিতে একটা সেন্টার আছে, একটু অসুবিধা তো হবেই, আমি তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িনি। বুলি বুলি, গ্যাস জ্বালিয়ে দু'কাপ চা বানা তো।

বুলি যায় গ্যাস জ্বালাতে। এখন তাকে কোল দিতে হয় না। এবাড়িতে তার কোল দেওয়ার দরকার হবে না। এখন সে রান্না করে, বাসন ধোয়, জামাকাপড় কাচে। সবাই বেড়াতে গেলে একা একা বাড়ি পাহারা দেয়।

কাকাবাবু—আঙ্কেল, বাড়ি ফিরলেই বুলির প্রথম কাজ গ্যাসে জল চাপানো। একদিন বিকেল থেকেই বাড়ি থমথমে। পিঙ্কি চুপচাপ। ঝর্ণামাসিও। হ্যাঁ, এর ভিতরে পিঙ্কির প্রাইভেট টিউটর নন্দিনীদি পড়ানো ছেড়ে দিয়েছে। চাকরি পেয়ে গেছে। তার বদলে যে এসেছে তাকে ঠিক পছন্দ হয়নি পিঙ্কির। সব সাবজেক্ট পড়ায় না। জিজ্ঞেস করলে বলে, মা বাবার কাছে বুঝে নিয়ো।

পিঙ্কি স্কুল থেকে ফিরে বলেছে, হিসট্রির কিছুই হচ্ছে না মাম্মা! ইংলিশের চারটে পিস এখনো হয়নি, ক্যাপ্টেন কুকটা দেখে দেবে?

কী দেখব?

কোশ্চেন, অ্যানসার, ভিতর থেকে কিছু আনসিন কোশ্চেন বের করতেও হবে।

ক্লাসে লেখায়নি?

নো মাম্মা, প্রোজটা খুব টাফ।

ঝর্ণামাসি নিয়ে বসেছিল ক্যাপ্টেন কুক। হয়নি, কিছুই হয়নি। পিঙ্কির বাবা রাতে ফিরলে

তার মা বলল, আর একটা টিচার লাগবে।

কেন, সায়েন্স সাবজেক্টে তো রয়েছে।

ও তো ম্যাথস আর সায়েন্স গ্রুপ পড়ায়, তা বাদে জিয়োগ্রাফিটা দ্যাখে, ইংলিশ হিস্ট্রি পড়ায় না, নন্দিনী সব পড়াতো।

ও তো মুখস্থ করলে হয়ে যায়।

কী মুখস্থ করবে?

কোশ্চেন অ্যানসার।

অ্যানসারগুলো লিখে দাও তাহলে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল অধীর, তুমি লিখে দাও।

স্কুলে কিছু করায় না।

সে তো জানি, বাট হোয়াট আর য়্যু ডুইং?

ঝর্ণামাসি রেগে গেল। বুলি চা ছাঁকতে ছাঁকতে শুনল ঝর্ণামাসি বলছে, হোয়াট ডু য়্যু মিন, আমি রান্না করি, বাসন মাজি, জামাকাপড় কাচি, ছেড়ে দাও বুলিকে, সব আমিই করব।

অধীর তখন নরম, আহা রাগছ কেন, বলছি, এতদিন তুমিই তো করাতে।

কোথায় করাতাম, সিক্স থেকে নন্দিনী করাত।

ফাইভে তো তুমি করিয়েছিলে।

ফাইভ আর সেভেন এক নয়, ওদের স্ট্যানডার্ড খুব হাই, আমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের নই, তুমি ফিরে একটু দ্যাখো, আমি বেঙ্গলি দেখাচ্ছি।

ওটা সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ, আমার অফিসের মন্ডলবাবু বলছিলেন, সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ হিন্দি নিলে স্কোপ অনেক বেশি, পিঙ্কিকে খোঁজ নিতে বলো তো, চেঞ্জ করা যায় কিনা।

ঝর্ণা বলল, এখন পারবে?

খুব পারবে, আজকাল টিভি দেখেই বাচ্চারা হিন্দি শিখে যাচ্ছে।

সে হবেখন, তুমি এবার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে, টাইম দেবে মেয়েকে।

অধীর একটু বিরক্ত হলো, কাজ ফেলে বাড়ি চলে আসব কী করে?

তাহলে আর একটা টিচার দ্যাখো।

নন্দিনী তিনশো নিত, দেবযানী নেয় থ্রি, ফিফটি, এখন ইংনিশ হিস্ট্রির জন্য টিচার রাখতে হলে আরো থ্রি ফিফটি, কী করে পারব?

পারতেই হবে।

অধীর রেগে গেল, বললেই হলো, টাকা আসবে কোথা থেকে?

বাহ্‌রে, ও যে পারছে না।

তুমি একটু চেষ্টা করো, অ্যানসারগুলো তো মুখস্থ করতে হবে।

অ্যানসার তো চাই, তুমি ওর ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট দেখেছো?

প্রোগ্রেস রিপোর্ট হাতে নিয়ে অধীর নির্বাক। চা খাওয়া হলো না। ঠাণ্ডা চায়ের কাপ বুলি সরিয়ে নিয়ে গেল। ইংলিশ হিস্ট্রি তো নয়, ম্যাথ্‌স বাদ দিয়ে সব সাবজেক্টেই পুয়োর মার্কস।

এ কী রেজাল্ট! পিঙ্কি পিঙ্কি!

ঝর্ণা বলল, থাক, ও বারণ করেছিল দেখাতে।

কিন্তু এই রেজাল্ট! মাস্টারের উপর তো ভরসা করা যাবে না।

আমি তো বলছি তুমি তাড়াতাড়ি ফেরো।

তা কী সম্ভব?

কথা কাটাকাটি হতে লাগল। বুলি এসে বসল পিঙ্কির পাশে। বই সব ছড়ানো ছিটানো। বুলির ভয় করতে লাগল। ও ঘরে কেউ ইংলিশ বলছে না। ভয় তো সে কারণেই। ইংলিশ বলতে বলতে পিঙ্কির মায়ের মুখ কেমন আলো হয়ে ওঠে না! বুলি টের পায় ইংলিশ হলো আনন্দের অভিব্যক্তি, বাংলা হলো দুঃখ, কষ্ট, ঝগড়া।

বুলি ডাকল, পিঙ্কিদি, কী হয়েছে?

পিঙ্কি রেগে ওঠে, কিচ্ছু হয়নি, তুই কী বুঝিস রে?

বুলি বলল, সামথিং।

পিঙ্কি অবাক হয়ে তার মুখে তাকিয়ে আছে, তুই শিখে যাচ্ছিস?

বুলি বলল, সামথিং।

পিঙ্কি আবার গুম হয়ে গেল, বিড়বিড় করল, মিস মাইকেল আমাকে পাশ করায়নি, মাম্মা, মাম্মা!

বুলি বলল, ভূতের গল্প শুনবি, ডাইনি ভূতের গল্প, গৎখালির গল্প?

চকচক করে ওঠে পিঙ্কির চোখ, সে তাকিয়ে আছে বুলির দিকে।

বুলি বলল, গৎখালি বলে একটা গ্রাম আছে, ওই আমাদের সংগ্রামপুর ভাণ্ডারহাটি পেরুয়ে, সেখানে একটা ডাইনি, না ডাইনি না, আসলে সে ভূতই, ভূত আর ডাইনি তো একই, করল কী, এক চাষার সুন্দরী বউকে দেখে তার খুব হিংসে হলো।

পিঙ্কি নিশ্চুপ তাকিয়ে আছে বুলির দিকে, চোখের পাতা পড়ে না।

হিংসে হলো কেন, না বউটার খুব সুখ, খায় দায় আহ্লাদ করে ঘুমোয়, আলতা পরে, সিঁদুর পরে, গয়না পরে, পান চিবোয়, গান করে, কী গান! না ওপারেতে কালো রং/ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম...... এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে / গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

পিঙ্কির চোখে জল এল যেন, মুখ নীচু করেছে সে।

বুলি বলে, তো গান শুনে, বউ-এর সুখ দেখে আহ্লাদ দেখে, বউ-এর লাল টুকটুকে শাড়ি, গয়না দেখে খুব হিংসে হয় ডাইনি ভূতের, সে করল কী, শ্যাওড়া গাছ থেকে নেমে এল, সে বউকে খপ করে ধরে নিয়ে টেনে তুলল গাছের মাথায়, সেখানে বসিয়ে দিয়ে লাল টুকটুকে শাড়িটি পরে গয়না, হার বালা সব পরে কপালে সিঁদুর পায়ে আলতা দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে ঢুকল গিয়ে চাষার ঘরে, অ্যাত্তোখানি ঘোমটা, তার উপরে সে ভোল পাল্টে বউ-এর মতো হয়ে গেছে কেউ ধরতেই পারে না, আসল বউ তখন গাছের মাথায় বসে কাঁদে, কাঁদে আর গান গায় গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে, তাই শুনে ভূত-বউও গান গায়, নাকি সুরে গান গায়, ওপারে জন্তি গাছটি, জন্তি বড়ো ফলে গো / জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।

তারপর? পিঙ্কি জিজ্ঞেস না করে পারে না।

ভূত-বউ গায় ; প্রাণ করে আইঢাই, গলা হল কাঠ / কতক্ষণে যাব রে ভাই হাড়মড়মড়ি মাঠ। হাড়মড়মড়ি শুনেই চাষা ধরতে পারে এ তার বউ না, বউ তো গায় হরগৌরীর মাঠ, তো ভূতে তো আর ভগবানের নাম করতে পারে না, চাষা বলে, কে রে?

ওঘর থেকে পিঙ্কির মা বলে, চেনাই যায় না, কী মেয়ে ছিল আর কী মেয়েই না হয়েছে,

সেই পিঙ্কির এই রেজাল্ট!

চাষা ডাকে, কে তুই বল, হাড়মড়মড়ির মাঠ বলিস?

পিঙ্কির বাবা বলে, কী নম্বর পেত, কী সুন্দর ছড়া বলত, জ্যাক অ্যান্ড জিল, এতো খারাপ হয়ে গেল কী করে, মনেই হয় না, মুখ দ্যাখো, ওকে বুঝিয়ে দাও দশ সাবজেক্টে দশটা টিচার রাখা যাবে না।

চাষা বলে, আমার বউ-এর গলার স্বর এমন নাকি হলো কবে?

পিঙ্কির মা বলে, ক্লাস ওয়ানে টুতে র‍্যাঙ্ক পেত, এ কী হলো!

বাবা বলে, তখন তো টিচারও ছিল না, তুমি পড়াতে।

মা বলে, এখন তো বড় হয়েছে, নিজে পড়বে, এ-যেন সেই পিঙ্কি নয়।

চাষা বলে, আমার বউ তো ভর সন্ধেয় ভগবানের নাম নিত, জল গামছা দিত, তুই কে?

পিঙ্কি না পেরে চিৎকার করে ওঠে, স্টপ ইট, বুলি স্টপ ইট, ওহ গড!

তুমি শুনবেনা শেষটা?

নো, নো, নো। পিঙ্কি দু'হাতে মুখ ঢাকে।

বুলি থেমে যায়। কী যে হয়েছে আজ! সেই ইস্কুল থেকে ফেরার পর কী নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল পিঙ্কি। ইংলিশ—বেঙ্গলি, বেঙ্গলি—ইংলিশ-এ কথা বলতে লাগল। তাকে আচমকা ঝর্ণামাসি পাঠালো নিচে, চিনি কিনে আনতে। সে বুম্বাকে নিয়ে গেল। ফিরে এসে দেখে সব থমথমে। পিঙ্কি মুখ গুঁজে বসে আছে সোফায়।

বুলি নীরব হয়ে আছে। ওঘরে এখনো কথা চলছে। পিঙ্কি কান খাড়া করে কথা শুনছে। পিঙ্কিকে ডাকল ওর বাবা আবার। পিঙ্কি উঠে গেল। বুলি নিঃঝুম হয়ে বসে থাকল। বুম্বা ঘুমিয়ে পড়েছে। না হলে বুম্বাকে সে এখন কোল দিত। কোলে করে গিয়ে দাঁড়াত গ্রিলজালে ঘেরা ব্যালকনিতে। বুম্বাকে এখনো মাঝে-মধ্যে কোল দেয় তো সে। যখন বুম্বা কাঁদে, যখন বুম্বা কিছুতেই পড়েনা, তার মা তাকে মারে, সেই সময়। বুম্বা তার কোলে উঠে শান্ত। বুলির কানে আসছে রেল লাইনের মালগাড়ির ঘসঘস। ওই লাইনে একটা বুড়ো কাটা পড়েছে মাস দেড়েক আগে। বুড়োকে চিনত সে। একা একা ঘুরত রাস্তায়। মাঝে-মধ্যে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। মাল গাড়িটা দম ফেলে ফেলে এগোচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে অন্ধকারে। ওঘরে গর্জন করে ওঠে অধীর কাকা।

দুই

পিঙ্কি, বুম্বা, ঝর্ণামাসি, কাকাবাবু গেল নিকো পার্ক। পিঙ্কির মা হলো মাসি, বাবা হলো কাকাবাবু। বুলির হাসি পায় ভাবলে। সবাই চলে গেছে, তাকে রেখে গেছে ফ্ল্যাটে। শীত এলে যখন চিড়িয়াখানায় যাওয়া হবে, তখন বুলিকে নিয়ে যাবে ঝর্ণামাসি, এই বলে গেছে। এখন একটু নিকোপার্ক, সিনেমায় যাওয়া উচিত পিঙ্কিদিকে নিয়ে, বুঝলি বুলি, দ্যাখনা কীরকম মন খারাপ হয়ে গেছে ওর।

তাই তো। এখন প্রায়ই বাংলা বলছে। বাংলা বলা মানেই তো মন ভালো নেই, বুলি এটা বুঝেছে ভালো করে। হ্যাঁ, নিকোপার্ক যাক, তাতে যদি মন ভালো হয়। মন ভালো না থাকলে পড়ায় মন বসে!

তাকে লক করে গেছে ঝর্ণামাসি। কী আছে, ক'ঘণ্টা ঘরের ভিতর থাকবে বুলি। নাহলে যদি বেরোতে চায় আচমকা, কী থেকে কী হয়ে যাবে। বস্তিতে যত বদলোকের বাস, বুলি তো বড়ও হচ্ছে। হ্যাঁ, গ্যাস জ্বালাবি না, টিভি চালাবি না। ডাইনিং-এর আলোটা জ্বেলে, সব ঘর অন্ধকার করে বসে থাকবি বুলি। না হলে শুধু শুধু আলো পাখার মিটার উঠবে।

দরজা লক করাতে বুলির তেমন আপত্তি নেই। সেও ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল। এবার নিশ্চিন্ত। একা সে বেরোতে চায় না। বস্তির ছেলে অতুল তাকে ডাকে। অতুল তার হাত ধরতে চায়। বুলির খুব ভয় করে। অথচ অতুলকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রোগা প্যাংলা, উল্টোডাঙার বরফকলে কাজ করে। নিচের ফ্ল্যাটের বুড়ি ঠাম্মা মারা গেলে অতুল চলে গেল বরফ আনতে। ভ্যানরিকশায় চাপিয়ে তার কাজের জায়গা থেকে বরফ নিয়ে এল। সেই বরফের ওপর শুয়ে থাকল বুড়ি ঠাম্মা প্রায় এক দিন। নিচে গুন গুন কান্না চলতে লাগল। সেই কান্না বাড়ল ঠাম্মার মেজছেলে নাগপুর না কোথা থেকে এসে পৌছতে। সেই সময় অতুল খুব করেছিল। খুব করেছিল রেলে বুড়োটা কাটা পড়লে। সেই তো আগে দেখেছিল।

দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, ভিতর থেকেও। বুলি এখন হাসছে, পিঙ্কির মা হলো মাসি, বাবা হলো কাকাবাবু। আন্টি আর আঙ্কেল। ইংরিজিতে ঠিক আছে, পিঙ্কি বলেছিল। ইংরিজি কত সুন্দর, ইংরিজিতে মন খারাপ হয় না। মন খারাপের কথা নেই, ঝগড়া নেই, কান্না নেই। কেঁদে যখন কথা বলে বুম্বা বা পিঙ্কি, বাংলায় চোখ ভাসিয়ে দেয়।

বুলি এখন কী করে? টিভি চালাবে? কিন্তু তার ভয় আছে। একদিন রিমোটকন্ট্রোল টিপে দেওয়ায় ঝর্ণামাসি খুব রেগে গিয়েছিল। চটাস করে গালে একটা চড়, দূর করে দেব যদি আর কখনো হাত দিস। রিমোটকন্ট্রোল তুলে রেখে গেছে ঝর্ণামাসি। কোথায় কী টিপতে হয় তা বুলি জানে না। তার ভয় করে, যদি ঝর্ণামাসি জানতে পারে। ওপরের ফ্ল্যাটের লোক, নিচের ফ্ল্যাটের লোক খবর দিয়ে দিতে পারে। একবার দিয়েওছিল। তাতে তার কান ধরল মাসি, খবদ্দার! সুতরাং বুলির দরকার নেই। তা ছাড়া টিভিতে আজ ভালো সিনেমা নেই। ঝর্ণামাসি বলছিল মুক্তি না কী যেন। তাই তো সবাই বেরোল নিকোপার্কের দিকে।

বুলি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। সোজা গেট পার হয়ে সরু রাস্তা, রাস্তার ওপারে বস্তি। ধোঁয়া উড়ছে বস্তির আকাশে, ডানদিকে রেল লাইন, রেল লাইনে তাকায় বুলি। শুধুই মালগাড়ি চলে বুড়োর মতো হাঁপাতে হাঁপাতে। রেললাইন অনেক উঁচুতে। তাদের স্বরূপনগরে ইচ্ছামতীর গায়ে যেমন বাঁধ, তেমনি। বুলির আচমকা মনে হয় বাঁধের ওপারে নদী। বুড়ো দাদু কি নদীতে যেতে চেয়েছিল? সন্ধের হালকা অন্ধকারে ওপারে তাকিয়ে স্বরূপনগর, ভাণ্ডারহাটি...। তার ভাইগুলো এখন বড় হয়ে গেছে। বাবা গেল মাসে এসে বলেছিল, আবার তার ভাই হবে অঘ্রান মাসে, তখন বুলি ফিরে যাবে স্বরূপনগর, ভাইকে কোল দেবে।

ওদের ফিরতে দেরি হবে। বাইরে খেয়ে ফিরবে। বুলির ভাত আছে। বুলি ভেতরে ঢুকে সব আলো জ্বালিয়ে দেয়। আলো নেভাবে পরে, ন'টা বাজলে। ঘর অন্ধকার থাকলে তার কেমন ভয় ভয় করে। রেল লাইনে বুড়ো কাটা পড়ার পর এই হয়েছে। ফ্ল্যাটবাড়ির ডানদিকে, রেল লাইনের দিকে একটা নিমগাছ আছে। এখন গাছটাকে দেখলেও বুলির ভয় হয়।

এই ভয়টুকু ছাড়া ফ্ল্যাটে একা থাকতে তার ভালো লাগে। এই সময় সব ঘরগুলো তার। যে কোনো জায়গায় সে যেতে পারে, শুতে পারে। বুলি সোজা ভেতরের ঘরে গিয়ে পাখা চালিয়ে রিলাক্সন-এর নরম গদির উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকল। পাখা ঘুরছে বন্‌বন্ করে।

পাখার ঘূর্ণন দেখতে দেখতে বুলি বিড় বিড় করতে থাকে, আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে.......হলুদ বনে কলুদ ফুল / তারার নাম টগর ফুল। কলুদ ফুলটা কী? এখন মাঝে মধ্যে ভাবে বাবা এলে জিজ্ঞেস করবে কলুদ ফুল কেমন। কেমন তার রং। বুলি উঠে বসল, গুনগুন করতে লাগল। দিদি তেরা দেবার দিবানা....। পিঙ্কিরা দেখে এসেছে। বুলি খাট থেকে নামল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল, বিড়বিড় করতে থাকে, সামথিং সামথিং, ডুইং ডুইং টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটিল ইস্টার। ইস্টার নয় স্টার ... ইস্টার.... নো নো স্টার। স্টার মানে তারা। আকাশের তারা। তারার নাম টগর ফুল। মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয়। ঝর্ণামাসি বলেছিল বুম্বাকে, যখন নিচের ফ্ল্যাটের বুড়ি ঠাকমা মারা গেল। সব মানুষ! তাহলে বুড়ো দাদু ভূত হয়নি, তারা হয়েছে? কে জানে! বুলির তো মনে হয় ভূত। গা থমথমে হয়ে যায় তার। বিড়বিড় করে হলুদ বনে কলুদ ফুল। নো মাম্মা নো মাম্মা, হলুদ বনে কলুদ ফুল। কথাগুলো বিড়বিড় করলেই তার ভয় কেটে যায়। মুখে হাসি ফোটে। বুলি ড্রেসিং টেবিল থেকে ঘুরে তাকাতে আলনা। আলনার উপরে আয়রন করা পিঙ্কির ইস্কুল ডেরেস। নো নো, স্কুল, নট ইস্কুল। নো নো ড্রেস, নট ডেরেস। ড্রেস। বুলি তোর যে কী হবে? বুলি হাসতে হাসতে স্কুল ইউনিফর্ম নামায় আলনা থেকে। আকাশী নীল স্কার্ট, সাদা শার্ট। এখন এই জামা আর স্কার্টে কী সুন্দর লাগে পিঙ্কিকে। গট্‌গট্‌ করে নেমে যায় যখন স্কুল ব্যাগ কাঁধে, বুলির চোখের পাতা পড়ে না। বুলি স্কার্টে হাত ঘষে, কী নরম, কী মোলায়েম, শার্ট স্কার্ট বুকে চেপে বুলি জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। এই জানালা থেকে রেললাইন পরিষ্কার। নিমগাছ ও রেল লাইনের গা-ঘেষে শুধু ঝোঁপ। ওই ঝোঁপে ফাল্‌গুন চোত মাসে শাদা, হলুদ, বেগুনি ফুল ফুটে থাকে। এখন শুধুই ডালপাতার ঝাড়। বর্ষার পর ওই ঝোঁপে জোনাকিরা দপদপ করে। এখন শুধুই অন্ধকার। অন্ধকার ওই ঝোপে সারাদিন ঘাপটি মেরে বসে থাকে। বিকেলের পর থেকে তেলকালি মাখা ভূতের মতো এক পা এক পা করে বেরিয়ে আসে। নিম ডালে গিয়ে বসে। বুলির গা আবার থমথমে হয়ে যায়। বুড়োটা যেন নিমগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেল লাইনের ধারে। হাওয়ায় বুড়োর বাতাসি চুল উড়ছে। জানালা থেকে সরে আসে বুলি।

স্কার্ট শার্ট খাটের উপরে রেখে ঝপ করে নিজের গায়ের ফ্রক খুলে ফেলল সে। তারপর দ্রুত হাতকাটা শার্টটা পর নেয়। চোখ বুঁজল বুলি। আয়নার কাছে যাবে। না না, তার ভয় করে। ভয় করে চোখ খুলতে। খাট, আলমারি আয়না, আলনা, পাখা, বই-এর টেবিল, বই, টেবিললাম্পি, দেওয়াল, দেওয়ালের নদী, পাহাড়ের ছবিঅলা নীল ক্যালেন্ডার, পিঙ্কির দাদু-দিদিমার ছবি, সবাই তাকে দেখছে। কারোর চোখের পাতা পড়ছে না। বুলি চোখ বুঁজে খাটের উপর থেকে স্কার্টটা নিয়ে ঘরের বাইরে ডাইনিং-এ চলে আসে। ডাইনিং হলো তার। এখানেই সে রাত্তিরে ঘুমোয়। এই দেওয়াল তার নিজের। বলবেনা কিছুই। বুলি বোতামগুলো লাগায় ধীরে সুস্থে। তারপর স্কার্টের ভিতরে রোগা রোগা দুই গা গলিয়ে দেয়।

স্কার্ট তো পরেনি কোনোদিন। সব ফুল ছাপ মোটা মোটা সুতির ফ্রক। পুজোর সময় একজোড়া কিনে আনে পিঙ্কির মা, হাসতে হাসতে বলে, শীত আসছে তো, মোটা জামায় শীত আটকাবে। তো শীত আর ক'দিন থাকে, তারপর মোটা কাপড়ের ফ্রকে সে শুধুই ঘামে। নিচের. টেপজামা ঘামে ভিজে যায়। গায়ে সব সময় ঘাম গন্ধ বজবজ করে। যেমন এই এখন। পিঙ্কির স্কুলের শার্টে কী আরাম! বুলি স্কার্ট পরে নিল। হুকটাও ঠিকঠাক লাগিয়ে নিল। এই প্রথম, কিন্তু অসুবিধে হলো না একটুও, কেননা প্রায় প্রত্যেক দিনই পিঙ্কির স্কার্টের হুক

খুলে দিতে হয়, যখন সে স্কুল থেকে ফেরে।

স্কার্টের ভিতরে শার্ট গুঁজে বুলি হয়ে গেল পিঙ্কি। এখনো জুতো বাকি আছে। থাক জুতো, সে তো বাইরে যাচ্ছে না যে শব্দ তুলবে খট্‌খট্‌। বরং ব্যাচটা চাই। পিঙ্কির ব্যাচটা তার খুব পছন্দ। কী সুন্দর নীল ফুলের মতো বুকের কাছটায় লেগে তাকে। বুলি সাবধানে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই চোখ বোঁজে। না,আয়নার সামনে সে কিছুতেই যাবে না। ওই আয়নায় সারাদিন পিঙ্কির মা বুম্বা তার বাবা আর পিঙ্কি মুখ দ্যাখে। তাছাড়া আর কেউ না। বুলিকে বারণ করা আছে আয়নার সামনে যেতে। তার নিজের একটা ছোট আয়না আছে। সে একদিন এই ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে চুল আঁচড়াচ্ছিল, ঝর্ণামাসি খুব বকেছিল। বুলি আয়নার দিকে তাকায় না। তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। ঝর্ণামাসি বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন কানের দুল খুলবে, শাড়ির আঁচল ফেলবে তখন আয়নাটা ঠিক বলে দেবে সব। বুলি দ্রুত চলে যায় আয়নার পাশ দিয়ে পড়ার টেবিলে। ব্যাচটা গুছোনই আছে। নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে ব্যাচটি লাগায়। ব্যাচ লাগাতে সে জানে। ব্যাচ লাগাতে শার্ট গুঁজতে, স্কার্ট পরতে, মাথায় হেয়ার ব্যান্ড লাগাতে জানে বুলি। আবার ঢুকল সে ঘরে। স্কুল ব্যাগটা নিয়ে চোখ বুঁজে বেরিয়ে আসে। স্কুলব্যাগ পিঠে ঝোলাতেও জানে সে। পিঙ্কি যা যা জানে, সব জানে সে, শুধু জানেনা মাম্মা মাম্মা আয়াম রেডি—হি হি করে হাসে বুলি। সে জানে হলুদ বনে কলুদ ফুল—ঝর্ণামাসি তাকে বলেছিল, এসব একদম শেখাবিনা বুম্বাকে, ওর স্কুলে রাইম শেখায়, জনি জনি—হা পাপ্পা।

কী সুন্দর বলে বুম্বা। বলতে বলতে মুখ ফুলে ওঠে ওর। মুখ ভর্তি আনন্দ! ইংরিজিতে আনন্দ ছাড়া দুঃখ আছে নাকি? বুলি স্কুলব্যাগ কাঁধে চলতে লাগল ডাইনিং-এ। কোনো ঘরে ঢুকবে না। ঘর দুটো তার নয়। ঘরের দেওয়াল সব বলে দেবে।

বুলি বলল, মাম্মা যাই। মাম্মা টা টা—ব্যাঙের মাথা হি হি হি।

বুলি ডাকল, বুম্বা বুম্বা, হে বুম্বা...। তারপর আর জানে না। পিঙ্কি একটা ক্যাডবেরি বের করে দিল স্কুলব্যাগ থেকে।

বুলি বলল, মাম্মা...। তারপর তার মনে নেই। পিঙ্কি তার মাকে জড়িয়ে ধরল। কথা বলতে লাগল। কী কথা—ব্যাঙের মাথা। ইংলিশ বললে পিঙ্কির মা খুশি হয়। বুলি বলল, বুম্বা বুম্বা, মাম্মা বুম্বা আমার পেন নিয়েছে।

ঝর্ণামাসি কিচেন মানে রান্নাঘর. থেকে বেরোয় না।

বুলি ডাকল, মাম্মা, হি হি—ব্যাঙের মাথা। বুলির আর মনে নেই। ইংরিজি শুনে ঝর্ণামাসি আন্টি হয়ে গেল। হাসিমুখে বেরিয়ে এল কিচেন থেকে, বুম্বা বুম্বা, গিভ...। আর জানা নেই বুলির। তবে এটা মনে আছে বুম্বা পেন দিচ্ছিলনা, ঝর্ণামাসি দিতে বলল। বুম্বা পেন নিয়ে দৌড়তে লাগল আর হাসতে লাগল। ঝর্ণামাসি স্টপ স্টপ করে তাকে ধরতে লাগল। কী হাসি। ইংরিজিতে এত হাসি থাকে যে বলার নয়। বুলির মনে হয় 'স্টপ' মানে হাসি, 'মাম্মা' মানে হাসি, 'গিভ' মানে হাসি,'আয়াম' মানে হাসি, 'স্টার' মানে হাসি। বাংলায় শুধু 'হলুদ বনে...।' বুলির শুধু মন ভালো হয় ওই ক'টা কথায়। তখন স্বরূপনগর ভান্ডারহাটি নদী, নৌকো, বাতাস, বাবা-মা, কোলদেওয়া ভাই সবাই হাসতে থাকে তার চোখের সামনে। বোলতা, ভ্রমরা, কাঠবিড়ালি, পানকৌড়ি, সাপ, ব্যাঙ—সব হাসতে থাকে। হাসতে থাকে শ্যাওড়া গাছের পেত্নি, চাষার আহ্লাদী বউ।

বুলি গুনগুন করে, বেদের মেয়ে জোসনা আমায় পাগল করেছে....হি হি হি। ঝর্ণামাসি শুনে খুব রেগে গিয়েছিল, কিন্তু পিঙ্কির কী হাসি, থামবি না বুলি, গা গেয়ে যা, ডোন্ট স্টপ।

ঝর্ণামাসি তখন চিৎকার করে উঠেছিল, থাম বলছি, এসব বস্তির গান।

পিঙ্কি উল্লাসে নেচে উঠেছিল, হাউ সুইট! মাম্মা হু...। বেদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল পিঙ্কি। তাতে ঝর্ণামাসি রেগে গিয়ে বুলির গালেই চড় বসিয়ে দিয়েছিল।

সেই চড়ে অবশ্য বুলির লাগেনি। বেদের মেয়ে জোসনাতে যে হাসি ছিল। শুধু ওতেই।

হাসতে হাসতে বুলির আচমকা খেয়াল হয়, কারা যেন কথা বলতে বলতে উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বুলি পটাপট স্কার্ট শার্ট খুলে ফেলে।

না তারা আসেনি। তিনতলার লোক উঠে গেল উপরে।

পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় পিঙ্কির মুখে কান্নাকান্না ভাব, মাম্মা শার্ট স্কার্ট এরকম কেন?

ঝর্ণা ছুটে এল কিচেন থেকে, হোয়াট হ্যাপেন্ড?

পিঙ্কির কান্নাকান্না ভাব রাগে পরিণত হলো শার্টে ঘামের গন্ধ, ক্রিজ নেই, কাচা হয়নি! এইটা পরে আমি স্কুল যাব।

কেচে আয়রণ করানো। মা অবাক। গম্ভীর। তখন পিঙ্কি বা তার মা কেউ ইংরিজি বলছিলনা। মা বলছে কাচা। বুলি কেচেছে দুটোই। আয়রণ করিয়ে এনেছে। পিঙ্কির তা বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝর্ণা ডাকল, বুলি!

বুলি জল ভরছিল পিঙ্কির জলের বোতলে। তার কানে গেছে কথাগুলো। সে ভয়ে চুপ। কোনোরকমে জল ভরে ঘরে আসে, কী হয়েছে আন্টি?

পিঙ্কি চিৎকার করে ওঠে, চুপ কর, আন্টি! এটা কাচা হয়নি?

কেচেছি তো পিঙ্কিদি, মাসি তুলেছিল বারান্দা থেকে।

হ্যাঁ, তাইতো। পিঙ্কির মা ঝর্ণাওতো বুঝতে পারে না কী করে হলো। ঘামের গন্ধ পাউডারের গন্ধ! তাহলে নিশ্চয়ই ইস্ত্রিওয়ালা বৈদ্যনাথ। সে তার মেয়েকে পরিয়েছে। শনিবারের বিকেলে দিয়ে রোববারে সকালে তো আনা। বুলির মুখে কথা নেই। আর এক সেট ছিল ভাগ্যি। পিঙ্কি সেই জোড়া পরে ইস্কুলে চলে গেল। বুলি স্কার্ট শার্ট দুটো নিয়ে কাচতে বসল। খুব বেঁচে গেছে সে।

তিন

শনি রবি পিঙ্কির স্কুল বন্ধ। যদি শুক্রবারে বেরোয় ওরা তখন বুলি স্কার্ট শার্ট পরে একা একা ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকে। মাথায় হেয়ার ব্যান্ড লাগায়। কাঁধে স্কুলব্যাগ নেয়। মাম্মা টা-টা—বলে হাত নাড়ে ক্রমাগত। হোক না পিঙ্কির পরা, ঘাম-পাউডারের গন্ধ, তবু তো চমৎকার। পিঙ্কির গায়ের গন্ধ, বুলির ভালো লাগে।

পিঙ্কির আকাশী নীল স্কার্ট, শাদা শার্ট, নীল হেয়ার ব্যান্ড, স্কুল ব্যাচ, বই-এর ব্যাগে খুব লোভ বুলির। তা যেন নেশায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সেই-ই তো ময়লাগুলো কাচতে বসে। বাথরুমে দরজা বন্ধ করেই স্কার্ট পরে নেয় একটা; শার্টও। সব শেষে খোলে। পিঙ্কির মা পুজোর পর থেকে বলছে চৈত্র সেলে বুলিকে শাড়ি কিনে দেবে। সে বড় হচ্ছে। শাড়ির কথা ভাবতেই ভালো লাগে না বুলির। তার চেয়ে যদি এইরকম 'ইস্কুল ডেরেস' পাওয়া যেত।

চৈত্র সেলে শাড়ি কেনা হয়নি। হয়নি কেননা পুজোর পর থেকে খুব চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি চলতে লাগল। পিঙ্কির হাফইয়ার্লির রেজাল্ট খুব খারাপ। পাঁচ বিষয়ে ফেল। বছরের মাঝখানে আর টিচারও পাওয়া যায় না। পিঙ্কির সঙ্গে বসে তার মা ঝর্ণামাসি। প্রাইভেট টিউটর তো তিনদিন পড়ায় দেড়ঘন্টা করে। পিঙ্কিকে নিয়ে বসে তার মা মাঝে মধ্যেই রেগে যায়। বুলি টের পায় ঝর্ণামাসি তার মতোই পিঙ্কির বই দেখে কিছু বুঝতে পারছে না। একদিন রেগেমেগে মেরেই বসল মেয়েকে, ইস্কুলে কী করায়, লিখে এনে মুখস্থ কর।

হ্যাঁ মুখস্থ কর। পিঙ্কির বাবাও ধমকায় মেয়েকে।

বাবা মায়ে ঝগড়া লাগে। বাবা মা ঝগড়া করতে করতে শেষে বলে, সব দোষ পিঙ্কির। আরো তো বাচ্চা আছে। সবাই ভালো রেজাল্ট করছে। সবাই তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। ইংলিশ মিডিয়াম ছাড়া আজকের দিনে কিছুই হবে না। চাকরি হবে না। বিয়েও হবে না। লোকে পুছবে না। ঝি গিরি করতে হবে বুলির মতো।

পিঙ্কির বেরোন বন্ধ। ঝর্ণামাসিও বেরোয় না। পিঙ্কির পরীক্ষা না শেষ হলে তারা কেউ কোথাও যাবে না। রেজাল্ট বেরোলে তবে যাবে। কী যে হবে! ঝর্ণামাসি কপালে হাত দেয়। পরীক্ষাও হয়ে গেল। চৈত্র সেলও চলে গেল। ঝর্ণামাসি শাড়ি আনতে ভুলে গেল। কেন ভুলল, না পরীক্ষা একদম ভালো হয়নি পিঙ্কির। সব ছেড়ে এসেছে। কী করব মা? খুব কঠিন যে। টাফ্, হেভি টাফ্! পিঙ্কি বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদে।

টাফ্ বললেই টাফ্! আর কেউ পড়ছে না, সন্দীপের ছেলে ক্যালকাটা বয়েজ-এ ফার্স্ট হয়, তা জানো? খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলছি, আর ও বলছে টাফ্! পিঙ্কির বাবা, অধীর বোস বাড়ি ফিরে রাগারাগি করে।

গরম পড়ে গেছে এরই মধ্যে। একদিন এল অতুল। বরফ কলের অতুল এসে বলল, সার্বজনীন শেতলা পুজো, চাঁদা দেবেন মাসিমা।

ঝর্ণার পিছনে দাঁড়িয়ে বুলি। বুলির সঙ্গে রোগা প্যাংলা অতুলের চোখাচোখি হয়। বরফ বরফ! বুলি ছিটকে সরে আসে। অতুলকে তার ভয় করে খুব। কেন যে করে? কী রকম হ্যা হ্যা করে হাসে। মদও খায় নাকি। শ্মশানে যায় প্রায়ই। একদিন বুলিকে শুনিয়ে বলেছিল, পঁচানব্বইটা মড়া পুড়িয়েছে, একশো আটটা হয়ে গেলেই সে লটারি পাবে। লটারি পেলেই মারুতি কিনবে, আইসক্রিম খেয়ে দিন কাটাবে। বলতে বলতে হাসছিল বরফ অতুল মুদি দোকানের সামনে। বুলি তখন চিনি কিনতে গেছে।

সেদিন বিকেলে সবাই বেরোল। সবাই মানে বুম্বা ঝর্ণামাসি আর কাকাবাবু। কী, না সেই খুব ভালো ছেলের জন্মদিন। পিঙ্কি তুই যাবি নাকি?

এমন ভাবে বলল যেন পিঙ্কির না গেলেই ভালো; গেলেই স্কুল, রেজাল্ট নিয়ে কথা হবে, হাফ ইয়ার্লির র‍্যাঙ্ক নিয়ে কথা হবে।

পিঙ্কি বলে, না যাব না, তীর্থ খুব সেলফিস, অহঙ্কারী, এমন ভাব করে যেন আর কেউ ফার্স্ট হয় না।

ঝর্ণা বলল, তা কেন, ভালো ছেলে, পড়াশুনো করে তাই ফার্স্ট হয়, অহঙ্কারী তুইও হ'না, তোর যেতে হবে না, বরং তুই আর বুলি বাড়ি থাক।

হ্যাঁ হ্যাঁ। পিঙ্কির বাবাও তাই বলল, এত লজ্জা করে, এবার যে কী হবে?

কপালে যা থাকে, যেমন পেটে ধরেছি। বলল পিঙ্কির মা।

ওরা চলে গেল। হ্যাঁ লক করেই গেল। পিঙ্কির পরীক্ষা শেষ, তবু বলে গেল তার মা, পিঙ্কি যেন পড়ে, ম্যাথস প্র্যাক্‌টিস করে।

পিঙ্কির মুখ অন্ধকার। কিছু সময় শুয়েই থাকল সে। তারপর টিভি চালায়, টিভি চলতে থাকে কিন্তু পিঙ্কি টিভি না দেখে শুয়ে থাকে। বুলি বলল, পড়বি না?

না, না, না, পড়ব না বেশ করব। পিঙ্কি গর্জন করে ওঠে, পরীক্ষার পর আবার কিসের পড়া রে, দরকার হয় তো তুই পড়।

হেসে ফেলল বুলি, আমি কি পড়তে পারি?

কী আনন্দ! হ্যাঁরে আর কোনো ঘোস্ট স্টোরি জানিস, ভূতের গল্প।

বুলি বলল, জানি, নিম গাছে বুড়ো বসে থাকে, সেই যে রেলে কাটা পড়লনা।

তোকে কে বলেছে?

বুলি বলল, আমি দেখেছি।

কী দেখেছিস?

বুলি বলল, বুড়ো গাছে এসে বসে থাকে।

পিঙ্কির বিশ্বাস হয় না, সে বলল, ধুস মিথ্যে কথা, আমার পড়তে ইচ্ছে হয় না।

কেন?

আই হেট দেম।

কী বলছিস পিঙ্কিদি?

পিঙ্কি বলে, ওদের কেন ভূতে ধরে না?

কাদের?

পিঙ্কি বলল, আই হেট হেট দেম, হ্যাঁরে, তুই আমার স্কুল ড্রেস পরিস?

না তো।

পরবি?

বুলির মুখ আলো, হ্যাঁ পরব।

যা পরে আয়। পিঙ্কি হুকুম করে।

বুলি লাফ দিয়ে অন্য ঘরে যায়। এখন তো পিঙ্কির স্কুল ছুটি। স্কুল ড্রেস কাচা আছে কিন্তু আয়রন করা নেই। তাতে কী হয়েছে, টেরিকটনের তো। ভাঁজ থাকে কাচার পরেও। বুলি সাজতে লাগল। বুকে ব্যাচ, মাথায় হেয়ার ব্যান্ড, পিঠে স্কুলব্যাগ। হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল পিঙ্কির সামনে, এই তো পরেছি, মাম্মা টা-টা।

পিঙ্কি চুপচাপ। পিঙ্কির মুখ অন্ধকার। বুলি বলছে, এইগুলো যদি না পরে আর পিঙ্কি, নতুন যদি কেনা হয়, সে চেয়ে নেবে পিঙ্কির মায়ের কাছ থেকে, হ্যাঁরে পিঙ্কিদি, দিবি তো?

তোর পরতে ভালো লাগে? পিঙ্কি তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, মাম্মা টা-টা—হি-হি-হি। বুলি হাসতে থাকে।

পিঙ্কি বলল, তুই এগুলো পরিস, তাই না? আমরা না থাকলে পরিস?

বুলি চমকে তাকায় পিঙ্কির চোখের দিকে, মুখ বদলে যাচ্ছে, সে টের পেল কী যেন, সঙ্গে সঙ্গে বলল, না, না তো।

না তো মানে, আমি জানি না ভেবেছিস?

না, পরিনা আচ্ছা খুলে ফেলছি।

খুলবি না, তুই এগুলো পরিস, না হলে আয়রন করা ড্রেসে তোর গায়ের গন্ধ থাকে কী করে, আমি বুঝিনি?

বুলি বলল, ভূতের গল্প শুনবি?

না।

বেদের মেয়ে জোসনা?

না।

হলুদ বনে কলুদ ফুল?

না।

ওপারে জন্তি গাছটি...গুণবতী ভাই...হাড়মড়ি মাঠ?

না, না, না, তুই পরিস কিনা বল।

পরিনি কোনোদিন। বুলির চোখে জল এসে যায়।

পরিসনি, য়্যু লায়ার, মিথ্যেবাদী। পিঙ্কি কথা বলতে বলতে থুতু ছেটায় বুলির গায়ে, আই হেট য়্যু। বিড়বিড় করছে পিঙ্কি। কী বলছে তা বুঝতে পারছে না বুলি। তবে ভাল কথা যে নয় তা টের পাচ্ছে। সে তার কনুই দিয়ে মুখ ঘষে, থুতু মোছে।

ঝপ করে পিঙ্কি কলার ধরে ফেলেছে বুলির, হোয়াট ডু য়্যু ওয়ান্ট, কী চাস তুই?

তার মানে?

তুই কি চাস আমি ঝি হয়ে যাই তোর মতো? কে তুই?

কী বলছিস পিঙ্কিদি? বুলির অন্ধকার মুখ থর থর করে কাঁপে। জল ছলছল করে।

যা বলছি তা ঠিক বুঝেছিস তুই, ধরতে পারিনি ভাবছিস, আমার স্কুল ড্রেসে তোর ময়লা গায়ের গন্ধ, ঘামের গন্ধ কী করে হয় রে? তুই নজর দিচ্ছিস তাই আমি ফেল করছি, এবারে ফেল করব অল সাবজেক্টে।

না, না পিঙ্কিদি শোনো। বুলি কী যেন বলার চেষ্টা করে।

তুই জাদু জানিস, তুক করতে পারিস? কেন পরিস তাহলে আমার ইউনিফর্ম?

বুলির ঠোঁট কাঁপে। বলতে পারে না কিছুই।

য়্যু সোয়াইন, ইডিয়ট, ব্লাডি ফুল...। চিৎকার করছে পিঙ্কি। বুলি বুঝতে পারে পিঙ্কি তাকে গালাগালি দিচ্ছে ইংলিশে। ইংলিশে গালাগালি আছে? আছে আছে। রাগ আছে? আছে আছে। কান্না আছে? আছে আছে। জানত না বুলি, জানছে এখন। আবার থুতু ছেটাতে ছেটাতে পিঙ্কি তার মাথার চুল ধরে ফেলে ঝাঁকাচ্ছে, উইচ! ঘোস্ট! তুই একটা ডাইনি ভূত, আমি বুঝতে পারছি তা।

পিঙ্কিদিই! বুলি কেঁদে ওঠে।

চোপ! পিঙ্কি ধমকে ওঠে, অ্যাম আই আ ফুল? য়্যু হ্যাভ ডান ইট, তোর নজরে আমার এই অবস্থা, আমাকে তুই চাষার বউ পেয়েছিস, আমার স্কার্ট পরে তুই পিঙ্কি হয়ে যাবি, আমি বছর বছর ফেল করব।

আমি আর পরব না। বুলি দুহাতে মুখ ঢাকে।

পরবি না মানে, সর্বনাশ তো করেই দিয়েছিস শয়তানি, ঘোস্ট, এ কি তোর গৎখালি যে আমাকে চাষার বউ করে দিবি।

ও তো গল্প।

গল্প! আমি বুঝি না ভাবছিস? গল্প হলে আমি ফেল করি, হিংসুটে মেয়ে, তুই এমন নজর দিয়েছিস যে এরপর তুই নিজেই আমার হয়ে স্কুলে যাবি, কেউ ধরতেও পারবেনা, সবাইকে হিপনোটাইজ করে দিবি, আমি বাড়িতে বসে বাসন মাজব, না হলে নিমগাছের মাথায় আমাকে তুলে দিয়ে আসবি, আমি কাঁদব, আমি অনেকদিন ধরে ওয়াচ করছি, আর কেউ বুঝতে পারছে না তুই আসলে কে, মা বাবাও জানে না।

সব মিথ্যে পিঙ্কিদি। কাঁদতে থাকে বুলি।

মিথ্যে! তাহলে মা বাবা আমাকে তীর্থর বার্থডে পার্টিতে নিয়ে গেল না কেন, মা বাবা আমাকে ভুলতে আরম্ভ করেছে, এরপর তোকে পিঙ্কি বলবে আমাকে বুলি বলবে, য়্যু আর ড়ুইং ইট, না হলে মা আগের বছর আমাকে পড়াতে পারত, এবছর পারছে না কেন, বাবা পারছে না কেন? তুই সব জানিস। এই রকম খারাপ রেজাল্ট আমার কোনোদিন হয়নি, মা বাবা আর ভালোবাসে না আমাকে, কেন? বলতে বলতে বুলিকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে ভীষণ আক্রোশে তাকে মারতে আরম্ভ করে পিঙ্কি। শার্ট ছিঁড়ে দেয়, স্কার্ট ছিঁড়ে দেয়। মুখে থুতু ছেটায়, বিড়বিড় করে, মেরেই ফেলব তোকে, ডাইনি, ভূত, কলকাতায় ডাইনিগিরি করতে এসেছিস...।

বুলি মার খায়। মার খেতে খেতে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে মার খায়।

এক সময় ক্লান্ত হয় পিঙ্কি। ছেড়ে দেয় বুলিকে। টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে, মাম্মা বুলির জন্য, মাম্মা আমি কি কেউ নই, আমাকে ভুলে যাচ্ছো মাম্মা, মা-মাগো....।

চার

চোখ ডলতে ডলতে বুলি বলল, মাসি ও পরতে বলেছিল তাই পরেছি।

অধীর ঝর্ণা লক খুলে ঢুকেছে। দুই মেয়ে দুই ঘরে ঘুমিয়ে। পিঙ্কির স্কুল ইউনিফর্ম বুলির গায়ে। বুলির মাথা ফোলা, কপালে কালসিটে।

ফেরার পথে অধীর ঝর্ণার কথা কাটাকাটি হয়েছিল ট্যাক্সিতে। তীর্থর কী চমৎকার রেজাল্ট। সব সাবজেক্টে অ্যাবভ নাইনটি। এমন বাচ্চার মা বাবা হয়েও সুখ। কিন্তু কী করে পারে ছেলেটা? অধীর একবার মুখ ফসকে বলেছিল, ওর মা, মানে সন্দীপ ভৌমিকের বউ তৃণা, তৃণা বলল কোনো টিউটর নেই, সে-ই পড়ায়। তারপরেই কথা বন্ধ করেছিল ঝর্ণা। রাগে গুম।

বাড়ি ফিরে বুলি পিঙ্কির অবস্থা দেখে ঝর্ণার রাগ হয়ে গেল; পিঙ্কিকে ডেকে তুলল, কী করেছিস তুই? ওকে মেরেছিস?

পিঙ্কি নিজেকে বাঁচাতে বলল, ও কেন আমার স্কুল ড্রেস পরবে, ও পরে, জানো মা...। পিঙ্কি বলতে লাগল। যা ভেবেছে তা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। বুলির জন্য তার এই দশা। হ্যাঁ, বুলি প্রায়ই তার ড্রেস পরে। প্রায়ই সে ঘাম পাউডারের গন্ধ পায়। বুলির গায়ের গন্ধ সে চেনে। বলতে বলতে সে কাঁদতে লাগল, বুলির নজর পড়েছে, তাই সে পাশ করতে পারবে না।

তাই বলে তুমি ওকে মারবে? অধীর গালে চড় বসায়।

ওকে মারছ কেন? ঝর্ণা অধীরের বিপক্ষে দাঁড়াতে পিঙ্কির পক্ষে। ট্যাক্সির ভেতরের কথাটা

তো সে ভোলেনি। রাগ বাড়তে লাগল ঝর্ণার, সে চিৎকার করতে লাগল, হতেই পারে, ওসব গাঁ গঞ্জের ব্যাপার আমরা কী জানি, না হলে ভালো মেয়েটা এমন হয়ে যাবে কেন, বুলি বুলি! কেন পরিস ওর জামা? যা বেরিয়ে যা।

ঝর্ণার রাগের সামনে অধীর দাঁড়াতে পারে না। গুটিয়ে ছেলেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। বুলি কাঁদে না, বিড়বিড় করে সব মিথ্যে মাসি, আমি তো কোল দিতে এসেছি, বুম্বাকে কোল দিতে এসেছিলাম মাসি, ওসব মিথ্যে।

আর এক মুহূর্তও এ বাড়ি থাকবি না। ঝর্ণা চিৎকার করে ওঠে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, ওঁরা ঘরে মারপিট করবেন, ঝি, ঝি-এর মতো থাকতে পারিস না, বেরো।

বুলি বেরিয়ে এল। সত্যিই বেরিয়ে এল। কী যে হলো তার, চোখে জল নেই, সে যেন দিনের আলোয় বেরোল। স্কুল ইউনিফর্ম গায়ে অন্ধকারে সে নেমে এল নীচে। নিম গাছটার দিকে তাকাল। গাছ থেকে বুড়ো নেমে এল। সিড়িঙ্গে বুড়ো তার সামনে সামনে হাঁটতে লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে খুকি, এখন কি তুমি স্কুলে যাবা, চলো নিয়ে যাই।

বুলির ভয় হলো না। হাঁটতে হাঁটতে বস্তির ভিতরে গিয়ে ঢোকে, অতুলদা!

তার ভয় হলো না দেখে বুড়ো ভূত মুখ আঁধার করে রেল লাইনের পথে হেঁটে গেল। আবার সে গলা দেবে রেলের চাকায়।

বুলি ডাকল, অতুলদা, অতুলদা!

তাস খেলছিল কোথায় যেন অতুল। বুলির ডাক শুনে পড়ি মড়ি করে ছুটে এল, কী হয়েছে, বুলি তুমি!

বুলি বলল, অতুল দা বরফ চাই মস্ত বরফের চাঁই।

কেন? অতুল চমকে ওঠে, কে মারা গেল? অতুল কতবার যে বরফ নিয়ে ঢুকেছে ওই সব ফ্ল্যাটবাড়িগুলোয়। ওদের বডি রাখতেই হয়। ছেলে আছে তো মেয়ে নেই, কারোর কেউই নেই ধারে কাছে। সব দূরে থাকে। তারা এসে না দেখলে শ্মশানে কী করে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই যে একবার বরফের উপরই বডি পচতে আরম্ভ করল। বুড়োর ছেলে শেষ পর্যন্ত এলই না ব্যাঙ্গালোর থেকে।

অতুল মলিন হাসে, এবার নিয়ে ছিয়ানব্বইটা হবে, ও বুলি কার কী হলো?

যার হয়েছে তার বাবা থাকে বাইরে, মা নেইকো কাছে, ভাই বুন কেউ নেই এখেনে, সে একা মরে গেল অতুলদা, বডি রাখতে হবে, তুমি বরফ আনতে যাও।

অতুল বললে, কে কোন ফ্ল্যাটের কথা বলছ?

বুলি বলতে পারে না। ফোঁপাতে থাকে। অতুল তার মাথায় হাত দেয়। চুল এলোমেলো করে দেয়, কাছে টানে, আদর করতে করতে বলে, তুই বাড়ি যাবি, তোর কী হয়েছে? ও বুলি, বুলি।

বুলি বলল, কোথায় আমার বাড়ি, কোথায় আমার মা বাবা ভাই বুন, সব ভুলে গেছি অতুলদা, আমি পিঙ্কি ইংলিশ বলি, ইস্কুল যাই টাটা করি, ইংলিশ বলি, আমি বুলি নই, পিঙ্কি। পিঙ্কি বুলি হয়ে গেছে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, মরে। আমি কোল দিতে এসেছিলাম, আর কোল দেওয়ার নেই, বোবার মতো ইংলিশ বলি, অতুলদা যাও বরফ নিয়ে এসো, পিঙ্কি যা বলেছে ঠিক বলেছে, ও মরে যাবে আমি পিঙ্কি হয়ে থাকব, ওর মা বাবা কেউ নেই এখেনে, দেখতে আসবে দূর থেকে, বরফ লাগবে, পিঙ্কি মরে গেল, আমি পিঙ্কি হয়ে গেলাম

অতুলদা।

বুলি গুন-গুন করে একই কথা বলে যাচ্ছিল। অতুল দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে কিশোরীর কথায়। তার একবার মনে হচ্ছে অন্ধকারে ওকে চুমু খায়, চোখের জল মুছিয়ে দেয়, পরমুহূর্তে কথাগুলি শুনে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে সে। তখন দূরে শোনা যায় অধীর বোসের গলার স্বর। সে খুঁজতে বেরিয়েছে মেয়েটাকে। পরের মেয়ে। হারিয়ে গেলে বিপদ। হাতকড়া পড়বে। যদি কিছু হয়ে যায়! অধীর বোসের গলার আওয়াজে অতুল পালায় অন্ধকারে। অধীর এসে বুলির হাত ধরে, ঘরে চ।

ঘরে ফিরতে ফিরতে বুলি বলে, কাকাবাবু আমিই আসল পিঙ্কি, আমার ইচ্ছে হয় ড্রেস পরে স্কুল যাই ইংলিশ বলি ক্যাডবেরি খাই, খুব ইচ্ছে, আমি নজর দিয়েছি তাই পিঙ্কি ফেল মারছে, মাসি পড়াতে পারছে না, মাসি কি ইংলিশ জানে না? বলতে বলতে বুলি কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ফ্ল্যাটে ফেরে।

ফ্ল্যাটের গোলমাল অনেক রাত্তির পর্যন্ত গড়ায়। ঝর্ণা আর অধীর একে অন্যকে দোষ দেয়। দোষ দিতে দিতে পিঙ্কির উপর রাগ ফলায়। রাগ ফলাতে ফলাতে এক সময় তারাও ঘুমোয়; সবাই ঘুমোয়। শহর ঘুমোয়। বস্তি ঘুমোয়, আকাশ ঘুমোয়, মাটি ঘুমোয়। শুধু ঘুম আসে না বুলির। সে দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে।

রাত গভীর, বয়স্ক। বুলির চোখ বস্তির দিকে, পথে। ওই পথ দিয়েই তো অতুল আসবে ভ্যান রিকশা ঠেলে। ভ্যান রিকশায় বরফ চাপিয়ে টানতে টানতে টানতে ফ্ল্যাট বাড়ির দিকে আসবে অতুল। অনেকবার দেখেছে বুলি। অনেকবার। মনে পড়লেই গা হিম হয়ে যেত। আজ তো একটুও তেমন হচ্ছে না। মরেছে পিঙ্কি।

বুলি দেখল অতুল আসছে। বরফের পাহাড় টানতে টানতে আসছে রোগা প্যাংলা অতুল। আসছে, শুধুই আসছে। বরফ এনেই যাচ্ছে। রোগা প্যাংলা শরীর বরফের অত কাছাকাছি থেকেও ঘামে ভিজে যাচ্ছে। মুখখানিতে হাসি। ভ্যান রিকশা টানতে টানতে অতুল গুন গুন করছে, বেদের মেয়ে জোসনা আমায় পাগল করেচে—হ্যাঁ, অতুলের মুখেই গানটা শুনেছিল বুলি প্রথম। তাকে দেখেই হয়ত! কনুই দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে গান গেয়ে গেয়ে বরফ আনছে রোগা অতুল মড়া জিইয়ে রাখবে বলে। মড়া বাঁচিয়ে রাখতে পারে সে। মড়াকে মরতে দেয় না।

বুলির ভালো লাগে অতুলকে। গা সিরসির করে ওঠে। বড় হয়ে গেল সে। মুখ চেপে ধরে ব্যালকনির গ্রিলে। দাঁত ঘষে গ্রিলে। দাঁতে গ্রিল কাটতে থাকে সে। সে আর পিঙ্কি। ওই যে পিঙ্কি। কখন উঠে এসেছে তা টেরও পায়নি বুলি। মধ্য রাত জুড়ে গ্রিলজালের লোহায় দাঁত ঘষার শব্দ উঠতে থাকে। বুলির ডাকতে ইচ্ছে করে অতুলকে, অতুলদা!

অতুল আসছে। আসতেই থাকে বরফ সমেত। তাকে একজন ডাকতে থাকে। সে বুলি হতে পারে, পিঙ্কি হতে পারে। পিঙ্কি হতে পারে, বুলিও হতে পারে। মরেছে একজন, তার বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই এখানে। তাই বরফ ডাকছে আর একজন, সে পিঙ্কি অথবা বুলি। ইংরিজি বললেই চেনা যাবে। ওপারেতে কালো রঙ...বললেই চেনা যাবে। কিন্তু ওরা তো কিছুই বলছে না। পৃথিবী এমন নীরব, নিঃঝুম, নিঃস্পন্দ ছিল জন্ম মুহূর্তের আগে। হয়ত তারও আগে।

(শারদীয় বারোমাস—১৯৯৫)

স্বদেশযাত্রা

একটা গোটা ইলিশ নিয়ে বাড়ি ফিরছে যোগেন সাধু, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ অফিসের ক্যাশবাবু। সিজিনে এই প্রথম, বেশ বড়সড় দেখেই কিনেছে। এবার বাংলাদেশের মাছ আসছে না, কাগজে তাই পড়েছিল, কিন্তু মাছওয়ালা ননী দিব্যি দিয়ে বলল, খাঁটি পদ্মার, সরকার না আনলেও তাদের আনতে হয়, বর্ষায় যদি পদ্মার ইলিশ না খাওয়াতে পারল তো মাছের ব্যবসা কেন?

মাছটি বেশ পছন্দ হয়েছে যোগেনের। ছুঁচোল মাথা, চ্যাটালো পেট, চকচকে রুপো রঙের ভিতরে আবছা লাল আভা ছড়িয়ে আছে। দেড় কে.জি ওজন হল। ডিম নেই গ্যারান্টি দিয়ে বলেছে ননী। কেটে কুটে দেবে বলেছিল মাছওয়ালা। যোগেন কাটতে দেয়নি, গোটা একটা ইলিশ নিয়ে বাড়ি ফেরার মেজাজই আলাদা। তারপর এক কাপ চা নিয়ে ইলিশ কাটা দেখবে সে। তার বউ অণিমা মাছ কাটে চমৎকার, বিশেষত ইলিশ। অণিমা কাটা মাছ পছন্দ করে না। নিজে না কুটলে মাছের স্বাদই পাওয়া যায় না, এই হল অণিমার মত। ধারালো বঁটিতে আড়াআড়িভাবে মস্ত ইলিশটা ছুঁইয়ে আচমকা পেটের কাছ থেকে দু'খন্ড করে ফেলায় আসল আনন্দ। কাঁচা ইলিশের গন্ধও কি কম মধুর! তেল, রক্তের মিশেল দেওয়া কাঁচা কাঁচা বুনো বুনো গন্ধটা যখন ওঠে দুখন্ড করা মাছ থেকে, অণিমা বলে, ইলিশের সব ভাল—এমন কী আঁশও। আঁশ ছাড়াতে কী ভালোই না লাগে তার। এক এক সময় পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ যোগেন তার চল্লিশ পেরুনো বউকে বলে, তুমি আর জন্মে মেছুনি ছিলে, অভ্যেসটা ছাড়তে পারোনি।

অণিমা রাগে না, হেসে বলে, মেছুনির কাছেই তো বেশি ভিড় বাবুদের, ঘিরে একেবারে ভনভন করে, হ্যাঁ গো তেমন মেছুনি আর আছে?

নাকে নোলক, পায়ে রুপোর গোড়, মোটাসোটা কালো-কোলো পান চিবোন মাসি? না, কোথায় তারা? কবে যে উধাও হয়ে গেল এই শহর থেকে! যোগেন আর বাজারে বড় একটা দেখতে পায় না।

ফিরতে ফিরতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তে হল যোগেনকে। তার মেছুনি বউয়ের মুখ হারিয়ে গেল মাথা থেকে, ইলিশের থলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে যোগেন ডাকল, এ লছমন, লছমন রাম।

ডাকল কেন লছমনকে? ওই তো ভোজপুরের লছমন রাম ময়লা তুলছে দু'চাকার ঠেলাগাড়িতে। ঠেলতে ঠেলতে ডাস্টবিন, সেখান থেকে ধাপা। ধাপার মাঠে ছড়িয়ে যাবে ময়লা। কপি, পালং, ভুট্টা, ডাঁটা লকলকিয়ে উঠবে। তার ডাক বোধহয় শোনেনি লোকটা, বুরুশ দিয়ে ময়লা ঠেলে একজায়গায় জড়ো করছে। কী ধপধপে ধুতি গেঞ্জি দ্যাখো। ময়লা সাফাই করে বলে পরিষ্কার কাপড় বেশি পরতে হয়, যোগেনের মনে হয় তা। আবার ডাকল

যোগেন। এ-বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে বুরুশ ফেলে তার দিকে হেঁটে আসছে লছমন। কী বলবে যোগেন? ডাকার পরে মনে হল, না ডাকলেই হত। কী দরকার? নিজে থেকেই জানবে না হয়। সে জানাবে কেন? এড়িয়ে যেতেই তো পারত যোগেন। এ কি বলার মতো কথা? ভাবলেই গা সিরসির করে উঠছে এখনও। লছমনকে দেখে যোগেনের মুখে করুণার ভাব জেগে ওঠে।

লছমন রাম এসে দাঁড়িয়েছে যোগেন সাধুর সামনে। প্রায় বুড়ো মানুষটি চোখেমুখে সম্ভ্রম ফুটিয়ে তার সামনে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছে। লছমন এইরকম। খুব ভীতু মানুষ, তায় যোগেন আবার ক্যাশবাবু, যোগেনের হাতে তার বেতন মেলে। কিছুই জিজ্ঞেস করবে না সে যোগেনকে, যতক্ষণ না যোগেন কিছু বলে। যোগেন যদি কিছু না বলে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে বাড়ির দিকে, লছমন জিজ্ঞেসও করবে না সাধুজি ডাকছিল কেন। সে ফিরে যাবে তার কাজে, বুরুশ দিয়ে ময়লা ঠেলতে থাকবে। তার কোনও কৌতূহলও হবে না যোগেন সাধু আচমকা ডেকে চলে গেল কেন। সুতরাং যোগেনের কাছে সুযোগ,সে চলে যেতে পারে। ডেকেছিল, কিন্তু কথা নেই বলে ইলিশ হাতে ফিরতে পারে বাড়ি। অথবা সে লছমনকে জিজ্ঞেস করতে পারে ইলিশটা কেমন? জবাব যোগেন পাবে না জানে, লছমন হাসবে, হেসে ঘাড় কাত করবে, অস্ফুট গলায় বলে উঠবে, হুজুর! তার কাছে যোগেন যে মতামত চাইছে তাই-ই যথেষ্ট, মতামত দেওয়ার সে কে?

যোগেন ভাবল চলে যায়। কিন্তু কথাটা যে না বললেই নয়। লছমনের কাছেই জানা যেতে পারে ভোজপুরের আরও খবর, সে তো ভোজপুরেরই মানুষ। ভোজপুরের মানুষকে সে ভোজপুরের খবরটা জানাবে না? যোগেন সাধু হল কৌতূহলী মানুষ, কত দিকেই না তার কৌতূহল। কত কথাই না সে জানতে চায়; যাচাই করতে চায়। যোগেন কথা বলে খুব বেশি, যোগেন কথা বলতে ভালবাসে; আজ সকালে বাজারে বেরনোর আগে খবরের কাগজে ভোজপুরের বাথানিয়াটোলা গ্রামে স্থানীয় ভূমিহার ভূস্বামীদের গুন্ডাবাহিনী, রণবীর সেনার হাঙ্গামার খবর সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। খবরটা জানাবে মা লছমনকে? লছমন তো আজ না হোক কাল জানবেই। সে জানালে কী আর ইতর বিশেষ হবে? বরং লছমনের কাছে কিছু শোনা যেতে পারে। হাতে এখন সময় অনেক, যোগেন একটু দেরি করে অফিস যায়। যায় কেন, না সকলেই তেমন যায় বলে। যোগেন সাধু আগে অফিসে গিয়ে করবে কী? একা ঘন্টা দেড়েক বসে থাকতে থাকতে সে হাঁপিয়ে উঠবে নিশ্চিত। ঘন্টা দেড়েক কথা না বলা মানে, দম বন্ধ হয়ে আসবে যোগেনের।

লছমন দাঁড়িয়ে আছে, যোগেন এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, আমার নোংরা গলিটায় আবার জল জমতে শুরু করেছে, কোথায় যে আটকে যাচ্ছে জল, লাইনটা দেখতে হবে, নর্দমা সাফ হয়েছে লছমন?

লছমন শুনল, ঘাড় কাত করল, খুব নিচু গলায় বলল, না হই সাধুজি।

থাক, ওসব কথা থাক, কী যেন বলতে ডাকলাম? যোগেন ইতস্তত করে। কী বলতে ডেকেছে সে তা লছমন জিজ্ঞেস করুক। তা করবে না, সে কৌতূহল নেই। যোগেন গলা খাঁকারি দেয়, বিড়বিড় করে বলল, হ্যাঁ রে তুই দেশে যাবি কবে?

পঁচিশ তারিখ, ক্ষেতি কাম—হুজুর?

ক্ষেতি কাম, ছেলে আসছে?

হুজুর। লছমন ঘাড় কাত করল।

দেশের খবর পেয়েছিস?

হুজুর।

যোগেন সাধু টের পায় ভোজপুরের খবর পৌঁছয়নি লছমনের কাছে। এতবড় খবর। তার জিভ সুড়সুড় করে ওঠে, এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় সে লছমনকে বলে, দেশে যেতে হবে না, তোর ভোজপুরে চাষবাস নিয়ে খুব হাঙ্গামা লেগেছে, খবর পেয়েছিস?

লছমনের দুই ঘোলাটে চোখ স্থির। সে যেন ভয় পেয়েছে কথাটায়। তাকিয়ে আছে যোগেনের মুখে, আরও কিছু শুনতে চায়। ভয় আর বিস্ময়ে তার কৌতূহল বাড়লেও তা প্রকাশ করার অভ্যেস লছমনের নেই। যোগেন সাধু যতক্ষণ বলবে, সে শুনবে। শুনবে কিন্তু প্রতিক্রিয়া চেপে রাখবে যতটা পারে। এইভাবেই সে অভ্যস্ত। যোগেন দেখল লছমন ঘাড় তুলে আকাশে চোখ রেখেছে। এতটা সময় বাবু যোগেন সাধুর চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। ঘাড় হেঁট করে থাকলে সব কথা যেন শোনা যায় না। যোগেনও আকাশে তাকায়।

মেঘ আসছে। মেঘে মেঘে ঘন কালো হয়ে উঠছে মাথার আকাশ। এবার মৌসুম আগেই এসে গেছে। এই মৌসুম—বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা মেঘ মানে বীজ, ফসল। বর্ষা এবার সময়ে নেমেছে, দক্ষিণের মেঘ ভেসে গিয়ে উত্তরের পাহাড়, হিমালয়ে বাধা পেয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে উত্তরবঙ্গ, আসাম। পাহাড় না পেরোতে পেরে উত্তরগামী মেঘ পশ্চিমে ফিরে উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার উপত্যকা ধরে এগিয়েছে, নেমেছে বৃষ্টি বিহারের মালভূমি অঞ্চলে। গঙ্গার দুই কূলের জমিতে নেমে পড়েছে মানুষ। রোপণ শুরু হওয়ার মুখে। মৌসুমী মেঘ রাজমহল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, নালন্দা, বৈশালী, পাটনায় বৃষ্টি নামাতে নামাতে পৌঁছে গেছে ভোজপুর। ভোজপুর থেকে তা যাত্রা করেছে আরও উত্তর-পশ্চিমে। লছমন আকাশ দেখতে দেখতে বর্ষা প্লাবিত কৃষিক্ষেত্রের কথা ভাবছে নাকি, ভাবছে দেশে ফেরার দিন এগিয়ে আনবে, না পিছিয়ে দেবে?

চাষের সময় তাকে দেশে ফিরতে হয়। ফসল তোলার সময়ও ফিরতে হয়। লছমন কলকাতায় নেই মানে তার দেশে হয় চাষ লেগেছে, নতুবা ফসল উঠছে। তখন এখানে চলে আসে মহেন্দর, লছমনের বেটা। সে লছমনের হয়ে কাজ করে। বেআইনি, তবু এমনই হয়। মেনে নিয়েছে লছমনের সুপারভাইজার, সরকার। বদলে সে লছমনের কাছ থেকে মাসোহারা পায়। মাস বেতন থেকে কিছুটা লছমন তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত যে তার নামে, তার অনুপস্থিতিতে, মহেন্দর কাজ করতে পারবে সাফাইয়ে। লছমন যাবে এই শ্রাবণের আরম্ভে, ক্ষেতি কাম করে ফিরবে ভাদ্রের শেষে, আবার যাবে অঘ্রানের মাঝামাঝি, ফসল পাকার খবর পেলে। খবর মনে মনেই পেয়ে যায় লছমন রাম। অঘ্রান মাসে গিয়ে ফসল তুলে ফিরতে ফিরতে তার মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের আরম্ভ। এইভাবেই চলছে। ক্যাশবাবু যোগেন সাধু সব জেনেশুনেও তার নামের বেতন তার ছেলেকে দেয় টিপসই নিয়ে। যোগেনের কাছেও তাই লছমন কৃতজ্ঞ। ইচ্ছে করলেই যোগেন তার বেতন আটকে দিতে পারে, চাকরিও খেয়ে নিতে পারে। অথচ যোগেন তা করে না, বিনিময়ে লছমনের কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় না। যোগেন বলে, আমাদের ফ্যামিলি কলকাতার সবচেয়ে পুরনো, কতকালের ব্যবসা আমাদের, আমি না হয় ব্যবসা না করতে পেরে কর্পোরেশনে

ঢুকেছি, তাই বলে পারিবারিক আভিজাত্য নেই, সাফাই মজুর লছমনের কাছ থেকে আমি নেব টাকা! এত অভাব পড়ে গেছে নাকি?

আগের ক্যাশবাবু নিত, যোগেন নেয় না। নেয় না বলেই লছমন যোগেনকে ভয় করে। যোগেন তা বোঝে। লছমন জানে, যোগেন ইচ্ছে করলেই তার অনুপস্থিতিতে তার বেতন বন্ধ করে দিতে পারে, চাকরি খেয়ে নিতে পারে। সে যখন দেশে যায়, কতবার যে অর্ধসমাপ্ত কথা বলে গেছে যোগেনকে হুজুর, সাধুজি, হামি ভোজপুর চলি, ক্ষেতি কাম—।

যোগেন শোনে, কোনও মন্তব্য করে না।

সাধুজি, মহেন্দর হামার কাম—।

যোগেন দেখে বাপের পিছনে সদ্য ভোজপুর থেকে আসা মহেন্দরের মুখ। মুখে ভোজপুরের ধুলো বাতাস লেগে। মাসখানেক এই শহরে থাকলে তা উবে যাবে। যোগেন তখন খবর নেয় ওই দেশের, এ মহেন্দর, খবর সব ভাল?

মহেন্দর হাসে, হুজুর, ভাল।

ভুমিহার রাজ চলছে?

মহেন্দর হাসে, হাঁ সাধুজি।

মহেন্দরের বয়স বছর পঁচিশ। এর ভিতরে তিন সন্তানের জনক। সে তার বাবার মতো অতটা মুখচোরা নয়, কথা বলে একটু আধটু। জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে না, খবর দেয়। কিন্তু যোগেন যখন জিজ্ঞেস করে, চাষের সময় সে থাকে না কেন দেশে, বুড়ো বাপকে ওখানে পাঠিয়ে সে চলে আসে কেন কলকাতায়, মহেন্দরের মুখে তখন আবছা অন্ধকার। যোগেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, রোয়া-কাটাই এর সময় লছমন দেশে না থাকলে কাজই হবে না, মহেন্দর থাকলে ধান ঘরে উঠবে না, জমিতে নামাই যাবে না।

যোগেন সাধু বলল, মহেন্দর কবে আসছে?

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে লছমন বিড়বিড় করে, এক্কিশ তারিখ।

যা তুই কাজে যা। যোগেন পা বাড়াল। ইলিশ নিয়ে দাঁড়ান যায় না বেশি সময়। কথাটা বলে দিয়েছে, এখন যা করার করুক লছমন। হনহন করে হাঁটে যোগেন।

দুই

যোগেনের মেছুনি বউ ইলিশ কাটতে পেরে খুব খুশি। তাকে ডাক দিচ্ছে, দেখে যাও কী রক্ত, ডিমও আছে পেটে।

রাস্তার ধারের ঘরে খাটের উপরে চায়ের কাপ নিয়ে যোগেন কাগজটা আবার দেখছিল। ভোজপুরের বাথানিয়াটোলার খবর ডিটেলে ছেপেছে। খবরের কাগজের লোক পারে বটে, ঠিক চলে গেছে ওখানে। বাথানিয়াটোলার চাপা কান্না—পর পর শায়িত মৃতদেহের ছবিও ছেপেছে। অণিমার ডাকে যোগেনের পাঠে ভঙ্গ হল, সে বলল, ডিম তো থাকার কথা নয়।

রয়েছে, দেখে যাও, ডিমভরা ইলিশ, ইস কী সুন্দর গন্ধ!

কাঁচা ইলিশের গন্ধেই যোগেনের বউ চনমন করে উঠেছে। এখন বাড়িতে যোগেন আর অণিমা। মেয়েকে ভোরবেলা স্কুল বাসে তুলে দিয়েছে যোগেন। সে কাগজ রেখে চায়ের কাপ হাতে কলতলার দিকে এগোল, অণিমার ভিতরে এমন সরসতা আছে যে এখনও যোগেনের

মাথা ঘোরে, আচমকা সে গরগর করে ওঠে। হাতে রক্ত মেখে অণিমা হাসছে, ডিম দেখেছ!

যোগেন বলল, ঠকাল ননী।

ঠকাল কোথায় গো, কী সুন্দর মাছ, খুব তেল আছে।

ডিমঅলা মাছে স্বাদ থাকে না। বলেই চমকে ওঠে যোগেন। গা সিরসির করে ওঠে যে কেন তা যোগেন ধরতে পারে না। বাথানিয়াটোলার খবরটি মনে পড়ে গেল। অণিমাকে বলবে? মেয়েরা খুন হয়েছে বেশি। এক প্রেগন্যান্ট মহিলাকে ধর্ষণ করে গলা কেটে—। না, না ওসব ওকথা অণিমা শুনবে কেন? অণিমা তার কথায় হাসছে, দুখন্ড মাছের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে বটির ধারালো গা দিয়ে কলতলায়। তিন আঙুল দিয়ে ডিম বের করতে করতে অণিমা বলল, ডিমঅলা মাছও তো ছাড় না, তোমাকে আমি খুব জানি, পাজি!

যোগেন দাঁতে ঠোঁট কাটে। জবাব দেয় না। কাগজ পড়ার পর থেকে জিভটা সুড়সুড় করছে। কথা না বললে পারে না, কিন্তু অণিমাকে কথাটা বলতে ভয় হচ্ছে। কেমন যেন লাগছে! কেন যে ইলিশ আনতে গেল আজ? দেখে এমন হল। নতুন ইলিশ! আচ্ছা সে এসবই ভাবছে কেন, কী হয়েছে তার? কাগজে খবর তো খবরই। তাই তো হয়। অণিমা শুনলে আর একপ্রস্থ রাগ করবে, সকালবেলায় আর কথা পেলে না, জমাদার, মেথরকে মাইনে দিতে দিতে যত নোংরায় তোমার চোখ।

কচু শাক ওঠেনি, ইলিশের মাথা দিয়ে রাঁধতাম। দুহাতে ধরে মাথাটা দুখন্ড করতে করতে রক্তমাখা হাতে অণিমা আবার বলল, কী তেল!

যোগেন চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে যাবে। বাথানিয়াটোলার খবর তকে টানছে। তার মনে হল জানালায় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। আলো আড়াল করেছে সে, তাই ঘর যেন অন্ধকার হল একটু। নাকি মেঘ আরও ঘন হয়েছে। ঘরে ঢুকে যোগেন দেখল তার অনুমান সঠিক। জানালার ওপারে বিপন্ন মুখ। লছমন এসে দাঁড়িয়েছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে খাটে উঠে যোগেন হাসে, কী হল?

হুজুর, সাধুজি।

এখন যোগেনকে বুঝে নিতে হবে কী বলতে চায় লছমন। কথা না বলে বলে এমন হয়েছে ওর যে কী কথা বলবে তাই ই ঠিক করতে পারে না। ওর ছেলে মহেন্দর এরকম নয়। মহেন্দর কথা বলে। বলে বলেই নাকি চাষের সময় দেশে থাকতে পারে না। ওর দেশে কথা বললে কাজ হয় না। হরিজন যত চুপ করে থাকবে তত নিরাপদ। ক্ষেতি কামে ফি-বছরই তো ঝুটঝামেলা লেগে থাকে। তাদের দু'বিঘে চাষ জমি আছে ধানের, বাকি যা পেয়েছিল মহাত্মা বিনোবা ভাবেজির ভূদানে চল্লিশ বছর আগে, তা টাঁড়, পাথুরে জমি, ঘাসও হয় না সেখানে। ভূমিহার রাজপুত, জমিনদারের কাছ হাতজোড় করে বিনোবাজি গরিব আদমির জন্য ওই জমি পেয়েছিলেন। দু'বিঘে চাষ জমি ভূমিহার রাজা দশরথ সিংজির দাদাজি, ঠাকুর্দা মাখ্খন সিংজি দিয়েছিল মহেন্দরের ঠাকুর্দা চিটা রামকে হরসাল কাম কাজ করার জন্য। ও জমি দানের। ও জমি চাকরান সম্পত্তি। চাকরের পেটভাতা। বিনা খাজনায় ভোগের কিন্তু বদলে বেগার কাম করতে হবে। এখন ও জমির খাজনা আছে। সরকার নেয়। জমিদার খাজনা নেয় না, [illegible] চাকরান জমি বলে বেগার তো দিতে হয়ই। আইন যা হোক, ভোজপুরে এমন রীতি।

যোগেন সাধুর কত কৌতূহল! অবাক হয়ে সে চাকরান জমির কথা শুনেছে। আগে যেমন হত, এখনও তেমন, ভূমিহার রাজের কাম করে দিলেই তবে চাষে নামা যায়।

লছমন ডাকে, হুজুর, সাধুজি।

কী হল লছমন?

ভোজপুর—! লছমন কথা শেষ করে না অভ্যাসে।

হ্যাঁ, ভোজপুরে রণবীর সেনা, আরে তোর দেশের লোকের নিজস্ব আর্মি আছে, কী জায়গারে লছমন, শুনেছিস কিছু?

হুজুর! লছমনের চোখ পশ্চিমগামী মেঘের ছায়া ধরে।

বিপদে পড়েছে যোগেন সাধু। কী কুক্ষণেই যে বলতে গিয়েছিল ভোজপুরের কথা। এখন তাকে বলতে হবে সব। চোখ ছলছল করছে লছমনের। টের পেয়ে গেছে। কখন তার দেশে জল নামবে তা যেভাবে টের পায় কলকাতার আকাশ দেখে, সেইভাবেই বোধহয়। আন্দাজ করেছে সবই হয়তো।

যোগেন বলল, কিছু না, নকশালদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে রণবীর সেনার, কী দেশ রে, জমির মালিকরা সেনাবাহিনী পোষে, রাইফেল স্টেনগান নিয়ে তারা খতমে বেরোয়, আইন নেই?

লছমন জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, কী হল হুজুর?

সবটা জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছে লছমন। ভয় না হতেও পারে, হয়তো অভ্যাসে। কথা শোনা তার দেশ গাঁয়ের অভ্যাস, কথা বলা নয়। এই শহরে এসে তা বদলায়নি এতটুকুও।

যোগেন বলে, ভোজপুর তো একটু জায়গা নয়, তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?

হুজুর!

যোগেন বলে, কুড়ি টাকা করে মজুরি ঠিক হয়েছিল, তা মানবে না মালিক, এই যা কাগজে লিখেছে, ও লছমন বাথানিয়াটোলা জানিস?

লছমন জানালার গরাদ ধরে ফেলেছে। যোগেনের চোখে বিভ্রম। গরাদ মুঠিতে ধরা লছমন রামকে আচমকা তার খাঁচাবন্দি মনে হয়। লছমনের পিছনে মেঘে ঢাকা পৃথিবীর ময়লা আলো, আকাশ, দূরে গাছগাছালির সবুজ, তবু যোগেনের বিভ্রম যায় না। সে উঠে নিজের ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেয়। লছমন গরাদে মুখ ঠেকিয়ে আছে।

যোগেন বলে, যা, কিছু হয়নি, কাম কর, আমার বাড়ির পিছনের ময়লা গলিটা দেখিস তো।

লছমন বলে, আদমি মর গিয়া?

সে তো মরবে।

হুজুর, গাঁওটা কী হল?

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে লছমন রাম। বাথানিয়াটোলা বলে যোগেন অতি কষ্টে হাসে, ভোজপুর কত বড় জায়গা, কলকাতার বালিগঞ্জে ঝামেলা হলে এই টালায় কিছু বোঝা যায়?

লছমন রাম ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে, হামার লেড়কির শ্বশুরঘর।

গায়ে রোঁয়া কাটল যোগেনের। কী বলছে লছমন? এমনও হয়? এতটা মিলে যায়?

মেলে না বলেই তো জানে যোগেন। ভোগপুরে গণহত্যা হয়েছে, তার সঙ্গে ভোজপুরের লছমন রামের কোনও যোগ থাকবে না এই তো স্বাভাবিক। তেমনই তো হয়ে থাকে, যোগেনের অভিজ্ঞতা তাই বলে। কলকাতা শহরেও তো কম ঘটনা ঘটে না, তার সঙ্গে যোগেনের কোনও যোগাযোগ থাকে? কলকাতায় বাস অ্যাকসিডেন্ট, পুলিশের গুলিতে, পার্টিতে পার্টিতে বোমা বাজির কারণে মানুষ তো মরে প্রায়ই। কলকাতার আশপাশে মরে। কিন্তু যোগেনের চেনা, যোগেনের কোনও স্বজন আত্মীয় মরেছে ওই সব ঘটনায়? মরেনি। এত যে রেল দুর্ঘটনা, বিমান দুর্ঘটনা, নৌকাডুবি, অগ্নিকান্ড হয়, তাতে যোগেনের কিছু হয়েছে কখনও? তার চেনাশোনা কেউ মারা গেছে? শোনেনি যোগেন। সে খবরের কাগজ পড়েই খালাস। কাগুজে উত্তেজনা নিয়ে ক'দিন কাটিয়ে খালাস। হ্যাঁ, পঁচিশ বছর আগে, নকশাল আমলে তার দুই সহপাঠীর লাশ বেলেঘাটার রাস্তায় পড়েছিল ভোরবেলায়। পুলিশ আগের রাত্রে বাড়ি থেকে তুলেছিল তাদের। তখন প্রতিদিন কত মৃত্যু! পুলিশ না গুনে লাশ ফেলেছে এখানে ওখানে। সেই প্রথম যোগেন দেখেছিল যে চেনা মানুষও মরে ওভাবে। কিন্তু সে কতকাল আগের কথা! ভুলেই গেছে যোগেন তার সহপাঠীদের মুখ। আর তাদের উপর তার যে খুব টান ছিল একথা কেউ বলতে পারবে না। নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল না বলেই তো যোগেন এতদিন বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। মৃত সেই দুজন ছিল খুব অহঙ্কারী, তাদের কথা যোগেন বুঝত না। সুতরাং সেই মৃত্যুও স্বজনের মৃত্যু নয়। তারপর তো সব শূন্য। যোগেন অবাক হয়ে লছমন রামের দিকে তাকিয়ে আছে। এভাবে যে মিলে যাবে তা তার কল্পনাতেও আসে না। এভাবে কি মিলতে পারে? কতবড় ভোজপুর, তার ভিতরে ধূলিকণার মতো একটা গাঁ বাথানিয়াটোলা, সেখানেই কিনা লছমনের মেয়ের শ্বশুরঘর! একে একে দুই হয়ে যাচ্ছে যে সব। যোগেন ভাবে, তার সামনে, গরাদের ওপারে কি তার মৃত সহপাঠীদের কেউ এসে দাঁড়াল? গা কাঁপছে যোগেন সাধুর। যে কাগুজে উত্তেজনা পোহানো তার অভ্যেস, সেই কাগজে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুড়ে যাচ্ছে গা।

গরাদে মাথা ঠোকে লছমন, সাচ বাত হুজুর।

সাচ বাত মানে বাথানিয়াটোলায় লছমনের মেয়ে সংসার করতে গেছে। কিন্তু বাথানিয়াটোলা কি ভোজপুরে একটা? আর নেই? কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাবে যোগেন তো শুনল, লেড়কির খবর এসেছিল হুজুর, মহেন্দর গেল মাহিনায় চিঠঠি পাঠালো।

কী চিঠি? জিজ্ঞেস করতে হবে না যেগেনকে। সে টের পেয়ে গেছে বিবাহিতা কন্যার কী খবর পেয়েছিও লছমন। কী খবর আসতে পারে। হ্যাঁ তাই, লছমন বলছে, তার লেড়কির বাচ্চা হবে কার্তিক মাসে। সে এবার গিয়ে বিশ মাইল পশ্চিমে বাথানিয়াটোলা থেকে মেয়েকে ঘরে আনবে ক'দিনের জন্য। ক্ষেতি করে মেয়েকে শ্বশুর ঘরে রেখে কলকাতা ফিরবে তাড়াতাড়ি, তারপর কার্তিক মাসে, ফসল পেকে ওঠার আগেই চলে যাবে। বড় পেয়ারের লেড়কি তার। বাচ্চা হওয়ার সময় তার বউকে পৌঁছে দেবে ওখানে। নিজেও থাকবে। মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছে লছমন।

শুনতে শুনতে যোগেন সাধু অবাক হচ্ছিল। যে লছমন কথা বলে না, সেই লছমন গড়গড় করে বলে যাচ্ছে সব। আর তার নিজের কথাই গেছে বন্ধ হয়ে। লছমন বলছে, তার ছেলে লিখেছিল মজুরি নিয়ে খুব ঝামেলা শুরু হয়েছে এবার তার গাঁও সুরজপুরে ভি।

যোগেন বলল, তোর জামাই তো নকশাল করে না।

লছমন নিশ্চুপ। যোগেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। লছমনের দু চোখ দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। যোগেন ওঠে। উঠতে উঠতে ভাবে, তার কথাটা কি ঠিক হল? কে নকশাল, কে নকশাল না, তা দেখে তো মানুষ মারেনি ভূস্বামীদের প্রাইভেট আর্মি। নকশালদের উপর রাগ মেটাতে সাধারণ নিরীহ মানুষ মেরে গেছে। তাদের অপরাধ, তারা আগের মতো থাকতে চাইছে না। তারা আর হুজুর মা বাপ বলে বিনা মজুরিতে শ্রম দিতে চাইছে না। তাদের নাকি এসব শেখাচ্ছে নকশাল পার্টি। বাথানিয়াটোলায় যখন হাঙ্গামা হয় পুরুষরা গাঁয়ে ছিল না, তারা কাজে গিয়েছিল। রণবীর সেনা মেয়েদের মেরেছে, ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছে, শিশুদের সেই আগুনে জীবন্ত পুড়িয়েছে, বুড়োদের মেরেছে। হাতের কাছে যাদের পেয়েছে মেরেছে, ধর্ষণ করেছে গর্ভবতী বধূকে। সব কাগজের খবর। হত্যা করে তারা উল্লাস করতে করতে ফিরেছে। যোগেন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। সে দাঁড়াতে চায় না লছমন রামের সামনে, বলে, উঠি, স্নান করতে হবে, অফিস না গেলে কি চলবে?

কথাটা বলে যোগেন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এ ঘর, ও ঘর, বাড়ির সর্বত্র এখন সুস্বাদু ইলিশের গন্ধ মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইলিশের গন্ধ যেন তার ঘর ছাড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। ভাজা ইলিশের গন্ধ নিতে নিতে যোগেন একবার ঘুরে তাকায়, লছমন জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গন্ধটা তাকেও যেন মোহিত করেছে। যোগেন শেভিং সেট, তোয়ালে, শ্যাম্পু, সাবান নিয়ে স্নানের উদ্যোগ নেয়। অনিমা তাকে জিজ্ঞেস করে, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

লছমনের সঙ্গে।

জমাদার? ডাকো ডাকো, গলিটা সাফ করতে বল, জল আটকে রয়েছে ক'দিন ধরে।

যোগেন বলল, আজ থাক।

থাকবে কেন, দেখছ না কীরকম বর্ষা নামছে, মাগো! কী নোংরা ওদিকটা। অনিমা চট করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লছমনকে ডাকতে ডাকতে, জমাদার অ্যাই জমাদার, কই নেই তো।

যোগেন চুপ করে থাকে। লছমন বোধহয় অনিমার ডাক শুনেই চলে গেছে, নাকি তার আগেই? সে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখে, নেই লোকটা। অনিমা রাগ করে, পালিয়েছে, এমন চালাক যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, আজ বাথরুম পায়খানাও পরিষ্কার করেনি।

যোগেন বলে, পরে আসবে হয়তো।

আর এসেছে। অনিমা গজগজ করতে থাকে, এখন আমাকে ওসব করতে হবে, বাথরুমটা কী পিছল হয়েছে, কোন দিকে দেখব আমি।

যোগেন বাথরুমের দিকে হাঁটল। একটু সাবধানেই না-হয় পা ফেলবে। দাড়ি কামিয়ে স্নান শেষ করতে তার আধঘন্টা যাবেই, বেশি তো কম নয়। স্নানবিলাসী মানুষ সে, মাসে ছখানা সাবান একাই ক্ষয়ে ফেলে।

তিন

ইলিশের স্বাদ জিভে নিয়ে যোগেন অফিসে চলল। সঙ্গে খবরের কাগজটা নিল। আজ তেমন কাজ নেই। পেমেন্টের দিন তো নয়। এদিন সে ক্যাশবুক সারে। তার ক্যাশ পেমেন্টের

জায়গা জালে ঘেরা খাঁচা। খাঁচায় বসেছে যোগেন বড় খাতা নিয়ে। কিন্তু মন কি বসে? চঞ্চল হয়েছে যোগেনের সর্বাঙ্গ। খবরের কাগজটা মেলে ধরেছে খাতার উপর। একই খবর আবার পড়তে পড়তে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় থেকে থেকে জেগে উঠছে যোগেন সাধু। সিগারেটের পর সিগারেট ধরাচ্ছে। কাগজ বন্ধ করছে, আবার খুলছে। একবার ঢেকুর উঠল ইলিশের। গন্ধটা পেল যোগেন। আশ্চর্য! এ কখনও হতে পারে? এমন অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি। খবরের কাগজের খবর মিলে যাবে তার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, এ কেমনভাবে হতে পারে? যোগেন যে ভাবতেই পারেনা অতদূর ভোজপুরে গণহত্যায় হত মানুষের স্বজন তার খুব চেনা। জানালার ওপারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে প্রতিদিনই কথা বলে সে। লছমনের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাথানিয়াটোলা গাঁওয়ে। তার মেয়েও সন্তান ধরেছে পেটে। জন্ম দেওয়ার জন্য শিহরিত হতে হতে অপেক্ষা করছিল এক মধুমাসের জন্য। কার্তিকেও তা মধুমাস লছমনের কাছে, তার কন্যার কাছে। এত মিল হয় কীভাবে? আচ্ছা, তার মেয়ের নাম কি ফুলমোতিয়া দেবী, যাকে হত্যা করেছে ভূমিহার জোতদারের সেনাবাহিনী?

যোগেনের তো মনে হয় এইসব দুর্ঘটনায়, হত্যাকান্ডে, ভূমিকম্পে, বন্যায় যারা মরে তারা বোধহয় কারও চেনা মানুষ নয়। তারা কারও স্বজন নয়, পুত্র নয়, পুত্রী নয়, পিতা নয়, মাতা নয়। তারা যেন স্বয়ম্ভু। খবরের কাগজের রিপোর্টাররাই শুধু চেনে তাদের। গণহত্যায়, দাঙ্গায়, বানে, বন্যায় মরার জন্য ধর্ষিতা হওয়ার জন্য, পোকার মতো আগুনে পুড়ে মরার জন্য কিছু মানুষের জন্ম হয় এই পৃথিবীতে। তাদের সবার মুখই যেন একরকম। মনে হয় তারা যেন অন্য গ্রহ থেকে এই মৃত্যু, এই অপমান বহন করার জন্য নেমে আসে পৃথিবীতে। এই তাদের কাজ। তাদের সঙ্গে যোগেনের অতি পরিচিত লছমন রামের সম্পর্ক এত নিবিড় হবে কেন?

যোগেন কথাটা তুলতে চায়। কেউ শোনে না। শুনলেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না। যোগেনের সহকর্মীরা কেউই প্রাত্যহিক রসালো গল্পের ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে চায় না। সিনেমার নবীন নায়ক-নায়িকা, তাদের নানা কেচ্ছা, টিভি সিরিয়াল, ক্রিকেট নিয়ে গল্প করতে করতে কে শুনবে ভোজপুরের খবর? শুনে তারা করবে কী, আলোচনা কি এগোবে? তারা যে ভোজপুরের কোনও খবরই রাখে না। যোগেন যদি বলে তাদের ওয়ার্ডের সাফাই মজুরের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে, তাতেও তারা বিচলিত হয় না, বলবে, এদিক থেকে তাড়া খেয়ে এদিকে গিয়ে জুটেছে নকশাল পার্টি, এমন তো হবেই।

যোগেন একা হয়ে যায়। কখনও তার মনে হয় লছমন রাম ঠিক বলেনি। হতেই পারে না। লছমন কেন মিথ্যে বলবে তা যোগেন খুঁজে বের করতে পারে না। নানারকম ভাবছে যোগেন সাধু। ভোজপুরের যে খবর সে পেয়েছিল গেল শীতে, ফসল কাটার সময়ে মহেন্দর-এর কাছ থেকে তা মনে পড়ে যায়। সে জানে কেন লছমনকে চাষের সময়, ফসল কাটার সময়, ফসল তোলার সময় দেশে যেতেই হবে। এই বর্ষায় ক'দিন বাদে শহর ভেসে যাবে। ভোজপুর থেকে আসা মহেন্দর যখন রাস্তার ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে জলে দাঁড়িয়ে জল সাফ করতে থাকবে তখন হয়তো তার বাবা লছমন রাম ছ'মাস বাদে দেশে ফিরে ভূমিহার রাজ দশরথ সিংহের পায়ে একশো টাকার নোট রেখে, মাথা ঠেকিয়ে চাকরান জমিতে নামার অনুমতি চাইবে। চাকরান সম্পত্তি, তাই অনুমতি এখনও চাইতে হবে। লছমনের

বাবা চাকর হয়েছিল মাখ্খন সিংহের কাছে। তার ফাইফরমাশ খাটত, কোঠি সাফ করত, ক্ষেতি জমিনে বেগার দিত, ভূমিহাররাজের পিছে পিছে হাঁটত, নয়া লেড়কি নিয়ে বাবু ফূর্তি মারলে দরজার বাইরে লাঠি নিয়ে বসে থাকত—এইজন্যই তো জমি পাওয়া। চাকরান জমি কত আছে? যে মুচি জুতো দিত তার জন্য জমি দিত ভূমিহাররাজ, যে লোক হাতিঘোড়ার দেখভাল করত, তাকেও জমি দিয়েছিল মাখ্খন সিংহ। এখন তাদের নামে, বাবা লছমন রামের নামে তবু বেগার দিতে হবে, চাকর খাটতে হবে। ভোজপুরের যা আইন সব ভূমিহাররাজের। সরকার নেই। পুলিশ নেই। সরকার, পুলিশ ভূমিহাররাজের আইন মানে।

মহেন্দর সব বলেছে একটু একটু করে। সে দশরথ সিংহের ফরমান মানে না, বেগার কাম করতে চায় না, তাই তার বাবাকে যেতে হয়। সে থাকলে চাষের জমিতেই নামতে পারবে না তারা। দশরথ সিংহ তাকে নকশাল বলে। মহেন্দর নকশাল চেনে না, কিন্তু তাদের কথা শুনেছে এর ওর মুখে। আরা টাউনের কাছে নকশাল পার্টি ঢুকে পড়েছে এ গাঁ ও গাঁয়ে। মহেন্দর এক একবার ভাবে তার গাঁও সুরজপুরে নকশাল পার্টিকে টেনে আনে। দশরথ সিংহ একবার তাকে নকশাল বলে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। খুব পিটাই করেছিল পুলিশ। শেষে বাবা লছমন রাম খবর পেয়ে দেশে ফিরে ভূমিহার রাজের পায়ে মাথা ঘষে তাকে খালাস করেছিল। একবার তার বাবা লছমনকে ধরে জুতো পিটাই করল দশরথজি, মহেন্দর তখন কত ছোট। আবছা মনে পড়ে। শুনেছে তারপর থেকে বাবা লছমন দশরথজির পা ধরে ফসল বোনা, ফসল কাটাই করে। চাকরান জমি, চাকর হয়ে থাকতে তো হবেই। চাকর না হয়ে থাকলে, সিংজি ফসল কাটাইয়ে সময় জমিনে দশটা ভৈষ ছেড়ে দিয়ে ফসল নষ্ট করে দেবে। দরকারে গোলি করে মেরেই দেবে। কে কী বলবে? দরকারে ঘরের লেড়কি টেনে নিয়ে যাবে নিজের কোঠিতে, কে কী বলবে? বেগার দিলে তবে হরিজন জমি চষতে পারে, হরিজনের ঘরের 'বহু, লেড়কি'-র মনে শান্তি থাকে।

যোগেনের সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। মহেন্দরের কাহিনী সে গল্পের মতো করে তার বউ অণিমাকেও শুনিয়েছে। কাগজে খবর যেভাবে শোনায়, সেইভাবে শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে অণিমা হাই তুলেবলেছে, সব মিথ্যে, এমন হতে পারে নাকি, মহেন্দরটা খুব চালাক, কাজ না করার ফন্দি এসব, ওকে বলে দিও প্রত্যেকদিন যেন গলি নর্দমা, বাথরুম, সাফ করে, সেফটি ট্যাঙ্কটা লিক করছে কেন কাল দেখে দিতে বলো তো।

সত্যি, যোগেনেরও তো মনে হতো এসব রং চড়ানো গল্প। যেমন সিনেমায় হয়, তেমনই গল্প। জমিদারি আর আছে নাকি? মগের মুলুক! মহেন্দর একটু ঠেটা ছেলে। ডিউটির কাজ ছাড়া কিছুই করতে চাইত না। শুধু যোগেন সাধুর হাতে বেতন মেলে বলে, তার কাজটা মাথা নামিয়ে করে দেয়। লছমন তো বলেই, সে মরে গেলে জমি থাকবে না, আর কাউকে চাকরান দেবে ভূমিহাররাজ।

সাধুজি হুজুর।

যোগেন চমকে তাকায়, জালের ওপারে বুড়ো লছমন রাম।

হুজুর সাধুজি!

যোগেন উঠল। খাঁচামুক্ত হয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। উত্তেজিত হয়েই আছে সে। তার গায়ে কখন যে কী জন্য রোঁয়া কাটে, জিজ্ঞেস করে, তোর বেটা মহেন্দর নকশাল?

অবাক হয়ে যায় লছমন, মাথা ঝাঁকায়, নেহি হুজুর, নকশাল না হই, সব ঝুটা বাত।

আয় বাইরে আয়। যোগেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এল অফিস চত্বরের বাইরে, খবর পেলি, ও লছমন কেউ কিছু বলল?

লছমন রাম হাসে, বলল হুজুর সব ঠিক হই।

ঠিক আছে! যোগেন অবাক, কী ঠিক?

হামার বাথানিয়াটোলায় হাঙ্গামা হয়নি হুজুর সাধুজি, সুগরিবজি বলল।

কে সুগরিবজি?

দামাদের গাঁও বাথানিয়াটোলার পাশের গাঁও আন্ধারপুরের ভূমিহাররাজ চন্দেশ্বর সিংজির বেটা সুগরিব সিংজি, ভূমিহার হই, কলকাতার পোলিস হই, সল লেক পোলিস লাইনে আছে, ওনার কাছে চলি গেলাম, উনি বলল একথা, হামার ভোজপুরে তিন বাথানিয়াটোলা আছে হুজুর।

কী আশ্চর্য ঘটনা! যোগেন সাধুর নিজস্ব ধারণা, এতকাল ধরে লালিত কল্পনা আবার থিতু হচ্ছে। তাই তো হবে। এতকাল তাই-ই হয়েছে। যোগেন সাধুর বিশ্বাস হয় লছমন রামের কথা। এক নামে পাঁচ জায়গা থাকতেই পারে। এই তো টালার পাশে বেলগাছিয়া, আবার হাওড়ায় রয়েছে বেলগাছিয়া। যোগেন সাধুর যে জমি আছে ক্যানিং লাইনে, মৌজার নাম সীতাকুণ্ডু, একই নামের গ্রাম যোগেন সাধু বানতলা পেরিয়ে পেয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। তার নিজের তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় যোগেন কেমন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে টান দিল। টান দিয়ে লছমনের কথা শুনতে থাকে, লছমন বলছে, তার জামাইয়ের গ্রাম বাথানিয়াটোলায় যদি হাঙ্গামা হত তো সুগ্রীব সিংকে কলকাতায় পাওয়া যেত না। সে কলকাতায় বসে থাকত না। মানুষ খুন করবে কে? ঘরবাড়ি জ্বালাবে কে, কারা? যারা এসব করে তারা নানা জায়গায় পুলিশ, বি এস এফ. রেল পুলিশ-এ কাজ করে। ভূমিহার, রাজপুত, কুর্মিরা যদি হরিজন, চামার, দুসাদের গাঁ জ্বালাবে ঠিক করে তো খত্ চলে যায় পঞ্জাব, ইউ পি, বঙ্গাল, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে। তারা সব উর্দি ছেড়ে ছুটি নিয়ে ভুমিহার, রাজপুত, কুর্মি যাদব হয়ে ফিরে যায় গাঁওয়ে। গাঁওয়ে ফিরে সবাই যে যার রণবীর সেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনা, কুঁয়র সেনা, লোরিক সেনায় ঢুকে পড়ে। সুগ্রীব সিংহ যখন যায়নি, তখন তার জামাইয়ের গ্রামে হাঙ্গামা হয়নি, কিন্তু...।

কিন্তু কী?

সুগরিব সিংজি ফরমান দিল হুঁজুর, হাঙ্গামা, হবে, খত্ এলেই সে চলে যাবে ছুট্টি নিয়ে।

কেন যাবে?

বহুৎ নকশালি উঠা হুজুর, হামার দামাদ বেগার দেয় না, ভূমিহাররাজের কোঠি সাফ করে না, তার পাও-এ শির লাগায় না, ওদিককার সব গাঁও এমন হয়ে যাচ্ছে, সমঝে দেবে ভূমিহাররাজ, হামার বেটার কথা ভি বলল সুগরিবজি।

মহেন্দর?

হাঁ, হুঁজুর, মহেন্দর যে কোনও সালে বেগার দেয় না, তা জানে সুগরিবজি, বিশ মাইল তফাতে থেকেও জানে মহেন্দর ভূমিহাররাজের পাও-এ শির লাগায় না, সব ভূমিহার সব ভূমিহারের খবর জানে হুজুর, সুগরিবজি বলল মহেন্দর ভি খুন হয়ে যাবে তেমন করলে, বহু বাচ্চা সাফ হয়ে যাবে মজুরির কথা উঠালে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।

যোগেন সাধু তো জানে, কোন মানুষ মরে দাঙ্গায়, গণহত্যায়। জানে বলেই লছমনের

এসব কথা তাকে স্পর্শ করছে না। যোগেন সাধু সকাল থেকে ধন্দে ছিল কীভাবে তার কল্পনা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে, তা নিয়ে। যোগেনের চা পিপাসা পেয়েছে। সে অফিস কম্পাউন্ড ছেড়ে বি.টি. রোডের দিকে পা বাড়ায়। আকাশের মেঘ এখন গঙ্গার উজানে উজানে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেছে, গঙ্গার কূল ধরে উত্তর পশ্চিমে এগিয়ে আরো বৃষ্টি নামাবে সে কৃষিক্ষেত্রে। খরাপীড়িত মাটি আকাশের দিকে চেয়ে আছে এখন। বীজ নিয়ে চাষী বসে আছে মেঘের অপেক্ষায়। যোগেন আকাশ দেখে আবার মাটিতে চোখ নামায়। তার পাশে লছমন রাম রয়েছে, ঈষৎ ন্যুব্জ তার দেহটি। লছমন রাম কথা বলেই যাচ্ছে, যোগেন জানে লছমনের ভয়ের কারণ অমূলক। যোগেনের কল্পনা তেমনই। তার ধারণা এত স্পষ্টভাবে মিলে যাবে তা সে ঘন্টাখানেক আগেও ভাবতে পারেনি। বিশ্বাস টাল খেয়ে যাচ্ছিল। এখন তো যোগেন বুঝতে পারছে লছমনের গাঁও সুরজপুরে গণহত্যা হলেও, সে আলাদা কোনও গাঁও হবে, যেমন হয়েছে বাথানিয়াটোলা। যেসব গ্রাম, গঞ্জ গণহত্যার সাক্ষী হয়, সেইসব গ্রাম গঞ্জ যেন এই পৃথিবীর অংশ নয়, এই ভারতবর্ষের মানচিত্রের ভিতরে নেই। এইসব গ্রাম গঞ্জ যেন গণহত্যা, গণধর্ষণের জন্য সৃষ্ট। কিছু মানুষ যেমন হত হতে জন্মায়, ধর্ষিতা হতে জন্মায়, সন্তানহারা হয়ে কাঁদার জন্য জন্মায়, কিছু গ্রামগঞ্জও যেন ক্রমাগত রক্তপাতের জন্য পড়ে থাকে আকাশের নীচে। অনন্ত রক্তপাতের জন্যই সেইসব গ্রাম পত্তন করেছিল এই পৃথিবীর মানুষ কোনও এক দূর অতীতে। ফলে ওইসব মানুষের সঙ্গে যেমন, গ্রামগঞ্জগুলির সঙ্গেও এই ভারতবর্ষর মানুষ যোগেন সাধুর কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। কোনওক্রমেই না। যেমন গড়ে ওঠেনি ভাগলপুর, আরোয়াল, জাহানাবাদ, সুরাট, লাতুর, মুম্বই-এর সঙ্গে, যেভাবে অচেনা থেকে যাবে বাথানিয়াটোলা, ভোজপুর, সেইভাবেই আগামি দিনের সুরজপুর, আন্ধারপুর আরও এক বাথানিয়াটোলা।

হুঁজুর সাধুজি, হাম ক্যা করে, হামি ভোজপুর চলি।

সে তো পঁচিশ তারিখ, মহেন্দর এলে তো যাবি।

নেহি হুঁজুর, হামি আজই চলি ভোজপুর।

কখন?

রাত মে টিরেন হই হুজুর, গাঁও গিয়ে ভূমিহার রাজের জমিনে মহেন্দরকে দিয়ে বেগার কাম করাই, ওর শির ভূমিহার রাজের পাও-এ লুটাই দিই, দামাদকে বলি মজরির কথা না উঠাতে, বেগার দিতে বলি।

সত্যি বলছিস?

হাঁ, হুঁজুর, হামি ভোজপুর চলি, ক'দিন হামি থাকবে না, মহেন্দর থাকবে না, বেতন কি পুরা মিলবে ও মাহিনায়?

যোগেন সাধু জিজ্ঞেস করল, তোর ডিউটি?

হামার ডিউটি রামু করে দিবে, হামি তো ওর ডিউটি করে দিয়েছি যখন ওর বাপ মরে গেল দেশে, সরকার সুপর জানে হুঁজুর, হামি বলে এসেছি, পাম্মিশন মিলে গেল, লেকিন বেতনের কথা বলতে পারল না, আপনি বেতন দিবেন, পুরা বেতন কি মিলবে হুঁজুর, ও হপ্তায় মহেন্দর এসে যাবে।

কেউ থাকবি না?

নেহি হুঁজুর, সুগরিব সিংজি বলল খত-চিঠি এলেই ছুটি নিয়ে গাঁও চলি যাবে, বস্তুত

নকশালি উঠা হুঁজুর, সাধুজি।

যোগেন কী বলবে ঠিক করতে পারেনা। এরকম হয়, হয়ে থাকে। ভিন প্রদেশী মানুষ নিয়ে কাজ করতে গেলে এইসব অভিজ্ঞতা নিত্য নৈমিত্তিক। উঠল বাই তো কটক যাই। বাই উঠে গেলে কে আটকায়? হাওয়া আসে যেন আচমকা। সেই হাওয়ায় ভেসে যায় এরা। দেশ-গাঁ বউ-ছেলেমেয়ের মুখ মনে পড়লে ছুটতে ছুটতে ট্রেনে গিয়ে ওঠে। স্নান নেই, খাওয়া নেই বগলে পুঁটলি নিয়ে হাওড়া স্টেশন। যোগেনের মাসতুতো ভাই অদ্রীশ থাকে সম্বলপুর। রেলের চাকরি। সে যে আচমকা কতবার চলে আসে! বলে, আছি বেশ আছি, চলছে, বেশ চলছে, তো একদিন সকালে আচমকা মনে হলো বাড়ি যাই, যেই না মনে হওয়া আর কে আটকায়—উঠল বাই তো কলকাতা যাই।

আচমকা ইলিশগন্ধী ঢেকুর ওঠে যোগেনের। আর তাতেই অণিমার মুখ। মনে পড়ে গেল সব। এখন ক'টা বাজে, তিনটে। আর কতক্ষণ? সন্ধেবেলায় তো লছমনকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ঘুরতে হবে টিকিটের জন্য কিন্তু কাজটা কী হয়েছে?

যোগেন জিজ্ঞেস করল, নর্দমাটা দেখেছিস, আমার বাড়ির পিছনে নোংরা গলি?

লছমনের চোখ পিটপিট করছে, নেহি তো হুজুর, সক্কাল থেকে টায়েম হল না।

আমি তাহলে নোংরায় থাকব?

হুঁজুর সাধুজি।

যাওয়ার আগে নর্দমা সাফ করে, গলি সাফ করে তবে ট্রেনে উঠবি লছমন, তোর ওসব ছুতো আমি বুঝি, নাহলে বেতন পুরোটা হেড অফিসে পাঠিয়ে দেব, তুই তো মহা চালাক, বেতন নিবি হাত পেতে, দেশে গিয়ে ঘুম মারবি, আমার কাজটাও করলি না ক'দিন ধরে।

হুঁজুর সাধুজি।

কাজ না করে দেশে চলেগেলে বেতন মিলবে কিনা বলতে পারব না, তোমার সরকার তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, লজ্জাও করে না তোর, এতবার বলছি!

হুঁজুর! লছমন রাম হাত জোড় করে। তার মুখে আর কথা নেই। কথা যা বলছে যোগেন সাধু। সে তো লছমনের বেতন থেকে টাকা নেয় না, শুধু মাঝেমধ্যে বাথরুম ইত্যাদি ময়লা গলি সাফাই. তার জন্য যদি টাকা চায় লছমন দেবে।

হুঁজুর! লছমন ঘাড় হেঁট করে হাঁটতে লাগল। বৃষ্টি এল। বৃষ্টির ভিতরেই লছমন রাম যাত্রা করল, না ভোজপুরের দিকে নয়, আপাতত যোগেন সাধুর গৃহাভিমুখে।

(দেশ—১৯৯৭)

কালো জল

দোতলার রবিদাসের গলা থামলে তিনতলার সুমন ডাকতে আরম্ভ করে, ও দিবাকর, দিবাকর পাম্পটা চালাবে, কোন সকালে কুড়ি মিনিট চালিয়েছ এক ফোঁটাও জল নেই।

এখন বেলা বারোটার মত হবে। দুইবাড়ির মধ্যিখানের গলিতে যে ফালির মত রোদটা শুয়ে ছিল এত সময় তা গড়াতে গড়াতে ও বাড়ির দেওয়াল, দেওয়ালের নিচে গলির ও প্রান্তের সরু ড্রেনে গিয়ে পড়েছে। ওই ড্রেনে মুখার্জি বাড়ির দেওয়াল বেয়ে জলের পাইপ এসে নেমেছে। রেন ওয়াটার পাইপ, তিনতলার তিনটি বাথরুমের পাইপ, ওয়াশ বেসিন, রান্নাঘরের পাইপ দিয়ে সমস্ত দিনই জল নামছে ছরছর করে। ও বাড়িতে সমস্ত দিনই জল খরচ হয়। শীতের সময় যখন আকাশ খটখটে রেন ওয়াটার পাইপ দিয়ে জল নামত এই বারোটা নাগাদই। কী তোড় সেই জলের! যত শীত, জলের তত বেগ! ওই বাড়ির বড়কর্তা তিনতলার ছাদে বসে রোদের ভিতরে স্নানের চেষ্টা করতেন। রবিদাস বলে, কর্তামশাই শুধু জল নিয়ে খেলা করেন, গায়ে জল দেন না, আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চানই করেন না। রবিদাস চেনে কোনটা বাথরুমের পাইপ, কোনটা ছাদের পাইপ। ঠিকই চেনে। সুমন ডাকল, দিবাকর, পাম্পটা চালাও।

ডাকতে ডাকতে সুমন দেখল ওই বাড়ির দেওয়ালে জলের ছায়া কাঁপছে। ড্রেনের জলে রোদ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে দেওয়ালে। ময়লা দেওয়ালে জলের ঢেউ চেনা যাচ্ছে। চেনা যাচ্ছে সাবানের ফেনার ছায়া। এর মানে ড্রেন শুকনো নেই। ড্রেনে জল নামছে। এ থেকে বোঝা যায় ও বাড়ির সব কলেই জল আছে, বাথরুমে, শাওয়ারে, রান্নাঘরে, ওয়াশ বেসিনে। ও বাড়িতে জলের অভাব নেই। ও বাড়ির ছাদে বসানো জলট্যাঙ্কি জল থৈ থৈ। এসব ভাবতে ভাবতেই সুমন ডেকে যাচ্ছিল দিবাকরকে। ডাকতে ডাকতেই শুনছিল জলের ছরছর শব্দ।

দিবাকর ওই তো। দিবাকর দাঁড়িয়ে আছে গলির মুখে। এই গলি ফ্ল্যাটবাড়ির প্রবেশপথ। বাড়িওয়ালা মুখার্জি মশায়ের জাহাজ বাড়ির প্রবেশপথ ওদিকে। কিন্তু এই গলিতে ও বাড়ির খিড়কির দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে কাজের লোকেরা যাতায়াত করে। দিবাকরের যাতায়াতও ওই পথে। গলির শেষে বাঁদিকে মুখার্জি বাড়ির খিড়কিদুয়ার, ডানদিকে ফ্ল্যাট বাড়ির পিছনে যাওয়ার পথ। পিছনে দুই বাড়ির এক রিজার্ভার। প্রচুর জল। আছে পাম্প মেশিনের ঘরও। আছে কাজের লোকেদের জন্য আলাদা বাথরুম-পায়খানা। সেই বাথরুম যেমন এ-বাড়ি ও-বাড়ির কাজের লোক ব্যবহার করে, তেমনি বাইরের লোকও, সুযোগ পেলেই। কর্পোরেশনের সাফাইকর্মীরাও দু-একজন ওই আরাম কলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে গুনগুন করতে করতে গলি দিয়ে চলে যায়। সুমন দেখছিল দিবাকর যার সঙ্গে কথা বলছে

সেই পান দোকানি সনাতনের গা ভিজে, মাথায় ভিজে গামছা মানে সনাতন ওই নোংরা বাথরুম থেকে স্নান করে ফিরছে। ওই বাথরুমের কলের সঙ্গে রিজার্ভারের পাইপের সরাসরি যোগ। জল কখনও বন্ধ হয় না।

দিবাকর শুনছে কিন্তু মাথা তুলছে না। দিবাকর ওইরকম। দশবার ডাকলে একবার সাড়া দেয়। সকাল থেকে দিবাকর, দিবাকর....দিবা...দিবা। কাকের কা-কা ডাকের মত ছ ফ্ল্যাট থেকে ডাক আসতেই থাকে। প্রতিদিনই এমন হয়। আজ একটু বেশি। ছুটির দিন তো। পুরুষরা সবাই বাড়ি আছে। মেয়েদের গলায় এত জোর থাকে না। দিবাকর সে ডাক শুনতে শুনতে ঘুমোতে পারে।

বোশেখী রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে গলিটার বাইরে, রাস্তায়, রাস্তার ওধারে অবহেলায় পড়ে থাকা কর্পোরেশনের মাঠটিতে। দিবাকর ওই মুখার্জি বাড়ির সরকার। এখন ও পদ নেই বটে। কিন্তু দিবাকরের হাতেই ও বাড়ির অনেক চাবিকাঠি। জলের পাম্প ওর হাতে। তাই সকাল থেকে রাম নামের মত দিবাকরের নাম ভাসে গলির বাতাসে। দিবাকর আলাপ করছিল সনাতন দাসের সঙ্গে। সে বলছিল জলেশ্বরের টর্নেডো ঝড়ের কথা। ক'দিন আগে কৌতূহলে তা দেখে এসেছে দিবাকর। তার গ্রামের গা ঘেঁষে ঝড়ের দত্যি তছনছ করে গেছে ঘরবাড়ি। গাছ উড়ে গেছে, মানুষ উড়ে গেছে, গরু-মোষ উড়ে গেছে, পুকুরের জল, মাছ উড়ে গেছে, বাচ্চাকোলে মা উড়ে গেছে, স্বামী উড়ে গেছে, দেবতার রোষ না হলে এমন হয় না। দেবতার আক্রোশেই হয়েছে এসব। দিবাকর বলছিল, তার গ্রামে কিছু হয়নি, বহুজন্মের পুণ্যে তারা বেঁচে গেছে। দিবাকর বলছিল, উয়ারা সব পাপী, পাপী না হলে এমন হয় মানুষ, গাছপালা আকাশে উড়ে যায়?

সনাতন মাথা দোলাচ্ছিল দিবাকরকে সমর্থন জানাতে। দিবাকর বলছিল, আকাশ দিয়ে সব উড়ে গেছে, গ্রামটাকে তুলে আছড়ে ফেলেছে মাটিতে। সে বলছিল বোরো ধানের খেত আকাশে তুলে নিয়েছিল, মাঠ, পুকুর, বাড়ি, ঘরদোর সব আকাশে উড়ছিল, এমন কি ওখেনে সুবর্ণরেখা নদীর যেটুকু ছিল, তাও আকাশে তুলে দিয়ে কী ভীষণ ব্যাপারই না করেছিল ভগবান। উপরওয়ালার রোষ ছাড়া এসব হয়?

সব উপরে উঠে গেলে নিচায় কী ছিল? সনাতন জিজ্ঞেস করেছে।

কিছুই না, ঠিক দুফরে ঘোর অমানিশি, পাপ, পাপে ইসব হয়!

দিবাকরের পাপপুণ্যের বিবরণ শুনতে শুনতে সনাতন বলে, উপরের বাবু ডাকছে।

দিবাকর বিরক্ত হল, ডাকুক, বড়বাবুর কথা মত মেশিন চলছে, মু কী করিব?

সুমন ডাকল, ও দিবাকর, পাম্পটা চালাও।

দিবাকর গ্রাহ্যই করল না সুমনের ডাক। আলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। সুমনও ডেকে যায়। না ডাকলে উপায় নেই। তারা স্বামী, স্ত্রী দু'জনেই অস্নাত। ছুটির দিন, ওয়াশিং মেশিনের সামনে ডাঁই হয়ে আছে কাপড় জামা। চন্দ্রা রেগে যাচ্ছে ক্রমশ। তাদের উত্তরমুখো ফ্ল্যাট। বৈশাখে সূর্য উত্তরায়ণে যায়। রোদ এসে তাদের ফ্ল্যাটের দেওয়াল সকাল থেকে তাতিয়ে দেয়। দখিনা বাতাস নেই ও ফ্ল্যাটে, তবে কিনা ব্যালকনি থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দেখে সময় কেটে যায়। দিবাকর কত দেখে গালে হাত দিয়ে সুমন বোসের বউ দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। এখন সেখানে সুমন। গরমে ভেপে গিয়ে আর্তনাদ করছে, পাম্পটা

চালাবে না ঠিক করেছ?

দিবাকর মুখ তুলেই দেখে জানালায় সুমনের বউ চন্দ্রা। চন্দ্রা ডাকল, ও ভাই দিবাকর, এবার চালিয়ে দাও পাম্প।

জল নেই! আর্তনাদ করল ব্যালকনিতে দাঁড়ানো সুমন।

নাই, পাম্প ঘরে গিয়ে দেখুন।

কী দেখব? চন্দ্রা বলল, তুমি ওসব দ্যাখো, জল ছাড়া চলবে না।

দিবাকর উদ্দীপ্ত হয় সুমন বোসের বউকে দেখে। তার নিজের পরিবার তো জলেশ্বরে। সে কথা ঘুরিয়ে বলল, টর্নিডো ঝড়ের কথা বলছি বউদি।

তোমার গ্রাম কি ওদিকে? চন্দ্রা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ বউদি।

কী সব্বোনাশ! জানালার ওপারে, তিনতলার ফ্ল্যাটে কৃত্রিম আতঙ্ক যেন ছড়ায়।

দিবাকর হাসে, মোর গাঁয়ে কুছু হয় নাই, প্রভু জগন্নাথের কির্পা।

চন্দ্রা যেন নিশ্চিন্ত হয়, তাহলে পাম্পটা চালাও।

দিবাকর বলল, ট্যাঙ্কে জল নাই।

রিজার্ভারে?

হ্যাঁ, আপনারা জল কেন তুলে রাখেন না? দিবাকর নিরীহ গলায় বলে।

কত তুলে রাখবে লোকে? চন্দ্রার পাশ থেকে সুমন গর্জে উঠেছে। সে ছিল ব্যালকনিতে। এখন চন্দ্রার পাশে দাঁড়িয়ে সে যেন ভীষণ তেতে যায়, সকালে কুড়ি মিনিট পাম্প চলেছে, জল তুলে রাখব কী করে হে, সব ফ্ল্যাটে কল খুললে জল থাকে?

দিবাকর বলে, জলের পেশার নাই, ট্যাঙ্ক খালি।

দোতলা থেকে রবিদাস চিৎকার করে ওঠে, বুড়বক পেয়েছিস, তোদের বাড়িতে জল নেই?

দিবাকর মাথা নামিয়ে নেয়। তার যা বলার কথা বলেইছে। বড়বাবু যেমন বলেন সে তেমনি বলে। বড়বাবু রামতারণ মুখার্জি রেগে আছেন ভাড়াটেদের ওপরে, তাই জলে জব্দ করছেন। রাগের কারণ ভাড়াটেদের অদ্ভুত স্বপ্ন। পাঁচ ফ্ল্যাটের লোক জোট বেঁধে বড়বাবুর কাছে গিয়েছিল যদি তিনি তাদের কাছে বিক্রি করে দেন ফ্ল্যাটের স্বত্ব। সবাই তো চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরনো লোক। বাস করতে করতে নিজের বলেই ভাবতে শিখেছে ফ্ল্যাটগুলিকে। সিঁড়ি চেনা, দেওয়াল চেনা, দেওয়ালের ময়লা চেনা, দেওয়ালের টিকটিকি, আরশোলা চেনা, বাতাসের গন্ধ চেনা—তবে ফ্ল্যাট তাদের হবে না কেন? চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে সবাই তো খুব পাকাপোক্ত। লিডার ছিল সুমন বোস। তার ইচ্ছে সবচেয়ে বেশি। যায়নি শুধু রবিদাস। সে এর ভিতরে নেই। ষাট টাকা ভাড়া দিচ্ছে, খামোকা কিনবে কেন? যায়নি লালি আর লালির মাও, তবে কিনা চিঠিতে লিখেছিল কিনতে রাজি। বড়বাবু সব শুনে দু'দিন সময় নিয়ে গুম হয়ে থাকলেন। তারপর দিবাকরই তো এসে খবর দিল ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে যে বড়বাবু বিক্রি করবেন না। প্রজারা সব যেমন আছে থাকুক। সব শুনে রবিদাস খি-খি করে হেসেছিল, শালা কত শখ, ফেলাট কিনবে, বড়বাবু ঠিক করেছে!

দিবাকর জানে ওই ঘটনার পর বড়বাবু জলে জব্দ করতে চাইছেন ভাড়াটেদের। শীত

ছিল বলে ধরা যায়নি এতদিন, এখন টের পাচ্ছে সবাই। এমন কি দিবাকর নিজেও। সকালে কুড়ি মিনিট ঘড়ি ধরে পাম্প চালানোর পর বড়বাবুর হুকুমে বন্ধ। তিনি না বললে দিবাকরের সাধ্য কী পাম্প চালিয়ে জল দেয়! ভাড়াটের তো ভাড়াটে হয়েই থাকা উচিত। ওসব কথা মনে আনে কেন?

চন্দ্রা ডাকল, ট্যাঙ্ক ভর্তি হতে কত সময় লাগবে দিবাকর?

দিবাকর ঘাড় নেড়ে এগোয়। সনাতনকে বোঝাতে চাইছিল টর্নেডোয় কীভাবে ফসলের ক্ষেত, পুকুর, ঘরবাড়ি সমেত সমস্ত গ্রাম আকাশে উড়ে গিয়ে, নদী আকাশে উড়ন্ত হয়ে অমাবস্যার অন্ধকারে নামিয়ে দিয়েছিল। কেন হয়েছিল? না পাপে। কোন পাপে? পাপ কী কম! ঘরের বউ অন্য পুরুষের সঙ্গে সিনেমা দেখে আসছে, ফূর্তি করে আসছে, গর্ভপাত ঘটাচ্ছে, সেই সব পাপেই না এসব হয় ওই দ্যাখো সুমনবাবুর বউ, সব সময় জানালায়।

সুমনবাবুর বউ জানালায়। দু'হাতে গরাদ ধরে সুমনবাবুর বউ দূরে পথের দিকে তাকিয়ে। দেখছে রোদের ভিতরে মিলিয়ে যাচ্ছে দিবাকর। দিবাকর দূরে চলে গেলে সে কাকে ডাকবে জলের জন্য। না ডাকলে তো জল পাওয়াই যাবে না। ডাকার পরও দিবাকর যদি জল না দেয়, আবার ডাকা যাবে। আবার, আবার। তারপর এক সময় জল তো আসবে। না এলেও দিবাকরকেই ডাকতে হবে। দিবাকরকে ডাকতে পারলে জল না পাওয়ার কষ্টটা যেন যায়। দিবাকরকে ডাকা মানে জলকেই যেন ডাকা। দিবাকরই যেন জল, অনেক জল। বাথরুমের শাওয়ারের জল, কলের মুখের জল, বালতি ভরা জলই যেন দিবাকর নিজে।

সুমন বলল, লোকটা কী পাজি!

কে? চমকে তাকায় চন্দ্রা।

ওই দিবাকর।

চন্দ্রা চুপ করে থাকে। দিবাকর কেন পাজি হবে, দিবাকরই তো জল দেয়। চন্দ্রার চোখ রোদ চকচকে দুপুরের দিকে তাকিয়ে জ্বালা করে ওঠে। চোখ রগড়ায় চন্দ্রা, বলে, ওদের গ্রামে টর্নেডো হয়েছিল।

মিথ্যে কথা।

ও যে বলল।

লায়ার, ও খুব মিথ্যে বলে, বড়বাবুর নামে দোষ চাপায়, আসলে জল নিয়ে সমস্ত গোলমালটা ও নিজে করছে।

কে বলল?

গৌতম।

চন্দ্রা বিড়বিড় করে, গৌতম যদি এতটা বোঝে তবে ও কেন দিবাকরকে বলে না, গৌতম তার বাবাকে বলুক, বলছে না তো।

ওরা বাবা দিবাকর, দিবাকর বলতে অন্ধ।

চন্দ্রা বলল, তোমরা বড়বাবুর কাছে যাও।

সুমন বলল, যেতে তো হবে।

চন্দ্রা বলল, কী আশ্চর্য, ওদের গ্রামে টর্নেডো!

টর্নেডো তো ও এখানে আছে কেন?

চন্দ্রা দেখছিল দিবাকর আবার ফিরছে। দিবাকরের ফেরা মানে জলের ফেরা। কী গরম বাতাস! চন্দ্রা ডেকে উঠল, ও দিবাকর, দিবাকর, কোথায় গিয়েছিলে?

দিবাকর হাসল, জবাব দিল না। চন্দ্রা শুনল তিনতলার ওপাশে ফ্ল্যাট থেকে নিখিল মল্লিক ডাকছে, দিবাকর! পাম্পটা চালাবিই!

দোতলা থেকে লালির মা ডাকল, পাম্পটা চালাও।

চিৎকার করল দোতলার অন্য ফ্ল্যাটের রবিদাস, অ্যাই শালা তোর কান কি কালা, সবাই জল জল করছে।

আবার লালির মা ডাকল। নিখিল মল্লিক, বিজন সেনগুপ্ত, অনিমেষ চক্রবর্তী, সুমন বোস, চন্দ্রা। নিখিলের স্ত্রী, রবিদাসের ছেলে। দিবাকর ডাক শুনতে শুনতে এগোচ্ছিল। এক একবার ঘাড় বাঁকিয়ে মাথাটা উঁচু করে তিনতলার চন্দ্রাকে দেখছিল। চন্দ্রাকে দেখতে গিয়ে লালির মা, নিখিল, বিজন, রবিদাস সবাইকে দেখছিল গরাদের ওপারে। সবাই যেন গরাদ ভেঙে লাফ দিয়ে পড়তে চাইছে। সবাই যেন খাঁচায় আঁটা বাঘ। সে চন্দ্রাকে বলল, বড়বাবুর হুকুম নাই, সকালে তো জল দিয়া হয়েচে।

অ্যাই শালা, দাঁড়া! রবিদাস জানালার ওধারে বসে হুঙ্কার দিল।

দুই

আশি পার কর্তামশাই রামতারণ মুখুজ্জে এখনও বেশ শক্তপোক্ত। তবে কিনা বেশি জলের ধার ধারেন না। সমস্ত শীত, সেই আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত গায়ে জল দেননি। এখন কয়েক মগ মাত্র। এত জল মানুষের কেন লাগে? কর্তামশাই জিজ্ঞেস করেন।

দিবাকর বলল, খুব তাত, আর জল তো পায়নি প্রায়, পাচ্ছে না।

কর্তামশাই বললেন, না পাক, এর বেশি দেওয়া যাবে না।

আজ্ঞে কাচাকুচির জল চাই, চানের জল চাই, কত কাজে জল দরকার, রান্নাবান্না, বাথরুম, ঘরমোছা, জল ছাড়া কিছুই হয় না।

কর্তামশাই শুনলেন না, বললেন, তোর সেই টর্নেডোর কথা শেষ হয়নি তখন।

দিবাকর বলল, বড়বাবু একটা বাজতে যায়, পাম্প চালাই।

চোপ! কর্তামশাই চোখ রাঙিয়ে ওঠেন, এত জল ওরা কী করে?

আজ্ঞে লাগে।

না লাগে না, কী বলছিলি টর্নেডোর কথা।

দিবাকর বুঝল টর্নেডোই কর্তামশাইকে শান্ত করতে পারে। সে বলতে লাগল এমন বাতাসের বেগ যেন পৃথিবীই উড়ে যাচ্ছিল, বোরো ধানের জমি, সুবর্ণরেখা নদী, বাড়ি ঘরদোর, পুকুর, জল, গাছপালা, শুধু শিবমন্দিরটা বাদ ছিল। শুনতে শুনতে কর্তামশাইয়ের চোখ বালকের মত স্ফীত হয়ে ওঠে। দিবাকর থামতেই তিনি বলে ওঠেন, তারপর কী হল?

আঁজ্ঞে ঝড় থামল।

নদী গেল কোথায়?

আঁজ্ঞে সেখেনেই আছে বড়বাবু।

পুকুর?

জল নেই, শুকনো হয়ে পড়ে আছে, পাঁক পর্যন্ত নেই।

আচ্ছা যখন সব উড়ছিল মানে নদী, পুকুর, তখন কী ছিল নিচে?

দিবাকর বলল, শুধু অন্ধকার।

কেন হল এমনি তা বলতে পারিস?

আজ্ঞে বড়বাবু নানাজনে নানা কথা বলছে।

কী বলছে?

শিবমন্দির অপবিত্র করেছিল একটা মেয়েমানুষ।

আর?

দুজনে মিলে সন্ধের পর মন্দিরের ভিতরে উমা আর শঙ্কর হয়েছিল।

আর?

দিবাকর বলল, একটা আইবুড়ো মেয়ে দু'বার গর্ভপাত ঘটাল।

আর কী?

দুটো বিধবা দুশ্চরিত্র হল, মানে পুত্রসম দেওরের সঙ্গে, ওসব বলা যায় না।

বড়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আসলে লোভ।

আঁজ্ঞে কর্তামশাই!

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, জানিস?

জানি। দিবাকর বলে, ওই যে নিখিল চিৎকার করছে।

বড়বাবু বললেন, করুক, লোভের ফল এ সব।

আঁজ্ঞে! দিবাকর ভ্যাবলা হয়ে গেল; টর্নেডো তো দাঁতন-জলেশ্বরে হল, ওপারে জলেশ্বর, এপারে দাঁতন, মোরা জগন্নাথের দয়ায় বেঁচে গেলাম।

কর্তামশাই বললেন, পাপ সর্বত্র।

আঁজ্ঞে তা ঠিক।

লোভ সর্বত্র।

তাও ঠিক বড়বাবু।

ওদের বল নিচের বাথরুমে কাজ সেরে যেতে।

দিবাকরের মুখখানি অন্ধকার হয়ে গেল। নিচের বাথরুম মানে কাজের লোকের বাথরুম, তার দরজা নিচের দিকে অনেকটা ভাঙা। নোংরাও বটে। ঠিকমত জল ঢালে না কেউ লাগোয়া পায়খানায়। আর পিছনের নোংরা গলিতে ইঁদুর পচেছে। ওখানে চন্দ্রা চান করতে নামবে? ও বাথরুমে জমাদার, রাস্তার লোক চান করে যায়। দিবাকর ইদানীং বাড়ির ভিতরেই সব কাজ সারে। আগে তাকে যেতে হত ওখানে।

ফ্ল্যাটে আছিস, থাক, আমি কাউকে কিছু বলেছি?

না আজ্ঞে।

কিনতে চায় কেন, কী লোভ!

আঁজ্ঞে তা ঠিক, কিন্তু ওরা আমাকে গালি দিচ্ছে।

দিক্ না, কত দেবে, ওদের থাকা হবে না মুখুজ্যেদের প্রজা হয়ে।

দিবাকর বলে, খুব অন্যায় করিছিল, কিন্তু মাপ করে দেন।

না! বড়বাবুর দু'চোখ রাঙিয়ে যায় যেন, ওরা ভেবেছে কী, পয়সা হলেই হয়ে যাবে, কত পয়সা হয়েছে ওদের?

দিবাকর চুপ করে থাকে। বড়বাবু চোখ বুঁজে আছেন। দিবাকর শুনতে পাচ্ছে চন্দ্রার ডাক। তাকে ডাকছে। নিখিল ডাকছে। রবিদাসের ছেলে। সবাই একসঙ্গে ডেকে যাচ্ছে। বড়বাবুর কানে কি যাচ্ছে না? যাচ্ছে ঠিক। বড়বাবুকে ডাকে দিবাকর, বাবু!

কর্তামশাই চোখ খুললেন, ব্রহ্ম শাপে এ সব হয়।

কী হয়?

টর্নেডো।

আঁজ্ঞে ঠিক। আমাদের শিব খুব জাগ্রত, কত বড় গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। এবার হয়েছিল?

হয়েছিল, কিন্তু লোকের যা হয়েছে সব্বোনাশ!

কর্তামশাই বললেন, আমি এবার ঘুমব।

আজ্ঞে মেশিন চালাব না?

একদম না, নিচে লাইন দিক সবাই। খি-খি করে হেসে ওঠেন রামতারণ মুখুজ্যে, বাড়ি আমার, আমি কী পারি তা ওরা জানুক, ভেবেছিল ওদেরই বাড়ি, এতদিন থাকতে থাকতে ভুলে যাচ্ছিল সবাই ভাড়াটে, আমার প্রজা, তেল মারতে হবে।

দিবাকর নেমে এল। নিজের ঘরে ঢুকে গেল। বাইরে ছায়াময় গলিতে ছ' ফ্ল্যাটের লোকজনের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। দিবাকর বলল, যাগ গে, আমার কী? যাঁর জল তিনি যদি না দেন তো হবে এমনি। বোশেখ মাস, জলের অভাব হবে না এমন কথা কে বলেছে? তার গাঁয়ে কোনও কুয়োয় জল থাকে এ সময়? কোন পুকুরই বা জল থৈ থৈ করে? কত বড় ঝড় গেল! দিবাকর চিৎ হয়ে শোয়। চোখ জুড়িয়ে আসে।

চোখ জুড়িয়ে আসে চন্দ্রারও। কোথাও দিবাকর নেই। সে নেই মানে জল নেই। যেটুকু জল সকালে ধরে রেখেছিল, তা দিয়ে মেয়ের স্নান হয়েছে, মেয়ের জামাকাপড় ধোয়া হয়েছে, রান্না হয়েছে। তারপর সব শূন্য। এখন শুধু দিবাকরকে ডেকেই যাওয়া।

সুমন বলল, গৌতমের কাছে যাব?

চন্দ্রা জবাব দেয় না। মনে মনে জলের কথা ভাবছিল। শাওয়ার খুলে নতুন সুগন্ধী সাবান মাখতে যে সুখ, সেই সুখ কল্পনা করছিল। স্নান তো হলই না। গা চিটচিট করছে। ম্যাক্সির ভিতরে শরীর ভেপে যাচ্ছে। কাল রাতে অনেক দাপিয়েছিল সুমন। নেশা করেছিল দু'জনেই। বিদেশি জিন। বিজ্ঞাপনের জিনটি টেলিভিশন থেকে তার ঘরে এসেছিল। সেই স্বল্পবাস যুবতী যেন সে। আর ছিল সুমন। সুমন যত খেয়েছিল, সে আরও বেশি। তারপর এখনও স্নান হল না। গা ঘিন ঘিন করছে। সুমনের ঘাম এখনও গায়ে লেপ্টে আছে। সুমন ওই সময় এত ঘামে!

সুমন বলল, যাই, কী বলো।

চন্দ্রা জবাব দিল না। রিমোটে টিভি চালিয়ে দেয়। শব্দ উধাও করে শুধুই ছবি দেখে। ছবি তো বিজ্ঞাপন। স্যানিটারি ন্যাপকিন কীভাবে বেঁকাচ্ছে! কাল রাতে কনডোমের

আড়ালহীন বিজ্ঞাপন দেখে কীরকম উত্তাল হয়ে গিয়েছিল সুমন। অলস চোখে চন্দ্রা টিভির দিকে চেয়ে থাকে।

সুমন ডাকল, কী করি বলো দেখি?

বিরক্ত হল চন্দ্রা, তোমার বন্ধুর কাছে যাও, ইস, কী সব অ্যাড? সব বলে দিচ্ছে।

সুমন বলে, ওরা কি শুনতে পাচ্ছে না?

চন্দ্রা ঝাঁজিয়ে ওঠে, একটু জলের ব্যবস্থা করো, সকাল থেকে গায়ে জল পড়েনি, তোমার কী, তোমার তো হলেই হল, ইস, গা এখন ঘিন ঘিন করছে।

সুমন কোনও কথা বলে না। চন্দ্রা খুব শান্ত। কিন্তু কত সময় শান্ত থাকবে? সত্যিই তো! কাল অত রাত পর্যন্ত ওসবের পর এত সময় স্নান না করে থাকা যায়!

কী হল যাবে! চন্দ্রা ঝপ করে চ্যানেল ঘুরিয়ে দিল রিমোটে। সেই বিজ্ঞাপন ঘুরে আসছিল। যুবতির শরীর থেকে আবরণ সরাচ্ছে পুরুষ, অতঃপর কনডোমের সুরক্ষা। চন্দ্রা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, যাবে না? কখন জল আসবে এরপর?

কারোরই তো জল নেই।

না থাক, আমার জল চাই, ওরা সব শীতের দেশের মানুষ, যাও না।

দিবাকরকে ডাকব?

কী করবে তা আমি বলব কী? চন্দ্রা চ্যানেল বদলায় রঙিন টিভিতে। সেই ব্লু রিবন জিনের বিজ্ঞাপন। বন্ধই করে দিল টিভি, ঘুরে সুমনকে বলল, তুমি নিচে গিয়ে ব্যবস্থা একটা কর, আমি আর পারছি না, কে বলেছিল তোমাকে জিন আনতে, মাথাটা কেমন ধরে গেছে, আমি কি মদে চান করব এখন?

সুমন আর দাঁড়াল না। এমন অবস্থা কোনওদিন হয়নি। আসলে জলের টানটা ক্রমশ বাড়ছে। সবে তো গরম এল। এ বছর বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে শীত অনেকদিন ছিল। গত সপ্তাহেও ঠাণ্ডা ছিল।

চন্দ্রা উঠে দরজা বন্ধ করল। ম্যাক্সির বোতাম খুলে পাখার তলায় বসল। মেঝেও তেতে গেছে। মেঝেতে জল পড়েনি। মোছাও হয়নি। ইস কীরকম ময়লা হয়ে আছে! চন্দ্রা আবার টিভি চালায়। মাথার চুল খোলে এমনভাবে, যেন স্নানের সময় হল। জলভরা বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে তার নিচে দাঁড়াবে মুক্ত শরীরে। শরীর জল চাইছে। চন্দ্রা চুল খুলে আচমকা উঠে দাঁড়ায়। ওই তো সেই কনডোম-অ্যাড। ইস! কিছুই আর লুকোনো থাকল না। সে বাথরুমে যায়। কী খটকটে হয়ে আছে বাথরুমের মেঝে। তেতে আছে। বাথরুমের ঠাণ্ডা ভাবটিই যেন উধাও। বিয়ের পর এই ফ্ল্যাটে এসে চন্দ্রার প্রথম কাজ হয়েছিল পুরনো বাথরুমটিকে সাজানো। এই ফ্ল্যাটে সুমনের বাবা-মা থেকেছেন কতদিন। তাঁরা মারা যেতে এখন সুমনের অধিকার। সুমন থেকে চন্দ্রার অধিকার। মেঝেতে মোজাইক টাইলস, দেওয়ালে গোলাপি প্ল্যাস্টিক রঙ, প্রমাণ মাপের আয়না, শাওয়ার, গিজার—সব চন্দ্রার মনের মত করে বসিয়েছে সুমন। শীতে কল খুললেই গরম জল, কোনও ফ্ল্যাটে আছে? বা শাওয়ার? সবাই তো বালতি থেকে মগে জল নিয়ে স্নানে অভ্যস্ত। শাওয়ারের কথা ভাবতেও পারে না রবিদাসরা। ওদের স্নানে কোনও বিলাসই নেই। গরমে এই শাওয়ার খুলে তার নিচে উন্মুক্ত শরীরে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেই পারে না কোনও ফ্ল্যাটের বউ-মেয়েরা। স্নানেই

চন্দ্রার যাবতীয় বিলাস। বাথরুমে কত সময় যে কাটাতে পারে সে? মেয়ে হওয়ার পর সময়টা কমেছে, কিন্তু মেয়ে যখন ঘুমিয়ে সে ঢোকে স্নানে। আর কাজের লোক থাকলে তার হাতে মেয়েকে দিয়ে সে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ায়। বিয়ের পর সুযোগ পেলেই স্নান-খেলা হত সুমন আর তার। চন্দ্রার চোখ শাওয়ারের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা হয়ে এল। মেঝে এত শুকনো, এত খটখটে ঠিক যেন রোদে পড়ে থাকা কলতলা। তাদের বাঁকুড়ার বাড়িতে কুয়োতলাও এমন শুকনো হয়ে থাকে দুপুরের রোদে। শেলফ থেকে নতুন সুগন্ধ সাবানটি নেয় চন্দ্রা। শুকিয়ে যেন শক্ত পাথর। কাল রাতে মুখ ধুয়েছিল এই সাবানে। সাধ হলেও স্নান হয়নি কেন না জল ছিল না। এ হল ফরাসি সাবান। সাবানটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে চন্দ্রা। নাকে গন্ধ নেয়। সাবান, শ্যাম্পুতে তার যেমন আগ্রহ, সুমনেরও তেমন। আজ শ্যাম্পু করে এই নতুন সাবানের সুগন্ধে স্নান শেষ করে দুপুরটা কাটত চমৎকার। বিকেলে বেরবে ভেবেছিল। কিন্তু সব ইচ্ছেই শেষ। নাকের কাছে সাবানটা ধরে থাকে চন্দ্রা। গন্ধটি নিয়ে যায় একনাগাড়ে। কাল এই সাবানে মুখমণ্ডল ধোয়ার পর তারা দু'জনে অনেকদিন বাদে বোতল খুলেছিল। সাবানের গন্ধটা ধীরে ধীরে মদের নেশায় হারিয়ে গেল।

চন্দ্রা শাওয়ারে তাকিয়ে থাকে। জল ছাড়া কি শুধু সাবানে স্নান হয়? বাতাসে স্নান হয়? বাতাসে কি সাবানের ফেনা হয়? গন্ধ ভুরভুরে হয়ে ওঠে বাথরুম? আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে ওঠে চন্দ্রা। মাথার খোলা চুল বুকের ওপর এসে পড়েছে কয়েক গাছি। চুলে কেমন রুক্ষ ভাব। লালচে। ম্যাক্সির বোতাম খোলা। সে ঘামছে। বাথরুমে দাঁড়িয়ে কোনওদিন ঘামেনি চন্দ্রা। ইস! সমস্ত শরীর ভিজে যাচ্ছে গোপন ঘামে, এই গুমোটে। সব আছে যেমন সাজিয়েছিল চন্দ্রা। শাওয়ার, মোজাইক টাইলস, আয়না, জলের কল— সব। জল নেই। ঘাড় তুলে সে আবার শাওয়ার দেখে। এমনভাবে দেখে যেন গ্রামবুড়ি রোদপোড়া জমিতে দাঁড়িয়ে মেঘ খুঁজছে আকাশময়। ম্যাক্সিটা খুলে ফেলে চন্দ্রা। জল! অলীক জলধারার নিচে দু'চোখ বন্ধ করে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীর বেয়ে জলস্রোত নেমে যায় পায়ের পাতায়। কপাল, গাল, গলা, দুই স্তন, স্তনসন্ধি, পেট, তলপেট দিয়ে নোনা ঘামের স্রোত নামতে থাকে। বাথরুম থেকে বেরবে না চন্দ্রা। যত সময় না জল আসে বেরবে না। সাবান হাতে ধীরে ধীরে বসে পড়েছে মেঝেয়। দু'চোখ বুজে আসে তার। ঘুম আসে গুমোটে। ঘুমোয় চন্দ্রা। ঘুমিয়ে আধো তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখে শাওয়ার ফেটে জল নামছে। সুমন, সুমন! সুমনের শরীর ফেটে গলগল করে জল বেরিয়ে আসছে। দেওয়াল! দেওয়াল ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। মোজাইক টাইলস ফাটিয়ে উঠে আসছে জল। সেই জলে কাগজের নৌকোর মত ভাসছে সুগন্ধ সাবান। চন্দ্রা দেখেই যায় এসব। জল এখন স্বপ্নের। জল নিয়ে স্বপ্ন দেখার দিন এল।

তিন

পাম্প চলল তিনটের পর। আধঘণ্টায় যতটা জল উঠল ফ্ল্যাটবাড়ির মাথার জল ট্যাঙ্কিতে, তা দাঁড়াতে পারল না, নেমে এল ছ'ফ্ল্যাটে। ছ'ফ্ল্যাটের কলের নিচে লাল, হলুদ, নীল জলপাত্র বসানোই ছিল। তার ভিতরে সরু রেখায় জল নামতে লাগল। ছ'ফ্ল্যাটের মানুষ দাঁড়িয়ে সেই জল দেখতে লাগল। কোনও ফ্ল্যাটের মানুষেরই আজ স্নান হয়নি। এই অবেলার

জলে ছ'ফ্ল্যাটের কেউ কেউ স্নান করল, কেউ জল ধরে রাখল ভবিষ্যতের জন্য। কেউ কেউ হলুদ, লাল, নীল জলপাত্রের জল দেখে ঠাণ্ডা হতে লাগল। বৈশাখী বেলায় এখন পড়তি ভাব, আকাশও কেমন ঘোলাটে হয়ে আছে। জলে স্নান হল না। জল ধরে রেখে গা হাত পা মুছে নিতে নিতে চন্দ্রা বলল, আবার যদি দেয় রাতে স্নান করব।

দিলে তো, একদিন অন্তর স্নান করতে হবে মনে হচ্ছে।

ওরা এমন করছে কেন গো?

সুমন চুপ করে থাকে। সে দুপুরে একা একা গিয়েছিল ও বাড়ির সদর দরজায়। কেউ দরজা খোলেনি। গরমের দুপুরে ছুটির দিনে ভাতঘুম দিচ্ছিল যেন গোটা বাড়িটাই। ডোরবেল শুনেছে কিনা কে জানে? কত বড় বাড়ি, কত ঘর! কত বড় চাতাল। ডোরবেল কত দূর পৌঁছয়, তা জানে না সুমন। দোতলায় যায়, না একতলায়, না তিনতলায়?

চন্দ্রা বলল, এত সুন্দর সাবানটা কেন আনলে, আর আনবে না।

আমি কী করব?

জল দিল না তো তোমার বন্ধু! ওই দেখ আবার বন্ধ করে দিয়েছে পাম্প।

চন্দ্রার কথা শেষ হতে না হতেই বাকি পাঁচ ফ্ল্যাট থেকে রব উঠতে লাগল, আরও কিছুক্ষণ চালাও দিবাকর, বালতি ভরেনি।

চন্দ্রা, সুমনও জানালায়। শুনল দোতলা থেকে রবিদাস গর্জন করছে, অ্যাই শুয়ারের বাচ্চা, পাম্প চালা, নিজেরা জলকেলি করছে সারাদিন।

চন্দ্রা ভয় পেল, সুমনকে টেনে নিল জানালা থেকে, এ সব কী বলছে রবিদাস?

রবিদাস হাঁকছে, অ্যাই বান্‌চোত দিবাকর।

ছি ছি ছি, এটা তো বস্তি হয়ে গেল। চন্দ্রা বলল।

সুমন বিড়বিড় করে, ও বাড়ির লোকগুলোও তো কিছু বলছে না, সারাদিন ভিখিরির মত জল চাইছি, ভদ্রলোকের মত ব্যবহার তো করছে না।

কথা বল না, তুমি দিবাকরকে একবার ডেকে এন দেখি।

কেন?

ওকে ঘুষ দিতে হবে, মাথা গরম করলে তো হবে না, ম্যানেজ করতে হবে দিবাকরকে।

সুমন হাসল, আর কেউ দেবে?

আমরা দেব।

আমরা দেব আর সবাই জল পাবে, ট্যাঙ্ক তো একটা।

না, তখন একা একা বাথরুমে বসে ভাবলাম, ও যদি রাত দুটো আড়াইটেয় পাম্প চালায় বড়বাবুকে না জানিয়ে, কাউকে না জানিয়ে, আমরা সব জল ধরে নেব, সবাই তো তখন ঘুমোবে।

সুমন অবাক হয়ে চন্দ্রার কথা শোনে। চন্দ্রা দুপুরে খুব রেগে গিয়েছিল। এখন শান্ত। সমস্তটা ভেবেছে ভাল করে। চন্দ্রা চাপা গলায় বলছে, জল লাগবেই, দিবাকরকে গালাগালি দিলে জল পাব না, বড়বাবুও জল দেবে না, টাকায় কী না হয়।

সুমন চুপ করে আছে দেখে চন্দ্রা ঝাঁজিয়ে ওঠে, কোনও লাভ নেই একজোট হয়ে, নিজেদের ম্যানেজ করতে হবে, তুমি যে সাবান মাখ, আমরা যেটা মাখি, সেটা কি এই

ফ্ল্যাটের কেউ চোখে দেখেছে? দেখেনি যখন এমনিই চলবে, জল আমার চাই, আলাদা করেই চাই।

সুমন বলল, জানতে পারলে রবিদাস তুলকালাম করবে।

সে আমি দেখব, ওরকম থার্ড ক্লাস লোক থাকে বলেই দিবাকর যখন তখন পাম্প বন্ধ করতে পারছে, আমরা আলাদা, আমাদের বাথরুম ওদের থেকে আলাদা, তেল, সাবান, শ্যাম্পু আলাদা, আমরা ওদের সঙ্গে গলা জুড়লে আমাদেরই ক্ষতি হবে, বড়বাবুকেও ম্যানেজ করতে হবে এইভাবে। বলতে বলতে চন্দ্রা হাঁপাতে থাকে, আমার জল চাই, অনেক জল, আমি ভাল করে স্নান করতে চাই, আমি এবার বাথটাব বসাব বাথরুমে, বাথটাব ভর্তি জল চাই, ওই সাবান মেখে আমি বাথরুম থেকে বেরোতে চাই।

সুমন শুনছিল। সুমনের কানে চন্দ্রার কথার সঙ্গে রবিদাস, নিখিল, লালির মার কণ্ঠস্বর মিশে যাচ্ছিল। সবাই চেঁচাচ্ছে। চন্দ্রা চাপা গলায় বলল, তোমার ইনকামও তো বেশি, তোমার ঘরেই কালার টিভি, টেলিফোন, তুমি জল ম্যানেজ করতে পারবে না; না পার তো বউয়ের জন্য ও সাবান আনলে কেন, বাথরুমে শাওয়ার লাগালে কেন?

সুমন বলল, নিচে যাই, দিবাকরের গলা শোনা যাচ্ছে গলিতে।

যাও, কিন্তু ওদের পক্ষে কথা বলবে না, দিবাকরকে ম্যানেজ কর, নিজেকে আলাদা করে ফেলতে হবে, না করতে পারলে এখানে থাকা যাবে না।

সুমন সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার নিয়ে রুবিয়ার হলুদ রঙের পাঞ্জাবি গায়ে নামল নিচে। দিবাকরকে ঘিরে ধরেছে নিখিল, বিজন, রবিদাস, লালির মা পর্যন্ত। রবিদাস উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, অ্যাই শুয়ারের বাচ্চা তুই চান করিসনি?

দিবাকর ঘাবড়ে গিয়ে বলল, করেছি।

লজ্জা করে না, ফ্ল্যাটের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত চান করতে পারেনি, নিজেরা জলকেলি করছিস সারাদিন, আমাদের জল তোরা তুলে নিচ্ছিস।

সুমন বলল, আমার বাচ্চা অবশ্য চান করেছে।

বাঁধা পেয়ে রবিদাস ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তোমাদের জন্যই কিছু হবে না, তোমরা সব বাবুক্লাস, তোমার মেয়ে চান করেছে, বাচ্চার কতটা জল লাগে হে, আমরা তেল মাথায় দিয়ে সারাদিন বসে থাকব?

দিবাকর বলল, বড়বাবু বলেছেন জল জমছে না জলট্যাঙ্কি রিজার্ভারে, ওখেনের বাথরুমে সিনান করে নিন না, জলের 'পেশার' তো কমে গেছে।

ওই নোংরা বাথরুমে, রাজ্যের ধাঙড়, জমাদার ওখানে চান করে, ওখানে যাব, ও বাড়ির কেউ ওখানে চান করে?

আমি কি জানি, উনি যা বলেচেন তা বললাম। দিবাকর বলে।

তুই পাম্প চালাবি কিনা বল। শান্ত মানুষ নিখিল চিৎকার করে ওঠে।

দিবাকর বলে, হুকুম নেই।

হুকুম নেই মানে, আমরা কি রাস্তার কলে চান করতে যাব?

ওই বাথরুমে যান, জল আছে।

রবিদাস হামলে পড়ে দিবাকরের হাত ধরল, জল দিবি কিনা বল।

সুমন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ওকে বলে কী লাভ রবিদাস?

তার মানে! রবিদাস ঘুরল সুমনের দিকে, তোমার তো ও বাড়ির সঙ্গে বেশি পেয়ার, দুপুরে গেলে দেখলাম, দরজা তো খোলেনি, তবুও শিক্ষা হয়নি।

ভদ্রভাবে কথা বল। সুমন গলা তোলে।

যা যা তো, ভদ্রতা শেখাতে আসিস না।

দিবাকর এবার সুমনের পক্ষে কথা বলে, আপনি এখানে কেন সুমনদা, আপনি বরং বড়বাবুর কাছে যান, এদের সঙ্গে আপনার মিলবে না, বড়বাবুকে বললেই হয়ে যাবে।

কথাটা এত সময় রবিদাস আর সুমনে হচ্ছিল। দিবাকর তা বাকি সবার সাথে জড়িয়ে দিতেই লালির মা খনখনে গলায় চিৎকার করে ওঠে, তার মানে! আমরা আর সুমন আলাদা, আমরা খারাপ আর ও ভাল, ওর বউ সুন্দরী বলে, নাকি তার ঢং আছে বলে, নাকি সে আমাদের সঙ্গে মেশে না বলে, ও বাড়িতেই যত আঠা।

এ সব কথা বলছেন কেন? সুমন রেগে ওঠে।

বেশ করব বলব, ও জল দেবে না কেন, শোন দিবাকর, জল না দিয়ে তুই চাতক পাখি হবি, তোর পাপের কোনও সীমা নেই।

আমাকে বলছেন কেন, আমি কে? দিবাকর আচমকা ভয় পেয়ে গেছে।

তুইই সব, কী পাপ করছিস তা তুই জানিস নে, মরবি এবার, আবার ঝড় হবে তোর দেশে, এবার তোর সব যাবে।

দিবাকর কুঁকড়ে গেছে, এ সব কী বলছেন মাসিমা?

ঠিক বলছি, বোশাখ মাসে জল দিসনি, জল না দেওয়ার যে কত পাপ তা তুই জানবি কী করে মুখ্যু, কাল যে আমার ফেলাটে গিয়ে বলছিলি গাছপালা, গরুবছুর, মানুষজন, খেত-খামার, পুকুর, নদী, জলের কুয়ো, জঙ্গল, পাথর সব উড়ে গিয়েছিল আকাশে, এবার তুই উড়ে যাবি দিবাকর, আকাশে কেঁদে মরবি এক ফোঁটা জলের জন্য। বলতে বলতে সত্তর পেরনো লালির মা হাঁপাতে থাকে। উত্তেজনায় দুলছে বুড়ি। জিভ দিয়ে লালা ঝরছে মাটিতে, চিৎকার করে সবাইকে শোনাচ্ছে বুড়ি, ডেকে ডেকে প্রাণ শুকোয়ে গেল, তেষ্টার জল নেই পর্যন্ত, তোদের একটুও মায়া হয় না দিবাকর, ওরে সারা আকাশে ফটিক জল, ফটিক জল করে ছুটে বেড়াবি, ছায়াও পাবিনে দিবাকর, জল দে, তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

এ সব আপনি কী বলছেন! আর্তনাদ করে ওঠে দিবাকর, জল তো বড়বাবু দেবে।

তুই দে, তোর হাতে মেশিন, না দিলে চাতক হবি, ঠিক চাতক হবি। গলির ছায়ায় লালির মা-র কথাগুলো পাক দিতে থাকে। সকাল থেকে চিৎকার করে গলা ভেঙে গেছে লালির মা-র। সেই ভাঙা গলায় শাপ দিতে থাকে, মরা স্বামীর নামে শপথ নিয়ে বলছি দিবাকর, তোর সংসার উড়ে যাবে আকাশে, জল দে, নইলে তোর সব্বোনাশ হবে, যদি আমি সতীসাধ্বী হই, তবে এ কথা ফলবেই, জল দে, দে জল।

সুমনকে জাপ্টে ধরেছে দিবাকর। কেঁদে ফেলেছে ভয়ে। সুমন দেখল ওপর থেকে ডাকছে চন্দ্রা, চলে এস, উঠে এস।

লালির মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে নিখিল, বিজন, রবিদাসরা, চাতক পাখি হবি দিবাকর, ঝড়ে উড়ে যাবি দিবাকর, জল দে।

সুমনকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে দিবাকর ছোটে খিড়কি দুয়ারের দিকে বড়বাবুকে ডাকতে ডাকতে। তার আর্তনাদ লালির মা-র কণ্ঠস্বরে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সুমন সিঁড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে।

পাম্প চলেছিল। আবার তা বন্ধও হয়েছিল বড়বাবুর কাছে সব খবর যেতে। বড়বাবু পাম্প ঘরের চাবি দিবাকরের কাছ থেকে নিয়ে বালিশের তলায় রেখে বললেন, যা সিনেমা দেখে আয়।

দিবাকর গেল চুপিসাড়ে, সদর দিয়ে বেরিয়ে। ফ্ল্যাটবাড়িটা নিঝুম। অন্ধকার নামল। গলিতে এখন আর আলো জ্বলে না। গলির অন্ধকারে ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে নেমে এল লালির মা, তার পিছনে রবিদাস, তারপর নিখিল, বিজন। সকলের দু'হাতে দুটি করে বালতি। তারা এই অন্ধকারের অপেক্ষাতেই ছিল। যাবে নিচের বাথরুমে, ধাঙড়, জমাদার, কাজের লোকদের স্নানের জায়গায়। গিয়ে দেখল, মেয়ে কোলে করে সুমন দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে অন্ধকার জায়গাটিতে। প্রাচীরের ওপারে পামট্রি। পাতাগুলি চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছিল। সুমন মেয়েকে চাঁদ দেখাচ্ছিল।

চন্দ্রা আছে। সুমন সকলকে বলল।

বাথরুম অন্ধকার। অন্ধকারে স্নানের শব্দ উড়ে আসছে। কত জল! শেষ পর্যন্ত চন্দ্র না পেরে নেমেছে নিচে। বড়বাবুর দেখা পায়নি সুমন। উনি নাকি জপে বসেছেন। বিকেলেও জপ! চন্দ্রা শুনে অন্ধকার মুখে নেমে এল সাবান-শ্যাম্পু নিয়ে। গায়ে জল ঢালছে চন্দ্রা, গুনগুন করছে জলের সুখে। চন্দ্রার সাবানের গন্ধ বাইরে ভুরভুর করছে।

লালির মা কাঁদল, কী দিনকাল, শাপের ভয়ও নেই লোকের!

সুমন কথা বলে না। নিখিল, বিজন, রবিদাসের সামনে সে কুঁকড়ে আছে। ওদের অসুন্দরী বউরা নামেনি এখনও। যৌবনহীনা নারীরা নামেনি। যুবতি, পরমা সুন্দরী রূপবতী চন্দ্রা নেমেছে। চন্দ্রা স্নান করছে। নিখিল, বিজন, রবিদাসরা বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে স্নানের শব্দ শুনছে। সুমন শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। চন্দ্রা কেন ওই সাবান নিয়ে নামল। অমন সুগন্ধতে সবাই বাথরুমের অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিল যেন। সাবানের গন্ধের সঙ্গে ওদিকের নোংরা গলির পচা ইঁদুরের গন্ধ মিশে যাচ্ছে। ইঁদুরের গন্ধটা লুকিয়ে যাচ্ছে যেন। সুমন মাথা নামায়। চন্দ্রা কি নিজের বাথরুমের মত এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সাবান সুখে মত্ত হয়েছে। সুমন না পেরে গলা তুলে বিজনের কাছে জিজ্ঞেস করল গভমেন্ট স্টেবল হয়ে শেয়ারের দামটা বেড়েছে, কী বল বিজন?

চন্দ্রা কি শুনতে পেল? স্নান শেষ হলে চন্দ্রা কি ভিজে কাপড়ে বেরবে? এ তো তার ফ্ল্যাট নয় যে মস্ত তোয়ালেতে কোনওরকমে ঢেকে-না ঢেকে...। লালির মা-র কান্না শুনল সুমন, আমাদের কি উঠে যেতে হবে, ও সুমন জল দেবে না?

সুমন জবাব দেয় না। তার সমস্ত শরীর শক্ত পাথর। লালির মা তার পায়ের কাছে ধুলোময়লায় উবু হয়ে বসে পড়ল। বড় বাড়ি থেকে গানের শব্দ আসছিল। চন্দ্রার গুনগুনানি শোনা যাচ্ছিল। সাবানের গন্ধ উড়ছিল অন্ধকারে। জল পেয়ে, মনের মত যুবতির শরীর

পেয়ে সাবানটা তার সমস্ত সুগন্ধ যেন মেলে দিয়েছে পাপড়ি খোলা ফুলের মত। সাবান ঘুরছিল চন্দ্রার সর্ব অঙ্গে। খুব গোপনে। অন্ধকারে।

লালির মা-র যেন খেয়াল হল, কী ফুলের গন্ধ, ফুল কোথায় রে রবিদাস?

রবিদাস হাসল, ফুল না।

তবে কীসের গন্ধ?

রবিদাস বলল, সাবানের।

নিখিল জিজ্ঞেস করল, কী সাবান, ও সুমন, কী সাবান মাখছে চন্দ্রা?

সুমন জবাব দেয় না।

রবিদাস তখন একটা সাবানের নাম করল। নিখিল মাথা নাড়ে। রবিদাস আর-একটা সাবানের নাম করল। নিখিল বলে, না না অত ভাল গন্ধ নয়, কোথা থেকে কিনেছ সুমন?

সুমন কথা বলে না।

রবিদাস তখন আর-একটা সাবানের কথা বলে। নিখিল হেসে উড়িয়ে দেয়। রবিদাস পরপর বলে যাচ্ছিল নতুন লাক্স, নতুন গোদরেজ, সিন্থল, ডাভ থেকে যত বিজ্ঞাপনের সাবানের নাম জানা আছে তার। রবিদাস বলছিল, দেখেছ বিজ্ঞাপনটা, একটি সুন্দরী একটি সাবান, হুইচ ওয়ান ইজ ইয়োরস, হা-হা-হা?

ওদের কথার মধ্যেই সুমন এগিয়ে যায়। অন্ধকারে ঘন হয়ে উঠেছে গন্ধটা। সবাই আবার চুপ করে গেছে। অন্ধকারে সকলে গন্ধের উৎসে তাকিয়ে আছে। চন্দ্রা জলের শব্দে বিভোর হয়ে আর কোনও শব্দই শুনতে পাচ্ছে না। শরীর ময়লা হয়েছিল চন্দ্রা জলে ধুয়ে নিচ্ছে নিজেকে। সুমন আরও একটু এগোয় দরজার দিকে। মনে হল, ওরাও যেন এগোল। সুমন বুঝতে পারছিল না অন্ধকারে চন্দ্রা শুকনো কাপড় পরবে কীভাবে। ভিজে ম্যাক্সি তোয়ালে বুকে চাপা দিয়ে বেরবে? সুমন টের পাচ্ছিল রবিদাসরা আরও সরে এসেছে। সুমন না পেরে শান্ত মেয়েটিকে কাঁদিয়ে দিল। কিন্তু মেয়েও তো কাঁদতে গিয়েই থেমে গেল। সুমন ডাকতে চাইছিল চন্দ্রাকে, পারছিল না। ওরা আবার সাবানের কথা বলছে। বলতে বলতে বাথরুমের দিকে তাকাচ্ছে বারবার। ওরা যেন অন্ধকারে দরজার ওপারে স্নানরতা চন্দ্রাকে দেখতে পাচ্ছিল। সবাই যেন ঘিরে আছে চন্দ্রাকে। চন্দ্রার কোনও উপায় নেই অনন্ত সময় ধরে স্নান করে যাওয়া ছাড়া। সাবান, শ্যাম্পু, অন্তর্বাস, কনডোমের বিজ্ঞাপনের নারীর মতো হয়ে চন্দ্রা জলে সাবানে অন্ধকারে ডুবে যেতে চাইছে। চন্দ্রার সব কিছু জেনে যাচ্ছে রবিদাস, নিখিলরা। সুমনের ঘাড় ভেঙে যায়। ঝুঁকে পড়ে সে। এতক্ষণে যেন টের পেল সুমনের দেড় বছরের কন্যা, সে ডেকে উঠল মাকে—মা ও মা, মা তুমি কই? রবিদাস আরও এগিয়ে এল, আর কতক্ষণ লাগবে তোমার বউয়ের, ও সুমন?

(শারদীয় আজকাল—১৯৯৮)

যাদুজীবন

পীরসায়েবের উরস লেগেছে পীরতলায়। কতকালের উৎসব এটি। এখন যারা খুব বুড়ো, থুত্থুড়ো, মরো মরো প্রায়, উরস শেষ হলে মাটি নেবে কিংবা শ্মশানে যাবে, ধুলোয় পাছা ঘষে হাঁটে, তাদের বাপ ঠাকুর্দার আমলেও পীরতলায় এই মেলা ছিল, উরস ছিল। যে গাছটি ওই অদূরে ডালপালা মেলে ছায়ায় ঢেকেছে সব, ওই যে ওই মস্ত মেহগনি,আর খালপাড়ের ওই শিরিস, ওই সব মহাবৃক্ষ যখন ছিল না তখনো পীরের এই মেলা ছিল পীরতলায়। খালের ওপারে দূরে আমোদপুরে যে ভুতোবোম্বাই আমগাছের ছায়া নিয়ে প্রায় যুদ্ধ হয়ে গেল আগের মাসে, তাই নিয়ে দুই তরফেই থানায় এল, থানা থেকে আলিপুর কোর্টে গেল দেওয়ানি মামলা ঠুকতে, সেই গাছ যখন আঁটির ভিতর প্রাণবীজ নিয়েও জন্মায়নি, তখনো ছিল পীরতলার মেলা। সুলেমান রিকশাওয়ালা জানে যখন নদী বিদ্যাধরী শুকোল এই পীরতলায়, পীরসায়েবের শাসনে নদী উধাও হলো পীরতলা থেকে, তখন আরম্ভ হলো এই মেলা। সে যে কতযুগ আগের কেউ জানেনা। তখন এই জগৎ সংসার ছিল কিনা তাই বা কে জানে' পীরতলায় তখন ছিলেন পীরসায়েব আর বিদ্যাধরী নদী। সুলেমান বলে, সব আমি জানি কী জানে সুলেমান বুড়ো? পীরসায়েব মোয়াজ্জেম শাহ্ আরব দেশ থেকে এসে নদী শাসন করলেন এখেনে। নদী তাঁর ভিটে ভাঙছিল। বিদ্যাধরী ছিল খুব খলবলে নদী। ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এল পীরবাবার দিকে।

সুলেমান বলে, থাম।

নদী প্রায় থেমেই গেল।

সুলেমান বলে, যা।

নদী চলেই গেল।

কোথায় গেল নদী? সুলেমান বলে কোথায় গেল কেউ জানে না, কিন্তু সে জানে। নদী গেছে মাটির নীচে। এখনো যদি পীরতলার মাটি খোঁড়, নদী মিলে যাবে। নদী মানে নৌকো, নদী মানে শামুকগেঁড়ি, নদী মানে নদীর গন্ধ, বাতাস। নদী না থাকলেও তার বাতাসটি আছে। সন্ধে হলেই টের পাওয়া যায়। আরো রাত্রি হলে মাটিতে কান দিলে ধরা যায়, বিদ্যাধরী বইছে। কাল রাতেও শুনেছে সুলেমান।

এখন সে রিকশার উপর বাবু হয়ে বসে। মেলায় প্যাসেঞ্জার বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু সে তো আসার পথে, বামুনপুকুর হাইরোড থেকে। সুলেমান আছে খালের এপারে, কাঁঠালিয়ায়, খালের উপর শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের মতো, কাছিমের পিঠের মতো খালপোল। পীরথান খালের ওপারে, থানাগোড়া থেকে দু কিলোমিটার হবে প্রায়। পীরের মেলাও তাই ওপারে। তবু সুলেমান তার রিকশা নিয়ে এপারে বসে, মেলা ফিরতি লোক নিয়ে যাবে বাসস্ট্যান্ডে।

বুড়ো সুলেমান জানে নদী আর পীরসাহেবের ইন্তেকাল হলো একদিনে। তাই এই পীর

মেলা নদী মেলাও বটে। বুড়ো সুলেমান বলে, আসলে নদীই হলেন পীরসায়েব, কী ছিলেন তিনি, কী ছিলেন না, তা বলবে কে?

পীরের মেলা বসে গেছে, তেরোই জ্যৈষ্ঠ আজ। পীরতলা হলো মধ্যিখানে, ওপারে দক্ষিণে বামুনপুকুর হাইরোড, এপারে উত্তরে কাঁঠালিয়া, বিজয়গঞ্জ, শানপুকুর। বাস যায় লাউহাটি হয়ে শ্যামবাজার। লোক আসছে দলে দলে। বাস থেকে নেমে পায়ে পায়ে খালপোল দিয়ে ওপারে গিয়ে পীরতলায় হারিয়ে যাচ্ছে। সুলেমান জানে মেলা বেড়ে যাচ্ছে বছর বছর। মানুষ বেড়ে যাচ্ছে বছর বছর। ফূর্তি অশেষ হয়ে যাচ্ছে ফি বছর।

বিজয়গঞ্জের একানব্বই নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে খাল পার হয়ে পীরথান তিন কিলোমিটার পথ। আবার পীরথান থেকে ওই দক্ষিণে বামুনপুকুর হাইরোড সাড়ে চার কিলোমিটার লম্বা হয়ে গেছে প্রায়। এদিকে খাল আছে তাই মেলা কেটে গিয়ে রসভঙ্গ, ওদিকে একই পথ, বামুনপুকুর হাইরোড পর্যন্ত মেলা পৌছল বলে। খালের ওপারে মেলা, এপারে শুধু জনস্রোত। মানুষের নদী বয়ে যাচ্ছে পীরথানের দিকে। সুলেমান বিড়ি ধরাতে ধরাতে দেখল লোকটা বসে আছে মেহগনির ছায়ায়, বাধানো চাতালে। এখনো বসে আছে। সেই সকালে এসেছে, সূর্য কত উপরে উঠে গেছে এর ভিতরে। মেলায় এসেছে তো মেলায় যাক। খাল পার হয়ে মিশে যাক মেলার ভিতরে। নাকি ও মেলায় আসেনি, এসেছে অন্য কোথাও। সে প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন বাজিয়ে দিল, যদি আসে লোকটা, শানপুকুর, ভাসিলিয়া, ভগবানপুর, তেউরহাট। ফূর্তিতে হর্ন বাজাতে লাগল সুলেমান রিকশাওয়ালা।

আজ সুলেমানের খুব ফূর্তি। মেলা তো বছরে একবার, থাকবে সাতদিন। রিকশার খদ্দের কম, তা হোক মেলা জমে গেছে যে। মেলা জমে গেছে এমন যে বিজয়গঞ্জে বাস থেকে নেমেই লাউহাটি, হাড়োয়া, বেড়াচাঁপা দে-গঙ্গার মানুষ মেলার ডাক শুনতে পাচ্ছে। এতলোক যে মনে হচ্ছে বাসস্ট্যান্ডেই মেলা লেগে গেছে। বাস থেকে নেমেই যদি মেলা পাওয়া যায় তবে কে আর রিকশার খোঁজ করে? আর সুলেমানের রিকশা তো খালপোলের গোড়ায়। বড় আশ্চর্য মানুষ সুলেমান, এখন ওপার থেকে মেলা ফেরত লোকের আসার কথা নয়, এখন সব মেলায় যাচ্ছে, তবু সে তাই রিকশা নিয়ে উল্টোদিকেদাঁড়িয়ে আছে। এখেনে প্যাসেঞ্জার হবে বিকেলবেলায়, যখন ফেরা আরম্ভ হবে মেলার মানুষের।

মেলা লেগে গেছে। মেলার ডাক খাল পার হয়ে এপারে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ...আসুন আসুন ভি,ডি,ও-য় আসলি ইংলিশ পিকচার, অ্যাডাল সিনেমা...কথা বলা পুতুল...কাটামুন্ডুর কথা বলা...তিনমাথাওয়ালা মানুষ....হেলিকপ্টার...নাগর দোলা মেরি গোরাউন্ড ...নররাক্ষস ....যাদুকর বংশীলাল।

সুলেমান ঘুরে তাকায়। লোকটা বসেই আছে। সে রিকশা থেকে নেমে পা টেনে টেনে গাছগোড়ায় গেল। লোকটা সিগারেট টানছিল দম ভরে। সুলেমানের দিকে ফিরেও তাকাল না। আচমকা বড় সিগারেটটা সিমেন্টের চাতালে চেপে আগুন নিভিয়ে তার নীল জামার পকেটে রেখে দিল। শাদা প্যান্ট, নীল জামা, কতদিন ধোয়া হয়নি কে জানে। নাকে বোটকা গন্ধটা এল। লোকটা আকাশে তাকিয়ে চুপচাপ। সামনে যে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে তা যেন টেরই পাচ্ছে না। ক' হাত দূরে খালপোল দিয়ে জনস্রোত যে বয়ে যাচ্ছে ওপারে তা যেন দেখতেই পাচ্ছে না। সুলেমান আচমকা হেঁকে উঠল, শানপুকুর, ভাসিলিয়া, ভগবানপুর, তেউরহাট, পাগলাহাট, বড়ালিঘাট।

মানুষটা লম্ফ দিয়ে ওঠে, ওদিকেও মেলা?

সুলেমান জিজ্ঞেস করে, যাবে কোথায়?

মেলায়, কিন্তু এখন না।

কখন?

সে এসে গেলে।

কেডা আসপে?

সে। বলে গালে হাত দিয়ে লোকটা আকাশে তাকিয়ে থাকে।

সুলেমান বলল, তা হলে যাওয়া হবে না?

সে আসুক, সে না এলে মেজিকই হবে না।

আই বাপ! তুমি কি মেজিকওয়ালা?

হ্যাঁ, মেজিসিয়ান বংশীলাল, সে আসুক।

সে কে?

সুলেমান শুনল মিস রেবেকা। কী আশ্চর্য! যাদুকরের বউ লক্ষ্মীরানীই না মিস রেবেকা ছিল? জলজ্যান্ত এক যাদুকর বসে আছে গাছতলায় তা কেউ খেয়ালই করছে না। কেউ এখন জানেই না যাদুকর বংশীলালের কথা। কাটামুন্ডুর কথা বলা তো তার কাছে জলভাত। এ পকেট থেকে পায়রা বের করে তো ও পকেট থেকে টিয়াপাখি।

লোকটা বলল, সে এলে আমাকে ডেকে দিও।

তুমি কি এখন ঘুমোবে?

হ্যাঁ, খোয়াব দেখব। বলতে বলতে লোকটা হাসল। হাসিটা কি সুলেমানের চেনা? কেমন হাসি! দুঃখের না আনন্দের তা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার দু-চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, শেষ বেলায় সূর্য যেমন ডোবে তেমনি যেন খোলা দুটি জ্বলজ্বলে চোখ অস্ত যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ছে যাদুকর। বুঁজতে বুঁজতে দুই চোখ সম্পূর্ণ ঢেকে গেল। লোকটা ঢলে পড়ল মেহগনিগাছের গায়ে। সুলেমান ফিরে এল তার রিকশায়, খালপোলের গোড়ায়।

খালপোলের গোড়ায় আছে বলে কেউ তাকে ডাকছে না, 'হেই রিকশা' বলে।

এখন খালপোল পার হচ্ছে সবাই। ওপার থেকে এপারে আসছে না রিকশায় চাপা মানুষ। সুলেমান রিকশায় বসে ভাবে কী শুনল সে? ঠিক শুনল তো? মিস রেবেকা! মিস রেবেকাই লক্ষ্মীরানী। মিস নয় মিসেস লক্ষ্মীরানী। সুলেমান এখন বসে থাকবে মিস রেবেকার জন্য। রেবেকা এলে সে মেহগনির তলা থেকে ডেকে তুলবে যাদুকরকে। কী নাম বলল? কী আশ্চর্য! সেই বংশীলাল! সুলেমান ভাবে এ যে ভারি রঙ্গ হলো। তাকে এখন এক মেয়েমানুষের জন্য জেগে বসে থাকতে হবে ভরভরন্ত দিনের আলোয়। রিকশায় বসে ঝিমোন ও যাবে না। সে গুনগুন করে, রেবেকা, রেবেকা...ভাই এবং বোনেরা লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, এবার আসছে মিস রেবেকা...।

কত শত নারী আসে, কতই বাহার,
শত মধ্যে তিনি কেবা কী নাম তাঁহার?

সুলেমান মেলার মিছিলে মিস রেবেকাকে খুঁজতে থাকে।

দুই

পীরতলার মেলা লম্বা হয়ে দক্ষিণে বামুনপুকুর ছুঁয়ে তো ফেলেছেই, হাইরোডে পৌঁছে গেছে আর এদিকে উত্তরেও এই খালের ওপারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে থানাগোড়ায়। সুলেমানের মনে হচ্ছে খালপোলের ওপর দিয়ে মেলা এদিকে চলে এল বলে। খালপোল পার হতে পারলেই মেলা উত্তরে এগিয়ে যাবে। তখন এই কাটাখাল, বিজয়গঞ্জের বহু পুরোন খাল আর মেলাকে আটকে রাখতে পারবে না, যেমন নদী পারাপার করে এদিকের মানুষ ওদিকে চলে যায়, তেমনি ও দিকের মেলা এদিকে চলে আসবে। সে এক ধুন্দুমার ব্যাপার হবে। হই হই আরো হবে। খালপোলের গোড়ায় রিকশা নিয়ে সুলেমান যেন বসে আছে সেই মেলা ধরার জন্য।

পীরতলার মেলা এত বড় হয়ে যাচ্ছে যে বামুনপুকুরে যারা নামছে বাস থেকে তারা যেন পীরথানে, পীরবাবার মাজারে যাওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না। পীরথানে পৌঁছনোর আগেই মেলা দেখা হয়ে যাচ্ছে তাদের। মেলা দেখা মানে কাটামুন্ডুর কথা বলা, নররাক্ষস, ভি.ডি.ও. কথাবলা পুতুল, আইসক্রিম, কোকাকোলা, জিলিপি, তেলেভাজা, আম, জাম, লিচু জুয়া, ধিঙ্গি মেয়েমানুষ, হাতা, খুন্তি, কড়াই, বটি, পিঁড়ে, মিটসেফ, আলনা, নাগরদোলা, ফুটফুটে ঘরের বউ, স্বাস্থ্যবান পুরুষমানুষ—সব। এ সব দেখতে দেখতে কেউ কেউ কেন, অনেকেই তো ভুলে যেতে পারে পীরবাবার মাজারে যাওয়ার কথা, অন্তঃসলিলা নদীর কথা, পথের ধারে বসা বিকৃত অঙ্গ মানুষের কথা, বিকলাঙ্গ অদ্ভুত দর্শন মানুষের মুখ। সুলেমান জানে এ সব। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোকটা ঘুমিয়েই পড়েছে সত্যি। মাথাটি হেলে পড়েছে সম্পূর্ণ, মুখ দিয়ে যেন লালাও গড়াচ্ছে—ওই যাদুকরের। যাদুকর এখন খোয়াব দেখছে। খোয়াবই তো যাদু। লোকটা কে? বংশীলাল! নিঃশব্দে হাসে সুলেমান। বংশীলাল কোথায়? কম দিনের কথা নয় তা তো। এই আধবুড়ো সুলেমান তখন শা-জওয়ান, মাথায় গন্ধ তেল চুলে টেরি, গায়ে নাইলনগেঞ্জি কোমরে প্যান্ট— সেই সময়ের। লোকটা কি এল ক্যানিং হোড়োভাঙা থেকে?

পীরতলার মেলায় যারা আসে, সে মেলা দেখতে আসা মানুষ হোক আর পশরা নিয়ে আসা হোক তারা শুধুই পীরতলার মানুষ নয়। পীরতলায় এত মানুষ থাকে না। পীরতলাকে ঘিরে যে বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ড সেখানেও এত মানুষ থাকে না। এত মানুষ তবে আসে কোথা থেকে? না আরো দূর, দূরান্ত থেকে। বহুদূরে পুব দখিনে যে নদী আছে, সে মালঞ্চর নদী হোক বা ওপারের চৈতলঘাটের নদী হোক, কিংবা সন্দেশখালির নদী হোক, সেই মস্ত নদী পার হয়ে দলে দলে মানুষ পীরতলায় তো আসেই। শুধু মেলায় নয়, সারাবছরই তারা চৈতলঘাট পার হয়ে মালঞ্চর ঘাটে নেমে, তারপর সেখান থেকে বাসে, ম্যাটাডোরে চেপে এমন কি ভ্যানরিকশাতে বসেও চলে আসে বামুনপুকুর, কিংবা এই কাঁঠালিয়া। বামুনপুকুরে 'নূরমহল' আর কাঁঠালিয়াতে 'চৈতালি সিনেমা'—দুই সিনেমা হলেই থাকে তাদের লক্ষ্য। পীরসায়েবের মেলা ছাড়াও পীরতলায় সম্বৎসর আনন্দ করার উপায় আছে। লোকজন নৌকোয় নদী পার হয়ে, বাসে, ম্যাটাডোরে, লরিতে, ভ্যানরিকশায় চেপে বামুনপুকুরে না হয় আরো ভিতরে এই কাঁঠালিয়াতে এসে ঢুকে পড়ে অন্ধকার ঘরে। 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' কিংবা 'বাবা কেন চাকর' দেখে হই হই করতে করতে ফিরে যায়। এই আসার ভিতরে আবার অন্য উদ্দেশ্যও থাকে। পীরসায়েবের মাজারে যাদের মানত থাকে, ভারা বাঁধার বাসনা থাকে যাদের পীর-মাজারের মহাবৃক্ষে, তারা সেই কাজ সেরে ভোর ভোর রওনা হয়ে তারপর হয়তো দিলওয়ালে কিংবা 'বেদের মেয়ে জোসনা' ও দেখে ফেলে। একসঙ্গে দুই কাজের এত সুবিধে অন্য কোথাও

নেই। সুলেমান ঘাড় ঘুরিয়ে আবার দেখল লোকটাকে। সিনেমা শো-এর জন্য অপেক্ষা করছে নাকি? শো-টাইমে ওর রেবেকা আসবে নাকি? হায় রেবেকা! পাঁচটা বল পাঁচ রঙের, আকাশে পাঁচটা বল উঠছে আর দুহাতের ভিতরে নাচছে। মিস রেবেকা ঠিক এই রকমই তো ছিল। কত বয়স হবে তার? একুশ বাইশ, একেবারে নতুন যৌবন, মুখখানি তার কেমন? যাদুকর ঘুমিয়ে পড়ার আগে জিজ্ঞেস করে নিলে হত। গায়ের রঙ কেমন, চোখের মনি নীল না বিড়ালের মতো বাদামি সবুজ? কতখানি মাথায়? কতখানি তার বুক, কেমন টানাটানা চোখ...যাদুকর, ও যাদুকর?

যাদুকর ঘুমিয়ে আছে। যত সময় ধরে ঘুমোবে তত সময় ধরে রিকশায় বসে সুলেমানকে মেলার মানুষ দেখতে হবে, তার ভিতরে খুঁজতে হবে মিস রেবেকাকে, তাকে পেয়ে গেলেই যাদু শুরু হয়ে যাবে। ঝান্ডিজুয়া খেলা, কাটামুন্ডু, নররাক্ষস ছেড়ে দলে দলে লোক তখন যাদু দেখতে ছুটে আসবে। কিন্তু ও কীরকম মানুষ! যে আসবে তাকে কী করে চেনা যাবে সে কথা না বলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল! পাগল নয়তো? পীরতলার মেলায় কত রকম লোকই না আসে। তার ভিতরে কত পাগলই না থাকে? সুলেমানের এই এক বিস্ময়। পাগলেরা কী করে খবর পায় তেরোই জৈষ্ঠ পীরতলায় মেলা বসছে। তেরোই জৈষ্ঠের হিসেব রাখে কী করে তারা? এত হিসেবই যদি রাখতে পারে তাহলে তারা পাগল কীভাবে হয়? কিন্তু পাগল আর ভবঘুরে তো ঠিক গন্ধে গন্ধে মেলায় আসে। সুলেমান সকাল থেকে অন্তত দশটা পাগলকে দেখেছে খালপোল দিয়ে ওপারে পীরথানের দিকে চলে যেতে। পাগল আর ভবঘুরে কি ঘুমের ভিতরে খবর পায় এই মেলার? নাকি লোক যাচ্ছে, তাই তাদের অনুসরণ করে চলে আসে এদিকে? কোনোকিছুই বোঝা যায় না। যাদুকর পরিচয় দিয়ে যে লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল সে পাগল হতে পারে।

এখন সুলেমান খালপোলের দিকে আসা মানুষের ভিতর থেকে মিস রেবেকাকে খুঁজে বের করতে চাইছে। মিস রেবেকা কি জানে যাদুকর কোথায় ঘুমিয়ে থাকবে? যাদুকর কি তাকে পীরতলার মেলার কথা বলে দিয়েছে শুধু। 'মেলায় থাকব' বলে একা একা এসে মেহগনি তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি যাদুকর জানে মিস রেবেকা তাকে খুঁজে বের করবেই। যাদুকর ছাড়া যাদু শুরু হবে কী করে?

ইস! কেমন ভাবে কোন চিহ্নে চেনা যাবে মিস রেবেকাকে তা যদি একবার শুনে নিত সুলেমান। ওই যে লোকটা ঘুমিয়ে আছে ও জানে! রেবেকাসুন্দরীর গায়ের রং কি কাঁচা সোনার মতো, নাকি মাজা মাজা, নাকি মেঘের মতো কালো! তিনটি বোনের কথা মনে আছে সুলেমানের। বড়বোন লক্ষ্মী, তার গা দিয়ে কালোরং পিছলে পড়ে যেন, কালো মুখখানিতে দুই চোখের সাদামণি জ্বলজ্বল করত। তার যৌবনেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল সুলেমানের। সুলেমান বলেছিল, মেঘ থেকে জন্ম নাকি তোমার, ও লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী না মিস রেবেকা।

পরের বোন ছিল পার্বতী। গায়ের রঙ কাঁচাসোনা, মাথার চুল মেঘের পুঞ্জ, যৌবন এমন ঘিরেছিল তাকে, গা দিয়ে মধুর গন্ধ পাওয়া যেত। না পেরে সুলেমান বলেছিল, চাঁদ থেকে জন্ম নাকি তোমার, ও পাব্বুতি?

পাব্বুতি না মিস রেবেকা।

তার পরের বোন ছিল সন্তোষী। মাজা মাজা গায়ের রঙ, ফুলের মতো মুখখানি, চোখ

দুটি টানা টানা, দেখলে একবার দাঁড়াতে হবে। ও সন্তোষী, সন্তোষী, নীল আকাশ কি তোরে নীচে পাঠাল, আকাশে তোর ঘর?

আমি সন্তোষী না, মিস রেবেকা।

কোন রেবেকা আসবে আজ? মেঘরেবেকা, চাঁদরেবেকা, নীলরেবেকা? ঠোঁট জোড়া পানরাঙা, গায়ে শাটিনের খাটো ফ্রক, বুকে জরির ফুল। তরতর করে জেগে উঠল যেন আধবুড়ো সুলেমান রিকশাওয়ালা। এই মেলাতেই বছর বছর আসত যাদুকর বংশীলাল, মাথার চুল সব শাদা, গায়ের চামড়া থলথলে, শাদাপ্যান্ট, কালো শার্ট, মাথায় হ্যাট। সাতদিনের মেলার সবদিনই সুলেমান তার যাদুর খদ্দের। মিস রেবেকার হাতে পাঁচটা রঙীন বল নাচত। তারপর সে ঢুকে যেত মস্ত এক বেতের বাক্সের ভিতরে। শুয়ে পড়ত টান টান হয়ে। যাদুকর ডাকত, এসে দেখে যাও, মিস রেবেকা শুয়ে পড়েছে কিনা।

একদিনই সুলেমান গিয়েছিল। দেখেছিল মিস রেবেকার। মুখে ভয় জেগে উঠেছে শ্বাসপ্রশ্বাসে ভরা বুক থর থর করছে। খাটো ফ্রক এতই খাটো যে টেনেও লজ্জা ঢাকা কঠিন। চকচকে ঘনকালো রঙের পুরুষ্টু উরু প্রসারিত করে শুয়ে আছে যাদুকরের বউ। ডালা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর যাদুকর ছুরি মারতে লাগল বেতের বাক্সে। ছুরি বিঁধিয়ে দিতে লাগল সমস্ত ফাঁক ফোকর দিয়ে। ভিতর থেকে আর্তনাদ উঠে আসতে লাগল। কিন্তু শেষে কী হলো, বাক্সের ডালা আপনিই খুলে গেল; ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মিস রেবেকা হাসতে হাসতে, তার পরা গোলাপী শাটিনের ফ্রক লাল টুকটুকে হয়ে গেছে। নিচু হয়ে সালাম করল মিস রেবেকা। কালোর কী রূপ! কোন অঙ্গ ছেড়ে কোন অঙ্গ তখন দেখবে সুলেমান?

সেই রেবেকা মানে মেঘরেবেকা আসবে নাকি? সে ছিল যাদুকরের বড়বউ, সঙ্গে আসত পার্বতী আর সন্তোষী। তিনবোনই পরপর। তারা ছিল ছেলেমানুষ, যাদুকরের ডান হাত বাঁ হাত, এ খেলা সে খেলায় সাহায্য করত।

সুলেমানের বুক ঝম ঝম করছে। কতদিন, কতকাল, বাদে সে মেয়েমানুষ দেখছে রিকশায় বসে। মেয়েমানুষ মানেই তো রং! কত রং সেখানে, শাড়ির রং, ব্লাউজের রং, চুড়ির রং, কপালে টিপের রং, ঠোঁটের রং, পায়ের আলতার রং, নখের রং—হাসির রং, উড়ন্ত আঁচলের রং, খসে যাওয়া ওড়নার রং। মেলায় তো এমনই দেখা যায়, দেখছে সুলেমান। রঙে ভেসে, গন্ধ ছড়িয়ে ছড়িয়ে মরালীর মতো চলেছে সবাই মেলার দিকে। কারোর খোলাচুল উড়ছে কারোর খোপা ভাঙছে, কারোর আঁচল আচমকা খসে যাচ্ছে, সামলেসুমলে হাসতে হাসতে চলেছে সবাই। এদের ভিতরেই মিস রেবেকা থাকবে। তাকে চিনে নিয়ে 'মেজিকঅলা' কে ডেকে তুলতে হবে তাকে। সুলেমান দেখল লোকটা প্রায় বাঁধানো চাতালে শুয়েই পড়েছে।

মেলা ডাকছে খালের ওপার থেকে। কাটামুন্ডু, নররাক্ষস, কথাবলা পুতুল, তিন মাথাওয়ালা মানুষ, ইংলিশ ভি.ডি.ও সব ডাকছে। সুলেমান বিড়বিড় করে, আসুন, আসুন। বহুকাল পরে আপনাদের প্রিয় যাদুকর বংশীলাল আর মিস রেবেকা।

মাথার উপর কোথা থেকে একখন্ড মেঘ ভেসে এসেছে। মেলার ডাক তো উপরেও পৌঁছয়। এত হাঁকডাকে মেঘ তো আসবেই। বছর বছর আসে। লোকে বলে মেলা শেষ হয় বৃষ্টিতে। লোকের কথা মুখেই থাকে, [illegible] অনেকবারই হয় না। মেঘ এসে চলে যায়। এখন [illegible] মেলার উপরে। ছায়া হতেই লোকের ভিড়

যেন বেড়ে গেল। খালপোলে এক দিকেই স্রোত। ওপারের মানুষ এপারে আসতেই পারছে না। মেলা বোধহয় খাল টপকে এপারে চলে এল। ধরাই যাচ্ছে না কোথাকার মেলা কোথায় ছড়িয়ে গেছে। খালপোলের এখানেই যদি এমন হয়, বামুনপুকুর তো ভেসেই গেল প্রায়। লোক এরপর ধরতেই পারবে না বামুনপুকুরের মেলা পীরতলায় ছড়িয়েছে, না তার উল্টোটা? পীরতলা থেকেই লোক হয় বামুনপুকুর নাহয় খোলপোল পার হয়ে চলে আসবে মেলা দেখতে। মেলা এমন বে-হিসেবিই হয়।

লক্ষ্মীকে চিনেছিল সুলেমান আলাপে। যাদুকরের বাড়ি ক্যানিং, মাতলা নদীর ধারে হেড়োভাঙা গ্রাম। লক্ষ্মীর দুটো বাচ্চা। একটা কোলে, অন্যটা কাঁখে। তার দুই বাচ্চা ধরে তার দুই বোন, সে খেলা দেখায়। সকালবেলায় পার্বতী আর সন্তোষীকে নিয়ে বাচ্চা সমেত যাদুকর গেছে মেলায় সওদা করতে, সুলেমান তখন হাজির, ডাক দেয়, রেবেকা, মিস রেবেকা, তোমার গায়ে ছুরি ফোটে না?

না, যাদুকরের মেজিক।

রেবেকা, মিস রেবেকা তোমার মা বাপ?

বে'র পর আর মা বাপ কী?

বুন দুটোর তো বে' হয়নি।

লক্ষ্মী বলে, মা মরেচে, বাপ নোতন সংসার করেচে, খেতে দেয় না, পরতে দেয় না, নোতন মা মরতে বলে, তো মেজিকঅলা যখন বলল ও দুটোরেও দেন, ভগবানের ইচ্ছেয় অভাব নেই, জমি আছে ক'বিঘে, আমি ওদের বে' দেব, তা বাপে আরো খুশি, যাদুকর ওদের তার খেলার সাথী করে নিল।

সুলেমান বলল, রেবেকা এই গন্ধতেলডা নাও, তোমার খেলায় খুশি।

লক্ষ্মী হাসল, যত বুড়ো মনে করো, মেজিকঅলারে, সে ততো বুড়ো লয়, তিন বুনরে সুখেই রেকেচে, ওদের তো বাপের মতো সেনেহ করে।

সুখে রাখুক। ঝপ করে সুলেমান তার হাত ধরে, তুমি তারে ডরো?

কে বলেছে?

বাক্সে ঢুকে ডরাইছিলে, কাঁপছিলে।

লক্ষ্মী বলল, এখনো ভয় গেল না, যদি ছুরি ঢুকে যায় সত্যি।

রেবেকা আমার সঙ্গে যাবা?

না, আমার মেজিক কী হবে?

আমি মেজিক শিখে নেব তুমার নেকট।

আমি জানি নে, যাদুকর শিখায় না, বলে শিখালে বিদ্যা চলে যায়, যাদু চলে গেলে যে কী হবে ছুলেমান, ওফরে কী যে হবে!

কী হবে?

বিশটা ছুরি ঢুকে যাবে আমার ভিতর, কবরের কান্না জানো?

না।

সে খেলাও সে দেখাবে পরের বার, ওফ যাদু চলে গেলে যে কী হবে।

সুলেমান বলে, ফালতু ডরাচ্ছ।

জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে ছুলেমান, তুমি যাও।

সুলেমান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোকটা উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। দিনদুপুরে এত হাঁকডাকের ভিতরেও দিব্যি খোয়াবে আছে। সুলেমান দেখল যাদুকর আসছে। যাদুকরের পিছনে দুই বোন, তাদের দুই কোলে যাদুকরের দুই সন্তান।

যাদুকর হেঁকে উঠল, তুই কেডা?

আমি ছুলেমান।

ভাগো হিঁয়াসে, অ্যাই সন্তোষী বেত আন, মাগীরে আজ দেখি।

সুলেমান দেখল ভীত মেয়েপক্ষী লক্ষ্মীরানী লুকায় তাঁবুর ভিতরে। পার্ব্বতী মাপ চাইছে তার হয়ে, দয়া করো, দয়া করো, হে যাদুকর। যাদুকর গজরাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

রাগেতে মেদিনী কাঁপে, তিনি বংশীলাল।

দয়া করো প্রভু তুমি, ঘরে নাই চাল।

তিন

পরের বছর মেঘরেবেকা এল না। এল না কেন? লক্ষ্মীরানী আবার পেটে ধরেছে। পার্বতীর কপালে সিঁদুর। সেও নাকি যাদুকরের এক পক্ষ হয়েছে। পার্বতীর সঙ্গে সন্তোষীও ঘুরছে মেলায় মেলায়। চাঁদরেবেকা আর নীলরেবেকা।

শীর্ণকায় পার্বতী ডাকে, ছুলেমান ভাই, ছুলেমান, দিদির বড় কষ্ট, দিদির একবার নষ্ট হয়েছে, দুই সন্তানের মার এমন হয়?

সন্তোষী বলে, নষ্ট হলো দাদাবাবুর রোষে, দিষ্টি খুব খারাপ যাদুকরের, আবার পেটে ধরতে ওকে রেখে মেলা করতে বেরনো হলো, দিদিটা বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে?

পার্বতী বলে, ওগো ছুলেমান তুমি যাও, তিন বুনির কপালে এক সোয়ামী, ওরেও ছাড়ে না যাদুকর, ছুলেমান যাও, তোমারে তুক করে মেরে ফেলবে ও লোক।

শুনেছিল সুলেমান। তাকে দেখে যাদুকরই বলেছিল, পার্বতীর সঙ্গে আশনাই হয়েছিল নদীর ধারের এক মাছমারার, ঝড়ে তার নৌকো ডুবেছে। সন্তোষীর পিছু পিছু ঘুরছিল এক কুমোর, হাতি ঘোড়া গড়ে, পুতুলও গড়ে আবার হাঁড়ি কলসী রঙ করে, বন বন করে চাকা ঘুরোয়। রক্তবমি করে মরে গেল লোকটা তুই সাবধান সুলেমান, এদিকি নজর দিলি কোনো বাপ বাঁচাবে না, পারবেই না বাঁচাতে।

সুলোমান এমন পাগল, ছুটল হেঁড়োভাঙা, থাকল মেলা পড়ে। ট্রেন বাস করে যাদুকরের ভিটেয় পৌঁছল ভর সন্ধ্যে, রেবেকা, মিস রেবেকা!

ভূত দেখেছিল সুলেমান। পোড়াকাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীরানী। আবার খসে গেছে পেটেরটা। কী যে করল তারে যাদুকর। ছুলেমান, ছুলেমান তুমি পালাও, আমি এবার মরব।

আমার সঙ্গে চলো। হাড় খটখটি শরীর ছুঁলো সুলেমান।

আমার মেজিক?

মেজিক একটাও জান না?

জানি, কিন্তু সবটা না, আবার মেজিক শিখালে আমার মরণ, কবরে ঢুকে দম আটকে মরে যাব গো ছুলেমান, বিশটা ছুরি ঢুকে যাবে শরীলে...। বলতে বলতে হাঁপাতে লাগল লক্ষ্মীরানী, আমারে বাণ মেরে দেবে যাদুকর, যাদুবিনা বাঁচার উপায় নাই মোর।

সুলেমান ফিরে এসেছিল অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে। হাঁটতে হাঁটতে সুলেমান পৌঁছে গেছে

মেহগনি তলায়। ঘুমন্ত যাদুকরকে ডাকে,মেজিকঅলা, মেজিকঅলা, কোন রেবেকা আসবে গো। মেঘ না চাঁদ, না নীল?

যাদুকর ওঠে না। সাড়াই দেয় না। সুলেমান ঘুরে দেখল মেলা যেন জনসমুদ্র। এত মানুষ এই মেলায় আগে কখনো আসেনি। সে যেন দ্যাখেনি এত মানুষকে এক সঙ্গে। সুলেমান দেখল খালপোল দিয়ে মানুষ আর উঠতে পারছে না। খালপোল ও মানুষে ভর্তি হয়ে গেছে। ওপারে খালপোলের নীচে যে থানাগোড়া সেখানে এত মানুষ, এত হাঁকডাক, এত মিঠাই এত বেলুন, এত মজা যে তা পেরিয়ে আর এগোতে না পেরে খালপোলের নীচেই সব দাঁড়িয়ে গেছে। ওপারে, খালপোলের নীচে মেলা বসে যাওয়ায় এপারে চাপ বাড়ছে। খালপোলে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ে মেলা দেখছে। সুলেমানের মনে হলো এপারেও মেলা চলে এল। যাদুকর উঠলেই হয়ে যাবে। এপারে যাদু শুরু করে দিলে আর কী বাকি থাকে?

সুলেমান ডাকল, ও মেজিকঅলা, মেজিকঅলা।

যাদুকর সাড়া দিল না এবারও। সুলেমান দেখল খালের ওপর থেকে পাঁচ রঙের পাঁচটা বেলুন উড়ে এসে এদিক দিয়ে ভাসতে উধাও হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গেই খালপোল থেকে মানুষ নামতে আরম্ভ করল। খালপোলের ওপারের হাঁক ডাক এপারে এসে পৌঁছল। পীরতলার মেলা খাল পার হয়ে এদিকেও চলে এল। ঘণ্টা বাজিয়ে হাওয়াই মিঠাইওয়ালা লোক ডাকছে।

সুলেমান তার পা টেনে টেনে যে রিকশার দিকে এগোবে, পারে না। জনস্রোত এখন এদিকে। এই পা-টা গাড়ির চাকার তলায় গিয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন না, এই ক'বছর আগে। তার মনে হয় যাদুকরের রোষে গেছে। কিন্তু তখন তো যাদুকর বি, লাল মানে বংশীলাল আর আসে না।

সুলেমান ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল, মেজিকঅলা হাজির, মিস রেবেকা আর যাদুকর বি, লালের যাদু, কবরের কান্না, বিশটা ছুরি বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াবে মেয়েমানুষ—মিস রেবেকা।

মেলা তো চলে এসেছেই। ওপার সম্পূর্ণ হয়ে মেলা উপচে পড়েছে এপারে। খালপোল যেন মড়মড় করছে। ঢেউ-এর মতো মানুষ নামছে। লোকজন সব ছুটে এল প্রায়, কোথায় মেজিকঅলা, এত বড় মেলা, মেজিক নাই! মেজিক না হলে কিছুই নাই, মেজিক কোথায়?

সুলেমান দু'পা পিছিয়ে যাদুকরকে আবার ডাকে, ওঠো গো মেজিকঅলা, লোকজন হাজির, তোমার ঝুলি উপুড় করো, নীল জামা শাদা করো।

বলতে বলতে যাদুকরের জামা ধরে টান দিল সুলেমান। লোকটা তার ভারী শরীর নিয়ে চাতাল থেকে গড়িয়ে পড়ল। চোখ উল্টে গেছে। সুলেমান হেঁকে উঠল, মেজিকঅলা, বংশীলাল! আর্তনাদ করে ওঠে সুলেমান।

মেলা দেখতে যারা পীরতলায় যাচ্ছিল, তারা খালের এপারেই মেলা পেয়ে যাওয়ায় খুব খুশি। পীরতলা পর্যন্ত হাঁটতে হবে না, পরিশ্রম হলো না, বাসস্ট্যাণ্ড থেকে হেঁটে এসে খালপোলও পার হতে হল না, মেলা মিলে গেল। তারা সবাই এসে সুলেমানের পাশে দাঁড়িয়েছে, ঘিরে দাঁড়িয়েছে মহাবৃক্ষ মেহগনি। তারা সবাই ডেকে উঠল, মেজিকঅলা, উঠে পড়ো।

উঠল না যাদুকর। এখন সে চিত হয়ে চোখ উল্টে পড়ে আছে। একজন এসে নাকের কাছে হাত রাখল, বাতাস নেই। একজন বুকে হাত দিল, ধুকপুকানি নেই। নাড়ি দেখতে চাইল একজন, পেল না। না পেতেই সে আর্তনাদ করে ওঠে, গোঁ, মরে গেছে লোকটা!

পীরতলার যাদুকর খালের এপারে এসে মেলার ভিতরেই মরে গেছে। মেলা যতটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, মরা যাদুকর নিয়ে তা আরো সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। জমে উঠল। ছোলা, বাদাম, তেলেভাজা, লজেন্স, হাওয়াই মিঠাই, চা, বিস্কুট খুব বিক্রি হতে লাগল। সন্দেশ, রসগোল্লা, গজা, জিলিপি এবং বেলুনও। যেতে যেতে বেলুন ওড়াতে ওড়াতে তারা সবাই ম্যাজিক দেখতে লাগল। যাদুকর মরে গেছে, নাকে হাত দিয়ে দ্যাখো, নাড়ি দ্যাখো, বুকে হাত দাও, বেঁচে নেই যাদুকর, কিন্তু বেঁচে উঠবে। বেঁচে উঠবে এই কথা যে কীভাবে রটে গেল? সবাই সুলেমানকে দেখতে লাগল। যাদুকর তো সুলেমানই। মরামানুষ বাঁচিয়ে তুলবে পীরতলার পীরসায়েবের মতো এই যাদুকর বংশীলাল। ওপারে থানাতে খবর গিয়েছিল, একটা মানুষ খালপোলের ধারে, কাঁঠালিয়ায় মেহগনিতলায় মরে পড়ে আছে, এই শুনে পুলিশ যখন নড়ে বসেছে, তখনই খবর এল ওপারের মেলা খুব গমগমে। জমজম করছে সব। যাদু শুরু হয়ে গেছে খুব জোর। মরামানুষ জ্যান্ত করার খেলা দেখাচ্ছে যাদুকর। শুনে পুলিশ আবার তাস খেলতে লাগল, ঘুমোতে লাগল, মেলায় বেরিয়ে পড়ল তোলা আদায় করতে।

পীরতলার মেলা খাল পার হয়ে কাঁঠালিয়া, বিজয়গঞ্জ ছাড়িয়ে গেছে। মেলা যে কিসের জন্য তাও ধরতে পারছে না মানুষ। কোথায় পীরতলা, পীরথান আর কোথায় বিজয়গঞ্জ? বুড়ো সুলেমান এখন তিন রেবেকার জন্য অপেক্ষা করছে। লক্ষ্মী, পার্বতী, সন্তোষী। তারা যাদুকরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একসঙ্গে। যাদুকর তাদের জন্য এই মেলায় এসে মরে গিয়ে বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি করে মেলা জমিয়ে দিয়েছে। এখন পীরসায়েবই পারেন তাকে বাঁচাতে। সুলেমান তার রিকশায় বসে ছিল। দলে দলে লোক মরা যাদুকরকে দেখে পয়সা পেলে চলে যাচ্ছে—ঘুরে টুরে আবার আসবে বলে।

এই রকম তো হয়ই। মেলা দেখতে এসে বেঘোরে মরে যায় কেউ কেউ। আর যদি তা হয়, উল্টো তো হতে পারে। এত মানুষের নাড়ি চলছে, বুক চলছে, পা চলছে, এ সবের ভিতরে পড়ে মরা মানুষ বেঁচে উঠতে কতক্ষণ! মরা মানুষের বেঁচে ওঠা না দেখতে পেলে এতদূরে আসা কেন সাত নদী পেরিয়ে? অতএব :

জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরোদিনে এস পীরতলা,
মরা মানুষ জ্যান্ত হয়, পাথরও চঞ্চলা।
খালপোল পার হয়ে মেলা ছুটে যায়,
দিক নাই কূল নাই, নদী যেমন হায়
মানষিই বয়ে যায় নদীর মতন,
যাদুতেই হয় সব, যাদুরই মতন।
জয় পীরসায়েব, জয় বিদ্যেধরী, জয়, জয়, জয়, জয়।

(শারদীয় নন্দন—১৯৯৯)

ব্ল্যাকম্যাজিক

সবুজের সব মুখস্থ। সবুজ সব খোঁজ রাখে বাজারের। সুতরাং ঠকাবার কোনও উপায় নেই। কোম্পানি যদি ফ্রি-গিফট দেয় দোকানদার তা চেপে রাখতে পারবেই না। সামান্য চাবির রিং, ডটপেন হলেও না। টুথব্রাশ বা গায়ে মাখার সাবান হলেও না। সবুজকে ফাঁকি দেবে কে? যে জিনিসে ফ্রি-গিফট পাওয়া যায়, সবুজ দোকানে গিয়ে সেইটেই চাইবে। যদি দোকানদার না দিতে পারে অন্য দোকানে যাবে। ফ্রি-গিফট যেন সবুজেরই উপার্জন। সবুজই যেন খুঁজে নিয়ে এল তা। এই যেমন এখন, মাসকাবারি বাজার এনেছে চোদ্দ বছরের সবুজ তার নতুন পাওয়া সাইকেলে চেপে। যত জিনিস কিনেছে তত জিনিসই ফ্রি এনেছে। বিশ্বজয় করে এসেছে চোদ্দ বছর পার হওয়া কিশোর। রিনি দ্যাখে, কিশোর নয়, সবুজ যেন যুবক। এই ছেলেকে সে পেটে ধরেছিল, বিশ্বাসই হয় না। মানুষ কী তাড়াতাড়ি বদলে যায়, কী তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

টেবিলে এক এক করে সাজিয়ে দিচ্ছে সবুজ, রিনি দেখছে। দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়েছে, ওরে সবজে, এ কোন্ পেস্ট এনেছিস, এ পেস্ট কি আমরা ব্যবহার করি?

নবীন শরীর নিয়ে ঝটকা মারল সবুজ, একটা ব্রাশ তো দশটাকা মা, আমার ব্রাটাতো চেঞ্জ করতেই হতো।

আলাদা কিনতে পারতিস?

হাসে সবুজ, আলাদা কেন কিনব? ফ্রি তো পেয়েই যাচ্ছি, আর কত চাবির রিং নেব মা?

এর মানে? রিনি অবাক। সে কি চাবির রিং আনতে বলছে ছেলেকে, বলছিল, তাদের অনেকদিনের অভ্যেস যে পেস্টে, সেই টুথপেস্ট বদল করল কেন সবুজ? সবুজ হাসে, আহ্, আহ, মা, তুমি কিছুই বুঝে উঠতে পার না।

আমি কি চাবির রিং-এর কথা বলেছি?

সবুজ বলল, ব্রাশের সঙ্গে চাবির রিং দিচ্ছে, চাবির রিং অনেক আছে, কেন নেব আবার?

না নিতিস, আমাদের আগের পেস্টের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

সবুজ বোঝায় সম্পর্ক আছে মা, তোমার পেস্টটা নিলে তো ফ্রি ব্রাশটা পাওয়া যেত না, কিনতে হতো ব্রাশ, টাকা খরচ, তার সঙ্গে চাবির রিং ...

রিনি মুগ্ধ হয় সবুজের ব্যাখ্যায়। হয়েছে ঠিক ওর বাবার মতো। নিলয় কি এই বয়সে এই রকম ছিল? সবুজ বলছে ফ্রি-গিফট ছাড়া যায় না, আবার ....।

হয়েছে, হয়েছে, দেখি কী এনেছিস, ওম্মা এ কী তেল রে?

সবুজ বলে, কেন খারাপ? মাথায় তো দিলেই না।

রিনি দেখল নতুন তেল। টেলিভিশনে তিনটি যুবতি প্রায় কিশোরী এর বিজ্ঞাপনে চুলের

ঢল নামিয়ে হাসে, এর সঙ্গে কী ফ্রি দিয়েছে? ফ্রি নিশ্চয়ই কিছু আছে, নাহলে সবুজ আনবে কেন? ছেলে খুব হিসেবি। মেয়েদের মুখ দেখে জিনিস কেনার বয়স কি হয়েছে সবুজের? সবুজ বলল, মা, এর সঙ্গে হেয়ার ডাই ফ্রি দিয়েছে।

হেয়ার ডাই! আকাশ থেকে পড়ল রিনি, কী হবে?

কী হবে মানে? তা তো তোমরা জানো!

রিনি এবার রাগ দেখায়, এই সবজে বলদেখি হেয়ার-ডাই কী?

সবুজ বলে, কেন চুলে দেয়।

চুলে কেন দেয় বল দেখি বাঁদর।

সবুজ। হায় সবুজ! এখনো তো দুধের শিশু প্রায়। ফ্রি-গিফট পেয়েছে তাই নিয়ে এসেছে, দোকানদার বলেছে নিয়ে যাও, মা বাবার কাজে লাগবে। সবুজ এখন ঠিক ধরতে পারছে না আসলে কী এটা? এও তো চুলে ব্যবহারের আর এক উপকরণ, তাহলে মা জিজ্ঞাসা করছে কেন?

রিনি আবার জিজ্ঞেস করে, বল হেয়ার-ডাই কী করে?

কেন, মাথায় দেয়, ব্ল্যাকম্যাজিক, চুল কালো হয় মা।

রিনি বলল, তোর বাবাকে দিবি বলে এনেছিস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতক্ষণে যেন দিশা খুঁজে পায় সবুজ। বাবার মাথার সাদা চুল এতে কালো হয়ে যাবে। তাহলে এর নাম কলপ? তাই তো! এবার বাবা যাবে কোথায়? হ্যাঁ মা, বাবার জন্যই এনেছি ধরে নাও।

পারবি তুই?

সবুজ বলে, তার আমি কী জানি, ফ্রি গিফট, নেব না কেন? বাবা যদি না মাখে আমিই মাখব, তুমিও মাখবে মা।

রিনি হাসছে, তুই মাখবি কবে রে, তুই কেন মাখতে যাবি?

সবুজ বলে, তাহলে তুমি।

রিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আচমকা সব চুল পেকে গেল নিলয়ের। অথচ কতই বা বয়স সবুজের বাবার? রিনির তেইশ, নিলয়ের তিরিশ, তখন সবুজ এল কোলে। এখন সবুজ চোদ্দ পার, নিলয় পার হয়েছে চুয়াল্লিশ, রিনির সাঁইত্রিশ। চুয়াল্লিশেই মাথা সাদা, নিলয় আধবুড়ো। কিন্তু কী অদ্ভুত গোঁ সবুজের বাবার। কিছুতেই চুলে রং দেবে না। রং দিলে নাকি চুল নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ এত যে মানুষজন দেখা যায়, সবার মাথার চুল কি স্বাভাবিক কালো, ডাই করা নেই? নিলয়েরই সহকর্মী ব্যানার্জিবাবুর তো পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, দেখলে মনে হবে নিলয়ই যেন পঞ্চাশ ছেড়েছে অনেকদিন আগে, আর ব্যানার্জিবাবু বড়জোর চল্লিশ। নিলয়ই তো বলেছে ব্যানার্জিবাবুর মাথার চুল রং করা। তবে? একবার সে কিনেও এনেছিল হেয়ার-ডাই—কালি মেহেন্দি। নিলয় ছুঁয়েও দেখেনি। পরে রিনি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

সবুজ দেখায়, এই যে মা তোমার ওয়াশিং পাউডার, সঙ্গে এটা দিয়েছে।

বাহ্। রিনি খুশি হল, সঙ্গে ৫০ গ্রাম শেভিং ক্রিম ফ্রি। নিলয়ের লাগবে। প্রায়ই তো বাসরে যেতে হয় ওকে, ছোটো ট্যুরে এসব খুব কাজে লাগে। সবুজ বলছে না নিলে তিনটাকা বাদ দিত, কিন্তু ৫০ গ্রামের দামই তো আট টাকা। টাকার বদলে জিনিস নেওয়াই তো ভাল,

দিন দিন যে রকম দাম বাড়ছে।

রিনি অবাক হয়ে দেখছে সবুজকে। কী সুন্দর বুঝে গেছে সব। টাকাকে বস্তুতে পরিণত করলে যে এই বাজারে লাভ বেশি, তা এর ভিতরেই বুঝে গেছে সবুজ। কিন্তু সবুজ এ কী করল? তিরিশ টাকার গায়ে মাখা সাবান রিনির শখের, তাও সে ওই এক সাবানে সারামাস চালাবে, সঙ্গে অন্য কম দামি চালু সাবানও তো থাকে। সবুজ একখানা নয়, তিনখানা এনেছে। তিনটে ওই হাঁসের ডিমের মত সাবান নব্বই টাকা। ওরে সবজে, তিনটে আনলি কেন? আমি তো আনতেই বারণ করেছিলাম।

সবুজ বলল, দারুণ অফার মা, দুটো নিলে একটা ফ্রি।

তার মানে?

ষাট টাকায় তিনটে, তিন মাসে একটা করে কিনতে গেলে নব্বই টাকা লাগত, দাম বাড়লে আরো বেশি লাগত, দাম তো বাড়বেই।

রিনি হিসেব করল, তিরিশ টাকার সাবান কুড়িতে এনেছে সবুজ। তার মানে দাম কমিয়ে দিয়েছে সবুজ। সে তিনটি সাবান দুহাতে ধরে একসঙ্গে নাকের কাছে নিয়ে এল। আহ। কী আশ্বর্য গন্ধ! কুড়ি টাকা যখন দাম হয়েছে ফ্রি গিফট নিয়ে, প্রতিদিনই ব্যবহার করতে পারবে সে। শীত যেতে না যেতে, ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকেই রোদে পুড়ে যাচ্ছে শহর। শেষ গ্লিসারিন সাবানটি পড়ে থাকল কদিন ব্যবহারের পর। অফুরান স্নানের দিন এসে গেল। নারকেল তেল গলে টলটলে হয়ে গেছে। রোদে পিচ গলছে হয়তো। পেপসি-কোলার রমরমে দিন এল। এই সময়ে এমন সাবান হাতে বাথরুমে ঢুকে পুরোনো চৌবাচ্চার বাসি জলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েও পড়া যায় আলস্যে। খুব ভাল করেছে সবুজ।

সবুজ বলল, মা এবার কোচিং যাব।

যা, সাবধানে সাইকেল চালাবি।

ঘাড় কাত করে বই-এর ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সবুজ। আচমকা সে বয়স্ক হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার বালক। রিনি প্রাণভরে দেখল। মুখখানিতে ভোরবেলার আলো। আহা, কদিন আগেও ঘরে লাফালাফি করে এটা ওটা ভাঙত ওছেলে। দেয়ালগুলো অ, আ, ক, খ—এ. বি, সি, ডি, লিখে ভর্তি করে দিয়েছিল। মা না খাওয়ালে খেতই না। এখনো তো ভাল করে খেতে পারে না। সেই সবুজ, নার্সিংহোম থেকে কোলে করে যে শিশুটিকে এনে শুইয়ে দিয়ে ছিল এই বিছানায়—সে এখন আলাদা শোয়। তার ঘর আলাদা। ঘরের দেওয়ালে শচীন, সৌরভ যেমন আছে, তেমনি আছে অমর্ত্য সেন। নিজের ঘর নিয়ে সবুজ আলাদা। কত বড় ছেলে তার। ভাবতে ভাবতে তেল, সাবান ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতে লাগল রিনি। গুছোতে গুছোতে ফ্রি-গিফট সব আলাদা করে ফেলল। আবার আলাদা করা দুটি সাবান ফ্রি-গিফটের একটির সঙ্গে মিশিয়েও দিল। আসলে একই সাবানের কোন্ দুটির দাম নিয়েছে, কোন্টা ফাউ তা ধরা যাচ্ছে না। যে কোনওটা ফাউ, আবার যে কোনওটা পয়সায় কেনা। রিনি নাকের কাছে এনে কাঁচা সাবানের গন্ধ নিতে লাগল।

দুই

এই তো হেয়ার-ডাই, তোমার ছেলে এনেছে। ফ্রি-গিফট।

কী হবে? নিলয় উদাসীন।

রিনি বলল, তুমি চুলে দেবে।

না, আমি ওসব দিই না।

দাও না তা কে না জানে, কিন্তু দিতে হবে।

সবুজ বাড়ি নেই। তিনদিন হেয়ার-ডাই সরিয়ে রেখে রিনি আজ শনিবারে চেপে ধরেছে সবুজের বাবাকে। কেন ব্যবহার করবে না নিলয়, কতজন করে। রেগুলার ব্যবহার করলে চুল কেন খারাপ হবে? সে পরে দেখা যাবে। কত কথাই না বলল রিনি এই হেয়ার-ডাই এর পক্ষে।

তোমার কী, আমি যদি ডাই না করি? নিলয় না পেরে বলল।

বুড়ো বর নিয়ে আমি পারব না। রিনি কপট রাগ নিয়ে নিলয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মাথা সাদা তাই বুড়ো, এমন কী বয়স হয়েছে নিলয়ের যে বুড়ো হয়েই থাকতে হবে।

রিনি আবার বলেছে, বুড়ো বরের সঙ্গে শুতে যাব না আমি।

শেষ পর্যন্ত নিলয় রাজি হল। না রাজি হয়ে উপায় কী? রিনি তো বলেছে, নিলয় যদি ব্যবহার না করে সে ওটা ফেলে দেবে জানলা দিয়ে।

সে কী, কেন?

রাখবে কেন, কার মাথায় ঢালবে এই ব্ল্যাক ম্যাজিক?

না, না পয়সার জিনিস।

হোক তা, রিনি ফেলেই দেবেই। বাড়িতে শুধু শুধু জায়গা আটকে রেখে দেওয়ায় লাভ কী? শুনে নিলয় হাসছে, কতটুকু জায়গা আটকে রাখে ওইটুকু প্যাকেট? যা হোক, রাখে তো, ক্ষুব্ধ রিনি যুক্তি সাজাতে থাকে। খুব রাখে। এরপর অবহলায় পড়ে থাকা জিনিসটা ইঁদুরে টানবে। ইঁদুরে টেনে কালো গুঁড়ো ঘরে ছড়িয়ে নোংরা করে দেবে, তা কি ঠিক হবে? মাথার সাদা চুলের পরিবর্তে এই কালো রং জামাকাপড়ে লেগে যাবে। সবুজের কাচা স্কুল ইউনিফর্ম নোংরা করে দেবে এই 'কৃষ্ণ-জাদু'। নিলয়ের শার্টে লেগে যাবে, রিনি বুঝিয়ে বলতে থাকে। নিলয় অবাক হয়ে শোনে, এক প্যাকেট হেয়ার-ডাই-এর এত ক্ষমতা? রিনি এমনভাবে বলছে যেন মাথার সাদা চুল না পেয়ে ওই কৃষ্ণ-জাদু তার জাদুতে সব জিনিস কালো করে দেবে ক্রুদ্ধ হয়ে। এ কেমন কথা?

রিনির গলা ফুলছে রাগে। নিলয়কে এতদিন মেনে নিয়েছে। এখন আর মানবেই না। পথেঘাটে নিলয়ের বয়সি লোকজন কী ফিটফাট, যেন সব আঠাশ, তিরিশ। অথচ নিলয়কে, দ্যাখো, যেন পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে, রিটায়ার করছে করছে এমন ভাব। সব ওই সাদা চুলের জন্য। রিনির বকম বকম শুনতে শুনতে নিলয় বলে, চা দেবে?

পারব না, আমার কথা তুমি না শুনলে, আমিও শুনব না তোমার কথা, আর এটা ফেলেই দেব, বারণ করব এবার সবজেকে, কে আনতে বলেছিল ওকে এসব?

ফ্রি-গিফট দিলে ও কী করবে? নিলয় তার ছেলের পক্ষে কথা বলে।

নেবে না, ফ্রি গিফট আরেকজনকে গিফট করে দেবে।

তা কেন, পয়সার জিনিস তো, বলে নিলয় অবাক হয়ে গেল। নিজের কথায় নিজেই আটকে যাচ্ছে সে। রিনি যে কথার জাল ফেলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো লক্ষণই তার ভিতরে নেই। সত্যিই তো, ফ্রি-গিফট বলে কি দাম নেই যে রিনি ফেলে দেবে? আলাদা করে কিনতে হলে টাকা দিয়ে কিনতে হত না? অবশেষে হার মেনেছে নিলয়। মনে মনে

যুক্তি সাজিয়েছে তার এসব গোঁ-এর কোনও মানে নেই। এখন আর বাবা-কাকাদের যুগ নেই যে চল্লিশ পার হলেই ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে যেতে হবে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। এখন মানুষের গড় আয়ু কত বেড়ে গেছে। এখন ভায়াগ্রা-যুগ। ভায়াগ্রা এসে গেলে যে কী হবে? কুড়ি বাইশের যৌবন আবার ফিরে পেয়ে যাবে পঞ্চাশের মানুষ। তাহলে নিলয় এই সামান্য কৃষ্ণ-জাদুতে আপত্তি করছে কেন? তার অফিসের চন্দ্রিমা পাল, চল্লিশেই ছিল মাথা সাদা। চুল কালো করে ফেলে কি সুন্দরীই না হয়ে গেছেন মহিলা। নিলয় তাঁকে তাকিয়ে দেখে। তার অফিসের অজয় কুণ্ডুর চুল তো তার চেয়েও সাদা ছিল, এখন অজয় রীতিমত রূপবান যুবক, আটচল্লিশ বছর বয়সেই চব্বিশের এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে। কী চমৎকার আছে লোকটা। বিশ শতক পার হয়ে একুশ শতকে পা দিচ্ছে পৃথিবী, সে যেন একশো বছর আগের জগতে বাস করছে। চুলে ডাই করলে কী হবে? কিছুই না, শুধু রিনি খুশি হবে, আর সবুজও হয়তো। সবজে তার বাবাকেও সবজে করে ফেলতে চায়। নিলয় হাসছে সবুজের ভালো মুখখানা মনে করে। এখন পৃথিবীময় সবুজের আন্দোলন। গ্রিন মুভমেন্ট। মানুষ অনেক বছর পর্যন্ত সবুজ থাকতে চাইছে, তারসঙ্গে পা মেলাবে না নিলয়? মনে আছে নিলয়ের বাবার বন্ধু সুপ্রকাশবাবুর কথা। লোকটা মাথার চুল কালো করত, এ নিয়ে কী হাসাহাসি! এখন কি সেই সময় আছে?

নিলয় বলল, আচ্ছা হবে।

হবে সত্যিই? রিনি আচমকা চুমুই খেয়ে ফেলল তার বুড়ো বরকে। কতকাল বাদে এই চুম্বন! কী যে হয়েছে রিনির! ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার পর সংকোচে সংকোচে গুটিয়ে গেছে। সেই রিনিই কিনা হেয়ার-ডাই দিয়ে নিলয়ের চুল কালো করে দিতে লাগল। এতকাল বাদে চুম্বন করল অজান্তে। আচমকা যেন আবেগে উতলা হলো প্রথম বয়সের মতো।

অনেকদিন বাদে স্বামী স্ত্রী কাছাকাছি হল যেন। এখন তো শরীর তেমন সাড়া দেয় না। কেন দেয় না কে জানে? জীবনে বৈচিত্র যেন নেইই আর। জীবনের সব বিস্ময় কি ফুরিয়ে গেল? নিলয় ক্রমশ যুবক হয়ে উঠতে লাগল। রিনির উচ্ছ্বাস বাড়তে লাগল। রিনি যে যুবক নিলয়কে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সতের বছর আগে, সেই যুবককে ফিরে পেতে পেতে বিস্ময়ে রাঙা হয়ে যেতে লাগল।

রিনি হাসতে হাসতে ছেলেকে ডাকল। সে দরজা ঠেলে ঢোকা মাত্র, ওরে সবজে দ্যাখ তোর বাবাকে, ভাগ্যিস এনেছিলি তুই।

সবুজ খুব খুশি। ফ্রি-গিফট খুঁজে খুঁজে মাকে চমকে দেওয়ার যে অভ্যাসে সে জড়িয়ে গেছে, তা যে এমনভাবে কাজে লেগে যাবে, তা যে মাকে এমন উচ্ছ্বসিত করবে ভাবতেও পারেনি। ফাউ জিনিস কোনও কাজে লাগে না তাইই তো জানত সে। তার অভিজ্ঞতা তেমনই। চামচ, কাচের গ্লাস কত পেয়েছে আচার, হরলিক্স, ঘি কিনে; সে সব তো পড়েই আছে। সাবানগুঁড়োর সঙ্গে একবার ছোটো একটা বালতি। ওটা কোনো কাজেই লাগে না প্রায়। কদিন বাদেই ওটা যে ফ্রি-গিফটে এসেছিল তাও ভুলে গেল সবাই। বালতি, চামচ, কাচের গ্লাস এ বাড়িতে এমন উচ্ছ্বাস তো আনেনি। আর পাঁচটা জিনিসের মতই পড়ে আছে। সবুজের বুক ফুলে গেল। বাবাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। পাকাচুল মাথায় আধবুড়ো বাবা গেল কোথায়? এখন যেন বাবা হয়ে গেছে নিলয় আঙ্কেল। বাবা নীল, সে সবুজ। নীল, সবুজ—নীল, সবুজ।

রিনি পারল শেষ পর্যন্ত। অনেকদিন ধরে সুযোগে ছিল। তার আবার যুবক নিলয়কে চাই। মাথাসাদা মানুষের সঙ্গে সংসার করার বয়স হয়েছে কি তার? ঘরবাড়ি বদলে গেল। জাদু কৃষ্ণবর্ণ—জাদুবর্ণ সব যেন রঙিন করে দিল। এল বসন্ত। জাদুবর্ণ আকাশে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শীতটা আচমকাই চলে গেল যেন। রিনির মনে হতে লাগল শীতের যাওয়া দ্রুততম করে তুলল তারা দুজন। তারা স্বামী স্ত্রী, আর পেছনে দাঁড়িয়ে জাদুকর ওই সবুজ, সবজে। ওর নাকের নীচে আবছা কালো গোঁফের রেখা, বুক চওড়া, মাথায় পাঁচ ফুট চার, ক্রমশ বেড়ে উঠছে ছেলে। নিলয় কি কম লম্বা? পাঁচ ফুট সাড়ে ছয়। নিলয় বলে সবজে তাকেও ছড়িয়ে যাবে। রিনির মনে হয় শুধু নিলয় কেন, সবজে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। সবুজের মাথা ঠেকে যাবে আকাশের নরম মেঘে। নিলয়ের বুকে পিষে যেতে যেতে রিনির দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। একটু ছাড় পেয়ে সে নিলয়ের কপালে চুম্বন করতে করতে বলে, কী বুদ্ধি সবজেটার, সবজেই পারল, নাহলে আমার কপালে বুড়ো বর।

কদিন আগে গেছে দোলপূর্ণিমা। আজ বোধহয় কৃষ্ণা চতুর্থীর রাত। শীতটা এই শহর থেকে আচমকা উধাও হয়ে গেছে। গতকালও তারা জানালা খুলে শুতে পারেনি। সন্ধে রাত থেকে হিম ঢুকছিল ঘরের ভেতরে। আজ দোতলার জানালা হাট করে খুলে পর্দা তুলে দিয়েছে রিনি। বিছানায় শুয়ে এ ঘর থেকে আকাশ দেখা যায়। আজ দেখা যাচ্ছে বড়সড় চাঁদ। গলিত রুপোর মতো চাঁদের আলো এসে মশারির চাঁদোয়ার উপর শুয়ে আলিস্যি ভাঙছে। চুঁয়ে চুঁয়ে চাঁদের আলো পড়ছে বিছানার উপর।

রিনি জিজ্ঞেস করে, কী এনেছ?

নিলয় বিছানায় যেন ভাসছে, আলতো করে উঠে বসে বলল, আমিও ফ্রি-গিফট পেতে পারি।

তুমি আবার কী পেলে ফাউ?

তিন

ফাউ এনেছে নিলয়। কিন্তু আসলটা কী? কীসে কী ফাউ পেয়েছে সে?

নিলয় বলল তোমার জন্য সারপ্রাইজ।

কী, কী এনেছ?

নিলয় বিছানার প্রান্তে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা টেনে নিল, তোমার জন্য সবচেয়ে সুন্দর নাইটিটা এনেছি।

কী এনেছ? রিনির যুগল ভুরু কুঁচকে গেল। সে হাত বাড়িতে বেড্ স্যুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। চমৎকার প্যাকেটটা। লুকিয়ে রেখেছিল নিলয় সন্ধে থেকে। কেন বার করেনি? বিছানায় সারপ্রাইজ দেবে বলে, আর সবজে যদি দেখে ফেলে? এসব তাদের দুজনের জিনিস। সবজের ভয়েই না ব্যাগ থেকে বার করেনি নিলয়।

প্যাকেট খুব সাবধানে খুলে নিলয় দু হাতে মেলে ধরল রিনির রাত্রিবাস। রিনি অবাক হয়ে দেখল, গোলাপি রং যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বচ্ছ পোশাকটি থেকে। এ কী পোষাক! না, নগ্নতাকে আরো নগ্ন করে তোলার এক আশ্চর্য আয়োজন। রিনির বিস্ময় আর যায় না। যেভাবে দুহাত সামান্য তুলে, মশারির চাঁদোয়া পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে কনুই থেকে তা ভেঙে রাত্রিবাস মেলে ধরেছে নিলয়, তাও যেন এক বিজ্ঞাপনের ছবি। নিলয় সুপুরুষ। নিলয়ের মাথার প্রতিটি

চুল ঘনকালো। নিলয় এখন নগ্নগাত্র, শুধু একটা বারমুডা পরিহিত নিলয় যেন বিজ্ঞাপনের দুর্বিনীত যৌবন, যার কাছে দলিত, মথিত এমন কী ধর্ষিতও হতে চায় বিজ্ঞাপনের নারী, যে নারী এক অলৌকিক পৃথিবীর যেন বা। যার লজ্জাহীন রূপটি হল বিজ্ঞাপনের আসল উপাদান। বিজ্ঞাপনের মেয়েদের তেমনই মনে হয় রিনির, না হলে কোনও নারী স্যানিটারি ন্যাপকিনের গুণাগুণ বর্ণনা করে আনন্দ পায়, লজ্জাহীন আনন্দ।

রিরনি জিজ্ঞেস করে, এ কার?

কেন তোমার?

আনলে কেন হঠাৎ?

হাসল নিলয়, বলল না কিছুই। বলল না কেন এনেছে, না রিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে যৌবন, সেই কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু তাও তো আসল কথা নয়। এই রাত্রিবাসের প্রতি তার কৌতূহল ছিলই। ধর্মতলার যে দোকানে এটি পাওয়া যায় তার পাশ দিয়ে আসতে আসতে কতদিন শো কেসে নগ্ন নারীমূর্তির শরীর ঢাকা এই রাত্রিবাস দেখে থেমেছে সে। থেমেছে, দেখেছে, কিন্তু দোকানটিতে ঢুকতে পারেনি কোনওদিন। সংকোচ ছিল। লজ্জা ছিল। এই রাত্রিবাস যারা পরে তারা অনেক যুবতি, যারা উপহার দেয় তারা অনেক যুবক। মোটর সাইকেল—জিনস—গেঞ্জি, সানগ্লাস, তার পিঠে, মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে যেন নবীন যুবতি। সেই বয়স পার হয়ে এসেছিল নিলয় অনেকদিন। এখন এই বয়সের ভার নিয়েসে দাঁড়াতে পারেনি নীল জিনস, নীল-গেঞ্জি আর সানগ্লাসের পাশে। মাথাভর্তি ছিল সাদা চুল। সেই চুল ঘনকৃষ্ণ হয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে নিলয়কে তার অধিকার। সাহস পেয়ে আজ সে ঢুকে পড়েছিল দোকানটিতে। রিনির জন্য নিয়ে এসেছে আশ্চর্য গোলাপি এক আবরণ, অন্ধকারেও নাকি এর রং হারিয়ে যায় না। অন্ধকারেও চেনা যায় গোলাপি শরীর, গোলাপি নগ্নতা।

রিনি বলল, এ তুমি কী করে আনলে?

কেন, সুন্দর না? কত দাম জানো?

দাম শুনে রিনি বলল, শুধু শুধু আনলে, এ কি পরার মতো, আমার উপযুক্ত?

নিলয় এবার রিনিকে ফিরিয়ে দিল তার কথা, বুড়ির মতো কথা বলছ যে।

বুড়িই তো।

ইস। বললেই হল, বুড়ি বউয়ের পাশে আমি ঘুমোব কী করে?

রিনি বলল, আমি জামাকাপড়ের ওপর পরব।

হাসল নিলয় মুখে হাত চাপা দিয়ে। রিনির কোলে এখন রাত্রিবাসটি দলা পাকানো। নিলয় আচমকা আলো নিভিয়ে দিয়ে বলল, এর নাম হনিমুন নাইটি, সঙ্গে ফ্রি বডি-অয়েল।

তার মানে? অন্ধকারে বসে জিজ্ঞেস করল রিনি।

ফ্রি-গিফট, আমিও পেলাম, শুধু তোমার ছেলে পাবে?

কী পেয়েছে?

বলছি তো বডি-অয়েল।

সে কী?

গায়ে মাখতে হয়, স্কিন ভাল থাকে।

তুমিই মেখ, আমার ওসব লাগবে না।

আবার হাসল নিলয় খুব চাপা গলায়, ও তো তোমাদের জন্য, মেয়েদের।

কই দেখি? রিনি বেড স্যুই টিপে আবার জ্বালিয়ে দিল আলো।

সাড়ে আটশো টাকার রাত্রিবাসের সঙ্গে ছাপ্পান্ন টাকার বডি অয়েল ফ্রি। বডি অয়েল কোথায়, এ তো ক্রিম। বুকের ক্রিম। প্যাকের উপর কোনার্কের নারীর অলঙ্কৃত স্তনযুগল। স্ফীত বুকের দিকে তাকিয়ে রিনি বলল, আমার জন্য?

হ্যাঁ তোমার।

এ আমার চাই না।

তাহলে ফেলে দাও, পয়সার জিনিস।

রিনি আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে টের পেল রিনি চাঁদের আলোর যে স্তবকটি বিছানার প্রান্তে শুয়েছিল একা একা, তা সরে গেছে তাদের অজান্তে। জানালা দিয়ে চাঁদটা আর দেখা যাচ্ছে না। মশারির চাঁদোয়ার উপরও নেই সেই জ্যোৎস্নার বিভা, ফেলে যাওয়া কোনও আলোর চূর্ণ, চূর্ণিত আলো। শুতে শুতে রিনি বলল, এমন পাগল তুমি, এ জিনিস পরা যাবে?

কেন?

পরে কি ঘর থেকে বেরোতে পারব?

আহা, এ তো রাতের জন্য।

রিনি বলল, ও ঘরে যদি সবজেটা ভয় পায়, তখন কি আমি এই নাইটি পরে চলে যাব, তুমি যেমন?

নিলয় বলল, তা কেন, এ তো তোমার আমার।

তোমার আমার মাঝখানে যে সবজে বসে আছে গো।

নিলয় দুহাত বাড়িয়ে রিনিকে টানে নিজের বুকে। চুম্বন করতে করতে বলে, আমাকে বুড়ো বলতে—তুমি যে সবচেয়ে বুড়ি।

বেশ, তাই থাকি।

বললে হল, নিলয় হাত রাখে রিনির বুকে, কী সুন্দর নাইটিটা, পরে শুলে, তারপর না হয় খুলেই রাখলে, আবার সবদিন তো পরার দরকারও নেই, এ হল ভায়াগ্রার মতো! রিনির কানে কুহু দেয় নিলয়, ভায়াগ্রার কথা শুনেছ তো, এই নাইটির নামও ভায়াগ্র, এখনই তো এসব লাগে।

রিনি চুপ করে থাকে। তার কানে কানে নিলয় বলে যাচ্ছে প্রথম বয়সের কথা। এসব কথা এখন আর শোনা হয় না, বলা হয় না, শুনতেও তেমন ইচ্ছে হয় না, বলতেও না। জীবনের ওই কৌতূহল, ওই বিস্ময় কবে কেটে গেছে। এখন চুলে জাদুবর্ণের ছোঁয়া নিয়ে, আবার স্বচ্ছ রাত্রিবাস, সুগন্ধী ক্রিম দিয়ে হারিয়ে যাওয়া উত্তাপ ফিরে পেতে চাইছে নিলয়, আর রিনিও বোধহয়।

রিনি তবুও বলল, ক্রিমটা না আনলে হত না।

তাহলে নাইটিটা পছন্দ?

কোনওটাই না, এত বয়স হল এখন আমি ওই ক্রিম মেখে সুন্দরী হব?

নিলয় বলল, তা কেন, ফ্রি-গিফট পেয়ে গেছি যখন....।

রিনি বিড়বিড় করে, কম বয়সে ওসব হয়, একবার সেই অনেকদিন আগে আনবে বলেছিলে না?

আনা হয়নি?

না, দরকার ছিল না, ইস আমার কেমন লাগছে, বুকে ওই ক্রিম মাখতে হবে, কেন গো কেন?

নিলয় জবাব দিল না। রিনি বাইরের অন্ধকারে চেয়ে থাকল। ওই যে বডি অয়েল, ও তো এই বয়েসেরই জন্যে। তেমন বিজ্ঞাপন একদিন দেখেছিল না সে? মেয়েদের ম্যাগাজিন, যেটি পুরুষেরই হাতে ঘোরে সবসময়, তাতে উন্মুক্ত স্তনের ছবি দিয়েছিল বিজ্ঞাপনটিতে। কী লজ্জাহীন সেই যুবতী মডেল—কী লেখা ছিল? শরীর মানেই তো বুক, স্তনযুগল, তা সুন্দর হলে শরীরও সুন্দর। ইস! রিনি চোখ বোজে। এই বুকের দুধ কতদিন খেয়েছে সবজে। সাড়ে চার বছর পর্যন্ত। ছাড়ানোই যেত না। কী সুন্দর ছিল ওই সবুজ। তার বুকে দুধও হয়েছিল খুব। দুধ যেন ফুরোত না। সেই দুধের লোভেই দুরন্ত ছেলে শান্ত। বুকের দুধ খেতে খেতে ঘুমোত সবজে। আর রিনিও পারত বটে ছেলে হওয়ার পর, ছেলেকে বুকের দুধ দেওয়া যে তার নেশা হয়ে গিয়েছিল। দুষ্টু সবুজ বাইরে গিয়ে দুধের জন্য ক্ষেপে গেলে তখন হত বিপদ! আহা কী দিন গেছে! তখন তো তার তেইশ। তেইশটা তো কম বয়সই বটে। তেইশে তো কত সংকোচই না থাকে। বিয়ে হয়েও যায় না। শরীর তখনো থাকে লুকোনো। নিলয়ের সামনে জামাকাপড় বদলানোও যেত না। কিন্তু যখন বুকে দুধ এল তখন তার সব গেল। ঘুমের ঘোরেও সবজে হাতড়াত তার মায়ের বুক। রিনি ঘুমিয়ে পড়তে থাকে।

নিলয় ডাকল, নাইটিটা পরবে না?

আজ থাক।

উঁহু। নিলয় তাকে টানল বেড় দিয়ে দিয়ে, চমৎকার হবে পরে দ্যাখোনা।

রিনি মাথা ঝাঁকায়, অন্যদিন হবে।

নিলয় তবু ডাকে, সাড়ে আটশো টাকার পোশাক, দেখবে না তা কেমন? টাকার তো দাম আছে। টাকাটা তো ফেলে দেওয়ার নয়। অবহেলার নয়। টাকার বিনিময়ে সে প্রায় ফুরিয়ে আসা বিস্ময়ের কলস আবার পূর্ণ করে দিতে চাইছে। অনেকদিন বিষণ্ণ হয়ে ছিল নিলয়। যে বয়সে পৌঁছেছে সেই বয়স বিষাদের। সেই বিষাদকে হারিয়ে ফেলার ক্ষমতাও ছিল না যেন তার। সেই ক্ষমতা এনে দিয়েছে সবুজ আর রিনি। ব্ল্যাকম্যাজিক। সেই ম্যাজিকে সব সংকোচ ভেঙে গিয়ে জেগে উঠেছে অদ্ভুত এক উল্লাস। রিনির মনে হচ্ছে নিলয় যেন শোধ নিচ্ছে। নাকি নিলয় এই ভাবেই বদলে গেছে কালো জাদুতে? তাদের দাম্পত্যে শরীরের বিস্ময়, শরীর ঘিরে বৈচিত্র ফুরিয়ে যাচ্ছিল সত্য। চেনা শরীর, চেনা মানুষ আর কতদিন বিস্ময় ধরে রাখতে পারে? কিন্তু তা ফুরোলেও অন্য এক বিস্ময় যেন জন্ম নিয়েছিল সবুজকে ঘিরে। সবুজ বড় হচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে, পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে যাচ্ছে সবুজ, সাইকেল নিয়ে বনবন করে ঘুরছে, মা মা করে ডেকে বাড়ি মাথায় তুলছে—এও কি কম? প্রায় বৈচিত্রহীন প্রায় বিস্ময়হারা তাদের দাম্পত্যে এই নবীন বিস্ময় তো অফুরান। এই বিস্ময়ে সরলতা ছিল, ঘুম ছিল জাগরণও উদ্‌বেগ ছিল, উল্লাসও। আলস্য ছিল, আলস্য ভাঙাও। সব বিস্ময় ঢেকে দিতে চাইছে নিলয়। জন্ম নিচ্ছে অন্য কৌতূহল। কৌতূহল নয়, চেনা মানুষকে অচেনা করে দেখে নেওয়ার বিস্ময় ঢেকে দিচ্ছে জীবনযাপনের সরলতা। নিলয় করছে? না, জাদুবর্ণ। জাদুকৃষ্ণবর্ণ। এই যে নিলয় বলছে ক্রিমটি প্রতিদিন ব্যবহার করতে, ক্রিমটিতে অদ্ভুত গন্ধ আছে তা কি জানে রিনি? ওই ওই গন্ধ উত্তেজিত করে তোলে নারী-পুরুষকে, সঙ্গের লিটারেচারটা কি পড়েছে রিনি?

রিনি চুপচাপ। সে যেন কিছুই শোনে না, কিছুই বোঝে না। রিনি যেন কবে দেখেছিল একটি ছবির বই, যাতে ছিল বিপুল বক্ষের ভারে নত যুবতির শরীর। সিলিকন বক্ষ ছিল তা। নগ্ন যুবতির বিপুল স্তনভার দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিল রিনি। নিলয় কি তাকে সেই সিলিকন বক্ষের নারী করে তুলতে চাইছে? এরপর হয়তো এনে দেবে সেই ইনজেকশান—বুকের সমস্ত গ্রন্থি স্ফীত হয়ে উঠবে। নিলয়ও হয়ে উঠবে সেই দানব সদৃশ, যে দলিত করেছিল সিলিকন-বক্ষের নারীকে। নিলয় কি তাই চায়? নিলয় নয়, কৃষ্ণবর্ণের জাদু। নাই চাইতেই যে ঘরে এসে পৌঁছেছে কোনও বিনিময় ছাড়াই।

চার

রাত্রিবাস আলমারির গভীরে, অন্ধকারে ঢুকে গেছে। বিকেলে স্নানের আগে রিনি ক্রিমটি আবার দেখল। প্রসাধনী তো। স্বাভাবিক কৌতূহলেই সিল ভাঙল। সিল ভেঙে ওটি হাতে নিয়ে তোয়ালে সাবান সমেত চলল স্নান ঘরে। এখন বাড়িতে কেউ নেই।

স্নান সেরে ক্রিমটি আঙুলের ডগায় নিয়ে একটু একটু করে রিনি তার বুকে লেপে দিতে লাগল। গোলাপি রঙের ক্রিম। বুকের রঙ আবছা বদলে যেতে লাগল। বুকের উপর ফুটে থাকা নীল শিরারেখা টানটান হয়ে যেতে লাগল বোধহয়। রোঁয়া কাটল দৃঢ় হয়ে ওঠা বুকে। রিনি আবেশে চোখ বুজল। কী সুন্দর গন্ধ! যেন কাঁঠালিচাঁপার সুবাস। গন্ধটা নিতে নিতে চোখ বন্ধ করল রিনি। ঘুমিয়েই পড়বে যেন স্নানঘরে। গন্ধটা যেন শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের ভিতরে।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। রিনির ঘোর ভাঙল সেই শব্দে। একসঙ্গে ডোর বেল এবং দরজায় ধাক্কা—সবুজ ছাড়া আর কে? ওই যে সবুজ ডাকছে, মা, মা, ও মা?

রিনি বেরিয়ে এল 'যাচ্ছি যাই' করতে করতে। দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সবুজ। ঘেমে নেয়ে এসেছে প্রায়। সাইকেল ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, মা, একটা চিরুনির সঙ্গে পাঁচটা ফ্রি, সঙ্গে একপাতা সেপফটিপিন—ওই দ্যাখো।

রিনি হাসতে লাগল, তুই কী রে?

বা, সব মিলিয়ে দাম পাঁচ টাকা, সব ফ্রি, বড়টা বাদ দিয়ে। বলতে বলতে নানা রঙের নানা খাপের ছোটো মাঝারি বড় চিরুনিগুলো পকেট থেকে বের করতে লাগল সবুজ প্রায় জাদুকরের মতো একটি একটি করে।

রিনি বলল, কী হবে?

থাকবে, চুল আঁচড়াবে তুমি মা। বলতে বলতে সবুজ মাকে জড়িয়ে ধরল। যেহেতু মা স্নান করে এসেছে, যেহেতু সে ঘেমে এসেছে সাইকেল চালিয়ে, সেইজন্য ঘামের শরীর নিয়ে মাকে বিব্রত করে তোলা।

মা, মা, তোমার চুল তুমি আঁচড়ে নেবে পাঁচ রকম চিরুনিতে পাঁচবার, কত চুল তোমার মা—মা কী মেখছো, কী গন্ধ এ কী! ওই সাবানে তো এমন গন্ধ না মা, তোমার চুলে কি ওই গন্ধ? ও মা তাই তো, চুলে নতুন তেলে কি এমন গন্ধ? কই আমি তো মেখেছি সকালে পাইনি তো।

রিনি সরে যেতে চায়, পারে না। সবুজ তাকে ঘিরে রেখেছে যেন। একটা সবুজ, দশটা

সবুজ হয়ে ঘিরে ধরেছে মাকে। মা আমি তোমার চুল আঁচড়ে দিই। প্রথমে বড় চিরুনির মোটা দাঁতে তারপর সরু দাঁতে, তারপর মেজো চিরুনির মাঝারি দাঁতে, তারপর সেজ চিরুনি দিয়ে, তারপর ওই কালো রঙের কাঁকই দিয়ে, তারপর....মা আমার কেশবতী।

রিনি প্রায় কেঁদে ফেলল, কী করিস সবজে সরে যা।

না, মা, কী সুন্দর গন্ধ, কত চেনা গন্ধ এটা।

সবুজ হা হা করে হাসছে, কী সুন্দর গন্ধ মা তোমার গায়ে, আমার যে কেন এত চেনা লাগে মা, চুলে কেন তোমার গা ময় গন্ধটা ভেসে আছে যেন মা, এ যেন ভগবানের আলো, ছবিতে যেমন থাকে তেমনই, গন্ধটা তেমনি আলোর মতোই।

রিনি এবার কেঁদেই ফেলল। ছেলে কি সত্যি বলছে? নাকি বানিয়ে? ছেলে কি জেনে ফেলেছে সব? রিনির ভয় করতে লাগল। সবুজ তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। দরজা বন্ধ করে চিৎকার করছে, মা এখানেও সেই গন্ধ, মা আলোটা গোলাপি গোলাপি।

ওরে সবুজ থাম। রিনি আর্তনাদ করে ওঠে। সে আর পারছিল না। এতক্ষণে টের পাচ্ছে এ কাঁঠালিচাঁপার সুবাস নয়, এ যেন সাপিনীর গায়ের গন্ধ। মিলন পিয়াসী সাপিনীর শরীর থেকে যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সেই গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর। সবুজ চেনে না। চেনে না সবজে, চেনে না বলেই উল্লাসে মেতে উঠেছে। নাকি চেনে, কিন্তু জানে না এ কীসের গন্ধ! হায় রে সবুজ! রিনি ফুল দমে মাথার উপরে পাখা ঘুরিয়ে দেয়। রিনি টেবিল ফ্যানটিও চালিয়ে দেয় সঙ্গে। রিনি জানালা দরজা খুলে দেয়। পর্দা তুলে দেয়। বাইরের অন্ধকারে চলে যায় গন্ধটা। ভুলে যাক সবুজ! সবুজ ডাকছে আবার। পাগল ছেলে বলছে, ও মা, মা এই যে গন্ধটা, তোমার গায়ের গন্ধটা আমার গায়ে মেখে গেছে মা, এ কেমন গন্ধ মা?

ওরে সবুজ থাম। কেঁদে উঠল রিনি।

স্নানঘর থেকে পাজামা সার্ট পরে বেরোল সবুজ। কী হল মা, ও মা কাঁদছ কেন, ও মা তোমার কী হল?

কিছু না।

সবুজ বলল, মোটা চিরুনি, সরু চিরুনি, কাঁকই দিয়ে আমার চুলটা আঁচড়ে দাও মামনি, কতদিন তুমি চুল আঁচড়ে দাওনা, তুমি চুল আঁচড়াবে, আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

ছেলের চুল আঁচড়ানোর আগে মাথার জল মুছিয়ে দিতে হয় যে। জল পড়ছে টপ টপ। মাথার উপরে বনবনে পাখা, গায়ের উপরে টেবিল পাখার হাওয়া, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। রিনি পটাপট সব বন্ধ করে ফেলল।

বাতাস থামল। গন্ধটি গেল? নাকি আরও বেড়ে গেল? রিনি সবুজের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকল। সবুজও চুপচাপ। সবুজ কি চেনা গন্ধটাকে জানার চেষ্টা করছে মনে মনে? রিনি ডাকল, আয় আঁচড়ে দিই চুল।

সবুজ উঠে গেল। কথা বলল না। তার নিজের ঘরে চলে গেল। রিনি ডাকতে পারল না। গন্ধটা আবার ঘন হচ্ছে। জাদুবর্ণের গন্ধ। জাদুকৃষ্ণ-জাদুগোলাপি দুই বর্ণ তার ঘন আমিষ গন্ধ নিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই ফ্ল্যাটে, ফ্ল্যাট থেকে এই শহরে। রিনি সেই গন্ধ নিয়ে শোকে আকুল হল।

(দিশা সহিত্য—১৯৯৯)

কেরানির সমস্ত জীবন

প্রথম গল্পটি ছিল কি বিখ্যাত সেই কেরানির মৃত্যু? নাকি লেডি উইথ দ্য ডগ কুকুর সঙ্গী মহিলা? আশিস যখন আঠের উনিশ তখন কলকাতার পথে পথে মস্কো প্রগতি প্রকাশনের বই। বাংলায় চেখব, পুশকিন, তলস্তয়, গোর্কি, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ। বাংলায় পড়া মানে বাংলাই পড়ছে। সমর সেন, ননী ভৌমিক অনুবাদ করছেন মস্কোয় বসে। এখন এই পঞ্চান্নয় সব ভুলে যাচ্ছে আশিস চন্দ। কোন বই কবে এসেছিল কলকাতা শহরে, কলেজ স্ট্রিটের মনীষা গ্রন্থালয় থেকে কেনা, নাকি ফুটপাথের দোকানে? কলেজ স্ট্রিটে যেত কোথায়, তখন কি তেমন চিনেছে কলকাতা? এই কলকাতা আর সেই কলকাতা আলাদা। তার আঠের উনিশের পৃথিবী আর তার চুয়ান্ন পঞ্চান্নর পৃথিবীতে বদল হয়ে গেছে অনেক। সেই যে রুশ দেশের কমরেড লেনিন, তাঁর নামে তো গান বাঁধে না আশিস চন্দর পুত্র। তার হাতে হাওয়াইয়ান গিটার, এই সতেরই আগস্ট সে পা দেবে আঠেরয়। ইন্টারনেট থেকে গান ডাউন লোড করছে, আর শুনছে। সে কোনো ব্যাপারে মন স্থির করে থাকতে পারে না। এক সময়, আরো চার বছর আগে, সে যখন চোদ্দো, খুব মেতেছিল ফুটবল নিয়ে। সেই নেশাটা কমেছে, কিন্তু নেই একেবারে তা নয়। কোটি পতি ক্রিকেটাররা তাকে আকর্ষণ করে না। এখন শুধু গান আর গান নিয়ে আছে তারা নাকি কয়েক বন্ধু মিলে গানের দলও করেছে একটা ইস্কুলের ফ্রেশার্স ওয়েলকাম অনুষ্ঠানে তাদের 'মৌন মুখর' গানের দল গান গেয়েছিল। ইস্কুলের জন্মদিনেও তারা ছিল সবার আগে। কিন্তু ক্লাস টুয়েলফ, সাবধান অগ্নিভ, সাবধান। রেজাল্ট ভাল না হলে জীবন বড় কঠিন হয়ে যাবে।

খুব যত্ন করে রেখেছিল আশিস সেই সব বইকে। এই তো বছরখানেক আগেও এক ছুটির দিনে ইভান ইলিচের মৃত্যু আবার পড়তে আরম্ভ করল। পড়তে পড়তে বেলা গেল, সন্ধে হয়ে এল। ইভান ইলিচ তাকে ঘিরে থাকল সমস্ত সন্ধে, মনে পড়ে গেল বিহানের কথা। বিহান নামটা কী করে এত বছর বাদে ঘুরে এল তার কাছে? বিহান কি তাকে দিয়েছিল এই বই? বিহানের হাতের চিহ্ন রয়েছে এই বই-এ। ইভান ইলিচের মৃত্যুর সঙ্গে ক্রয়টজার সোনাটা। কী অসম্ভব সেই কাহিনি গো আশিস? পড়ো পড়ো পড়ো, রুশ দেশই শ্রেষ্ঠ দেশ, তোমার এত চিন চিন করো কেন, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, কী করে হয়?

আমি কি বলেছি, ওসব আমার কথা নাকি?

তোমার কথা হবে কেন, কিন্তু কাদের না কারোর কথা তো?

তার দায় আমার হবে কেন?

কিন্তু যে দেশে তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, চেখব জন্মান সে দেশের তুল্য দেশ হয়?

হেসে ফেলেছিল আশিস, কী বলছ তুমি, রুশ সাহিত্যের কথা কে অস্বীকার করে?

সংশোধনবাদী, পচে গলে গেছে, সেদিন যখন বলল তোমার বন্ধু তুমি কিছু বললে না তো?

তার সঙ্গে রুশ সাহিত্যের কথা আসছে কী করে?

যে দেশে অমন সব লেখক জন্মান, সে দেশ কী করে গলে পচে যায়?

বিহানের ছিল অদ্ভুত যুক্তি। যে দেশে ওই সব লেখক জন্মান, সেই দেশ কখনো নষ্ট হতে পারে, আরে দেশটা মানে তার জনগণ তো গলে পচে যায়নি। আশিসের বন্ধু সমরজিৎ বলেছিল তো সে দেশের পার্টির কথা। তখন এমনি কত কথা চলত। তারাশঙ্করকে কী সমালোচনা না করল একদিন সে সমরজিৎ। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়া তারাশঙ্কর হলেন সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের সমর্থক। পদাতিকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পচে গেছেন, কী করে অকাদেমি পুরস্কার নিলেন? বিহান তাকে বলেছিল, অমন মূর্খর সঙ্গে কেন বন্ধুতা, ওর সঙ্গ ছাড়ো আশিস, ও অপমান করতে ভালবাসে, ওঁদের অপমান আমার গায়ে লাগে।

তখন আমার মনে হয়েছিল বিহান শুধু শুধু গায়ে নিচ্ছে সমরজিতের কথা। এসব হলো রাজনৈতিক তত্ত্ব। আর কোনো দেশে বড় লেখক জন্মানর সঙ্গে তার শাসককুলের কী সম্পর্ক? এদেশ তো রামায়ণ, মহাভারতের, রবীন্দ্রনাথের, এদেশ কি ভাল আছে? সমরজিৎ রবি ঠাকুরকেও ছাড়ত না। বিহান বলেছিল, ও এলেই মনে হয় আমাকে অপমান করতে আসছে, আমি তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ ভালবাসি, ও এসেই ওই সব কথা তুলে ওঁদের নস্যাৎ করে দেবে।

আমি তখন বলেছিলাম, না বিহান না, তোমার উপর ওর রাগ হবে কেন, ও সাহিত্য শিল্পকলাকে এক চোখে দ্যাখে, তোমার দেখা ভিন্ন।

তোমার বন্ধুর দেখা ভুল।

ও বলে তোমার দেখা ভুল।

আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ জীবন ভাবতেও পারি না।

সেই কথা শুনে সমরজিতের কী হাসি। আরে রবীন্দ্রনাথ নয় পেটের ভাত চাই।

চাই তো, তা বলে রবীন্দ্রনাথ থাকবে না?

জমিদার কবি, কী হবে রবি ঠাকুরে, যারা রবি ঠাকুর নিয়ে আদিখ্যেতা করে তারা বিপ্লবেরই বিরোধিতা করে, জনগণের সঙ্গে এ হলো প্রতারণা, বিপ্লবের পর জনগণের সাহিত্য রচনা হবে।

বিহান কফি হাউসের টেবিলেই কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে উঠে গিয়েছিল। তখন সমরজিৎ একটু চুপসে গিয়েছিল। উঠে নিচে নেমে বাস স্টপ থেকে আবার ডেকে এনেছিল বিহানকে, স্যরি, আমি তোমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছি, আর হবে না। সমরজিৎকে আমি বলেছিলাম, অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে শেখ, আর ওসব কথা বলবি না।

সমরজিৎ মাঝে মধ্যে উধাও হয়ে যেত। তখন তারা নিশ্চিত থাকত না। বিহানই চঞ্চল হয়ে উঠল প্রায় দু'মাস সমরজিৎ উধাও হয়ে থাকার পর, কী হলো তোমার বন্ধুর?

জানি না, বোধহয় বিপ্লব করতে গেছে।

না না, ব্যাপারটা অত সহজ নয়, যে ভাবে ধরপাকড় হচ্ছে, যে ভাবে পুলিশি এনকাউন্টারে মারা যাচ্ছে, আমার ভয় করছে আশিস, ওর ভিতরে একটা তেজ আছে, পাগলামিও, ওর না ক্ষতি হয়ে যায়।

ও এলে তো কলহ হবে।

তা হোক, কিন্তু কলহ হয় বলে না এসে বিপদে পড়বে, আমি ওকে ইনসাল্টেড অ্যান্ড হিউমিলিয়েটেড পড়তে দেব, ননী ভৌমিকের অনুবাদ, তোমার চেখবটা আমাকে দেবে আশিস?

কী খুঁজছ? আশিসের আঠের বছরের ছেলে অগ্নিভ জিজ্ঞেস করল।

তলস্তয়ের দুটি বড় গল্প গেল কোথায়?

মা জানবে, বই তো মা গোছায়।

সুজাতা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে বলল, তুমিই কোথাও রেখেছ।

তুমি দ্যাখোনি।?

খেয়াল করিনি, মিস্ত্রি লাগার পর বই সব উলোটপালোট হয়ে গেছে, সারাজীবনে তো বই-ই সঞ্চয় করেছ, এখন কোন বই কোন তাকে গিয়ে ঢুকেছে কে বলবে?

অগ্নিভ বলল, তোমার জহুর আলি কোম্পানি নিয়ে যায়নি তো, তারা হয়ত পড়ছে ডেথ অফ ইভান ইলিচ, সবচেয়ে ক্ষমতাবান আর ধীন অভিজাত মানুষটা মৃত্যুর আগে তার পাপের কথা বলে যাচ্ছে, এ তো তারা শোনেনি কখনো, দ্যাখেনি কখনো, তাদের এসব জানা, কিন্তু না জানার ভান করে থাকতে হয়, বাবা ও বই আর ফেরত পাবে না, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়ছে, রাজমিস্তিরি রব্বানি, ইসমাইল, মথুর, কদিনেই জঙ্গল মহলে পৌঁছে যাবে ওই বই।

চমকে ওঠে আশিস, কেঁপেও ওঠে ভিতরে ভিতরে, কী বলছে তার ছেলে। এ কথা কার কথা? তোর? তুই জানলি কী করে? পড়েছিলি নাকি? কী মনে হয়েছিল?

অগ্নিভ গুনগুন করছে, লুকিং বিয়ন্ড দ্য এমব্যারস অফ ব্রিজেস গ্লোয়িং বিহাইন্ড আস, টু এ গ্লিমস অফ হাউ গ্রিন ইট ওয়জ অন দ্য আদার সাইড.....। কী গান শোনে আর গায় বোঝে না তারা। কার গান, দুঃখ আছে এর ভিতর, কে গেয়েছে, পিঙ্ক ফ্লয়েড, ইংলিশ ব্যান্ড, এ তোমাদের যুগেরই গান বাবা, তখনো কি জানতে, কী সবুজ ছিল সব, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছ সব, জহুর আলিরা হাসছে ইভান ইলিচকে পড়ে, এ আর এমন কি, আরো পাপ আছে।

স্তম্ভিত আশিস বই আর বই-এর দিকে তাকিয়ে থাকল। এর ভিতরে কোথায় আছে তারা?

সুজাতা জিজ্ঞেস করে, তুই কবে পড়লি ও বই?

পড়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত জবাব অগ্নিভর।

ও কথা কি তো? সুজাতা জিজ্ঞেস করে, জহুর আলিরা সত্যিই! কী সব বলিস বোঝা যায় না কিছুই, ওসব বই এখন রেয়ার হয়ে গেছে, মস্কোয় ছাপা হতো।

হেড মিস্ত্রি জহুর আলি, তার পনের জনের দল। যদু, মধু, ইসমাইল, রব্বানি, বিকাশ, মথুর, নামগুলো এখনো মনে আছে। ক'জন ছিল পাকা চোর। মায়ের আমলের পুরোন পানের বাটা, দু'জোড়া কাঁসার থালা, গেলাস, বাটি—তার ভিতরে একটা থালা বাটি গেলাসে আবার তাদের ছেলে অগ্নিভর নাম লেখা, ওর অন্নপ্রাশনে দিদিমা দাদুর দেওয়া। আরো গিয়েছিল একটা ট্রানজিস্টার, থার্মো ফ্লাস্ক। উধাও যে হয়েছে তা টের পেতেই পনের বিশদিন লেগে গেল। তখন সব কাজ শেষ করে জহুর আলি পেমেন্ট নিচ্ছে। বাড়ির জিনিশপত্র আবার স্ব স্ব স্থানে যাচ্ছে। এটা ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। জহুর আলি মাথা নামিয়ে, শেষে বলল, সঙ্গে সঙ্গে বললে ধরা যেত বাবু, এখন কি আর তারা কাছে রেখেছে।

তোমার মিস্ত্রি চোর, তুমি কি কাজ পাবে এরপর?

সবাই তো না, একজন দু'জন।

নাম বলো আমি থানায় যাব। ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেছিল আশিস।

তারা তো দেশে চলে গেছে, বিস্টি নামল, চাষ লাগল তাই।

তখন অগ্নিভ বলেছিল ছেড়ে দাও বাবা, যা গেছে গেছে, ইউজ হত না বলেই হারিয়েছে, মাসি না বললে তো ধরতেই পারতে না কী গেছে, আদৌ গেছে কি না।

ছেড়ে দেব, কাঁসার থালা বাটি গেলাস, কী ভারি ভারি সব, তোর ঠাকমার দেওয়া। সুজাত বলে উঠেছিল।

তখন অগ্নিভ আবার মাথা নাড়ে, কোনোদিন কি ব্যবহার হয়েছে, মনে তো পড়ে না।

বাড়ির সব জিনিশ কি ব্যবহার হয়রে, খুঁজে, [illegible] আমার হাতে রেখে গেলেন উনি।

আঠের বছরের ছেলে বলেছিল, থানায় গিয়ে এফ. আই. আর. [illegible] যাদের নামে করবে, তারা কি সত্যি নিয়েছে, অন্য কেউও তো নিতে পারে।

থেমে গিয়েছিল আশিস। জহুর আলি চলে যেতে অগ্নিভ বলেছিল, তোমার হেড মিস্ত্রিরিও নিতে পারে, লোকটা এক কথায় বলে দিল নিয়েছে অমুক অমুক, এতই যদি জানবে, তবে আগে সাবধান করেনি কেন?

কথায় যুক্তি ছিল। কিন্তু সুজাতার মন শান্ত হয়নি। শাশুড়ি তাকে কী বলে গিয়েছিলেন সেই কথা গুনগুন করে বলছিল। আশিস থানা পর্যন্ত যায়নি। গেলে হেড মিস্ত্রিরিকে ধরত লোকটা কাজ করেছিল ভাল। আর হেড মিস্ত্রিরি কি নিতে পারে? সব ছিল তাদের স্টোর রুমে। ছিল কি না তাই বা কে জানে। অনেক আগেই তো চলে যেতে পারে। কতদিন ওসব বের করে দেখা হয়নি। খোঁজই করা হয়নি ওসবের। অগ্নিভ বলল, বইটা হয়ত পোকায় পুরোটা খেয়ে নিয়েছে বাবা এত বছর ধরে, ওই সব রেয়ার বই খেতে সুস্বাদু, তোমার অনেক বই-এ তা হয়েছে, পোকায় ধরা বই রাখা যায় না।

আমার কলেজ লাইফের বই, টিউশনির টাকায় কেনা।

অগ্নিভ বলল, তলস্তয় কি বাজারে পাওয়া যায় না, কিনে নাও।

আহা, তুই বুঝতে পারছিস না, আমার প্রথম তলস্তয় পড়া ওই বইয়ে, তখন দাগিয়ে দাগিয়ে পড়তাম।

তাতে হয়েছে কি, জলে নষ্ট হয়ে গেলে মানিক গ্রন্থাবলী আবার কেননি তুমি?

চুপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে আশিস। ও ঠিক ধরতে পারছে না আসলে তার কী হারিয়েছে।

যে কোনো মলে চলে যাও, পেয়ে যাবে। বলে তার হাওয়াইয়ান গিটারে টুং টাং, তাকিয়ে আছে স্ট্রিঙের দিকে

তুই কিছু জানিস না, ওই সব অনুবাদ-বই-এর যুগ শেষ হয়ে গেছে, সোভিয়েত রাশিয়াই উঠে গেছে।

অগ্নিভ বলল, তোমাদের শুধু নস্টালজিয়া, পিছনে তাকিয়েই আছ বাবা, বয়সের লক্ষণ এ সব, ওই জন্যই সামনের কিছুই দেখতে পাও না, তোমাদের সব বই চুরি হয়ে যাচ্ছে, আজই কিনে আনো।

সমর সেনের অনুবাদ, প্রগতি প্রকাশনের ছাপা, ও বই কোথায় পাব, কী সুন্দর অনুবাদ ভাবতে পারবি না।

ছেলে চলে গেল। সে এখন ফাউন্টেন পেন, ডট পেন, জেল পেন ছেড়ে কম্পিউটারে লেখে। ২৫শে বৈশাখ তার ইস্কুলে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত বর্ষ উদ্‌যাপন হলো। তাকে বলা হলো সূচনার ভাষণ লিখে নিয়ে যেতে। কোন ভাষায়? ইংরিজি। কেন ইংরিজি? ছেলে বলল, ওই যে সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। ইংলিশও হবে, বাংলাও হবে, রবীন্দ্রনাথ কি শুধু বাঙালির?

হিন্দি হবে?

উর্দুও হবে বাবা। বলে ছেলে গুনগুন করতে লাগল, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে......।'

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, ওসব বই আবার ছাপতে পারে তো?

দেশটাই উঠে গেছে, প্রগতি, রাদুগা প্রকাশন উঠে গেছে, কে ছাপবে?

তোমার সেই জুয়াড়ি ও অন্যান্য গল্প কোথায়, পুশকিন বা কোথায়?

নেই! ইস কোথায় গেল সব? প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে আশিস।

অনেক বই তো ছিল, তুমি একে ওকে পড়তে দিয়ে হারিয়েছে, কিন্তু বাংলায় যদি না থাকে আমার মতো পড়ুয়া কী করে পড়বে, মনে আছে তুমিই আমাকে বলেছিলে ক্রয়টজার সোনাটা পড়তে, হারিয়ে গেল?

আশিস বলল, খুঁজে দেখ, সব বই এক সঙ্গে উধাও হতে পারে?

তাইই হয়েছে যেন, কোনো রুশ বই-ই বাড়িতে নেই।

তা হয় নাকি! বিড়বিড় করতে লাগল আশিস। দস্তয়েভস্কির জুয়াড়ি ও অন্যান্য গল্প, ফাদার সিয়েগি ও অন্যান্য গল্প, অপমানিত ও লাঞ্ছিত, তলস্তয়ের ওই বই ছাড়া আনা কারেনিনা, পুনরুত্থান, গোর্কির মাদার, চেলকাশ ও অন্যান্য গল্প, পৃথিবীর পথে, পৃথিবীর পাঠশালায়, চেখবের গল্প। বাংলায় পড়া ওয়ার্ড নম্বর সিক্স, গুজবেরি, কেরানির মৃত্যু, কুকুর-সঙ্গী মহিলা, মনে পড়ে গেল চেরি অর্চাড—মঞ্জরী আমের মঞ্জরী নাটকের কথা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মঞ্চ কাঁপিয়ে উল্লাস! বিহান বলল, আমি ওঁকে প্রণাম করব আশিস।

সমরজিৎ বলেছিল, এমন নাটক হয় না যা দেখে মানুষ বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হবে?

বিহান বলেছিল, আপনি তো দ্যাখেননি, দেখুন।

সমরজিৎ বলেছিল, কী জানি আমার সব কেমন মনে হয়, মনে হয় এসব বঞ্চিত মানুষের কী কাজে আসে, আমি ক্রাইম অ্যান্ড পানিসমেন্ট পড়তে পড়তে আর পারিনি, আমার বিপ্লবে কী কাজে লাগবে, তুমি বিপ্লবের গান পড়েছ?

মাথা নেড়েছিল বিহান, না পড়িনি।

তুমি হাউ দ্য স্টিল ওয়জ টেম্পারড, পড়েছ?

না, আমাকে তো দাওনি আশিস, তোমার কাছে আছে?

আশিস মাথা নেড়েছে। তখন সমরজিৎ বলেছে, এই সবই প্রতিবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী, আসল বইগুলো পড়বি না আশিস, ইস্পাতও অনুবাদ হয়ে এসেছে, কিনিসনি কেন?

আশিস বলেছিল, কেন হয়নিরে, আমি রাশিয়ান ক্লাসিকে মুগ্ধ।

এই জন্য তো বলি ওরা সংশোধনবাদী, ভাল মন্দ মিশিয়ে দিচ্ছে, যাতে কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য তা বুঝতে না পারা যায়, বিপ্লবী মন তা ধরতে না পারে, গুলিয়ে যায় সব।

বিহান রেগে গেছে, এ আপনি কী বলছেন, চেখব তো গুজবেরি গল্পে এইটা লিখেছিলেন, আসল রুবল আর নকল রুবল এক সঙ্গে মিশে গেছে, কী আশ্চর্য গল্প!

কী দিন গেছে সেই সব। একদিন দেরি হল আসতে, কলকাতায় সেদিন বাসে আগুন, পথ অবরোধ। বিহান আগে এসে গিয়েছিল কলেজ থেকে। সমরজিৎও। কফি হাউসে সমরজিৎ আর বিহান মুখোমুখি। বিহান তাকে দেখে বলল, এই তো বিপ্লবের গান আর লং মার্চের দিনগুলি।

পড়ো, সব কিছু পড়ে নিজে নিজে বুঝে নেওয়া যায়। আশিস বলেছে।

ওসব বই তুমি আমাকে পড়াওনি কেন আশিস? বিহান জিজ্ঞেস করে।

আশিস বলেছিল, কোনোদিন হয়ত পড়তে।

সমরজিৎ বলেছিল, তুই তো ওকে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ পড়িয়েছিস, দস্তয়েভস্কি পড়িয়েছিস, এতে কোনো বিপ্লবী মন গড়ে ওঠে না।

আশিস বলেছিল, পড়ুক ও বিপ্লবের গান।

বিপ্লবের গান, ইস্পাত পড়ে মুগ্ধ বিহান। সে আর এক মানুষ আর এক পৃথিবী। মানুষের জয়ের কথা শুধু, পরাজয় কোথাও নেই! অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে জয়। আশিস বলেছিল, চারপাশে এত পরাজিত মানুষ, তারা কি সত্য নয়, কেরানিটির কথা ভেবে দ্যাখো বিহান, ভয়েই মরে গেল সে, আমার বাবা তো এমনি, সরকারি পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আত্মগোপন করে থেকেছেন সাত দিন।

কেন, উনি কাকে ভোট দিলেন তা কে জানবে?

ওঁর মনে হয়েছে জেনে যাবে সব, সাধারণ মানুষের কোনো কিছুই গোপন থাকে না এই পৃথিবীতে।

সমরজিৎ শুনতে শুনতে বলেছিল, ওই কেরানি এখন নির্ভয়, আমাদের বাবা কাকাদের ভয়ের পৃথিবীটাকে আমরা বদলে দেব বিহান, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, নিশ্চয়......।

কী সুন্দর গান! বিহান গলা মিশিয়েছে, আশিসও।

এই গানই কেরানির পৃথিবীকে সমস্তরকম ভয় মুক্ত করবে, তোর রবীন্দ্রনাথের গান নয়, বিপ্লবে কী হবে রবি ঠাকুর?

বিহান বলেছিল, আমার মন যে আশ্রয় পায়, তুমি কি একলা বসে রবি ঠাকুরের গান শুনেছ কোনোদিন সমরজিৎ?

একলা বসব কেন আমি, আমি সকলের সঙ্গে থাকব, ঘরে থাকব না পথে থাকব।

এ তোমার রোমান্স, তুমি তো গৃহহীন নও যে পথে থাকবে।

যারা গৃহহীন তাদের সঙ্গে থাকব, কত মানুষ এই শহরের ফুটপাথে থাকে তা দ্যাখো না, ফুটপাথেই তাদের ঘর সংসার।

কত তর্ক, বাদ বিবাদ, তবু সমরজিৎ তাদের বন্ধু। একদিন হতাশ সমরজিৎ তাকে বলল, তোকে পারব না, তুই একটা জগদ্দল পাথর, কিন্তু বিহানের মন অনেক নরম, কাদামাটির মতো, তাকে আমি তৈরি করে নেব, কমিউনিস্ট ইস্তাহার পড়তে দিয়েছি ওকে, রেড বুক দেব।

তাই বিহান, আমাকে তো বলনি।

ভুলে গিয়েছিলাম আশিস, আচ্ছা চিন দেশে কি অমন হয়েছে? বিহানের মুখ চোখ ঝকঝক করছিল।

বিপ্লব তো হয়েছে, শোনা যায় সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আমাদের দেশেও যদি হয়, কেরানি বাবার ভয় চলে যায়, পৃথিবী সকল ভয় মুক্ত হয় আশিস?

চুপ করে ছিলাম আমি। ভয় কি সত্যিই যেতে পারে? আমার ভিতরেই যে কেমন এক আশঙ্কা প্রবেশ করছিল তখন। হেরে যাওয়ার ভয়। হেরো মনুষেরাই তো ভয় পায়। রাষ্ট্র বিপ্লবের পর কি কোথাও কোনো পরাজিত মানুষ থাকে না? বিষণ্ণ মুখ থাকে না? সমরজিতের কাছে হেরে যাচ্ছি আমি তা টের পেয়েছিলাম। বিহান কমিউনিস্ট ইস্তাহার পড়বে, পড়ুক না। আমিও কি পড়িনি? বিপ্লবের গান পড়বে, আমিও কি পড়িনি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পড়ব না? কেন নয়? পড়েও ছিলাম। পড়তে পড়তে রক্তের ভিতরে প্রবল উচ্ছ্বাসও টের পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল এক অলৌকিক পৃথিবীর কথা পড়ছি আমি। বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত। আমি যে লু-সুনের অনুরাগী, ম্যাডম্যান'স ডায়েরি, আ ট্রু স্টোরি অফ আ-কিউ পড়ে বিহানকে পড়তে দিয়েছিলাম। যা ভাল পড়ি তা বিহানকে পড়াই। ডাকঘর, বিসর্জন পড়তে বলি। মধ্যবর্তিনী, শেষের রাত্রি, গুপ্তধন, নষ্টনীড় পড়তে বলি। গল্পগুচ্ছ দিয়ে দিলাম, আমার চেখবের বই নিয়ে আর ফেরতই দেয়নি

বিহান। দাগিয়ে দাগিয়ে পড়া বইটা নিয়ে বলল, তুমি আর [illegible] এই বইটা কত মূল্যবান, তোমার ছোঁয়া লেগে আছে পাতায় পাতায়, আমি যখন বইটা নিয়ে আমার ঘরে একা হই আশিস, মনে হয় তুমি আছ পাশে [illegible] তোমার কলমের ছোঁয়া, অত নিবিড় ভাবে পড়তে হয় যে [illegible] জানলাম, আশিস যখন আমি ঘুমোই, আমার পাশে চেখব থাকেন, চেখব নন, তুমি তুমি না থাকলে ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স কে পড়াত আমাকে? সেই বিহান আমাকে বলল, প্রায় সারারাত ধরে বিপ্লবের গান পড়েছে, তার মানে চেখব সরে গেছেন।

এর মানে কি আমার হেরে যাওয়া নয়? বিপ্লব তো কাউকে না কাউকে হারিয়ে দেয়, সেই হেরো মানুষটা যায় কোথায়? হেরো মানুষরা কি সবসময় ভীষণ অত্যাচারী হয়, দানবের মতো শক্তি তার। সেই দানবের মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতেই হয় শুধু। বিহান শুনে বলল, তুমি ভুল করছ আশিস, তোমার আমার মতো মানুষ হারবে কেন, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়.....।

আশিস যা আন্দাজ করছিল ভয়ে ভয়ে তা ক্রমশ সত্য হয়ে উঠতে থাকে। কই বিহান? বিহান বিহান, তুমি আর নেই সে তুমি! তার দেখাই মেলে না। সমরজিতের কাছে হেরে যাচ্ছে সে তা টের পেতে থাকে। হেরো মানুষ বারবার হেরেই যায়। কিন্তু এও হয়, হেরে গিয়েও সে দমে না। না দমলে তাকে সাইবেরিয়াতেও যেতে হয়, তবু সে দমে না। কিন্তু সে তো দস্তয়েভস্কি। মস্ত উঁচু মানুষ। লক্ষ কোটিতে একজন। গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত সলঝেনিৎসিন। আমি তো আমার পিতার ভয় নিয়ে জন্মেছিলাম। আমার কোনো গোপনীয়তা নেই, থাকতে পারে না। আমার কোনো পছন্দ থাকতে পারে না। আমি আমার প্রিয়জনকে ভালবাসতে পারি না, হেরে যাওয়ার ভয় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যখন ভাবি এই তো আমার জয়ের নিশান, এবার উড়াব এই নিশান, আমরা করব জয়..... টেরও পাই না আমার চেয়ে শক্তিমান দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পিছনে, নিশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের উপর।

বিহানকে নিয়ে নিল সেই সমরজিৎ। কৌলীন্যে সে আশিসকে হারালো, রূপে আর অরূপে হারালো আশিস চন্দকে। সব কিছু হয়ে গেল নিঃশব্দে। বিহান বলল, আমার তো সেই স্বাধীনতা আছে আশিস, কতটা সময় কোথায় দেব, কী পড়ব, কী পরব, আমিষ না নিরামিষ, কখন কোথায় যাব না যাব, তুমি আমাকে বন্দী করলে হয় কী করে?

আমি যে তোমার কাছে বন্দী হয়ে গেছি।

বিহান প্রথমে কোনো জবাব দেয়নি, একটু পরে নিম্নস্বরে বলেছিল, আমার কোনো খাঁচা নেই, নিজেও আমি খাঁচায় নেই, আমিও কাউকে খাঁচায় রাখিনি।

কতদিন আগের কথা এসব। এখন কি মনে হয় এ জন্মে এসব ঘটেছিল? সেই বয়সের ছবি দেখলে কি নিজের মনে হয়! মনে হয় না অন্য কারোর? অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে বিহানের পাশে সেই গ্রুপ ছবিতে। গ্রুপ ছবিতে সমরজিৎও আছে। আছে আরো বন্ধু, বন্ধুনি। সুজাতা বলল, কী হলো, পুরোন অ্যালবাম কেন?

এই আমাদের বন্ধু সমরজিৎ, দেশ বিদেশ ঘুরে এখন থাকে সাউথ সিটির সেই থার্টিয়েথ ফ্লোরে। সবচেয়ে সাকসেসফুল মানুষ। ও আর বিহান। আমার বন্ধু বলত পথেই হবে তার ঘরবাড়ি, সে এখন তিরিশ তলায়, সমরজিৎ মাস ছয় আগে একবার হঠাৎ যোগাযোগ করেছিল, যেতে বলেছিল তার ফ্ল্যাটে।

বলেছিলে তো, গেলে না কেন?

বলেছিলাম ভয় করবে।

কিসের ভয়?

তিরিশতলার ভয় সুজাতা, আমি হলাম সেই ভীরু কেরানি, বাবা একবার বিরোধীদলকে ভোট দিয়ে ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরোননি সাতদিন।

কতবার বলেছ ও কথা, তিনি খুব ভালমানুষ ছিলেন, ভালমানুষ মানে কি ভীরু মানুষ?

কী জানি তাই মনে হয় যেন।

তোমার কেরানির গল্প তো এত বছর ধরে শুনেই গেলাম, বইটা কাকে দিয়েছিলে?

সত্যি, বইগুলো সব কোথায় গেল বল দেখি।

হাওয়াইয়ান গিটার হাতে আবার ঢুকে পড়ল অভিজিৎ, বলল, এখনো সেই কথা, বাবা তোমরা পারোও বটে, টিভিতে কী দেখাচ্ছে দ্যাখো গিয়ে।

কী দেখাচ্ছে?

মাটির নীচ থেকে একের পর এক কঙ্কাল বেরিয়ে আসছে, বাবা তোমরা কী করেছ এত দিন ধরে? ছিহ্!

কী করব, এই তো আমি, তোর মা, তুই, তোর দিদি, এই তো আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই, বড় কিছু যে করব সে সাহস আমার ছিল না, তুই ডেথ অফ এ ক্লার্ক পড়েছিস, ভয়ের চোটে লোকটা মরেই গেল, আশিস চন্দ বেঁচে আছে এইটাই তার সাহসের প্রমাণ।

ও সব বললে তো হবে না বাবা, আমার আঠের বছর হয়নি এখনো, ভোট কী করে দিতে হয় জানি না, কত কঙ্কাল উঠছে মাটির তল থেকে, তার মানে তারা সবাই তোমার মতো ছিল না, তারা দস্তয়েভস্কি, সলঝেনিৎসিন ভগৎ সিং, যতীন দাস, ষাট দিন পরে অনশন করে মরে গেলেন তিনি, বাবা তোমরা সারাজীবন [illegible] করলে না কিছুই না, অথচ গাঁয়ের মাটির নীচ ভরে গেল মরা মানুষের [illegible] কঙ্কালে। মাটির নীচে থেকে দস্তয়েভস্কি, যতীন দাস, ভগৎ সিং-দের কঙ্কাল উঠে আসছে বাবা।

মাথা নিচু করে থাকল আশিস চন্দ। সুজাতা বলল, তুমি মন খারাপ করছ কেন, আসলে তো তোমাকে বলছে না তোমার ছেলে।

ছেলে আবার এ ঘরে নেই। সে টিভির সামনে বসে দেখছে সেই সব ভয়াবহ শাদা কালো ছবি। লালমাটির পথও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বনের শাল-মহুয়া-শিরিশ-কেঁদের অরণ্য ছাই-এ ঢেকে গেছে। লাল মাটির ডাঙা ডাহি, প্রান্তর কালো হয়ে পড়ে আছে। গাঁয়ের মানুষ, লং মার্চের কৃষক, শ্রমিক, বিপ্লবের গান গাওয়া হাড়জিরে অনাহারি মানুষ হাঁটু মুড়ে বসে আছে, কালো মানুষ, দ্রাবিড় মানুষ তারা। তাদের সামনে ছড়িয়ে আছে ধবধবে শাদা হাড়-কঙ্কাল, হাত পা মাথা সব। এত শাদা শুধু ভাতেরই রং হয়। আর কোনো কিছুরই নয়। সেই হাড়-কঙ্কাল ছুঁয়ে আছে যারা, তারা বহুবছর, তাদের যৌবন থেকে এই বার্ধক্যের কাল, হাজার হাজার মাইল হেঁটেছে শুধু লং মার্চে।

দরজার ফাঁক দিয়ে আশিস চন্দ দেখতে দেখতে না পেরে সরে গেল নিজের ঘরে, বই-এর স্তূপের ভিতর। তারপর উঠে এল। জানালার ধারে বসে মোবাইল ফোন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কত কথা সমরজিতের। বহুজাতিক কোম্পানির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সাত বছর ছিল নিউ-ইয়র্কে। কলকাতায় এসেছেও তা দশবছর। বিহান তার কথা বলে। বিহানই ডেকেছে তাকে। সমরজিতের গলায় বিস্ময়, 'হ্যাঁরে, তুই এখনো চেখব, তারাশঙ্কর পড়িস, জীবনানন্দ?'

বিহানের ফোন নম্বর দিয়েছিল সমরজিৎ। সেও তো বছর দুই হয়ে গেল। তখন কলকাতা মিছিল আর প্রতিবাদে ফুঁসছে। নিরীহ মানুষ মরেছে ভিটেমাটি বাঁচাতে। ভীরু কেরানির পুত্র লোকটা কোনো মিছিলেই বেরোয়নি। আর ক'দিন চাকরি আছে, তার যদি ক্ষতি হয়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় প্রহরা আছে। কে কখন কোথায় যায় তার খবর চলে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষের কাছে। কে কখন কী ভাবছে, তাও গোপন নয়। সে তো ভীরু কেরানিই হয়েছে, একবার সে মরেছিল ভয়ে, আর মরতে রাজি নয়। সেই সময় গিয়ে আর এক সময় এল। তার এখন একটাই কাজ, সেই যে দাদু দিদিমা, হলদে ঝুঁটি মোরগ দুটি আর মিশা নামের ভালুকের গল্প থেকে যার আরম্ভ সেই [illegible] বইগুলি খুঁজে বের করা। আমারও কিছু অর্জিত অধিকার ছিল, তা আবার [illegible] [illegible] নেব, ইভান ইলিচের কথা আবার পড়ব এই বয়সে।

'বিহান, চেখবের সেই বইটি কি আছে তোমার কাছে, সোভিয়েত রাশিয়া নেই, নেই প্রগতি প্রকাশন, কলকাতার কোথাও ওই বই খুঁজে পাবে না আর, আছে তো, না হারিয়ে গেছে এতদিনে?'

মেসেজ পাঠিয়ে দিল আশিস চন্দ। ওরা এই শহরে কি এখনো আছে? স্বপ্নে ভরা এই শহরে? এই শহরটার কিছুই নেই, আছে শুধু অযুত নিযুত স্বপ্ন। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় তার মোবাইল বেজে উঠল, 'আছে, স্বপ্নের ভিতরে আছে সেই বই, আমার কাছে, আমার নিদ্রায় অনিদ্রায় স্বপনে জাগরণে আছে সে।'

কেঁপে উঠল বছর পঞ্চান্নর আশিস চন্দ। সেই বই, তার পাতায় তার কলমের দাগ। যে পংক্তিগুলো মনে বসে যেত, তার তলায় দাগিয়ে দেওয়া ছিল তার অভ্যেস। সেই বই ছুঁয়ে শিহরিত হতো ধোঁয়া ধুলো আর বারুদ গন্ধে ভরা সেই কলকাতা মেয়ে, কেমন বলত সে, ওই বই আমার সোনার কাঠি আশিস, পাতা ওল্টাতেই তোমার গা ছুঁয়ে যায় আমার হাত, আমার শিয়রে থাকে সে তোমার ঘাম গন্ধ নিয়ে।

কেরানির আর মরণ হল না। সে যে হারেনি এই জীবনে তা জানতে এতটা বছর কেটে গেল, তবু জানতে তো পারল। কথাটা বুকের ভিতরে নিয়ে আশিস চলল ওই ঘরে সুজাতা আর অগ্নিভর কাছে। তার পরিবারে, মাথা উঁচু করে, বুক চিতিয়ে।

(অনুষ্টুপ-২০১১)

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

ধ্রুবপুত্র
অশ্বচরিত
আগুনের গাড়ি
সুবর্ণরেখা
কৃষ্ণগহ্বর
নদীবসত
খরাবন্যার ফুল
জনসমুদ্র
আসনবনি
অরুন্ধতী তারার রাত
নিসর্গের শোকগাথা
হাঁসপাহাড়ি
এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ
অমর মিত্রর ছোটগল্প
সমাবেশ
বসন্ত বিলাস
শ্রাবণ অগ্রহায়ণ
কাঁটাতার
সমুদ্রের স্বর
নীল প্রহর
ভি. আই. পি. রোড
দানপত্র
মাঠ ভাঙে কালপুরুষ
আলোকবর্ষ
ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে (মনোজ মিত্রর সঙ্গে)
চাঁদু গায়েনের ডাকাত ধরা (ছোটদের)